সাংস্কৃতিকী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

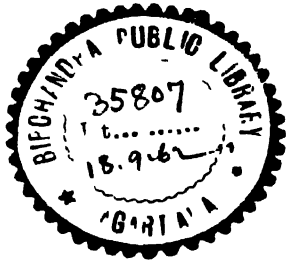

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো,
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
কানাই পাল

মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিভিন্ন সময়ে রচিত ও নানা পত্র-পত্রিকায় কিংবা পুস্তকের ভূমিকা-রূপে প্রকাশিত, অনেকগুলি প্রকীর্ণ প্রবন্ধের মধ্য হইতে কতকগুলি লইয়া, 'সাংস্কৃতিকী' নামে বর্তমান সংকলন প্রস্তুত হইয়াছে। সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বারোটি প্রবন্ধ আছে। পুনর্মুদ্রণের কালে কয়েকটি প্রবন্ধের স্থানে স্থানে প্রয়োজন-বোধে কিছু সংশোধন বা সংযোজন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সংকলনে ও ইহার মুদ্রণে আমি স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অনিলকুমার কাঞ্জিলালের নিকট হইতে প্রচুর সহায়তা পাইয়াছি, এই কার্য্যে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সুরুচি উভয়েরই সাহায্য আমি সানন্দ চিত্তে স্বীকার করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, শ্রীমান্ রাণা বসু বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত বইয়ের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—২২ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৬৮, ৬ মার্চ ১৯৬২ ॥

'সুধর্মা'
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সূচী-পত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	সংস্কৃতি ('সোনার বাংলা')	১-১৩
২।	যবদ্বীপের মহাভারত ('প্রবাসী'-প্রকাশিত কাশীদাসী 'মহাভারত'-এর ভূমিকা)	১৪-২৯
৩।	রামায়ণ (শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর ভূমিকা)	৩০-৪৬
৪।	কুরল্ (নলিনীমোহন সান্যাল-অনূদিত 'কুরল'-এর ভূমিকা)	৪৭-৬২
৫।	কোল-জাতির সংস্কৃতি ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)	৬৩-৯৬
৬।	তাও ('উদ্বোধন')	৯৭-১০৮
৭।	সূফী অনুভূতি ও দর্শন ('উদ্বোধন')	১০৯-১২২
৮।	অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)	১২৩-১৫৬
৯।	দরাপ খাঁ গাজী ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)	১৫৭-১৭৪
১০।	মণিপুর-পুরাণ ('উদ্বোধন')	১৭৫-১৮৮
১১।	শিল্প-কলা (পাটনায় অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে শিল্প-কলা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ)	১৮৯-২১৪
১২।	রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" ('শারদীয়া বসুমতী')	২১৫-২৩৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

(২ অক্টোবর ১৮৮৯—২৯।৩০ জুন ১৯৫৯)

অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ ও সোদরোপম সতীর্থ

স্মরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটি আজকাল বাঙলায় খুবই চ'ল্‌ছে। চারিদিকেই, বিশেষতঃ তরুণদের মধ্যে, নানা সংস্কৃতি-সভার আর সংস্কৃতি-সম্মেলনের কথা শোনা যাচ্ছে। এই সভা আর সম্মেলন করা আজকাল শিক্ষিত আর শিক্ষিতুকাম জনসমূহের মধ্যে একটি বাতিক বা ব্যসনের মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'সংস্কৃতি' ব'ল্‌লে কী বোঝা উচিত, সে সম্বন্ধে হয়তো সকলের একটা স্পষ্ট ধারণা নেই; কিন্তু একটা আব্‌ছা-আব্‌ছা বোধ বা অনুমান সকলেরই আছে যে. 'সংস্কৃতি' দ্বারা সাহিত্য সংগীত রূপ-কলা নাটক নৃত্য এই-সব ধ'র্‌তে হয়। বাঙলাদেশে বা বাঙালীদের মধ্যে—এবং বাঙলার বাইরে বহু অবাঙালীর মধ্যেও—একটা এই ধরণের বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীতেই আধুনিক ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তার সবচেয়ে লক্ষণীয় রূপ নিয়েছে। 'সংস্কৃতি' শব্দটি আর তার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি কিন্তু বিশ পঁচিশ বা ত্রিশ বছর আগে এতটা লোক-প্রিয় হ'য়ে ওঠেনি। কোনও জাতির মধ্যে তার ভাষার কোনও বিশেষ শব্দের লোকপ্রিয়তা কোনও বিশেষ যুগে বেশ দেখা যায়। ভাবটি বা বস্তুটি অপরিবর্তিত রইল, কিন্তু তার প্রকাশক শব্দটি ব'দ্‌লে গেল—এটি অনেক সময়েই হ'য়ে থাকে; শব্দের fashionableness অর্থাৎ শব্দ-সম্বন্ধে লোক-রুচি, পরিধেয়-গত রুচির মতনই অনেক সময়ে নিতান্ত অকারণে বা খামখেয়ালি-ভাবে ঘ'টে থাকে।

একটা খুব সরল ভাব নিয়ে এই রকম শব্দ-পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া যায়। ইংরিজি love-এর প্রতিশব্দ এখন যা বাঙলায় জোরের সঙ্গে চ'ল্‌ছে, সেটা হ'চ্ছে 'ভালোবাসা'। ইংরিজিতে খুবই বাচংযমতা আছে, ওদের ভাষায় 'লাভ্‌' এই একটি syllable বা অক্ষরের দ্বারা প্রকাশিত ভাবটিকে বাঙলায় জানাতে হ'লে কিন্তু চারিটি অক্ষর 'ভা-লো-বা-সা'-র দরকার হয়। কিন্তু 'ভালোবাসা' শব্দটি (বা মিলিত শব্দ দুইটি), দু-শ বছর আগে বাঙলা ভাষায়, love, এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হ'ত না। তখন 'ভালো-বাসা'-র অর্থ, শুদ্ধ বা কেবল প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, প্রীতি, প্রভৃতি ছিল না;—'ভালোবাসা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই মিলিত শব্দটি কতকটা যেন বর্ণ- বা রাগ-হীন নিষ্প্রাণ শব্দ ছিল; এর অর্থ ছিল তখন, 'ভালো ব'লে অনুভব করা, ভালো মনে করা।' 'ভালো-বাসা' শব্দের 'বাসা' বা 'বাস্' ধাতু, 'বোধ করা' অর্থে প্রযুক্ত হ'ত—এখন এই অর্থে ধাতুটি অপ্রচলিত হ'য়ে যাচ্ছে। 'ভালোবাসা'-র পাশাপাশি 'মন্দ-বাসা' শব্দটিও মাঝে মাঝে শোনা যায়; কিন্তু প্রাচীন বাঙলাতে 'বাস্' ধাতু বেশ জীবিত ধাতু। এই ধাতুর সহযোগে 'ভালো-বাসা', 'মন্দ-বাসা'-র মতন পুরাতন বাঙলায় 'ভয়-বাসা', 'ঘৃণা-বাসা', 'লজ্জা-বাসা', 'দুঃখ-বাসা' প্রভৃতির প্রয়োগ খুবই মেলে; এমন কি, 'বাসি ভাত ব্যঞ্জনে জিহ্বায় জল বাসে', এ-ও পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যের মধ্যে দেখি, রাহী বা রাই আর কান বা কানু পরস্পরের প্রতি 'নেহ' বা 'নেহা' (অর্থাৎ কিনা 'স্নেহ') করে। 'ভালোবাসা' অর্থে অন্য খাঁটি বাঙলা শব্দ চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভাষায়, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১৫-র শতকে, অজ্ঞাত। এই 'নেহ, নেহা' শব্দ পরবর্তী কালে, ১৬-র আর ১৭-র শতকে 'লেহ, লেহা' রূপ ধরে, আর আজকালকার বাঙলায় এর একটি রূপ হ'চ্ছে 'নেই'—যেমন, 'কুকুরকে নেই দিলে মাথায় চ'ড়ে বসে'। ১৬-র শতকের শেষ থেকে সম্ভবতঃ, আর ১৭র শতকে, 'লেহ, লেহা' বোধ হয় সেকেলে শব্দ ব'লে পরিগণিত হয়। তখন সংস্কৃত 'প্রীতি' শব্দটি এসে বাঙালীর কাছে বড়োই প্রিয় হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রায় সকলেই (বিশেষ ক'রে কবিরা) এই শব্দের মোহে প'ড়ে যায়; শব্দটিকে ভেঙে 'পিরীতি' আর পরে 'পিরীত' ক'রে নেওয়া হয়। আজকাল যেমন 'অবদান', 'রূপদক্ষ', 'সত্যিকার', 'আকাশ-বাতাস', 'আপ্রাণ', 'প্রচেষ্টা', 'প্রগতি', 'পরিস্থিতি' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের লোকপ্রিয়তা দেখা যায়, 'পিরীতি, পিরীত' শব্দটিকে নিয়ে 'ভালোবাসা' অর্থে লোকে তখন তেমনি মাতামাতি আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে জড়িত সহজিয়া ভাবের কবিতা কতগুলি আছে; সেগুলিতে 'পিরীতি, পিরীত' শব্দ নিয়ে অনেক 'আদিখ্যেতা' অর্থাৎ বাক্যবিন্যাস করা হ'য়েছে—যেমন, 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে?' ইত্যাদি শীর্ষক পদ। কিংবা 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর এ তিন ভুবন' ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ করা পদ। 'পিরীতি'র রাজত্বের অবসান হ'ল, বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় ১৭০০-র পূর্বেই। এখন 'প্রেম বা প্রণয় বা ভালোবাসা' অর্থে ভদ্র-সমাজে 'পিরীত' শব্দের ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অশিষ্ট ব'লে পরিগণিত হবে ; শব্দটি এখন জাতিচ্যুত হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় ১৮-র শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার ভাওয়ালে ব'সে পোর্তুগীস পাদ্রি বা সাধু-বাবা মানোএল দা-আসসুম্পসাউঁ তাঁর যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' বই লেখেন, আর যে বই রোমান অক্ষরে লিস্‌বনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান, তাতে কিন্তু 'ভালোবাসা' অর্থে 'দয়া করা' প্রযুক্ত হ'য়েছে, অন্য শব্দ নয় : যীশু মানুষের প্রতি দয়া করেন, ঈশ্বরও দয়া করেন, আর 'মাউগ' আর 'ভাতার'ও পরস্পরের প্রতি দয়া করে। 'দয়া করা' এখন কেউ বোধ হয় আর বলে না। সুতরাং, 'প্রীতি, স্নেহ, প্রেম, পিয়ার-করা', এই ভাবের জন্য, বিভিন্ন যুগের 'নেহ, নেহা করা', 'পিরীতি, পিরীত করা', 'দয়া করা' এবং শেষটায় 'ভালোবাসা', এই শব্দগুলির প্রয়োগ পর-পর এক বাঙলাতেই দেখা দিয়েছে।

ভালোবাসার মতন পুরাতন বা সনাতন ভাবের প্রকাশক শব্দের সম্বন্ধে এই রকম ফ্যাশন বদলায়। নোতুন বা হালের আমদানী-করা ভাব বা চিন্তাধারার সম্বন্ধে তো শব্দ বদলাবেই। একেবারে নোতুন শব্দ তো আসবেই, আবার অর্থ বিকৃত ক'রে বা বদলিয়ে' পুরাতন শব্দেরও ব্যবহার হ'বে। মধ্যযুগের ভারতের ধর্ম-সাধনায় খুব বেশী ক'রে ঈরানের সূফী মতবাদের, সূফী সংঘবদ্ধ সাধনার প্রভাব এসে প'ড়েছিল—এমন কি বাঙলার চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় মতের বৈষ্ণব সাধনার উপরেও। ঈরানী সূফী আধ্যাত্মিক সংগীতের ছায়া বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়, বৈষ্ণব উদ্দাম কীর্তনের সঙ্গে সূফীদের নামের জিকির বা সমবেতভাবে উচ্চৈঃস্বরে নাম-জপের মিল আছে ; এইরূপ কীর্তনে যদি কোনও ভক্তের ভাবাবেশ হয়, বাঙলাতে তাকে বলা হয় 'দশা'। এই 'দশা' শব্দ এই বিশেষ অর্থে প্রাচীন সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, কারণ এই ধরণের সমবেত-ভাবে গান গেয়ে ধর্ম-সাধনার রেওয়াজ বা রীতি প্রাচীন যুগে ছিল না ব'লেই মনে হয়। এখন, ফারসীতে সূফীদের পারিভাষিক শব্দে এইরূপ ভাবাবেশকে 'হাল' বলা হয়—'হাল' মূলে আরবী শব্দ, এর মুখ্য অর্থ হ'চ্ছে 'অবস্থা', পরে 'ভাবাবেশ'-অর্থে ফারসীতে এর অর্থ-বিস্তার ঘটে ; বাঙলায় 'দশা' শব্দটিরও এই বিশেষ অর্থে প্রয়োগ, ফারসী 'হাল'-এরই দেখাদেখি হ'য়েছিল ব'লে মনে হয়। যাঁদের হাতে, যাঁদের দার্শনিক বিচার আর পাণ্ডিত্যের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁদের মধ্যে শ্রীরূপ আর শ্রীসনাতন যে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, সেকথা মনে রাখ্‌তে হবে ; আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবেরও যে মুসলমান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল, একথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জান্‌তে পারা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নোতুন ধরণের একটি ধার্মিক বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের জন্য প্রাচীন শব্দ পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হ'ল।

আবার বহু স্থানে নোতুন ভাব বা দৃষ্টি অথবা বস্তু বা ব্যাপারের জন্য পুরাতন শব্দ ব্যবহারে অসুবিধা হ'লে, বা সে বিষযে জ্ঞান না থাক্‌লে, নোতুন শব্দ, বিদেশী শব্দ, বিনা প্রশ্নে গৃহীত হ'য়ে যায়। এই ব্যাপাব মধ্য-যুগের বাঙলায় যথেষ্ট পরিমাণে হ'য়েছে—বাঙলায় আগত প্রায় আড়াই হাজার ফারসী ও আরবী-ফারসী শব্দ আর এক শ'র উপর পোর্তুগীস শব্দ তার প্রমাণ ; আর এখন তো আমাদের দ্বারা শত শত ইংরিজি শব্দ অহরহঃ গৃহীত হ'চ্ছে—প্রায় হাজার বারো-শ' ইংরিজি শব্দ তো এবই মধ্যে বাঙলা শব্দ হ'য়ে বাঙলা ভাষায় এক রকম স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছে। নোতুন নোতুন ভাবের, দৃষ্টিভঙ্গীর আর ব্যাপারেব জন্য বাঙলায় আগত কতকগুলি বিদেশী (আরবী-ফারসী আর ইংরিজি আর অন্য ভাষার) শব্দের নমুনা—'মারফতী (গান), শহীদ, কোরবানি, খেতাব, বীমা, নজর (=ভেট), মুলতবী, বহস, সরাই, কাফের, তাল্লাক, হারাম, তপসীলী ; লাট (=লার্ড, লর্ড), গবর্নমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, ভোট, কণ্ট্রোল, হোটেল, কমিশন, কমরেড, মিশন, কংগ্রেস, পাদ্রি, বলশেভিক, নিহিলিস্ট' ইত্যাদি। সাধারণতঃ নোতুন আমদানী-করা বস্তুর নাম সহজেই গৃহীত হয। বিদেশ থেকে আগত নোতুন জিনিসের সঙ্গে তার বিদেশী নামটাকে বর্জন করার চেষ্টা করা হয না ; যেমন—'বরফী, সান্তারা (= কমলালেবু), তামাকু, কিংখাব, মীনা, চা, গ্যাস, সেলুলয়েড, বেকলাইট, কুইনাইন, ম্যাজেণ্টা, পেনসিলিন' প্রভৃতি। কিন্তু ভাব- আর দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পর্কিত শব্দ, আধিমানসিক আর আধ্যাত্মিক বিষয়ের শব্দ—এগুলির সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই নিজেদের শব্দ-ই ব্যবহার ক'রতে চাই। আর যদি আমাদের প্রাচীন চিন্তাধারা আর সাহিত্যের গতি অব্যাহত থাকে, তা হ'লে আমরা এ বিষয়ে খুবই রক্ষণশীল হ'য়ে থাকি, নিজেদের শব্দই যতদূর সম্ভব ব্যবহার ক'রতে চাই—তা প্রচলিত শব্দ-ই হোক্ বা নোতুন ক'রে গ'ড়ে নেওয়াই হোক্, অথবা প্রাচীন সাহিত্য বা শব্দ-ভাণ্ডার থেকে পুনরুদ্ধার ক'রে আনাই হোক্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মানুষ বিশেষ-ভাবে নিজেকে জানবার প্রথম চেষ্টা করে প্রাচীন গ্রীস দেশে। সেখানে মানুষের জীবনের কেন্দ্র, চিন্তার কেন্দ্র ছিল নগরে—যেমনটা প্রায় সব দেশেই হ'য়ে থাকে। প্রাচীন কালের সুসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রাচীন গ্রীসেও ছিল—তারা মনে ক'রত যে, যেহেতু তারা ছিল Hellenes হেল্লেনেস বা গ্রীক, সেই হেতু তারাই জগতে মানুষের মধ্যে ছিল উন্নত, তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ আর সভ্য; আর বাকী সব জাতির মানুষ, যাদের ভাষা ছিল গ্রীকদের কাছে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য, তারা সকলে ছিল Barbaroi বার্বারোই বা বর্বর—অসভ্য। গত দুই তিন হাজার বৎসরের বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আর নৃতত্ত্ববিদ্যা নামে নব-জাত মানব-বিষয়ক বিজ্ঞানের বলে, তা ছাড়া পশ্চাৎপদ জাতির মানুষকে দলনে সভ্য জাতির মানুষের ক্ষমতা বা অধিকার কার্য্যতঃ মেনে নিয়ে—আজকাল আমরা যে-রকম ব্যাপকভাবে মানুষকে 'সভ্য' অথবা 'অসভ্য' পর্য্যায়ে ফেলি, সেটা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষেও, যারা আর্য্য-ভাষা-নিবদ্ধ ধর্ম আর রীতি-নীতি গ্রহণ ক'রেছিল, তারা ছিল 'আর্য্য', আর বাকী ছিল 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ 'মিশ্র' জাতির মানুষ। এতদ্ভিন্ন, চতুর্বর্ণের theory বা ধারণা আসাতে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে একটু অন্য ভাবে, ধর্মনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা ভারতবর্ষে হ'য়েছিল। সভ্য আর অসভ্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীসে আর ভারতে এই ধরণের মনোভাব ছিল—নাগরিক-ই সভ্য, গ্রাম্য-ইঅ সভ্য। সংস্কৃতের 'সভ্য' শব্দের মুখ্য অর্থ—যা সভা-র উপযুক্ত, যেখানে পাঁচজনে ভদ্রভাবে বা বন্ধুভাবে মিলিত হয়, সেখানকার উপযুক্ত; আদি-আর্য্য-ভাষায় 'সভ্য' মানে কোনও গোত্র বা গোষ্ঠী দলের মানুষ, এই শব্দের ইন্দো-ইউরোপীয় প্রতিরূপ হ'চ্ছে *sebhyos, যা-থেকে অধুনা প্রায় অপ্রচলিত ইংরিজি শব্দ sib, sibling (অর্থাৎ 'আত্মীয়') উদ্ভূত হ'য়েছে, আর জরমান শব্দ Sippe অর্থাৎ 'জ্ঞাতিগোষ্ঠী'। তা হ'লে 'সভ্য' শব্দ মূলতঃ হ'চ্ছে 'গোষ্ঠী-সম্পৃক্ত'; তারপরে হ'ল 'জনসমাগম-সম্পৃক্ত'; পরে 'ভদ্র, সংযত, সংস্কারযুক্ত, refined, civilized', এই-সব অর্থ সহজেই উদ্ভূত হয়।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আমরা হালে civilized আর uncivilized শব্দ দুটি শিখলুম। নৃতত্ত্ববিদ্যা তখন শিশু-অবস্থায়; অনেকটা ইউরোপীয় শ্বেতকায় শ্রেষ্ঠতা-বোধের দ্বারা চালিত সেই শিশু-বিদ্যার নির্দেশে আমরা তখন মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

civilized বা uncivilized পর্য্যায়ে ফেল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম। তখন আমাদেব ভাষায় এই দুই ইংরিজি শব্দের প্রতিশব্দেব দরকার হ'ল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আমরা 'সভ্য' আর তার বিপরীত 'অসভ্য' এই দুইটি শব্দ সংস্কৃত থেকে গ্রহণ ক'র্‌লুম। এইবারে, একটি নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখবার রীতি এল ; সংস্কৃত 'সভ্য' আর 'অসভ্য' শব্দদ্বয বাংলা আব আধুনিক ভারতীয ভাষায তাদের আধুনিক অর্থ গ্রহণ ক'র্‌লে।

মানুষের সভ্যতা বা সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভের কথা আলোচনা ক'বে আমাদের জ্ঞান আর বোধ-শক্তি যতই বাড্‌তে লাগ্‌ল, ততই এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম-ভাবে দেখার আবশ্যকতা দেখা দিল, সেই সঙ্গে দেখা দিল নোতুন শব্দেব আবশ্যকতাও। পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতিব বা জনগণেব মধ্যে আছেই ; কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি ক'র্‌তে পারলুম—ঘরবাড়ি, যন্ত্র-পাঁতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতিব জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতবেব ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতাব আভ্যন্তব প্রাণ বা অনুপ্রেবণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তব অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিবিক্ত বস্তুটির নাম-কবণ হ'যেছে ইংরিজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয ভাষায Culture (জর্‌মানে Kultur 'কুল্‌তুর') শব্দ রূপে। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল আর ফল, আবার ফল থেকে বীজ, তা থেকে পুনরায় গাছ ; বিভিন্ন গাছের ভিতর দিয়ে এই কার্য্য বা গতিক্রম চ'লেছে। যদি এক-ই বিশাল আর ক্রমবর্ধিষ্ণু বনস্পতির ভিতরেই এই গতিক্রম কার্য্যকর হ'য়ে দেখা দিত, তাহ'লে কোনও সমাজের গতিশীল সভ্যতা আর সংস্কৃতির সঙ্গে উপমার বস্তু পাওয়া যেত। আমরা মোটামুটি ভাবে ব'ল্‌তে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হ'চ্ছে culture। অবশ্য একেবারে সর্বজন-স্বীকৃত পারিভাষিক শব্দ রূপে civilization বা সভ্যতা আর culture শব্দ দুটিকে সকলেই এইভাবে সব সময়ে ব্যবহার করে না ; কিন্তু যখন কোনও জাতের বাইরেকার সভ্যতা দেখে তাকে পুরাপুরি চেনা যায়, তখন ব'ল্‌তে হয়—'এহো বাহ্য', ভিতরের কথা কী ? তখন তার মানসিক আর আনুভবিক দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার বাহ্য সাধন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রকাশ, তার দর্শন সাহিত্য শিল্প সংগীত প্রভৃতি, তার মানসিক প্রবৃত্তি আর তার অবচেতনা, তার নৈতিক আদর্শ আর তৎপ্রকাশক সহ-জ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিপাটি, এ-সমস্তের কথা এসে যায়ঃ এ-সমস্তকে বাহ্য 'সভ্যতা' ছাড়া আর একটা সর্বন্ধর সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা হয়। সেই সংজ্ঞাটি ইউরোপে culture শব্দের রূপে দেখা দিয়েছে।[১]

এই culture শব্দের মূলে আছে লাতীনের cultura 'কুলতুরা' শব্দ; এই শব্দ লাতীনের col 'কোল্' ধাতু থেকে হ'য়েছে, col অর্থে 'কৃষ্, চাষ করা', আবার 'যত্ন করা, পূজা করা'-ও হয়। culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ-সাধন' বেশ হ'তে পারে, খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চ'লতে পারে। 'টানা' ও পরে 'লাঙ্গল টানা' বা 'চাষ করা' অর্থে, 'কৃষ্' ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অর্থের দিক থেকে culture-এর প্রতিরূপ শব্দ মনে ক'রে, বাঙলায় ব্যবহার করা হ'তে থাকে বোধ হয় গত তিরিশ বছরের ভিতরে। বঙ্কিমচন্দ্র culture-অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'কৃষ্টি' শব্দটি গতানুগতিক-ভাবে গ্রহণ ক'রে থাকবেন—যদি তিনি স্বয়ং এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়ে না থাকেন। 'কৃষ্টি'র অর্থগত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাঙলায় গৃহীত এর culture-অর্থ সমর্থিত হয় না। 'কৃষ্টি'র মূলগত অর্থ 'কর্ষণ-কার্য্য', তা থেকে 'চাষ-করা ক্ষেত', তা থেকে 'ক্ষেত্র, ভূমি, দেশ', এবং তারপরে 'দেশের মানুষ, জাতি'। বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে 'জাতি'; যেমন, 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' মানে 'পাঁচ জাতি'—প্রথম-প্রথম আর্য্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা, অনু, দ্রুহ্য, তুর্বশ, যদু আর পুরু বংশের লোকেদের সম্বন্ধে এই 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' শব্দ প্রযুক্ত হ'ত, পরে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের অর্থ-প্রসার ঘটে। 'চাষ'-অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে। culture-অর্থে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটি সম্বন্ধে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

'সংস্কৃতি' শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশী হন। এই শব্দটি বাঙলায় এখন থেকে ২৪।২৫ বছর আগে কেউ ব্যবহার ক'রেছেন কিনা জানি না। 'সংস্কার' শব্দটি অবশ্য পাওয়া যায়, তা কিন্তু culture-অর্থে নয়; কতকগুলি সামাজিক ধার্মিক অনুষ্ঠান (যেমন, বিবাহ-সংস্কার), আর চিরপোষিত বা বংশধারানুসারে লব্ধ বোধ বা বিচার অর্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শব্দটি রূঢ়ি হ'যে গিযেছে। 'সংস্কৃত' শব্দটি, মূলতঃ, শুদ্ধ বা উন্নত অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, উপরন্তু সংস্কৃত-ভাষা অর্থেও সুপ্রচলিত। 'সংস্কৃতি' শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। culture-এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ ব'লে শব্দটি আমার মনে লাগে। আমার বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন—তিনি ব'ল্লেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধ'রে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার ক'রে আসছেন।

১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষযে আলাপ করি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কিনা, জানি না—সম্ভবতঃ শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে, culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, 'কৃষ্টি' শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয না, একথাও বলেন। 'সংস্কৃতি' শব্দ ঋগ্বেদে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে আছে; আর এবিষযে ঐতরেয ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃত একটি অতি সুন্দর উক্তির প্রতি শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধেয শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই এটি দেখে থাকবেন। শিল্পস্তুতি সম্বন্ধে উক্তিটি—

"ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে—হস্তী, কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।···আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"

'(পার্থিব) শিল্প-সমূহ দেব-শিল্প বা স্বর্গীয় শিল্প-সমূহকেই প্রশংসা করে; এই সমস্তের (অর্থাৎ দেব-শিল্পের) অনুকৃতি রূপেই এই পৃথিবীতে শিল্পকে ধরা হয়। শিল্প-দ্রব্য কী রকম? হস্তী অর্থাৎ হাতীর দাঁতের কাজ, কাংস বা ধাতব পাত্র, বিবিধ প্রকারের বস্ত্র, স্বর্ণ-নির্মিত অলংকারাদি, অশ্বতরী-যুক্ত রথ—এই প্রকার। এই শিল্প-সমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি; এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখানে চমৎকার-ভাবে আত্মোন্নতি-বিধানে, আত্মিক সংস্কৃতিতে, নিজের জীবনকে ছন্দোময় ক'র্‌তে শিল্পের কাজ কী, তা বলা হ'য়েছে। রূপ-শিল্প, রূপ-কর্মও যে সংস্কৃতির সাধন, তার বিচারও এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

Civilization বা সভ্যতা হ'চ্ছে (বিশেষ ক'রে তার বহিরঙ্গ বা পার্থিব দিকে) মুখ্যতঃ জন-সমাজের ব্যাপার—নগরের ব্যাপার। মানুষে মানুষে মেলামেশা না হ'লে, বুদ্ধির বিচারের আর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয় না। অবশ্য গভীর অনুভূতি বা উপলব্ধির জন্য মানুষকে কৃত্রিম নাগরিক আবেষ্টনী ছেড়ে কোথাও বা প্রাকৃতিক গ্রাম্য বা আরণ্য বা পার্বত্য আবেষ্টনীর আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে হয়। ভারতবর্ষের গভীরতম উপলব্ধি ঘ'টেছিল তপোবনে, নগর থেকে দূরে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের অবস্থিত আশ্রমে। কিন্তু ভারতের সভ্যতার, পার্থিব উৎকর্ষের ক্ষেত্র নগর-ই ছিল ; শহরের বস্তু ব'লেই উদ্ভাবনী সভ্যতাকে যে নামে ইউরোপে অভিহিত করা হয়, তার মূলে আছে লাতীন ভাষার civis শব্দ, যার অর্থ 'নগর'। লাতীন urbs শব্দের মানেও 'নগর' ; তা থেকে urban শব্দ, অর্থ 'নাগরিক, উন্নত, ভদ্র, সংস্কৃতিযুক্ত'। আরবদের মধ্যেও শহরের সঙ্গে সভ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বীকার করা হয়, তাই, যা 'মদীনা' অর্থাৎ নগরেব সঙ্গে সংযুক্ত, তা-ই হচ্ছে 'তমদ্দুন' বা সভ্যতা। 'নাগরিকতা' শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় ; শব্দটি বেশ উপযোগী ছিল, কিন্তু 'নাগর' শব্দ থাকাতে বাঙলায় 'নাগরিকতা'র একটু অর্থাবনতি ঘ'টেছ। 'সভা'র সঙ্গেই যা জড়িত, 'সভা' থেকেই অর্থাৎ মানবগণের সংগমন বা 'অন্‌জুমন' থেকে, একত্রীভবন থেকে, যা উঠেছে, তাকেই আমরা 'সভ্যতা' বলি।

যুগে যুগে elemental অর্থাৎ ঔপাদানিক বা মৌলিক ভাবকে প্রকাশ ক'র্‌তে যে বিভিন্ন শব্দ লোকপ্রিয় হ'য়ে থাকে, নোতুন আর সূক্ষ্ম নানা-ভাবের জন্য যে-ভাবে শব্দ ভাষায় প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে, সে-সম্বন্ধে, আর civilization ও culture-এর বাঙলা প্রতিশব্দ সম্বন্ধে, এতক্ষণ আমি কতকটা অসংলগ্নভাবে একটু প্রসঙ্গ ক'র্‌লুম। আজকাল হাটে বাটে সর্বত্র যে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, সেই 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে, তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধেও দুটো কথা ব'ল্‌লুম। এইবারে বিশেষ ক'রে ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অল্প কিছু নিবেদন ক'রে আমার আলোচনার উপসংহার ক'র্‌বো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতের বাহ্য বা পার্থিব সভ্যতা একটা বিরাট্ ব্যাপার। ভারতের এই civilization যে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন ও মধ্যযুগের civilization-এর চেয়ে কম নয়, সে কথা সর্ববাদিসম্মত। প্রকৃতিতে এই পার্থিব সভ্যতা অন্য পাঁচটি দেশের পার্থিব সভ্যতার সমপর্য্যায়েরই বস্তু। ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতের বাস্তু, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও নানা হস্তশিল্প, ভারতের দর্শন আর ধর্ম, ভারতের সাহিত্য—এ-সব তো আছে; কিন্তু এর প্রাণ কোথায়? ভারত-সভ্যতা-তরুর সংস্কৃতি-পুষ্প কিভাবে ফুটে উঠেছে? সেটা একটু প্রণিধান ক'রে দেখ্‌বার বিষয়।

ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতকগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণা-রূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান। এই ভাবপুঞ্জ ভারতের জনগণের ইতিহাসের আধারেই দানা বেঁধেছে। নানা জাতির সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি গ'ড়ে উঠেছে—এই-সব জাতির ভাষা আর সভ্যতা, এদের সংস্কৃতি, এদের ঐতিহ্য, মূলতঃ পৃথক্ ছিল। কিন্তু অস্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড-ভাষী আর ভোটচীন-ভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতির জনগণ আর্য্যভাষা গ্রহণ ক'রে আর্য্যভাষীদের সঙ্গে মিলে উত্তর-ভারতে প্রাচীন হিন্দু-জাতিতে পরিণত হ'ল। আর্য্য-ভাষীরা প্রথমটায় বিজেতা হ'য়ে আসে; বিজেতার দর্প আর দম্ভ জাত্ আর্য্য-ভাষীদের মধ্যে বহুদিন ধ'রে ছিল, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু শেষটায় যখন এই-সব জাতির মিশ্রণ ঘ'ট্‌লো, তখন, এদের নিজ-নিজ পৃথক্ জাতিত্ব আর সত্তা সম্বন্ধে যে বোধ ছিল, আর এই বোধ নিয়ে যে স্বাভাবিক গর্ব ছিল, সেটা লোপ পেলে—সকলেই এক নব-সৃষ্ট জাতিতে নিলীন হ'য়ে গেল, এক বিরাট্ সমন্বয়ে সকলেই যেন নিজ সার্থকতা লাভ ক'র্‌লে। পৃথক্ স্বজাতি-গর্ব আঁকড়ে' ধ'রে থাক্‌লে, মিলিত-ভাবে একটি নোতুন মিশ্র জাতির সৃজন হ'তে পার্‌ত না। বিভিন্ন জাতির দৃষ্টি-ভঙ্গী ধর্ম-বিচার বা সিদ্ধান্ত, আচার-অনুষ্ঠান—এ-সব এককে অপরের সামনে তুচ্ছ ক'রে দেখ বার ও দেঁখাবার প্রবৃত্তি আর থাকা সম্ভবপর হ'ল না, কারণ এ-সব জিনিস্, এই মিশ্র জাতির জনগণের পিতৃকুলাগত বা মাতৃ-কুলাগত রিক্থ হ'য়ে দাঁড়ালো। এই জন্য হিন্দু সভ্যতার প্রথম থেকেই একটি বড়ো সাংস্কৃতিক সূত্র প্রকট হ'ল—সমন্বয়। বিভিন্ন ধর্ম-মত বা বিচার এক-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সত্যে পৌঁছুবার বিভিন্ন পথ মাত্র—এই বোধ ভারতীয় জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হ'ল। এই পরমতসহিষ্ণুতা ভারতের সংস্কৃতির সব চেয়ে বড়ো কথা। ভারতীয় ঔদার্য্য দেখিয়ে কেবল ব'ল্‌বে না, সব ধর্মেই বা সব সমাজেই সত্য আছে—তবে আমার ধর্মে আর আমার সমাজে-ই সত্যটা পুরাপুরি বিদ্যমান ; ভারতীয় ব'ল্‌বে—বিভিন্ন ধার্মিক অবলোকন বা দৃষ্টি-ভঙ্গী বা দর্শন, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অবশ্যম্ভাবী রূপেই দেখা দিয়েছে, আর এই-সব দর্শন, যতক্ষণ না অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ নিজ সার্থক মহিমায় সকলের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। বিভিন্ন আপাত-বিরোধী মতবাদের মধ্যকার ঐক্য বা'র ক'রে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা, চিরকাল ধ'রে ভারতীয় ক'রে এসেছে ; পিতৃলোক আর পুনর্জন্ম, হোম আর পূজা, এক আর বহু দুই-ই একসঙ্গে দেখা, পিণ্ডদানে মুক্তি আর অনপনেয় কর্মফল, জ্ঞান আর ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম আর সকাম অনুষ্ঠান, সামাজিক বিভেদ আর সামাজিক সমীকরণ—এ-সমস্তকেই ধ'রে নিয়ে। এদের বিবাদের মধ্যে সংবাদ আবিষ্কার ক'রে, এক মহান্ মিলন-সংগীত গাইবার চেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কথা।

তারপরে, ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় বড কথা হ'চ্ছে এর তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। বিচারের পথে বা অনুভূতির পথে, দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান ও জীবনে তার উপলব্ধি—এই-ই হ'চ্ছে মানুষের প্রধান কার্য্য। যদি বিচারের পথে গিয়ে কেউ নাস্তিক ভাবে পৌঁছয়,তাতে দুঃখ নেই—নাস্তিকের সিদ্ধান্তকেও উড়িয়ে দেবার অধিকার কেহ আমাদের, তাকেও জোর ক'রে আস্তিক্যে আন্‌বার চেষ্টা অবৈধ। প্রাচীন ভারতের আর্য্য আর বিভিন্ন প্রকারের অনার্য্য, বিশেষতঃ দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক-ভাষী অনার্য্য—এদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-সমূহের সমবায়ের ফল হ'চ্ছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ্য-দ্বারা যে প্রার্থনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনারূপে গৃহীত হ'য়েছে, সেটি হ'চ্ছে গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রার্থনা ; আর এই প্রার্থনায় আমরা দুটি অংশ পাই—একটিতে হ'চ্ছে জগৎ-প্রপঞ্চের স্রষ্টার অনুধ্যান ('তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি'—সৃষ্টিকর্তার সেই বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি), আর অন্যটিতে এই প্রার্থনা যে, আমাদের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি যেন ভগবানের দ্বারায় পরিচালিত হয়, আমরা যেন বিধি-দত্ত বুদ্ধি ধ'রেই সব কাজ ক'রে যেতে পারি ('ধিয়ো যো নঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রচোদয়াৎ'—তিনি আমাদের ধীসমূহকে পরিচালিত করুন)। এই জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বা আকর্ষণ থাকাতে, বহু মূর্খতা বহু গোঁড়ামি বহু অন্ধ-বিশ্বাস নানাভাবে ভারতীয় জাতিকে নানা সময়ে বিপন্ন ক'রে তুললেও, মোটের উপর সে-সব কাটিয়ে' উঠবার শক্তি এই জাতি তার সংস্কৃতির দ্বিতীয় মূলকথা এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসা থেকে পেয়েছে।

'অহিংসা' হ'চ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় কথা। এ অহিংসা কেবল প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি আর ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ানো নয়—এর পিছনে আছে 'করুণা' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে দার্শনিকের চোখে দেখা দরদ, আর আছে 'মৈত্রী' অর্থাৎ সকলকে মিত্রভাবে দেখে তাদের মঙ্গল করার চেষ্টা। এই অহিংসা কেবল vegetable world বা উদ্ভিদ্-জগতের উপযোগী নিষ্ক্রিয় অথবা পর-পরিচালিত ব্যাপার নয়। এর পিছনে আছে ন্যায়-দৃষ্টি ও সহানুভূতি: আর ন্যায়-দৃষ্টি আছে ব'লেই অহিংসার পথে মূর্তি গ্রহণ ক'রতেও ক্ষেত্র-বিশেষে বাধা নেই।

ভারতীয় সংস্কৃতির আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে। 'দম' বা আত্ম-দমন; 'ত্যাগ' বা শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর বস্তু-জগতের প্রতি উপেক্ষা; 'অপ্রমাদ' অর্থাৎ নিজের বুদ্ধিকে প্রমত্ত বা ঘোলাটে' না করা; জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্য শিব আর সুন্দরের আবাহন—ইত্যাদি অনেক বিষয়ে এই সংস্কৃতির প্রকাশ হ'য়েছে।

সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও একসময়ে চিরকালের জন্য ব'লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতি-ও গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নোতুন নোতুন ভাবপরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা ক'রেছে, সমর্থও হ'য়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এদেশে ইস্‌লামী সংস্কৃতির আবির্ভাব হ'ল। এই সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন আর বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য, সেটা হ'চ্ছে এর অন্তর্গত সূফী দৃষ্টিকোণ, সূফী আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই জিনিসকে মধ্য-যুগের ভারত সাদরে বরণ ক'রে নিলে, এর মধ্যে সে অচেনাকে খুঁজে পেলে। কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি সন্তগণের আবির্ভাব হ'ল, ভারতের সূফী সাধকেরা এলেন; কাশ্মীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জৈনুল-আবেদীনের মতন উদার-হৃদয় রাজার, সম্রাট্ আকবরের মতন 'সুল্হ্-ই-কুল্' অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রীর প্রচারকের, রাজকুমার দারা শিকোহের মতন হিন্দু আর মুসলমান চিন্তার ও সাধনার দুই মহাসাগরের মিলনাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন-দ্রষ্টার প্রকাশ ঘ'টল। ইসলামী সংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতি, এই দুইয়ের পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ কেবল বিরোধের সংঘাত নয়। উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতার কাছে নম্র পরমত-সহিষ্ণুতাকে আপাত-দৃষ্টিতে লাঘব স্বীকার ক'র্তে হ'য়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ঝড়ের পরে মৃদু সমীরণের মত সূফী মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণ-ই হ'চ্ছে ভারতে ইসলামী আর হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের মুখ্য কথা। নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি—যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয় বিশুদ্ধ আরব-জাত ইসলামও নয়, যা হ'চ্ছে সত্যকার ভারতীয় হিন্দু-ইস্লামীয় সংস্কৃতি—এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে—নানা ধরণের খ্রীষ্টান মত ও সাধনা, জনসেবা, নানা নোতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব-নব শিল্প-সৃষ্টি. Socialism বা সম্পত্তি-সাম্য প্রভৃতি নানা সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা আর প্রযোজনা। আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় ক'রে বহুরূপ হ'য়ে যা বিরাজ ক'র্বে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ক'রে এক ক'রে তুল্বে।

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যবদ্বীপের মহাভারত

ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতীয় ধর্মের, সভ্যতার ও সাহিত্যের প্রসারের সূত্রপাত খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে, ভগবান্ বুদ্ধের জীবৎকালের অবসানের পর হইতেই যে ঘটিয়াছিল—এইরূপ অনুমান করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের দুইটি বিশিষ্ট রূপ—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম—ভারতের বাহিরে প্রসৃত হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমের দুর্গম গিরি- ও মরু-ময় সীমান্ত-পথ দিয়া, 'ক্ষুদ্র ভারত' (India Minor—এখনকার আফগানিস্তান), বাহ্লীক (এখনকার বল্‌খ্ প্রদেশ) পারস্য, চুলিক দেশ (Sogdiana—এখনকার রুষ-তুর্কিস্তান), কুস্তন দেশ (খোতান—চীন-তুর্কিস্তানের দক্ষিণ অংশ), কুচ (কুচার ও কারা-শহর—চীন-তুর্কিস্তানের উত্তর অংশ), ভোট দেশ (আধুনিক তিব্বত), এবং মহাচীন (চীনদেশ), কোরিয়া ও জাপানে, ভারতীয় কৃষ্টি ও চিন্তার যে ধারা প্রবাহিত হয়, তাহা মুখ্যতঃ বৌদ্ধ চিন্তা ও ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভগবান্ বুদ্ধের জীবন-চরিত এবং প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ও বৌদ্ধ মনোভাবের দ্বারা শোধিত নানা গল্প, আখ্যায়িকা, জাতক, অবদান ইত্যাদি, ভারতের বৌদ্ধ-সংস্কৃতির সহিত ভারতের বাহিরের পূর্বোক্ত সুসভ্য ও অর্ধ-সভ্য জাতির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে ও তাহাদের চিত্তকে সরস করে। তাহাদের নিজ-নিজ ভাষার সাহিত্যেও এই সকল আখ্যায়িকা সাদরে স্থান পাইয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া যায়। এইরূপে ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিরাট্ অংশকে মধ্য-এশিয়া, চীন, কোরিয়া ও জাপানের অধিবাসিগণ আত্মসাৎ করিয়া লয়; ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য স্বদেশের গণ্ডী কাটাইয়া বিশ্বসাহিত্যের কোঠায় নিজ চিরস্থায়ী আসন করিয়া লয়।

বৌদ্ধদের মধ্যে বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী এতটা বেশী স্থান দখল করিয়া বসে যে, তাহাদের নিকট ভারতের বুদ্ধ-পূর্ব যুগের প্রাচীন ইতিহাস বা কাহিনী বিশেষ সম্মান পায় নাই। লোক-প্রচলিত গল্পের অন্তে একটুখানি ধর্ম-দেশনা বা উপদেশ জুড়িয়া দিয়া, গল্পের ঘটনাকে বুদ্ধদেবেরই জন্মান্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘটিত ঘটনা বলিয়া কল্পনা করিয়া, ও গল্পের পাত্র-পাত্রীকে কোনও অতীত জন্মের বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার সহচর বা সমসাময়িক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া—ভগবান্ বুদ্ধদেবের নামের সহিত আখ্যান-বস্তুকে এইরূপে কোনও ক্রমে জুড়িয়া দিয়া—যেন তাহারা স্বস্তি পাইত, ও আখ্যানটিকে বুদ্ধ শ্রাবকগণের শ্রবণ বা পাঠের যোগ্য বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন ভারতের প্রায় সমগ্র কথা-সাহিত্য এইরূপে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-কথায় সে-রূপে বুদ্ধদেবের নাম জুড়িয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া, বৌদ্ধগণ আমাদের মহাভারত ও পুরাণের বিচিত্র আখ্যায়িকাগুলি গ্রহণ করেন নাই—মহাভারত ও পুরাণাবলীর শাশ্বত রস-ভাণ্ডার হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহাভারতে ও পুরাণে, প্রাচীন আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান ও দেবতা-বাদ এবং বিশেষ-ভাবে ব্রাহ্মণ্য মনোভাব—ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদ ও পৌরাণিক শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা-প্রতীককে অবলম্বন করিয়া জগৎ-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যার প্রয়াস—প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিক মতের অননুমোদিত ব্যাপার থাকায়, প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের এই বিরাট্ দিক্‌টি বৌদ্ধদের সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ইহার ফলে, ভারতের জাতক অবদান ইত্যাদি চীন ও জাপান লাভ করিল, কিন্তু ভারতের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ চীন জাপানে পহুঁছিল না। চীনের মত সুসভ্য জাতিকে ও জাপানের মত কর্মী জাতিকে রামায়ণ মহাভারতের মত বিরাট্ বিশাল কাব্য-রসোজ্জ্বল গ্রন্থ কিভাবে নাড়া দিত, তাহা কল্পনা করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

অপর পক্ষে, ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দুস্তর সাগর-পথ ধরিয়া যখন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও চিন্তার ধারা ইন্দোচীনে (অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, শ্যাম দেশ, কম্বোজ ও চম্পা বা কোচিন-চীনে) ও ইন্দোনেসিয়ায় (অর্থাৎ মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্নিও, সুলাবেসি, ও ফিলিপীন-দ্বীপ-পুঞ্জে) প্রসৃত হইল, তখন এই সভ্যতা ও চিন্তার ধারা তাহার দুইটি রূপেই ঐ সকল দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই জলপথে ভারতীয় বণিগ্‌গণ ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ায় যাতায়াত করা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম যে সকল ভারতীয়ের গমন ঐ সকল দেশে ঘটিয়াছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-মতের ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্রাহ্মণও ঐ সকল দেশে গিয়া পহুঁছিয়াছিলেন। চম্পা কম্বোজ যবদ্বীপ বলিদ্বীপ বোর্নিও প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলালিপিগুলি সংস্কৃতে লেখা, এবং সেইগুলি হইতে এই কথা-ই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। খ্রীষ্ট-জন্মের দুই তিন শতকের মধ্যেই এই শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইযাছিল। এই সময়ে ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির বাহন হইযা ব্রাহ্মণের শুভাগমন চম্পা ও যবদ্বীপ এবং বোর্নিওতে ঘটিয়াছিল।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের অনুমোদিত আখ্যায়িকা ইতিহাস আদিও ঐ-সকল দেশে নীত হয়। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের বা পরের প্রথম শতকে, কোন্ কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবিশেষ লোকপ্রিয় ছিল, তাহা আমরা জানি না। বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ অবশ্য ছিল; কিন্তু বেদ কোনও কালে লোকপ্রিয় সাহিত্য ছিল না। ইতিহাস-পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত তখনও কী আকারে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। আধুনিক গবেষকদের মতে, রামায়ণ মহাভারতকে আমরা এখন যে-আকারে পাইতেছি, এই দুই মহাগ্রন্থের আকার দুই হাজার বৎসর পূর্বে সেরূপ ছিল না; পরবর্তী যুগের নানা প্রক্ষিপ্ত অংশ তখনও ইহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। রামায়ণ মহাভারত তখনও স্বজ্যমান। তখনকার দিনে যে রামায়ণ মহাভারত প্রচলিত ছিল, এখনকার প্রচলিত পুস্তক হইতে অনেকটা পৃথক্ পুস্তক দুই হাজার বৎসর পূর্বে যবদ্বীপে নীত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে এ কথাও বলা চলে যে, তখনকার দিনে পুঁথি পহুঁছিবার আগে ভারতের নাবিক বণিক্ ও ব্রাহ্মণের মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও-দেশে পহুঁছিয়াছিল। যবদ্বীপে ঋষি অগস্ত্যের খুব নাম-ডাক; দক্ষিণ-ভারতে তামিল-দেশেও অগস্ত্যের পূজা হয়, অগস্ত্য অনেক স্থলে শিবের সহিত অভিন্ন-রূপে কল্পিত হন। দক্ষিণ-ভারত হইতেই যবদ্বীপে এই অগস্ত্য-পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান যুক্তি-যুক্ত। প্রাচীন যবদ্বীপের অষ্টম ও নবম শতকের কতকগুলি তারিখ-দেওয়া সংস্কৃত শিলা-লেখে (৬৫৪, ৬৮২ ও ৭৮৫ শকাব্দে) অগস্ত্যের উল্লেখ বা উদ্দেশ আছে। অগস্ত্যের উপাখ্যান রামায়ণ মহাভারত উভয়েই আছে। যবদ্বীপের প্রাচীন (অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার) কোনও অনুশাসন বা লেখে মহাভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রামায়ণের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পত্তন এই ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, এবং মহাভারতের অনুবাদকেই অবলম্বন করিয়া হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের এবং রামায়ণের আখ্যায়িকার সঙ্গে যবদ্বীপের জনগণের বিশেষ পরিচয় যে খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর পূর্বেই ঘটিয়াছিল, তাহার পক্ষে অন্য প্রমাণ আছে। যবদ্বীপের প্রাচীনতম মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের; এই মন্দিরগুলি মধ্য-যবদ্বীপের উত্তর ভাগে Dieng দিএঙ্-নামক শালভূমিতে অবস্থিত। এগুলি শৈব-মন্দির, এখন এই মন্দিরগুলি শূন্য ও ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে; কিন্তু স্থানীয় যবদ্বীপীয়গণ এই মন্দিরগুলির এক-একটিকে মহাভারতের পাত্র-পাত্রীগণের নামের সহিত জড়িত করিয়া অভিহিত করে; যথা—Tjandi Poentadewa ('চাণ্ডী পুন্তাদেব' বা 'যুধিষ্ঠির-মন্দির'—'পুন্তাদেব' যবদ্বীপে যুধিষ্ঠিরের নাম), Tjandi Ardjoena ('চাণ্ডী অর্জুন' বা 'অর্জুন-মন্দির'), Tjandi Srikandi ('চাণ্ডী শ্রীকান্দি' বা 'শিখণ্ডী-মন্দির') [আধুনিক যবদ্বীপীয় মতে 'শিখণ্ডী' হইয়া গিয়াছেন 'শ্রীকান্দি' বা 'শ্রীকান্তি', এবং তিনি রাজা দ্রুপদের কন্যা, দ্রৌপদীর কনিষ্ঠা ভগিনী ও অর্জুনের স্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন], Tjandi Soembadra ('চাণ্ডী সুম্বদ্রা' অর্থাৎ 'সুভদ্রা-মন্দির'), Tjandi Pandoe (পাণ্ডু-মন্দির), Tjandi Abijasa (ব্যাস-মন্দির), Tjandi Bima (ভীম-মন্দির), Tjandi Gatotkatja (ঘটোৎকচ-মন্দির), Tjandi Nakoela-Sadewa (নকুল-সহদেবের মন্দির), Tjandi Sintjaki ('চাণ্ডী সিন্‌ত্যাকি' বা 'সাত্যকি-মন্দির'), Tjandi Aswatama (অশ্বত্থামা-মন্দির), প্রভৃতি। এই নামগুলি হয়তো অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে দেওয়া; কিন্তু এই শিব-স্থানের সহিত কুরু-পাণ্ডবদের নাম জড়িত থাকা প্রাচীন ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাহা হউক, দিএঙ-এর শৈব মন্দিরগুলি হইতে মহাভারতের অস্তিত্বের 'অকাট্য' প্রমাণ না হইলেও, পুরাণের কোনও কোনও আখ্যানের সহিত দেশের লোকের পরিচয়ের প্রমাণ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ইহার পরে মধ্য-যবদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে Prambanan প্রাম্বানান্-এর শিব-ক্ষেত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে তিনটি বিরাট্ মন্দির আছে, সেই মন্দিরগুলির ভিত্তি-গাত্রে খোদিত রামায়ণ ও কৃষ্ণচরিত্রের অপূর্ব সুন্দর চিত্রাবলী দর্শনে অনুমান করা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতকে যবদ্বীপের জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মহাভারতের (অন্ততঃ মহাভারতের এক প্রধান পাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের) ঘটনাবলীর জ্ঞান বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল।

যবদ্বীপের প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দুযুগের ইতিহাসের প্রথম কল্প অন্ধতমিস্রাময়। ভারতবর্ষ হইতে—খুব সম্ভব পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে—ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী বণিগ্‌গণ আসিয়া এই দেশে উপনিবিষ্ট হয়, ও যবদ্বীপের আদিম মালয়জাতীয় অধিবাসীদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে মিলিত হইয়া 'হিন্দু যবদ্বীপীয়' অভিজাতবর্গের সৃষ্টি করে। প্রথম যুগের এই মিশ্র ভারতীয়-যবদ্বীপীয় জনগণের ধর্ম ব্রাহ্মণ্যই ছিল। ইতিমধ্যে সুমাত্রা দ্বীপেও হিন্দু বা ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। সুমাত্রায় আগত ভারতীয়গণ বোধ হয় উত্তর ও পূর্ব ভারত হইতেই আসে; ইহারা সুমাত্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সুমাত্রায় শ্রীবিষয়- বা শ্রীবিজয়-নগরে (আধুনিক Palembang পালেম্‌বাঙ্‌-এ) এক পরাক্রান্ত রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীবিজয়ের রাজবংশের নাম 'শৈলেন্দ্র-বংশ'। শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা দ্বীপময় ভারতের বহুল অংশে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। যবদ্বীপও ইঁহাদের দখলে আসিয়াছিল। যবদ্বীপে ইঁহারা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সুবিখ্যাত Boro-boedoer বর-বুদুর ('বুদুরের বিহার') চৈত্য নির্মাণ করেন।

অনুমান হয়, শৈলেন্দ্র রাজগণের শাসন-কালে, বৌদ্ধ রাজশক্তির পৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেন একটু সংকুচিত, একটু নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দশম শতকের প্রারম্ভ হইতে পূর্ব যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য (শৈব)-ধর্মাবলম্বী যবদ্বীপীয় রাজগণ আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ইঁহারা ধীরে ধীরে সুমাত্রা হইতে আগত বৌদ্ধ-মতাবলম্বী বিদেশী শৈলেন্দ্র রাজশক্তিকে যবদ্বীপ হইতে দূরীভূত করিয়া দেশকে স্বাধীন করেন ও দেশে ব্রাহ্মণ্য মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিশুদ্ধ যবদ্বীপীয় এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে কয়জন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম নাম করিতে হয় রাজা দক্ষের। দক্ষ আনুমানিক ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। খুব সম্ভব তাঁহারই আমলে প্রাম্বানানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তিনটি বিরাট্‌ মন্দির নির্মিত হয়। ইঁহার পরে রাজা Sindok সিন্দোক্‌-এর নাম পাই (আনুমানিক ৯৩০); ইঁহার অনেকগুলি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই সকল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজার রাজত্ব-কালে, যবদ্বীপে শিল্প ও সাহিত্য প্রভৃতি সব দিকেই একটি নূতন চেতনার, নবীন প্রাণের সাড়া পড়িয়া যায়। দশম ও একাদশ শতকে যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পত্তন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সাহিত্য সৃষ্টি হয় অনেকটা মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া। রাজা ধর্মবংশ যবদ্বীপে রাজত্ব করেন দশম শতকের শেষে। তাঁহার সময়ে যবদ্বীপীয় ভাষায় মহাভারতের একটি গদ্য অনুবাদ প্রস্তুত হয়। এই অনুবাদ একেবারে আক্ষরিক নহে—ইহাকে কতকটা সংক্ষেপে মূল কথা লিখিয়া যাওয়া বলা যাইতে পারে। তবে তখনকার দিনে যে সংস্কৃত মহাভারতের মূল গ্রন্থ যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল, অনুবাদকগণ যে সেই মূল গ্রন্থ সামনে রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—ইহা বেশ বুঝা যায়। ইঁহারা মাঝে মাঝে মূল সংস্কৃত শ্লোকাংশ বা পূরা শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু এই যবদ্বীপীয় অনুবাদ হইতে মূল মহাভারতের পাঠ-নির্ণয় বিষয়ে দিগ্‌দর্শনে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়—অনুবাদ দেখিয়া, বিষয়-ক্রম এবং উদ্ধৃত মূল সংস্কৃত শ্লোক ও শ্লোকাংশ দেখিয়া, দশম ও একাদশ শতকে যে সংস্কৃত মহাভারত যবদ্বীপে ব্যবহৃত হইত, তাহার সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যাইতে পারে; এবং অধুনা-প্রচলিত ভারতীয় সংস্করণগুলির সঙ্গে তাহার একটি তুলনা করিলে, আদি মহাভারতের পাঠ-নির্ণয়ের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে। ডচ্ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কিছু কাজ করিয়াছেন। ইঁহারা এই প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারত কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াছেন। D. H. H. Juynboll য়এন্‌বল্ রোমান অক্ষরে হলাণ্ড হইতে কতকগুলি পর্ব প্রকাশিত করিয়াছেন—আদি, বিরাট, আশ্রমবাসিক, মৌষল ও মহাপ্রস্থানিক। বিখ্যাত ডচ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Dr. Hendrik Kern কের্ন্-ও মহাভারতের যবদ্বীপীয় অনুবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের আলোচনা ডচ্ ভাষায় লিখিত বলিয়া আমাদের কাছে প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে।

মহাভারতের এই গদ্য অনুবাদ প্রায় নয় শত বৎসর পূর্বেকার যবদ্বীপীয় ভাষায় লিখিত; এখন যবদ্বীপে সাধারণ লোকে এ ভাষা বুঝিবে না। এই প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার একটি নাম হইতেছে Basa Kawi 'কবি ভাষা' বা সংক্ষেপে Kawi 'কবি'। বোধ হয়, প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যেই এই ভাষার প্রয়োগ ছিল বলিয়া, মধ্য-যুগে যবদ্বীপীয়েরা এই নাম দিয়া তাহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাতৃভাষার প্রাচীন রূপকে নির্দেশ করিত; যেমন প্রাচীন ভারতে বেদের ভাষাকে 'ছান্দস' বা 'ছন্দঃ' বলা হইত। কবি-ভাষা সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ; ভারতের বাহিরের একটি দেশে, আধুনিক বাঙ্গালা উড়িয়া মারহাট্টির মত এত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কবি-ভাষায় গদ্য মহাভারত দশম-একাদশ শতকে রচিত হইলেও, ইহার পুঁথিগুলি তত প্রাচীন নহে; বড় জোর দুই-তিন শত বৎসরের। যবদ্বীপ তখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে—সংস্কৃতের চর্চাও তখন যবদ্বীপে লোপ পাইয়াছে। এইজন্য পুঁথিতে ধৃত সংস্কৃত শ্লোক ও শব্দাবলী ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ। সম্পাদন-কালে শ্রীযুক্ত য়এন্‌বল্ কলিকাতার এশিয়াটিক্ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ পাঠ দিয়া আলোচনার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই গদ্য মহাভারত যবদ্বীপীয় ভাষার এক আদিম পুস্তক; সমগ্র মালয় পলিনেসীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই মহাভারতকে প্রাচীনতম পুস্তক বলা যায়। ইউরোপের নানা ভাষায়—এবং ইউরোপের বাহিরে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রথমে লিখিত নানা বন্য জাতির ভাষায়—যেমন হিব্রু ও গ্রীক বাইবেলের অনুবাদকেই প্রাচীনতম পুস্তক বলিতে হয়, তেমনি আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতের অনুবাদ একটি বিশাল ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন-স্থল হইয়া আছে।

কৌতুককর হইবে বলিয়া, এই প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্য মহাভারতের আদি-পর্ব হইতে একটু নিদর্শন নিম্নে বঙ্গাক্ষরে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

[উতঙ্কের উপাখ্যান হইতে।
উচ্চারণ সর্বত্র স্বরান্ত; ['] = অর্ধ অ-কার; ব = w, ব = b]

মঙ্‌কন পব'কস্ সঙ্ সাবিত্রী রি সির। বিনেহক'ন্ ইর তেকঙ্ কুণ্ডল, আগিরঙ্ ত সঙ্ উত্তঙ্ক; মাজর্ ত সির রিঙ্ মহারাজ পোষ্য, অত'হ'র্ অম্‌বিৎ মুলিহং; সিনয়ুতন্ ত সির, বিনেহ্ ভোজন রুমুহন্। ই স'ড'ঙ্ নিঙ্ ভোজন ইনর্, পণ্ডক'ন রি সির, কতোন্ তঙ্ স'কুল অতীস্ ততন্ য়োগ্য পঙন'ন ইঙ্ ব্রাহ্মণ; লিঙ্ নির।
"যস্মাদ্ অশুচ্যন্নং দদাসি, অতিশয়াশ্রাদ্ধস্ত মহারাজ পোষ্য, অপন্ অবেহ্ ভোজন তন্‌শুচি, মতঙ্ য়ন্ বুতা ত কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঙ্‌কন লিঙ সঙ্‌ উত্তঙ্ক। সুমহুর্‌ মহারাজ পোষ্য; ইক ভোজন তন্‌শুচি কবেহ্‌, অপন্‌ সক রি গ্যা নির রি পমবিৎ সঙ্‌ উত্তঙ্ক মুলিহ তুমুলয্‌, মতঙ্‌ য়ন্‌ অঙ্‌গক্‌ পিণঙ্‌লিব'তক'ন্‌। মল'স্‌ ত সিরানপথ। "যস্মাদ্‌ অন্নং দূষয়সি, তস্মাদ্‌ অনপত্যো ভবিষ্যসি, ইবিঙ্‌ স'কুল পবেহ নি ঙ্‌ললুন্‌ ভোজন রি কিত সিনঙ্‌ গুহ্‌ ত তন্‌শুচি; তন্‌তহ প্র লুরিঙ্‌ত: জহ্‌ তস্মাদ অনপত্যা ত কিত।" (আদি-পর্ব, পৃঃ ১৩।১৪)

ধর্মবংশের কিছু পরে রাজা হন ঐর্‌লঙ্গ (Airlangga) বা এর্‌লঙ্গ (Er'langga)। ইনি একাদশ শতকের প্রথমার্ধে যবদ্বীপে রাজত্ব করেন। এর্‌লঙ্গের পিতা উদয়ন ছিলেন বলিদ্বীপেব এক সামন্ত রাজা, তাঁহার মাতা মহেন্দ্রদত্তা ছিলেন ধর্মবংশের পূর্বজ সিন্দোক্‌-এব প্রপৌত্রী। এর্‌লঙ্গ প্রাচীন যবদ্বীপেব এক প্রবলপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। বাল্যজীবনে ইনি বনে ব্রাহ্মণদেব আশ্রমে প্রতিপালিত হন। ইনি ধর্মবংশেব কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং নিজ শৌর্য্যে ক্রমে সমগ্র যবদ্বীপেব অধীশ্বর হন, ও ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপেব চক্রবর্তী বাজা রূপে অভিষিক্ত হন। ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার রাজ্য দুই পুত্রেব মধ্যে বিভাগ করিযা দিযা ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই এর্‌লঙ্গেব রাজত্ব-কালে যবদ্বীপীয সাহিত্য তাহার প্রথম গৌরবময যুগে পদার্পণ করে। ইতিপূর্বে যে গদ্য মহাভারত রচিত হয়, তা কে পণ্ডিতের পাঠোপযোগী পুস্তক বলা চলে। জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য, মহাভারতেব আখ্যানকে অবলম্বন করিযা কতকগুলি কাব্য যবদ্বীপীয় ভাষায় এই সময়ে সর্বপ্রথম রচিত হয। 'অর্জুন-বিবাহ' কাব্যখানি এইরূপ মৌলিক কাব্যের মধ্যে প্রধান; বিরাট-পর্বের একটি কবিতাময় অনুবাদও রচিত হয়, এবং খুব সম্ভব রামায়ণেরও কবিতাময় অনুবাদ কবি-ভাষায় এর্‌লঙ্গের রাজত্ব-কালে প্রস্তুত হয়। এই সকল কাব্যের ছন্দ ও ভাব সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত, এবং ভাষা সংস্কৃত-শব্দ বহুল।

যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনাব রীতি বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে (১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা বর্ষজয়ের সভার কবি ত্রিগুণ, 'সুমনঃশতক' ও 'কৃষ্ণায়ণ' নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন: ইহার পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(১১২০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা কামেশ্বরের সভাকবি Mpu Dharmaja ম্পু ধর্মজ 'স্মর-দহন' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

ইতিমধ্যে যবদ্বীপে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলিতে ধীরে ধীরে মূল সংস্কৃত-গ্রন্থের বহির্ভূত নানা বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় ক্রমে বিরল হইতে আরম্ভ করে; হিন্দু ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়া ইহার একটি প্রধান কারণ। আর্য্য বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম যবদ্বীপে প্রবেশ লাভ করিবার পূর্বে, দেশের আদিম ধর্ম ও মনোভাব এবং আদিম জনগণের মধ্যে প্রচলিত আর্য্য-পূর্ব যুগের দেবতা-বাদ ও দেবতার লীলা—এই সমস্ত বস্তু একেবারে মরিয়া যায় নাই। এগুলি ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ভারতবর্ষ হইতে আনীত রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের গল্পের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া যবদ্বীপীয় মনোভাবের অনুকূল করিয়া নবীনভাবে পুষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। ইতি-পূর্বে, এক হাজার বৎসরের অধিককাল যবদ্বীপে সাধারণ্যে মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি প্রচলিত রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালে, লোক-মধ্যে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মূল আখ্যানগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমিয়া আসায় ও অবশেষে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার ফলে, এই পরিবর্তন আরও দ্রুত বেগে ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত ভারতবর্ষ বা জম্বুদ্বীপের অস্তিত্বের কথাই যবদ্বীপের লোকে ভুলিয়া গেল; এবং রামায়ণ-মহাভারতে ও পুরাণে বর্ণিত ঘটনাবলী যবদ্বীপেই ঘটিয়াছিল—লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল। যবদ্বীপে মহাভারতের এক নূতন রূপ ক্রমে দাঁড়াইয়া গেল—তাহাতে মূল আখ্যান ঠিক আছে, মূল পাত্রপাত্রীদের নাম ও বংশ-পরিচয় উভয়-ই কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও একেবারে পরিবর্তিত হয় নাই;—মূলের বহু বস্তু আশ্চর্য্য-ভাবে অবিকৃত আছে—কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষে অজ্ঞাত নানা পাত্রপাত্রী ও ঘটনা-সমাবেশ আসিয়া জিনিসটিকে সম্পূর্ণরূপে যবদ্বীপেরই একটি বিশিষ্ট ব্যাপার করিয়া তুলিল।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্যাপারটি এত পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজা জয়াভয়ের কালে (১১৩৫-১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) কবি Penuluh প'নুলুহ্ 'ভারত-যুদ্ধ' কাব্য লেখেন—ইহা মহাভারতের যুদ্ধের কথা; এতদ্ভিন্ন হরিবংশের কাব্যানুবাদও করেন। সংস্কৃত-বহুল কবি-ভাষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এগুলি লেখা। কবি-ভাষা বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িল—মধ্য ও আধুনিক যুগের ভাষা আসিয়া গেল। এই সকল কাব্যকথা ভাঙ্গিয়া অর্বাচীন যুগের ভাষায় আবার নূতন কাব্য রচিত হইতে লাগিল। তারপরে মুসলমান ধর্ম আসিল, পঞ্চদশ শতকের প্রথমে প্রায় সমগ্র যবদ্বীপ মুসলমান-ধর্মাবলম্বী স্থানীয় রাজাদের হাতে গিয়া পড়িল—এই চারি শতকের মধ্যে সংস্কৃত-মূলানুসারী মহাভারত অন্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

যবদ্বীপের শিল্পে নূতন একটি রীতি ধীরে ধীরে আসিয়া যায়, এবং একটি অভিনব অভিনয়-প্রণালী ক্রম বর্ধমান লোকপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে; ইহার প্রভাবেও যবদ্বীপে মহাভারতের ও রামায়ণের দ্রুত রূপ পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। শিল্পের নূতন ধারাটি আসিয়া যবদ্বীপের হিন্দু বা ভারতীয় প্রকৃতিকে একেবারে বদলাইয়া দিল। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ছিল বহিরঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক, অন্তরঙ্গে ভাবপ্রাণ; অর্থাৎ দেবতা মানব পশু আদির মূর্তি অবলম্বনে কোনও গভীর আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করা-ই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। প্রতীক বা প্রকাশ স্থূল রূপে এই যে মূর্তি প্রযুক্ত হইত, তাহা যথা-সম্ভব realistic বা বাস্তবানুসারী হইত। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রক পর্য্যন্ত, যে ভাস্কর্য্য-শিল্প ও চিত্র-শিল্পের নিদর্শন আমরা পাই, তাহা ভাবশুদ্ধি- ও ভাবপ্রাণতা-যুক্ত একটি বাস্তবিকতার দ্বারা উদ্ভাসিত। ইহার বিপরীত রীতি আমরা পাই অন্য ধরণের শিল্পে, যেখানে বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভাবদ্যোতনা অপেক্ষা decoration বা অলংকৃতি-ই হইতে মুখ্য প্রেরণা; এখানে দেবতা-, মানব-, বা পশু-মূর্তির স্থান হয় একেবারে-ই নাই, কিংবা যেখানে আছে, সেখানে বাস্তবানুসারিতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, কেবল অলংকারের নক্‌শা হিসাবেই অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে তাহাদের চিত্রণ করা হইয়া থাকে। মুসলমান-ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্প (কেবল পারস্য, তুরস্ক ও ভারতের মোগল যুগের মুসলমান চিত্র ছাড়া অন্যত্র) এই aniconic decorative art বা অমূর্ত অলংকৃতি-মূলক শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে; বিজাস্তীয় বা গ্রীক খ্রীষ্টান শিল্প এইরূপ মূর্তিযুক্ত অলংকৃতি-মূলক শিল্পের শ্রেণীতে পড়ে। যবদ্বীপের প্রথম যুগের শিল্পে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত যে শিল্প প্রচলিত ছিল তাহাতে, বাস্তবানুসারিতা ও প্রাচীন হিন্দু বস্তুতান্ত্রিক ভাবপ্রাণতা পুরাপুরি বিদ্যমান ছিল; বর-বুদুর, প্রাম্বানান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রভৃতির শিল্প, এবং পরবর্তী যুগের কতকগুলি বিষ্ণু, শিব ও দেবীর মূর্তিও এই ধরণের—এই শিল্প ইহার প্রাচীন ভারতীয় জাতিত্ব হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু আদিম মালয় বা ইন্দোনেশীয় প্রবৃত্তি বা মনোভাবের নব-প্রতিষ্ঠার ফলে, যবদ্বীপের শিল্পে অলংকৃতি-প্রিয়তা আসিয়া গেল, বাস্তব রূপ অপেক্ষা অলংকার বা নক্‌শার সৌন্দর্য্যের দিকে একটা টান আসিয়া গেল। জীবৎকল্প প্রতিমূর্তি আড়ষ্ট প্রাণহীন পুতুলের পর্য্যায়ে গিয়া পহুঁছিল, এবং যবদ্বীপের শিল্প, Wayang ওয়াইয়াং বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত কিম্ভূতকিমাকার পুতুলের বিশিষ্ট শিল্পে পর্য্যবসিত হইল। চামড়ায় কাটা, রঙ্গীন ছবির মতন পুতুলের ছায়াকে সাদা চাদরের উপরে ফেলিয়া, ছায়ানাট্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী প্রদর্শন, যবদ্বীপে মধ্যযুগ হইতে প্রবর্তিত হয়; আজকাল এইপ্রকার অভিনয়-রীতি খুবই লোকপ্রিয়। যবদ্বীপের লোকেরা নামে মুসলমান হইলেও, মুখ্যতঃ এইপ্রকার ছায়ানাট্যের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতকে নিজেদের মধ্যে জীবন্ত রাখিয়াছে। জীবন্ত রাখিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইয়াং-এর শিল্প-প্রভাবে এবং কালধর্ম্মের প্রভাবে মূল সংস্কৃত ভাবকে অনেকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছে। ঠিক এক-ই রীতির ছায়ানাট্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পের অভিনয় বলিদ্বীপেও প্রচলিত আছে; এবং ঈষৎ অন্য ধরণের ছায়ানাট্যে, একটু অন্য রীতির মূর্তি অবলম্বন করিয়া এখনও শ্যামদেশে ও কম্বোজে রামায়ণ অভিনয়ের জন্য প্রযুক্ত হয়। যবদ্বীপের ছায়ানাট্যের বর্ণনা ইতিপূর্বে বাঙ্গালা-পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে ('প্রবাসী' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৩৬, ও শ্রাবণ ১৩৩৮), তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে, এই ছায়ানাট্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া, মহাভারত এখনও কিভাবে দ্বীপময় ভারতে সুরক্ষিত হইয়া আছে, তাহার অল্প আলোচনা করা যাইতেছে।

যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান এখন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ ডচ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত J. Kats কাট্‌স্ ডচ্ ভাষায় লেখা Het Javaansche Tooneel, I, Wajang Poerwa, Walteyreden (Batavia) 1923 নামে তাহার সুবৃহৎ ও সুন্দর চিত্র দ্বারা অলংকৃত পুস্তকে লিখিয়াছেন। এই পুস্তকের ইংরেজীতে বা ভারতীয় কোনও ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন, যবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত Inter-ocean নামক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইংরেজী পত্রিকায় শ্রীযুক্তা Moons-Zorab মুন্‌স-জোরাব যবদ্বীপের মহাভারত, পুরাণ ও আখ্যায়িকার সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যপূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ বহু বৎসর হইল লিখিয়াছেন। যবদ্বীপীয় মহাভারত-কাহিনী প্রথমতঃ দেবতাদের কতকগুলি আখ্যায়িকা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হয়। পরে কুরুবংশের কথা, এবং পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের চরিত বর্ণনা। তারপরে সংস্কৃত মহাভারতের মত পাণ্ডব ও কৌরবগণের ইতিবৃত্ত, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতি পর্য্যায় সমস্ত-ই আছে। যবদ্বীপের লোক-প্রচলিত মহাভারতে কিন্তু মূল কুরুপাণ্ডব-কথা ব্যতীত, সাবিত্রী-চরিত, নলোপাখ্যান প্রভৃতি অন্য উপাখ্যানের স্থান নাই—অন্ততঃ কাট্‌স্‌-এর বইয়ে ২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী যে যবদ্বীপীয় মহাভারতের সারাংশ দেওয়া আছে, তাহাতে পাইতেছি না। মূল কৌরব-পাণ্ডব-চরিত লইয়া-ই ইহাদের মহাভারত। তবে প্রত্যেক পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মহাভারত ও পুরাণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনেক গল্প আছে। বিশেষ খুঁটিনাটির সঙ্গে প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর জন্ম- ও বিবাহ-কথা বর্ণিত ও নাটিত হয়। অবশ্য মূল আখ্যান-ভাগ মোটের উপর অনুসৃত হইয়াছে। সংস্কৃত-মহাভারত-বহির্ভূত যে-সকল নূতন গল্প ও নূতন পাত্র-পাত্রী আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি যবদ্বীপের প্রাচীন লোক-ধর্ম-সংক্রান্ত দেবতা, যোদ্ধা বা রাজা-রাণী প্রভৃতি। ইহাদের অনেকের নামও সংস্কৃত নহে। আবার যবদ্বীপীয়দের মুখে সংস্কৃত নামগুলি বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কিংবা নূতন নাম সৃষ্ট হইয়াছে; যথা Palasa Ra=পরাশর, Poentadewa=যুধিষ্ঠির, Tjompala=পাঞ্চাল, Jama-Widoera=বিদুর, Arimbi=হিড়িম্বা, Ngastina=হস্তিনাপুর, Soembadra=সুভদ্রা, Destarata=ধৃতরাষ্ট্র, Sengkuni=শকুনি, ইত্যাদি। মহাভারতের কতকগুলি কথাবস্তু যবদ্বীপে এবং বলিদ্বীপেও বিশেষরূপে জনপ্রিয়। ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ যবদ্বীপীয় মহাভারতের মতে অর্জুনের কন্যা Dewi Pregiwa 'দেবী প্রগীবা(?)'-কে বিবাহ করেন। ঘটোৎকচের পুত্রের নাম 'শশিকিরণ'। পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জুনিয়ম্ (কিরাত-বেশী মহাদেবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ), অর্জুনের স্বর্গে গমন, নিবাত-কবচ বধ (সংস্কৃত মহাভারতের নিবাত-কবচ-জাতীয়-রাক্ষসগণ যবদ্বীপে একজন দৈত্য রাজাতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে) ও অপ্সরা সুপ্রভার সহিত অর্জুনের বিবাহ—এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আখ্যান যবদ্বীপে 'মিস্তরাগ' বা 'বীতরাগ' অর্জুনের আখ্যায়িকা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং বিখ্যাত যবদ্বীপীয় কাব্য 'অর্জুন-বিবাহ' এই সমস্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত। অর্জুনেব সঙ্গে বিকটাকৃতি Semar 'সেমার' নামে তিনজন অনুচব সর্বদা ফিরিত ; সেই 'সেমার'-ত্রয় প্রাচীন যবদ্বীপীয় দেবলোক হইতে মহাভারতের জগতে আমদানী-করা।

যবদ্বীপীয় জনগণ মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিবার পরে, মহাভারতের এই বিস্তৃত আখ্যায়িকার ভিতবে কিছু-কিছু মুসলমানী ভাবও প্রবেশ করে। মহাভারতের উপাখ্যানটিকে একটি সূফী মতবাদের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির এখনও যবদ্বীপীয়দেব কাছে 'ধর্ম-বংশ' বা 'ধর্ম-পুত্র' নামে পরিচিত, আদর্শ নরপতি রূপে সম্মানিত। তিনি শান্তিপ্রিয় লোক, এত বেশী ক্ষমাশীল যে লোকে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারে। তিনি শত্রু জয করেন—তাঁহার সত্যের বলে ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। Kalima Sada 'কালিমা সাদা' নামে যুধিষ্ঠিরের একটি মন্ত্রপূত তাবিজ আছে, যাহাব ইন্দ্রজাল-প্রভাবে তিনি জগতে সর্বত্র জয়ী। এই তাবিজে লিখিত hadji 'হাজি' বা জ্ঞান যুধিষ্ঠিরের জানা আছে বলিয়াই তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব।

যবদ্বীপীয় মহাভারতে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বিরোধী যে বহু কথা আছে, সেগুলির দুই-একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব 'চম্পাল' বা পাঞ্চাল রাজ্যে গেলেন। সেখানে রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হইতেছিল। রাজা দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভীম বীরত্ব না দেখাইয়া এইরূপে কন্যাগ্রহণ করা অনুমোদন করিলেন না,—কারণ সেরূপ করিলে পাণ্ডব-নামে কলঙ্ক পড়িবে। তিনি রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুপদের ভ্রাতা Gandamana গন্ধমনের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে জয় করিলেন। যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। যবদ্বীপীয় মহাভারতে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কথা নাই, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বের কথাও নাই। যবদ্বীপীয় মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য বরাবর-ই পাণ্ডবদের বিরোধী, তাঁহার-ই চেষ্টায় পাশা-খেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ঘটে। মূল মহাভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বর্ণিত আছে যে, পাণ্ডবদের অরণ্যবাস-কালে একদা দ্রৌপদী যখন আশ্রমে একা ছিলেন, তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়াস করেন, কিন্তু সফলকাম হন না, পাণ্ডবদের হাতে তাঁহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা ঘটে। অপর, বিরাটের রাজসভায় কীচকের হাতে দ্রৌপদীর নিগ্রহ হয়, ফলে ভীম কর্তৃক কীচক-বধ ঘটে। এই দুই কথার আধারের উপরে যবদ্বীপের মহাভারতে ভারতবর্ষে অজ্ঞাত দুইটি নূতন ও সম্পূর্ণরূপে যবদ্বীপীয় গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দাতা ছিলেন, যে যাহা চাহিত তিনি তাহাকে তাহা দিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র, যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিবার মানসে, Bismaradja 'ভীষ্মরাজ' নামে অসুরের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, দ্রৌপদীকে নিজের রাণী করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজচিহ্ন Toonggoel Naga 'তুঙ্গুল নাগ' নামে রাজচ্ছত্র ও 'কালিমা-সাদা' নামে ঐন্দ্রজালিক তাবিজ তাঁহার সঙ্গে থাকিলে, কেহ-ই তাঁহার হানি করিতে পারিবে না; সেজন্য ভীষ্মরাজ-রূপী ইন্দ্র তাঁহার ভগিনীকে দেবর্ষি নারদের বেশে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়া ঐ দুইটি বস্তু চাহিয়া আনাইবার জন্য পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির নারদ-বেশী ভীষ্মরাজ-ভগিনীকে বস্তু দুইটি দিলেন, এবং দ্রৌপদীকে ভীষ্মরাজের গৃহে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না—তাঁহারা এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন বিনা কিছু করিবেন না স্থির করিলেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ দ্বারাবতী হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য আকাশ-মার্গে উড়িয়া গেলেন। ইতিমধ্যে স্বীয় রাজচিহ্ন ও তদধীন রাজ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যুধিষ্ঠির উন্মাদের মত হইয়া গেলেন, এবং রাক্ষসবৎ যাহা সম্মুখে পড়ে তাহা-ই ধ্বংস করিতে লাগিলেন। অন্য পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের আগমনের অপেক্ষায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ঘটোৎকচের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গগন-মার্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে নারদ-বেশী ভীষ্মরাজ-ভগিনীর নিকট হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজচিহ্ন ছত্র ও তাবিজ উদ্ধার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তাহা আনিয়া দিলেন; ইহাতে যুধিষ্ঠির শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইতিমধ্যে ভীষ্মরাজ-বেশী ইন্দ্র উপস্থিত হওয়াতে, অর্জুন বাণ মারিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন; ইন্দ্র ভীষ্মরাজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে দেখা দেন। যুধিষ্ঠির এদিকে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুদূর দেশে গমনপূর্বক তপশ্চারণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জন্য Mega-malang 'মেঘ-মালঙ্' নামে বিরাট্ এক মেঘখণ্ডকে আসন করিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য 'মেঘ-মালঙ্' অভিমুখে গমন কবিলেন। পথে Dewa Mambang 'দেব মাম্বাঙ্' নামে এক রাক্ষসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়—শ্রীকৃষ্ণ তখন Tiwikrama 'ত্রিবিক্রম' নামে নিজ রাক্ষসী মূর্তি প্রকট করিয়া চক্রাস্তের দ্বাবা দেব-মাম্বাঙ্-কে বধ করেন। তাহার পবে তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হইযা তাঁহাকে আবার গৃহে পাঠাইয়া দেন।

এই প্রকার নানা অপরূপ উপাখ্যান যবদ্বীপেই কল্পিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয। অনুরূপ আব একটি যবদ্বীপীয গল্প হইতেছে Frangbaya 'এরঙ্ভয'-এর আখ্যান। Roedjemlawa 'রুজিম্লর' দেশের রাজা এরঙ্ভয়-ও দ্রৌপদীকে কামনা কবে। এই ব্যাপাব লইযা দ্রৌপদীর কনিষ্ঠা ভগিনী অর্জুনের পত্নী Srikanti 'শ্রীকান্তি' জ্যেষ্ঠা দ্রৌপদীকে নানা বিষয়ে যথেষ্ট অপদস্থ কবেন। বলা বাহুল্য, এই আখ্যানও আমাদের দেশে অজ্ঞাত।

সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ-কাহিনী ব্যতীত যবদ্বীপেব লোক-প্রচলিত মহাভারতে পাণ্ডবদের পরলোক-গমনের অন্য এক অদ্ভুত কাহিনী বিদ্যমান আছে। পাণ্ডবেবা পরীক্ষিৎকে রাজা কবিলেন, ও নিজেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনবাস কবিতে লাগিলেন। পরে পরীক্ষিতের কাছে দূত পাঠাইয়া যুধিষ্ঠিব, পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদী, ইঁহাদের জন্য ছযটি 'চাণ্ডী' বা 'চান্দি' অর্থাৎ স্মৃতি- বা সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করাইযা লইলেন। ইঁহাদেব উদ্দেশ্য ছিল যে, শীঘ্রই ইঁহারা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া মোক্ষলাভ করিবেন। সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হইলে পরে, শ্রীকৃষ্ণ সহ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া মন্দিরগুলি অবলোকন করিলেন। তৎপরে চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া, প্রথমে দ্রৌপদী ও পরে অর্জুন নকুল সহদেব ও যুধিষ্ঠির তাহাতে প্রবেশ করিযা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন করিলেন। কিন্তু ভীম অগ্নিপ্রবেশ না করিয়া কেবল তাঁহার কেশচ্ছেদ ও হস্তপদের নখ কর্তন করিয়া যোগাসনে বসিলেন, এবং আকাশের সঙ্গে মিশিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মুসলমান-যুগের একখানি ইতিহাসে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যান আছে :—পাণ্ডবগণের নাশ হইল, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহার 'কালিমা-সাদা'র ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে অমর হইয়া রহিলেন। পরে Sultan

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Kalidjaga 'সুলতান কালিজাগা' নামে একজন যবদ্বীপীয় Wali 'ওলী' বা ঐশ্বরিক-শক্তি-বিশিষ্ট প্রথম যুগের ইস্‌লাম-প্রচারক—যুধিষ্ঠিরের 'কালিমা-সাদা'র মধ্যে নিহিত 'হাজি' বা যোগবিদ্যা বা জ্ঞানের সন্ধান পান, ও তাহা পাঠ করিয়া এই জ্ঞান আত্মসাৎ করেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরের যোগবিদ্যার অধিকার লাভ করিয়া, এই মুসলমান সাধু, নিজেই যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মরাজের পুত্র বা অংশ হইয়া গেলেন—প্রাচীন যবদ্বীপের সমস্ত আধ্যাত্মিক ও ঐন্দ্রজালিক সম্পদ্ মুসলমান গুরুর অধিকারে চলিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরের তখন আর জীবিত থাকিবার আবশ্যকতা রহিল না—তিনি যবদ্বীপে ইস্‌লাম-ধর্ম প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের প্রাচীন হিন্দুধর্মের সহিত-ই মরিলেন। হিন্দু যবদ্বীপের উপরে মুসলমান-ধর্মের বাহ্য চিহ্ন পড়িল, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাহার গভীরতম অনুভূতির প্রতীক-স্বরূপ যুধিষ্ঠিরের নামের সহিত জড়িত এই যোগবিদ্যা রহিয়া গেল। ইহা যেন একটি সজ্ঞানে রচিত রূপক।

এমনি করিয়া যবদ্বীপে মূল সংস্কৃত মহাভারতের পরিবর্তন ও পর্য্যবসান ঘটিয়াছে।

[বঙ্গাব্দ ১৩৩৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রামায়ণ

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ দ্যুলোকে প্রচরিষ্যতঃ।
তাবদ্ রামায়ণী কথা ভূলোকে প্রচরিষ্যতি॥

একজন ভক্ত খ্রীষ্টান লেখক যীশু খ্রীষ্টের জীবন-চরিতকে the Greatest Story Ever Told অর্থাৎ "জগতের সব চেয়ে মহৎ উপাখ্যান" আখ্যা দিয়া কিছুকাল আগে আমেরিকায় ও ইউরোপে খ্রীষ্টায়নের বা যীশু-চরিতের পুনঃ-প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করেন। যে-কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেই হউক না কেন, ভক্তের নিকটে তাঁহার ইষ্টদেবতার কথার চেয়ে বড়ো আর কিছু-ই নাই—পাঠে শ্রবণে কীর্তনে অনুধ্যানে নব-নব অনুপ্রেরণা ও রসানুভূতির চিরন্তন উৎস-স্বরূপ হইয়া, ভক্তের প্রাণে তাঁহার ইষ্টদেবতার কথা চিরতরে বিরাজমান থাকে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপাখ্যান বিশ্বমানবের রস-সর্জনার ভাণ্ডারে সুপ্রাচীন কাল হইতেই রক্ষিত হইয়া আছে, যেগুলি অমর, যুগযুগান্তর ধরিয়া যেগুলি মানুষের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করিয়া আসিতেছে; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকে যেগুলি বিভিন্ন দেশে নব-কলেবর ধারণ করিলেও, মূল কথা-বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার আভ্যন্তর মহত্ত্বের আবেদন আপামর সাধারণের নিকটে পহুঁছাইয়া দিতেছে। রামায়ণের উপাখ্যান সমগ্র বিশ্ব-মানবের চিত্তের রসায়ন-স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি উপাখ্যানের মধ্যে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর উপাখ্যান। প্রাচীন ভারত-বিদ্যার আধুনিক রীতির আলোচকগণের মতে, অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতে আর্য্যভাষায় রামায়ণ-কথা তাহার প্রথম রূপ গ্রহণ করে। পরে ভারতবর্ষের মধ্যেই নানা সাহিত্যিক ও মৌখিক রূপভেদকে আশ্রয় করিয়া এই উপাখ্যান পরিবর্ধিত ও মার্জিত হয়; এবং ভারতের বিভিন্ন কথ্য ভাষায় প্রচলিত মৌখিক রূপগুলির বিলোপ-সাধন না করিয়া; পরন্তু সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া, মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্য নামের সহিত জড়িত সংস্কৃতভাষায় রচিত রামায়ণ-রূপে এই উপাখ্যান এমন একটি চিরস্থায়ী মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়াছে, যাহা কেবল ভারতীয় মানবের পক্ষে নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেও, এক অতি মহৎ সাহিত্যিক রিক্থ হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাঁড়াইয়াছে। এই রিক্‌থের অন্তর্নিহিত পারিবারিক ও ধার্মিক আদর্শ ও নীতি তথা রম্য ভাবসম্পুট, সমগ্র মানবজাতিকে সর্বকালে অনুপ্রাণনা দান করিবে ও আকুল করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতবর্ষের সভ্যতার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে, ভারতের ভারত-ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে রামায়ণ ও মহাভারতের মাধ্যমেই। বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে এশিয়া-খণ্ডে ও অন্যত্র যেখানেই ভারতের বাণী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই রামায়ণ এবং মহাভারতের উপাখ্যান ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা অথবা প্রচার হইয়াছে। ভারতের ভারতীয়তার প্রসারের ফলে এশিয়া-খণ্ডের কতকগুলি দেশকে Greater India অর্থাৎ "বৃহত্তর ভারত" নাম দিয়া বিশালতর ভারতবর্ষের এক একটি অংশ বলিয়া ধরা হয়। এই দেশগুলি হইতেছে, Farther India বা "প্রতর ভারত", অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, কোচিন-চীন বা চম্পা এবং লাওস্-অঞ্চল (Viet nam ভিয়েৎনাম বা Indo-China ইন্দোচীনের আনামী-ভাষী জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত দেশ, ঠিক মত বৃহত্তর ভারতের অংশ নহে—এই দেশ বাস্তবিক "বৃহত্তর চীন"-এরই অংশ) ; Malaya বা মালয়-উপদ্বীপ, ও Indonesia ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ "দ্বীপময় ভারত" বা দ্বীপান্তরের দ্বীপসমূহ (সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, সুম্বাওয়া, তিমোর, সুলাবেসি, বোর্নিও প্রভৃতি) ; এবং Serindia অর্থাৎ প্রাচীনকালের মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি প্রদেশ (যেমন কুস্তন বা খোতন, অর্থাৎ পশ্চিম Sin-Kiang সিন-কিয়াং বা চীনা তুর্কিস্তান ; ক্রোরায়্না বা পূর্ব-সিন-কিয়াং ; ঋষীক দেশ বা তোখারিস্তান অর্থাৎ উত্তর-সিন্-কিয়াং ; চুলিক বা সুগ্‌দ দেশ অর্থাৎ প্রাচীন সোগ্দিয়ানা)। ভারতবর্ষ হইতে যে-সমস্ত দেশে ভারত-ধর্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইয়াছে, সেই-সমস্ত দেশে রামায়ণ মহাভারত ও নানা পৌরাণিক উপাখ্যানও পহুঁছিয়াছে—তবে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার উপর-ই এই-সব দেশে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। এইজন্য মধ্য-এশিয়া হইয়া চীনে রামায়ণ-কথা পহুঁছায় বটে, কিন্তু 'রামঞ্‌ঞদেস' বা সুবর্ণভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ-ব্রহ্মের, ও দক্ষিণ-শ্যামের দ্বারাবতী রাজ্যের Rmen 'র্মেঞ্' বা Mon মোন্-জাতি, Cambodia বা কম্বুজদেশের Khmer খ্‌মের-জাতি, উত্তর- ও মধ্য-ব্রহ্মের Thul-Cuk থুল-চুক্ অথবা Pyu

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্যু এবং Mran-Ma ম্রন্-মা বা ব্রহ্ম-জাতি, উত্তর-শ্যামের Dai দৈ বা Thai থাই-জাতি, চম্পার Cham চাম-জাতি, মালয়-উপদ্বীপের Malay মালাই-জাতি এবং যবদ্বীপের সুন্দা, মাদুরা ও যবদ্বীপীয় জাতি তথা বলিদ্বীপের ও লম্বকদ্বীপের অধিবাসিগণ—ইহারা সকলেই এককালে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শে অনু-প্রাণিত ধর্ম ও সমাজ গড়িয়া তুলে, এবং এই ধর্ম ও সমাজকে জীবনে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে। সেই হেতু ইহাদের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের—বিশেষ করিযা রামায়ণের—এক লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায়। এক বলিদ্বীপ ও আংশিকভাবে লম্বকদ্বীপ ছাড়া, এই-সমস্ত দেশে এখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম বা ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ বিদ্যমান নাই;—ব্রহ্মে, শ্যামে, কম্বুজদেশে ও চম্পায় লোকে এখন বৌদ্ধধর্ম পালন কবে,যদিও তাহারা কিছু পরিমাণে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে তৎতদ্-দেশের ব্রাহ্মণের নির্দেশ মানিয়া চলে। অন্যত্র—মালয়-উপদ্বীপে ও দ্বীপময়-ভারতে, জনসাধারণ মুসলমান-ধর্মই স্বীকার করিয়া লইয়াছে; তথাপি তাহাদের জীবনে অতীতের অবশেষ-স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব এখনও গভীরভাবে কার্য্য করিতেছে, বিশেষ করিয়া যবদ্বীপে;—স্বাধীন ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারত রাষ্ট্রের আমাদের ভারতে প্রেরিত প্রথম রাজদূত শ্রীযুক্ত Soedorsono সুদর্শন ভারতবর্ষে অবস্থান-কালে এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ইন্দোনেসিয়ার ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে, বাহিরে মুসলমান-ধর্ম সকলে মানিলেও, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব এখনও বিশেষ প্রবলভাবে বিদ্যমান।

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়া, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত রামায়ণ-উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু ছোট-বড়ো কাব্য-নাটকাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতে, যথা পালি ও বিভিন্ন প্রাকৃতে, রামায়ণ-কথা নানাভাবে মিলে। রামায়ণ জৈনদের মধ্যেও বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল, এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতে জৈন রামায়ণ আছে। ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে, উত্তর-ভারতের আর্য্যভাষার মতই, রামায়ণের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। তমিল্ ভাষায় মহাকবি কম্বন্-রচিত রামায়ণ, তমিল্ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালম্ ভাষায় রামায়ণ-আখ্যান লইয়া বহু কাব্য ও নাটক আছে। বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রাম-কথা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হইতেছে—রামায়ণাশ্রয়ী কোনও-না-কোনও মহাকাব্য। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহৃদয় সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিগণের চেষ্টায় রামায়ণের একাধিক অনুবাদ বা রূপায়ণ ফারসী ভাষাতেও হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে, তিব্বতী, চীনা, বর্মী, মোন্, খ্‌মের, শ্যামী, মালাই, প্রাচীন ও মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় ও সুন্দানী প্রভৃতি ভাষায়, এবং বলিদ্বীপের ভাষায়, সংক্ষিপ্ত রাম-কথা অথবা নাতি-ক্ষুদ্র রামায়ণ-গ্রন্থ উপলব্ধ হইয়াছে। যবদ্বীপীয় ভাষায় একাধিক রামায়ণ বিদ্যমান। ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাহিরে যে এতগুলি বিভিন্ন রূপে রাম-কথা প্রচলিত আছে, সেগুলির বিষয়-বস্তু সর্বত্র এক নহে—ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা পার্থক্য সেগুলির মধ্যে দেখা যায়। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন রাম-কথার বিভিন্ন রূপ-ভেদ সম্বন্ধে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আলোচনা প্রসঙ্গে। দীনেশ-বাবু এই বিষয়ে পরে আরও বিশদ করিয়া তাঁহার ইংরেজী পুস্তক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ সালে প্রকাশিত) The Bengali Ramayanas-তে আলোচনা করেন। তিনি দেখাইয়া দেন, মহর্ষি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ও বাঙ্গালা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, এই উভয়ের মধ্যে ভাবের ও ঘটনার পার্থক্য কত বেশী। বস্তুতঃ, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কেবল মূল কথা-বস্তুর ব্যত্যয় না করিয়া, রাম-কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া রচিত সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ ও বাঙ্গালা কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, দুইখানি পৃথক্ পুস্তক। তুলসীদাসের কোসলী (হিন্দী) রামায়ণ, যাহার কবি-দত্ত নাম হইতেছে 'শ্রীরামচরিত-মানস', এইরূপ আর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক; ইহাতে কেবল বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করা হয় নাই—তুলসীদাস স্বয়ং বলিতেছেন—

নানা-পুরাণ-নিগমাগম-সম্মতং যদ্
রামায়ণে নিগদিতং, ক্বচিদ্ অন্যতোঽপি বা।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা-
ভাষানিবন্ধম্ অতিমঞ্জুলম্ আতনোতি॥

"অনেক পুরাণ-, বেদ- ও শাস্ত্র-সম্মত যে কথা রামায়ণে আছে, আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অন্যত্র হইতে (নিজের অনুভব) একত্র করিয়া, নিজের অন্তরের সুখের জন্য রঘুনাথজীর গাথা, ভাষায় মনোহর ছন্দাদিরূপে বিস্তারপূর্বক তুলসী রচনা করিতেছে।" (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের বঙ্গানুবাদ)

তুলসীদাস নিজ অনুভব ও কবি-কল্পনার প্রয়োগে তাঁহার "রামরচিত-মানস"-কাব্য রচনা করিয়াছেন; এবং সর্বোপরি এক অপূর্ব ভক্তিব ধারায় তাঁহার রাম-কথা আপ্লুত কবিযা দিয়াছেন। এই ভক্তির প্রবাহ বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। এইজন্য তাঁহার কাব্য ভক্তিরসের এক অপূর্ব উৎস হইয়া বিরাজমান; সহৃদয় পাঠক একবার তুলসী-রামাযণের রস আস্বাদন করিলে, তাহাকে আর ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ছোট-খাটো বিষযে তিনি বাল্মীকি-রামায়ণকে পূরাপুরি অনুসরণ কবেন নাই,—দুই-চারিটি এমন ঘটনার সমাবেশ তিনি করিয়াছেন যাহাতে মূল আখ্যায়িকার হানি হয় নাই অথচ তাহা আরও কল্পনোজ্জ্বল হইযাছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জনকের সভায় বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের আগমনের পূর্বে মিথিলার রাজোদ্যানে রাম ও সীতার পরস্পরকে দর্শন ও পূর্বরাগ—ইহাতে মূল উপাখ্যান যেন আরও সুন্দর হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, দক্ষিণ-ভারতের তমিল্ মহাকবি কম্বন্-এর রামায়ণে এই পূর্বরাগের কথাও আছে—কম্বন্ তুলসীদাসের প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বেকার কবি; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, এ বিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত অন্য কোনও রাম-কথার ধারা অনুসৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যেই রামায়ণের কতকগুলি পৃথক্ ধারা দেখিতে পাওযা যায়। 'অদ্ভুত রামায়ণ' আছে; তদ্ভিন্ন রাম-কথার দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এবং 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত রাম-কথার বিভিন্ন রূপ লইয়া বিচার করিলে, একখানি অতি উপাদেয় গবেষণাত্মক পুস্তক রচিত হইতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন যুগে রচিত রাম-কথায় মূল উপাখ্যানের অতিরিক্ত যে ঘটনা-বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, তাহা লক্ষণীয়। সাধারণ অষ্ট পুরাণানুমোদিত বহু ব্যাপার রামায়ণের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে যেমন, অন্যত্রও তেমনই কবিগণ সাধারণতঃ বাল্মীকির গ্রন্থ লইয়া-ই অনুবাদ করিতে বসিতেন না। রাম-কথা আকাশের আলো ও বাতাসের মতো দেশের মানুষের মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিরাজ করিয়াছে। কবিরা সহজভাবে চোখের জ্যোতি ও নাসিকার শ্বাসের মতো রামায়ণ-কথা নিজ-নিজ চিত্তে গ্রহণ করিয়া, পুরাণ-পাঠক এবং রামায়ণ-গায়কের দ্বারা প্রচারিত নানা পুণ্যময় প্রাচীন আখ্যায়িকা বা ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া, নূতনভাবে দেশের জনগণের মধ্যে রামায়ণ-কথার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বাহিরেও রাম-কথার লক্ষণীয় বিকাশ বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। পালি জাতক-গ্রন্থে প্রাপ্ত 'দসরথ-জাতক'-এ যে-ভাবে রাম-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রচলিত রাম-কথা হইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের—ইহাতে রাবণ বা সীতা-হরণের স্থান নাই। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ হিমালয়-অঞ্চলে বনবাসে গিয়াছিলেন, এবং পরে সেখান হইতেই তাঁহারা রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন; পালির দশরথ-জাতকের মধ্যে অদ্ভুত কথা এই যে, সীতা ছিলেন রামের ভগিনী ও পরে বিবাহিতা স্ত্রী। কোনও-কোনও মতে, রামায়ণ-কথায় অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র উপাখ্যানের সমাবেশ বা সংমিশ্রণ আছে—অযোধ্যার কথা, কিষ্কিন্ধ্যার কথা, এবং লঙ্কার রাবণের কথা। ৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ অবদান-কথার অনুবাদের মাধ্যমে রাম-কথা চীন দেশে পহুঁছায়—সে রাম-কথা পালি দশরথ-জাতকেরই আখ্যানের মত। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে, মধ্য-এশিয়ার সোগ্‌দিয়ানা বা চুলিক-দেশের এক ভিক্ষু কর্তৃক চীনা ভাষায় যে রাম-কথা অনূদিত হয়, তাহা কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ—ইহাতে রাম-সীতার নির্বাসন, রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণ, জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ, বালি- ও সুগ্রীব-সংবাদ, সেতুবন্ধ, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতি মূল বিষয়-বস্তু আছে; কিন্তু লক্ষণীয় কথা, রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির নামগুলি মূল সংস্কৃত রূপে নাই। রামায়ণ-কথার প্রারম্ভিক রূপ আলোচনার জন্য, দশরথ-জাতক ও চীনা ভাষায় অনূদিত রাম-কথাগুলির সার্থকতা আছে। চীনারা ভারতীয় (সংস্কৃত) নামেরও চীনা অনুবাদ করিত; তাহাদের এই অনুবাদ, অনেক সময়ে আমাদের কাছে সুপরিচিত সংস্কৃত নামের আধারে না হইয়া, অন্য অনুরূপ ও অজ্ঞাত নামেরই অনুবাদ হইত। তদ্দ্বারা ইহাইসূচিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে এই-সব নামের অন্য বিকল্প-রূপও প্রচলিত ছিল। চীনারা "ধৃত-রাষ্ট্র" না বলিয়া (বা বলিবার চেষ্টা না করিয়া) ইহার অনুবাদ করিত "তী-কুও" (Ti-Kuo অর্থাৎ Hold-Kingdom); সেইরূপ "তথাগত" = "ঝু-লাই"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(Ju-lai অর্থাৎ That-way Gone), "অশ্বঘোষ" = "মা-হেঙ্" (Ma-heng = Horse-Neigh)। "দশ-রথ" এই নামের অন্য একটি প্রচলিত রূপ "দশ-রত" ধরিয়া, তাহারা ইহার অনুবাদ করিয়াছে—Shih-hsi "শ্যঃ-শী" = Ten-Pleasures ; "দশ-রথ" = Ten-Chariots-এর চীনা অনুবাদ হয় Shih-choe "শ্যঃ-চ্যো"। সুতরাং যে প্রাচীন রামায়ণ-কথা প্রথম চীনা ভাষায় অনূদিত হয়, তাহাতে "দশ-রত" নামটিই ছিল—"দশ-রথ" নহে। (তুলনীয়, "ভারত"-শব্দের প্রাচীন কালে প্রচলিত দুইটি রূপ—"ভারত" ও "ভারথ" ; এই "ভারথ" হইতেই প্রাকৃতে "ভারধ", "ভারহ", এবং আধুনিক ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষায় "ভারথ")।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খণ্ডে, ইন্দোচীনে, ও ইন্দোনেসিয়া-তে রামায়ণ-কথা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের প্রথম ভাগেই প্রচারিত হইয়াছিল। কম্বুজদেশের Veal Kantel বেআল্ কান্তেল্ নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের একটি সংস্কৃত লেখ হইতে জানা যায় যে, সেখানকার একটি মন্দিরে রাজা ভববর্মা কর্তৃক রামায়ণ, ও অশেষ বা সম্পূর্ণ ভারত অর্থাৎ মহাভারত এবং পুরাণ গ্রন্থ অর্পিত হইয়াছিল, এবং ঐ সকল গ্রন্থ প্রত্যহ পঠিত হইত—

রামায়ণ-পুরাণাভ্যাম্ অশেষং ভারতং দদৌ
অকৃতাহ্নহম্ অচ্ছেদ্যাং বাচনাস্থিতিম্।

চম্পা-দেশের Tra Kieu ত্রা-কিয়্যো লেখ হইতে জানা যায় যে, রামায়ণের কবি মহর্ষি বাল্মীকির একটি প্রতিমা পূজার জন্য ঐ দেশে স্থাপিত হইয়াছিল ; এই লেখটি রাজা প্রকাশবর্মা (৬৫৩-৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়। এইরূপ 'পাথুরে' প্রমাণ' হইতে বুঝিতে পারা যায়, এখন হইতে অন্ততঃ দেড-হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীনে রামায়ণ-মহাভারত কিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দোচীনের—কম্বুজ ও চম্পার, তথা শ্যামের—ভাষা-সাহিত্যে ও শিল্পেও রামায়ণের অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য শিল্প-সৃষ্টি হইতেছে Angkor Vat অঙ্কর বাৎ-এর (অর্থাৎ 'নগর-বাস্তু'র) বিখ্যাত বিষ্ণু-মন্দির—এই মন্দির খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্য-ভাগে গঠিত কম্বুজ-রাজ্যের এক বিরাট্ কীর্তি—ইহার প্রস্তরময় ভিত্তি-গাত্রে রামায়ণের চিত্র উৎকীর্ণ আছে। কম্বুজ-দেশের ভাষায় (Khmer খ্‌মের ভাষায়) প্রচলিত রামায়ণের কোনও ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ দেখি নাই। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিল্পে রামায়ণ-কথার এই বিরাট্ প্রকাশ হইতে এইরূপ অনুবাদেরও অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চম্পার Cham চাম-জাতির লোকেরা এখন জাতি-হিসাবে ধ্বংসের পথে—তবে তাহারা এখনও বিকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম পালন করে। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে প্রাচীন কালের স্মৃতি ও প্রাচীন ধর্মের কথা এখন প্রায় অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। শ্যামের অধিবাসী Dai দৈ বা Thai থাই-জাতির মধ্যে রামায়ণ-কথা সমধিক প্রচলিত; রামায়ণের পাত্র-পাত্রীর নামের ও কৃতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাঙ্কক-নগরী শ্যামের রাজধানী, সেখানে শ্যামের জাতীয় সংগ্রহশালার প্রবেশ-চত্বর-গৃহে ব্রঞ্জ-নির্মিত মানবাকার ধনুর্ধারী রামচন্দ্রের সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্যামের দৈ-জাতির প্রথম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইন্দ্রাদিত্য রাজার পুত্র রাজা রাম গম্‌হেঙ্ (খম্‌হেঙ্) ত্রয়োদশ শতকে দৈ বা থাই-জাতিকে কম্বুজ-রাজের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার নাম হইতে তখনকার দিনেও থাই-জাতির মধ্যে রাম-কথার প্রভাব সূচিত হয়। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন এক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজা রামাধিপতি নূতন 'অযোধ্যা' (Ayuthia আইয়ুথিয়া) নগরী স্থাপন করিয়া সেখানেই নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্যামদেশের এখনকার রাজ-বংশের নাম 'মহাচক্রী' বংশ, এই বংশের প্রত্যেক রাজা 'রাম' নামে অভিহিত। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ-বংশের পত্তন হয়; প্রথম রাজার নাম ছিল 'রাম ফা বুদ্ধ য়োদ্ ফা চুড়ালোক', অথবা প্রথম রাম (১৭৮২-১৮০৯ পর্য্যন্ত ইঁহার রাজত্ব-কাল); তৎপরে 'ফ্রা বুদ্ধ লোএস্ লা নাভালৈ', দ্বিতীয় রাম (১৮০৯-১৮২৯); 'ফ্রা নাঙ ক্লাও', তৃতীয় রাম (১৮২৯-১৮৫১), 'ফ্রা চোম ক্লাও মহা-মংকুৎ' চতুর্থ রাম (১৮৫১-১৮৬৮); 'চুড়ালংকার', পঞ্চম রাম (১৮৬৮-১৯১০); 'বজ্রায়ুধ', ষষ্ঠ রাম (১৯১০-১৯২৫); 'প্রজাধিপক', সপ্তম রাম; এখন 'অতুল্য-তেজাঃ' (শ্যামী উচ্চারণে 'অদুল্‌দেৎ'), নবম রাম, রাজত্ব করিতেছেন। শ্যামদেশে ১৭০ বৎসর ধরিয়া—সাত পুরুষ জুড়িয়া—সত্যকার 'রাম-রাজ্য' চলিয়া আসিয়াছে।

শ্যাম-ভাষায় যে জনপ্রিয় রামায়ণ প্রচলিত, যাহা সকলেই পাঠ করে এবং যে রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া জীবন্ত নটনটী ও নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা অভিনয় তথা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়, এবং চিত্রের সাহায্যে Hnang 'হ্নঙ্' বা ছায়া-নাট্য দেখানো হয়, সে রামায়ণ "রামায়ণ" নামে অভিহিত নহে, এবং তাহা বাল্মীকির রামায়ণের আধারেও রচিত নহে। সেই রাম-কথা 'রাম-কীর্তি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নামে অভিহিত হয় (যেমন তুলসীদাসের কোসলী হিন্দীতে রচিত রামায়ণের নাম 'রামচরিত-মানস')। 'রাম-কীর্তি' শব্দটি শ্যামীদের উচ্চারণে প্রথমে Rama-Kir 'রাম-কীর্' রূপ গ্রহণ করে ; শ্যামীরা অন্ত্য র-কারকে ন-রূপে উচ্চারণ করে বলিয়া, 'রাম-কীর্তি' শব্দ এখন শ্যামী ভাষায় Rama-Kien 'রাম-কিয়েন্' রূপে পরিচিত।

কিছুকাল হইল, শ্যামদেশের রাজধানী বাঙ্কক নগরের "থাই-ভারত সংস্কৃতি মন্দির" (Thai-Bharat Cultural Lolge) শ্যামী 'রাম-কিয়েন্'-এর এক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিযাছেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯) ; অনুবাদ করিয়াছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বর্গীয় সত্যানন্দ পুরী এবং শ্যামী লেখক চারোএন সারাহিরান্ Charoen Sarahiran। স্বামী সত্যানন্দ পুরী বাঙ্গালা দেশ হইতে ১৯৩৫ সালের দিকে শ্যামদেশে ভারত-ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও প্রচার করিতে যান ; তিনি সেখানে শ্যামী ভাষা খুব ভালো করিয়া শিখিয়া লন, শ্যামী ভাষায় দার্শনিক বিষয়ে একজন নামী লেখক বলিয়া শ্যামী সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, শ্যামীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিযা বেদান্ত-প্রচারের কার্য্যে আত্মনিয়োজিত হন ; কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানীরা নাকি তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। 'রাম-কিয়েন্'-এর অন্যতম আধার একখানি প্রাচীন শ্যামী গ্রন্থ 'নারায়ণ-সিপ্পাং'—ইহাতে নারায়ণের দশ-অবতারের কাহিনী আছে। অবতারগুলির ক্রম ও কার্য্য বিভিন্ন —এই গ্রন্থ-অনুসারে দশ অবতার এই ভাবের ছিল : (১) বরাহ ; (২) কূর্ম ; (৩) মৎস্য ; (৪) মহিষ—মহিষাসুর-বধ নারায়ণের এই মহিষ-অবতার কর্তৃকই সংঘটিত হয় ; (৫) মুনি—ত্রিপুরাসুরের রাজধানী হইতে শিবলিঙ্গ উদ্ধার করেন ; (৬) সিংহ (অর্থাৎ নরসিংহ)—হিরণ্যপকাসুরকে বধ করেন ; (৭) কুজ—বামনের পরিবর্তে, দানব তাবন্‌কে পরাভূত করেন ; (৮) কৃষ্ণ ; (৯) অপ্সরা—নারায়ণ অপ্সরা-মূর্তি ধারণ করিয়া নন্দকাসুরকে মোহিত করিয়া পরে তাহার বধ-সাধন করেন (এই নন্দকাসুর-ই পরে 'দশকণ্ঠ রাবণ' রূপে অবতীর্ণ হয়) ; এবং (১০) রাম। 'নারায়ণ-সিপ্পাং' গ্রন্থে বিষ্ণু-ই প্রধান দেবতা, কিন্তু 'রাম-কিয়েন্'-এ ঈশ্বর বা শিব হইতেছেন প্রধান।

'রাম-কিয়েন'-এর রাম-কথা নানা বিষয়ে স্বতন্ত্র—রামায়ণের মূল উপাখ্যানটি ঠিক থাকিলেও, ছোট ও বড়ো ঘটনাগুলির বিস্তর হেরফের আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতীয় রাম-কথায় অজ্ঞাত নানা কথা আছে, সুপরিচিত নামগুলিও বহুস্থলে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর নাম 'রাম-কিয়েন্'-এ "কৌসুরিয়া, সমুদ্রজা, কৈয়কেশী" হইয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠের নাম ঠিক আছে, কিন্তু বিশ্বামিত্র হইয়া গিয়াছেন "স্বমিত্র"। মন্দোদরীর শ্যামী নাম "মণ্ডো", তিনি পূর্বজন্মে এক মণ্ডুকী বা বেঙ ছিলেন। রামের গাত্রবর্ণ হরিৎ, ভরতের (শ্যামীতে "বরত") রক্ত, লক্ষ্মণের ("লক্ষণ") পীত এবং "শত্রুদ্" বা *শত্রুঘ্নের গাত্র-বর্ণ ছিল রক্তনীল। শ্যামী রামায়ণের উপাখ্যান-বৈচিত্র্য এবং পাত্র-পাত্রীদের নামের পার্থক্য, কতটকু ভারতে প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত অন্য রাম-কথা বা পুরাণ-কথা হইতে প্রাপ্ত ও কতটুকু শ্যাম-দেশের প্রাচীন থাই-জাতির পুরাণ-কথার প্রভাবে সৃষ্ট, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। শ্যামী রাম-কথা লইয়া আর আলোচনা করিব না—তাহার পূর্ণ পরিচয় এক্ষেত্রে অনাবশ্যক ; কৌতূহলী পাঠকদের জন্য স্বামী সত্যানন্দ পুরীর অনুবাদ আছে। ভারতের ও শ্যামের (তথা যবদ্বীপের রাম-কথা অবলম্বন করিয়া একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।

ইন্দোনেসিয়ায় (যবদ্বীপে ও অন্যত্র) রামায়ণের ইতিহাস অতি বিচিত্র। যবদ্বীপের রামায়ণ লইয়া, 'কবি' বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ও ডচ্ ভাষায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকার এম-এ (অধুনা খড়্গপুর কলেজের অধ্যক্ষ) Indian Influences on the Literature of Java and Bali (Greater India Society কলিকাতা হইতে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত) নামক তাঁহার গবেষণাত্মক ইংরেজী পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন (অধ্যায় ৭, ৮, ৯, ১০, পৃঃ ১৭০-২৩১)। প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ ডচ্ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত Hendrik Kern হেন্দ্রিক্ কের্ন্ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়া দেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডচ্ পণ্ডিত W. F. Stutterheim ষ্টুটর্হাইম জর্মান ভাষায় ম্যুনিক্ শহর হইতে Rama-legenden und Rama-reliefs in Indonesien অর্থাৎ 'ইন্দোনেসিয়ায় রাম-কাহিনী ও রাম-কথার প্রস্তর-চিত্র' বিষয়ে বৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে তিন খণ্ডে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডচ্ সরকার কর্তৃক পরিচালিত জনশিক্ষা-পরিষদ্ (Voolks-lektuur)-এর প্রকাশন-মন্দির, Weltevreden Batavia (অধুনা Djakarta জকর্তা)-নগরের Balai Poestaka "বালাই-পুস্তাকা" অর্থাৎ "গ্রন্থ-গৃহ" নামক প্রতিষ্ঠান হইতে Serat Rama 'রাম-কথা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুস্তক রোমান লিপিতে ও যবদ্বীপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে Tjandi Prambanan চান্দি (চাণ্ডি) প্রাম্বানান্-এ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের বিরাট্ মন্দিরত্রয়ের মধ্যে, মধ্যস্থলে অবস্থিত শিবের মন্দিরের প্রস্তরময় ভিত্তি-গাত্রে খোদিত অদ্ভুত-সুন্দর রামায়ণ-চিত্রাবলীর প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে—এইরূপ সুন্দর রামায়ণ-চিত্র ভারতবর্ষেও কোথাও নাই; উপরন্তু, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে Tjandi Panataran চান্দি পানাতারান্ মন্দির-গাত্রের সম্পূর্ণ অন্য রীতিতে খোদিত চিত্রগুলিও প্রকাশিত হইয়াছে। যবদ্বীপে প্রচলিত রামায়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে, এই পুস্তকে ভারতে ও মালয়-দেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন রামায়ণের বিচার আছে। বাল্মীকি-মতে মূল রাম-কথা প্রদত্ত হইয়াছে, ও যবদ্বীপের এক অতিপ্রসিদ্ধ কাব্যময় রাম-কথাও মুদ্রিত হইয়াছে।

যবদ্বীপ ও ইন্দোনেসিয়ার রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। শ্যাম-দেশের মত অত পরিবর্তন ইহাতে হয় নাই। রাম ও সীতা যবদ্বীপে আদি স্রষ্টা, মানব-জাতির পিতা ও মাতা রূপেও কল্পিত হন ("র-মো, সী-ত্যো" রূপে নাম দুইটি উচ্চারিত হয়)। এ বিষয়ে পূর্ণ বিচারের এখন আবশ্যকতা নাই। বহু পূর্বে এ বিষয়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ও Rupam 'রূপম্' পত্রিকায় কিছু লিখিয়াছিলাম। 'প্রবাসী'-তে চান্দি প্রাম্বানান্-এর খোদিত রামায়ণ-চিত্র প্রকাশিতও হইয়াছিল। এখানে কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীতা-হরণের পরে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধানে কিষ্কিন্ধ্যার নিকটে অরণ্যে ঘুরিতেছেন, এমন সময়ে রাম তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ বাঁশের চোঙ্গা করিয়া জল আনিলেন, নিকটে প্রবহমান একটি স্রোতস্বিনী হইতে। রাম সেই জল আস্বাদ করিয়া দেখিলেন, তাহা লবণাক্ত। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ কারণ অনুসন্ধান করিতে নির্গত হইলেন—তিনি নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে উজাইয়া হাঁটিয়া চলিলেন, কোথায় সেই ক্ষুদ্র নদীটির উৎপত্তি তাহা দেখিবার জন্য। দেখিলেন, নদীটি আর কিছু-ই নহে, সুগ্রীব এক গাছের উপরে বসিয়া নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু হইতে নির্গত অবিরল অশ্রুধারা নদী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এইভাবে লক্ষ্মণ-সুগ্রীবের ও পরে রাম-সুগ্রীবের মিলন ঘটিল। প্রাম্বানান্-এর মন্দিরের রামকথা-চিত্রে দেখা যায়, লক্ষ্মণ জলপাত্রের জন্য মোটা বাঁশের চোঙ্গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লইয়া বৃক্ষে উপবিষ্ট রোরুদ্যমান সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। যবদ্বীপে রামায়ণ-কথা লইয়া Wayang Koelit "ওআইয়াং-কুলিৎ" অর্থাৎ ছায়া-নাট্যও হইয়া থাকে, নৃত্য-নাট্যও হয়। এই-সব নাট্য-অনুষ্ঠানেও রাম-কথার বিষয়-বস্তুতে কিছু কিছু অভিনবত্ব থাকে। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণের সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে যবদ্বীপের এক সামন্ত-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর গৃহে আমাদের এই প্রকার নৃত্য-নাট্য দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। এবিষয়ে আমার 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে (কলিকাতায় ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ৩৫০-৩৫১) আমি লিখিয়াছি। শূর্পণখার একসঙ্গে আট আটটি রাক্ষস স্বামীর কল্পনা (প্রত্যেকেরই মুখ মহিষ এবং শূকরের মুখের ভাব মিলাইয়া প্রস্তুত মুখসের দ্বারা আবৃত—এই মহিষশৃঙ্গ শূকরমুখ আটটি রাক্ষস যেন বর্বরতা ও মূর্খতার প্রতীক)—শূর্পণখার বিরহে আটজন স্বামীর নাচ-গানের মাধ্যমে চিত্তের অধৈর্য্য প্রকাশ, এবং দণ্ডকারণ্য হইতে শূর্পণখার প্রত্যাবর্তনে যুগপৎ আট স্বামীর সোল্লাস নৃত্য—অদ্ভুত ও বীভৎস-মিশ্র হাস্যরসের এক অনপেক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা এইভাবে পল্লবিত রাম-কথা যবদ্বীপে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, পরন্তু মূল আখ্যানের মর্য্যাদা ইহাতে মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রামায়ণ-কথা এইভাবে নানাজাতির চিত্তকে রসসিক্ত করিয়াছে। বিশ্ব-মানবের সাহিত্য-রস-পিপাসু মনের জন্য রাম-কথা এক অক্ষয় রসভাণ্ডার-রূপে বিরাজমান। বিরাট্ সাহিত্য-সর্জনার গুণ-ই এই—ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের মনকে নানাভাবে আকুল করিতে পারে। আমাদের দেশে রামায়ণের সাহিত্য-রস তো আছেই; সেই সাহিত্য-রস, সাহিত্য-রসিকজনের চিত্তকে কী কারণে এবং কী ভাবে আবিষ্ট করিয়া থাকে, আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকগণ তাহার বিচার করিয়াছেন। রামায়ণে romance অর্থাৎ রমন্যাস বা রোচিষ্ণুতা আছে, এই রোমান্স সকলের চিত্তকে আকুল করিবেই। ইহাতে বাস্তবানুসারিতাও আছে, বিশেষতঃ চরিত্র-চিত্রণে—সেই বাস্তবানুসারিতার সত্যদৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে। উপাখ্যানের অলৌকিক অংশ বর্জন করিয়াও, তাহার যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহ দেখা দেয়, এই সত্যদৃষ্টি-ই তাহার নিরসন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু ইহার মধ্যে যে পারিবারিক জীবনের আদর্শ আছে, তাহার আর তুলনা হয় না। রামায়ণের প্রথম প্রচারের সময় হইতেই ইহার অমৃত-প্রবাহ ভারতীয় পারিবারিক জীবনকে পবিত্র ও পুণ্যময় করিয়া রাখিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম, সৌভ্রাত্র, প্রভুভক্তি, আশ্রিত-রক্ষা প্রভৃতি যে-সমস্ত গুণে সমাজের মানুষের মধ্যে শান্তি ও সুখ সহজলভ্য হয়, যে-সমস্ত গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হইতে পারে, নিখিল-চিত্ত-মথনকারী মনোহর উপাখ্যানের মাধ্যমে, উপাখ্যানের পটভূমিকা নগর ও অরণ্য উভয়ের পারিপার্শ্বিকে, অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সকলকে প্রীত বিস্মিত করিবার সে-সমস্ত গুণ ও আদর্শ রামায়ণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। রামায়ণের সামাজিক আদর্শ ও বিশেষ করিয়া পারিবারিক আদর্শ-ই হইতেছে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের আদর্শ। সত্য বটে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী সব যুগে ও সর্বত্র এক-ই প্রকার থাকে না বা হয় না। রাম-চরিত্র একদিকে মহীয়ান্, তাহার মহত্ত্বের তুলনা হয় না। অন্যদিকে, রামের কতক-গুলি আচরণে বা কার্যে আধুনিক যুগের মানুষ সহমত হইতে পারিবে না; যেমন বালি-বধ, সীতার বনবাস ও শম্বুক-বধ। কিন্তু তাহা হইলেও, রামায়ণের সহজ সরল পারিবারিক আদর্শকে আমরা কোনও কালে কোনও সমাজে উপেক্ষা করিতে পারি না। রামের চরিত্রের গৌরব, লক্ষ্মণের ও ভরতের কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃভক্তি, সীতার চরিত্রের বিপুল মাধুর্য্য ও মহিমা, উর্মিলার আত্মবিলোপ, হনুমানের ভক্তি ও কর্তব্য-পরায়ণতা—এ-সমস্তই আমাদের হৃদয়ের বস্তু। ইঁহাদের চরিত্র বাল্মীকির মহাকাব্যে অতিমানব মহাপুরুষ, বীর এবং বীরাঙ্গনার চরিত্র—মানবিকতার আধারে দণ্ডায়মান থাকিয়াও, এই মহাগ্রন্থে তাঁহারা সকলেই দেবত্বের পদে অধিরূঢ় রহিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের চরিত্রের মানবিক গুণের জন্যই তাঁহারা আমাদের কাছে এত প্রিয়, এত আপনার হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের ও বহির্ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণ ইঁহাদিগকে সেই সেই অঞ্চলের জীবনের অন্তঃস্থলে টানিয়া লইয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের সীতা ক্ষত্রিয়াণী, বীরাঙ্গনা; বাঙ্গালায় আসিয়া তিনি কৃত্তিবাস-প্রমুখ বাঙ্গালী কবির অঙ্কিত চরিত্রালেখ্যে বাঙ্গালার গৃহস্থ ঘরের বধূ হইয়া গিয়াছেন। আবার রাজস্থানে তিনি মধ্যযুগের রাজপুতানী, কেরলে তিনি কেরল-সীমন্তিনী, তুলসীদাস-প্রমুখ কবির কল্যাণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি উত্তর-ভারতের লজ্জাশীলা অথচ তেজোদৃপ্তা কুলবধূ। সীতা মহীয়সী বীরাঙ্গনা, কিন্তু আমরা "জনম-দুখিনী" বাঙ্গালী ঘরের লাজুক বধূ সীতাকেই জানি, তাঁহার পুণ্য চরিত্র আকুল চিত্তে পূজা করি—এবং এই জনম-দুখিনী অথচ স্বামীর প্রেমে গরবিনী এবং স্বামীর আদর্শে ধন্যা ও অনুপ্রাণিতা রাম-ঘরণী সীতাকে, নূতন করিয়া গৌরাঙ্গ-জায়া বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে ও রামকৃষ্ণ-পত্নী সারদা দেবী রূপে পাইয়াও আমরা ধন্য হইয়াছি।

রামায়ণের কথা একাধারে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ধর্মাদর্শ-পূত সুসংস্কৃত জীবনের কথা, এবং মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের ভারতীয় গৃহস্থ-জীবনের শুচিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা। ইহার প্রাচীন স্বরূপ প্রণিধানের জন্য আমাদের সমক্ষে বাল্মীকির মূল রামায়ণ রহিয়াছে। আমাদের জীবনের উপযোগী করিয়া ইহার অন্তর কাহিনীর নানা ঘরোয়া রূপ আমরা দিয়াছি। আবার প্রাচীন বীরগাথার যুগ, যেখানে বিরাট্ উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রী হয় দেবধর্মী মানব, না-হয় মানব-ধর্মী দেবতা, তাহাকে অতিক্রম করিয়া বা তাহাকে প্লাবিত করিয়া আমরা মধ্যযুগের ভক্তির এবং আত্মনিবেদনের ধারা বহাইয়াছি। বাল্মীকির রামায়ণ এক ধরণের বস্তু; কিন্তু তুলসীদাসের রামরচিত-মানসে আছে ভক্তের পুলক, স্বেদকম্প ও অশ্রুবর্ষণ, এবং ভক্তিশাস্ত্রের দার্শনিক বিচার ও জীবনে তাহার প্রতিফলন; তেমনি কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা পাই, সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় যে রামায়ণ-কথা "স্বে মহিম্নি" বিদ্যমান, তাহার উপাখ্যানের সংকলন, ও সঙ্গে সঙ্গে ধরাধামে অবতীর্ণ দেবতা রামচন্দ্রের ললিত-কোমল স্নেহ-প্রবণ ভক্ত-বৎসল দেবপ্রকৃতির প্রকাশন। নানা দিক্ হইতে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষার দ্বারা প্রচারিত এই রামায়ণ-কথার পূর্ণ সার্থকতা পরিস্ফুটিত হইতেছে।

কিন্তু একদিকে রাম-কথার অন্তর্নিহিত জীবনের আদর্শ ও নীতিনিষ্ঠতা, অথবা ইহার দ্বারা সমাজ-সংস্করণ এবং সমাজ-রক্ষা, ও অন্য দিকে রাম-কথার বাহ্য রূপের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অথবা সংস্কৃতির পরিচয়, প্রাচীন ভারতীয় জাতির পরিচয়—এ সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে রামায়ণের ভিতরের কাব্য-প্রাণ, যেটি সোনার-কাঠির মত মানব-মনে কাব্যামৃত-রসাস্বাদের সাহায্যে নূতন অনুভূতি, নবীন চেতনা আনিয়া দেয়; যাহাতে সমগ্র ভাবে, কেবল পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রাণী রূপে নহে, মানবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংযত করে, পবিত্র করে, উন্নত করে, পরিপূর্ণ করে। এই জন্য রামায়ণ, মহাভারত, য়িহুদী পুরাণ, কালিদাসের নাটক ও কাব্য, ঈরানী ইতিহাস-কথা শাহ্‌নামা, গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াদ ও ওদিসি, গ্রীক ট্রাজেডি নাট্য-সম্পুট, শেক্‌স্পিয়ারের নাটকাবলী, গ্যেটের রচনাবলী, টল্‌স্টয়ের রচনাবলী, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রভৃতি মহাগ্রন্থের সার্থকতা। ব্যাপক-ভাবে আমাদের জাতির পক্ষে, আমাদের জাতির প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে, ইহা এক বিধি-দত্ত পরম সৌভাগ্য যে, রামায়ণ-মহাভারতের মতো গ্রন্থ আমাদের সভ্যতার আধার-ভূমি ও প্রকাশ-ভূমি হইয়া আছে। মহাকবির এবং সাধকের ভাষায় আমরা আমাদেরও প্রাণের ভাষা পাই; সেইজন্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানব-মনের প্রতি রামায়ণের আবেদন উদ্ধার করিয়া, আমার এই অক্ষম রামায়ণ-প্রশস্তি সমাপ্ত করিতেছি—

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি,
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।

অসহ দুঃখ সহি' নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি'
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।

কহিল, "বারেক ভাবি দেখো মনে,
সেই একদিন কেটেছে কেমনে,
যেদিন মলিন বাকল-বসনে
চলিলা বনের পথে—

ভাই লক্ষ্মণ, বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন,
নববধূ সীতা আভরণ-হীন
উঠিলা বিদায়-রথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজপুরী-মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে-সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
প'ড়েছে এমন ঘরে।

অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গল-দীপ নিবিয়া আধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।

আর একদিন, ভেবে দেখো মনে
সেদিন শ্রীরাম ল'য়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি,—

'জানকী, জানকী', আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার-আননে
রহিল নীরবে চাহি'।

তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের—
এত বিষাদের, এত বিরহের
এত সাধনের ধন,
সেই সীতাদেবী রাজসভা-মাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।

সে-সকল দিন সে-ও চ'লে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—
যায়নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণ সার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।

শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর,
মধুর-করুণ তানে ;

সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে,
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।"

[বঙ্গাব্দ ১৩৬৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুরল্

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় যতগুলি সাহিত্য আছে, সেগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের। তাহার পরেই, মৌলিকত্বে, মনোহারিত্বে, প্রসারে, বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে তমিল সাহিত্যের স্থান। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল জুড়িয়া সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়েই উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির সাহিত্য বহুশঃ সংস্কৃত সাহিত্যেরই আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের ভাষাসাহিত্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এই-সমস্ত নূতন সাহিত্যের উদ্ভব সত্ত্বেও, সংস্কৃত-ভাষায় সাহিত্য-রচনা এখনও লুপ্ত হয় নাই। ইহা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, প্রাচীনতম কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে গ্রথিত, ও ইহার অন্যতম প্রতীক-স্বরূপ বিদ্যমান—ইহা ভারতের প্রধান মৌলিক সাহিত্য। সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু ও চীনা—জগতের এই চারিটি মৌলিক সাহিত্য বিদ্যমান; অন্যগুলি প্রায়শঃ এইগুলিরই অনুকারী।

উত্তর-ভারতে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, ধীরে-ধীরে সংস্কৃত সাহিত্য পুষ্টি ও প্রসার লাভ করিবার সহস্র বৎসর পরে, দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর তমিল জাতির মধ্যে স্বাধীন-ভাবে সাহিত্য-চেষ্টা দেখা যায়। আদি-যুগের তমিল সাহিত্যে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবর্ধমান প্রভাব প্রথম হইতেই তমিল সাহিত্যের উপরে আসিয়া পড়ায়, তমিল সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী কালে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। প্রথম যুগের তমিল সাহিত্যে যেটুকু সংস্কৃত বা উত্তর-ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে, সেটুকুর দ্বারা ইহার মৌলিকত্ব নষ্ট হইতে পারে নাই; প্রথম যুগের তমিল সাহিত্য সেই প্রভাবটুকুকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, নিজ বৈশিষ্ট্যকেই বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিশুদ্ধ তমিল সংস্কৃতির প্রকাশ-স্বরূপ আদি যুগের তমিল সাহিত্য ভারতবর্ষের সাহিত্য-জগতে অন্যতর মৌলিক বস্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কবি তিরুবল্লুবর্ (তিরু—রল্ল্ল্লুবর্)-কর্তৃক রচিত কুরল্ (কুরল্), বা 'মুপ্পাল্' এই প্রথম যুগের তমিল-সাহিত্যের একটি মুখ্য গ্রন্থ। ইহা তমিল ভাষার অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক, এবং উত্তর-ভারতের সংস্কৃতাদি আর্য্য-ভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির সহিত দক্ষিণ-ভারতের বিশুদ্ধ দ্রাবিড তমিল সংস্কৃতির প্রথম যুগের সার্থক সংমিশ্রণের ফল-স্বরূপ। ইহাতে ভাষায়, ছন্দে, বর্ণন-ভঙ্গীতে এবং কোনও-কোনও বিষয়ের প্রকটনে দ্রাবিড-বৈশিষ্ট্য সুন্দর-ভাবে রক্ষিত আছে। লোক-প্রিযতায ইহা তমিল ভাষার অদ্বিতীয পুস্তক।

প্রস্তুত গ্রন্থ এই প্রাচীন, উপাদেয় এবং জনপ্রিয় তমিল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। মূল তমিল ভাষা হইতে অনূদিত না হইলেও, ইহার দ্বারা বঙ্গ-ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। ভারতের একটি গরিষ্ঠ ভাষার অমূল্য রত্ন-স্বরূপ এই পুস্তকের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিযা, শ্রদ্ধেয শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়, বঙ্গভাষী জনগণের মানসিক সংস্কৃতির প্রসার-কল্পে বিশেষ শ্রমস্বীকার-পূর্বক, বাঙ্গালা-পাঠকগণের সমক্ষে ইহা উপস্থাপিত করিয়াছেন—বঙ্গবাণীর চরণে এই অভিনব সুরভি ও বর্ণোজ্জ্বল পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া বঙ্গভাষা-সরস্বতীর শোভা বর্ধন করিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের প্রসার বিষয়ে যত্নবান্ প্রত্যেক বাঙ্গালী এইজন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিবেন।

কুরল্-গ্রন্থ এবং ইহার রচযিতা, তথা প্রথম যুগের তমিল-সাহিত্যের সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ সম্বন্ধে নলিনী-বাবু তাঁহার ভূমিকায কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত ভী. আর্. রামচন্দ্র দীক্ষিতর্-রচিত Studies in Tamil Literature and History (Luzac & Co, London,1930), স্বর্গীয় পী. টী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর-রচিত History of the Tamils (C. Coomaraswami Naidu & Sons, Madras, 1929), শ্রীযুক্ত এম্. এস্. পূর্ণলিঙ্গম্ পিল্লৈ-প্রণীত A Primer of Tamil Literature (Ananda Press, Madras, 1904; পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ Munnirpallam Dt. Tirunelveli, 1929), শ্রীযুক্ত এম্. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর্-প্রণীত Tamil Studies (Guardian Press, Madras, 1914) প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এখানে সে-সমস্ত আলোচনার পুনরবতারণা না করিয়া, মোটামুটি-ভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে ষষ্ঠ শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মধ্যে কোনও সময়ে কুরল্-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিরুবল্লুবর্-এর জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে পারে; কিন্তু প্রচলিত কুরল্-গ্রন্থ খুব সম্ভব অত প্রাচীন কালের রচনা নহে—উহার ভাষা পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে।

ইহা অবিসংবাদিত যে তিরুবল্লুবর্ ও তাঁহার সমসাময়িক কতকগুলি কবির গ্রন্থে তমিল ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রক্ষিত আছে। এই সকল কবিকে তমিলের 'সঙ্গম্' যুগের কবি বলা হয়। সংস্কৃতের 'সংঘ' শব্দ প্রাচীন তমিলে 'চঙ্কম্'-রূপ ধারণ করে; এখন আধুনিক তমিলে প্রাচীন তমিলের বানান 'চঙ্কম্' বিদ্যমান, কিন্তু শব্দটির উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে 'শঙ্গম্' বা 'সঙ্গম্'। তমিল ভাষায় এই 'শঙ্গম্' বা 'চঙ্কম্' অর্থাৎ 'সংঘ' শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'পণ্ডিত ও কবিদের পরিষৎ'। তমিলদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ-কথা অনুসারে, বহু প্রাচীন যুগে তমিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনটি 'সংঘ' বা পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। এই-সব সংঘ সম্বন্ধে পুরাণ-সুলভ বহু অত্যুক্তিময় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। স্বয়ং মহাদেব, কার্ত্তিকেয় এবং অগস্ত্য মুনি—ইঁহারা প্রথম সংঘের কবিদের মধ্যে অন্যতম তিনজন ছিলেন। প্রথম দুইটি সংঘ যথাক্রমে প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর এবং তিন হাজার সাত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কেবল শেষ সংঘটিতেই ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয়; এই সংঘ, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দিকে বিদ্যমান ছিল। তমিল সাহিত্যের প্রাচীনতম কবিরা এই তৃতীয় সংঘেরই সদস্য ছিলেন, কিংবা এই যুগের লোক ছিলেন। ইঁহাদের সমসাময়িক রাজাদের ঐতিহাসিকত্ব, সুতরাং ইঁহাদেরও ঐতিহাসিকত্ব, একরূপ প্রমাণিত। সুতরাং, প্রথম দুই সংঘের কথা বাদ দিলে, মোটামুটি খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম শতক হইতে তমিল সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

দুই হাজার বৎসর ধরিয়া তমিল সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। দুই হাজার বৎসরে উত্তর-ভারতের আর্য্য-ভাষার যেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে—প্রাচীন প্রাকৃত যেমন আধুনিক বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে,—তমিল ভাষারও তেমনি বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিশেষভাবে শিক্ষা না করিয়া যেমন বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মহারাষ্ট্রীয় বা পাঞ্জাবীর পক্ষে তাহার মাতৃভাষার প্রাচীন রূপ প্রাকৃতের অর্থগ্রহণ করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য, তেমনি আধুনিক তমিল-ভাষীর পক্ষে বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে সংঘ-যুগের সুপ্রাচীন তমিল কাব্য পাঠ করিয়া বুঝা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। এখনকার প্রচলিত তমিল, প্রাচীন তমিল-ভাষা হইতে অনেকটা পৃথক্ আর একটি ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন তমিলকে তমিল ভাষায় 'চেন্-তমিঝ্"' (আধুনিক উচ্চারণে 'শেন্দমিঝ্"') বলে। 'কুরুঞ্জ্' এই প্রাচীন তমিলে, 'চেন্-তমিঝ্"'-এ লিখিত।

তমিল ভাষার ইতিহাসকে মোটামুটি এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

[১] প্রাচীন-তমিল বা 'চেন্-তমিঝ্"'—সংঘ-যুগের কবিদের রচনায় ধৃত; দ্বিতীয়-তৃতীয় হইতে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টীয় শতকের শেষ পর্য্যন্ত। ভাষার ও সাহিত্যের গতি ধরিলে, প্রাচীন তমিলে দুইটি স্তর দেখা যায়—(ক) খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক পর্য্যন্ত, ও (খ) নবম-ত্রয়োদশ শতকের তমিল। এই প্রাচীনতম যুগের তমিলের ব্যাকরণ 'তোল্-কাপ্পিয়ম্' (? তৃতীয়-চতুর্থ শতক) এবং অর্বাচীন প্রাচীন তমিলের জন্য 'বীর-চোঁঝি"য়ম্' (একাদশ শতক)।

[২] মধ্য-তমিল—চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত। 'নন্নূল্' (ত্রয়োদশ শতক) এই যুগের তমিলের ব্যাকরণ। মধ্য-যুগের তমিলকে আবার দুই যুগাংশে বিভক্ত করা যায়—(ক) প্রথম মধ্য-তমিল, ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত; এবং (খ) দ্বিতীয় মধ্য-তমিল, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক। (কেরলের মালয়ালম্ ভাষা মধ্য-তমিলের বিকারে পঞ্চদশ শতকে নিজ বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়, এবং তদনন্তর স্বতন্ত্র সাহিত্যিক পথ অনুসরণ করে।)

[৩] নব্য-তমিল—অষ্টাদশ শতক হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত। ১৮০০-১৯০০, এই এক শত বৎসর ধরিয়া নব্য-তমিলের দ্বিতীয় যুগাংশ।

প্রাচীন-তমিলের যুগে তমিল বর্ণমালা দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতের জন্য ব্যবহৃত 'গ্রন্থ' লিপির আধারে গঠিত হয়, এবং তমিল বর্ণ-বিন্যাস-রীতি ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময়ে স্থিরীকৃত হইয়া যায়। এই বানানের রীতি এখনও পর্য্যন্ত তমিলে চলিতেছে। তখনকার যুগের তমিল উচ্চারণ বদলাইয়াছে, কিন্তু বানান আছে সেই দেড় হাজার বৎসর পূর্বেকার তমিল উচ্চারণকে অবলম্বন করিয়া।

সংস্কৃত বা প্রাকৃতের তুলনায়, ধ্বনি-বিষয়ে প্রাচীন তমিল নিতান্ত অসম্পূর্ণ বা দরিদ্র ছিল।* সেই হেতু প্রাচীন তমিলের জন্য গঠিত তমিল বর্ণমালাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। নিম্নে এই বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ দেওয়া যাইতেছে—

[১] স্বরবর্ণ—'অ, আ; ই, ঈ; হ্রস্ব এ, দীর্ঘ এে ; হ্রস্ব ও, দীর্ঘ ওো; ঐ, ঔ'।
[২] ব্যঞ্জনবর্ণ—'ক, ঙ ; চ, ঞ ; ট, ণ ; ত, ন ; প, ম ; য়, র, ল, ব (=র্র) ; ঝ", ল্ল, র, ন ; ঃ।

হ্রস্ব 'এ' এবং 'ও' বাঙ্গালা অক্ষরে কেবল 'এ, ও,' দ্বারা লিখিত হইতে পারে ; এবং দীর্ঘ 'এ' ও দীর্ঘ 'ও', এই দুই বর্ণ দুইবার লিখিয়া বাঙ্গালায় প্রকাশিত করা যাইতে পারে ; যেমন হ্রস্বধ্বনি—'পেরিয়, পোয়্, তেন্' ; দীর্ঘধ্বনি—'তেচম্' (=দশ), 'অরোোক্কিয়ম্' (=আরোগ্য) ; 'তেণ্'।

প্রাচীন- ও মধ্য-তমিলে পঞ্চবর্গের স্পর্শধ্বনি কয়টির মধ্যে মাত্র প্রথমটি ছিল—অঘোষ অল্পপ্রাণ 'ক, চ, ট, ত, প' মাত্র ; প্রাচীন-তমিলেরও পূর্বাবস্থায়, বর্গের তৃতীয় ধ্বনিগুলিও ছিল (ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ 'গ, জ, ড, দ, ব')। কিন্তু অনুমান হয়, প্রাচীন-তমিলের যুগে, খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যে, ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলি সর্বত্র অঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়া যায়। আদি-দ্রাবিড ভাষায় মহাপ্রাণ-ধ্বনি (খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ,) ছিল কিনা, তাহা জানা যায় না ; থাকিলেও, সেগুলি প্রাচীন তমিলের পূর্বাবস্থাতেই অল্পপ্রাণ হইয়া যায়, এবং পরে এই অল্পপ্রাণ সঘোষ হইতে অঘোষ পর্য্যায়ে নীত হয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—আদি-দ্রাবিড রূপ 'দ্রমিঝ্"' ('ঝ"'-ধ্বনি সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে) ; উহা হইতে সংস্কৃত 'দ্রমিড, দ্রমিল্ল', দ্রবিড' ; আদি-দ্রাবিড '*দ্রমিঝ্"' হইতে, প্রাচীন তমিলের প্রথম অবস্থায় '*দমিঝ্"', সিংহলীতে ও পালিতে 'দমিল্ল', এবং গ্রীকে *Dumir

*সংস্কৃত এবং প্রাচীন-তমিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার তুলনা-মূলক ধ্বনি-বিচার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এস্. অনন্তরত-বিনায়কম পিল্লৈ-রচিত বিশেষ উপযোগী পুস্তক The Sanskrit Element in the Vocabularies of the Dravidian Languages (University of Madras Dravidic Studies III, 1919) দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(*Damirikė = '*দমিঝ্"কম্', অর্থাৎ 'তমিলদেশ') রূপগুলি গৃহীত হয়; এবং '*দমিঝ্" পরিবর্তিত হইয়া, প্রাচীন বা 'সংঘম্'-যুগের তমিলে 'তমিঝ্" '-রূপ ধারণ করে—Tamizh বা Tamil, যাহা আমরা বাঙ্গালায় 'তমিল' (বা 'তামিল')-রূপে লিখিয়া থাকি। আদি-দ্রাবিড '*ঘুত্র', '*ঘোতর;' ইহা হইতে, সংস্কৃত 'ঘোট, ঘোটক', প্রাকৃত 'ঘোড, ঘোডঅ', আধুনিক আর্য্য-ভাষা-গুলিতে 'ঘোড়, ঘোডা'; '*ঘুত্র' হইতে '*গুত্র', '*গুতির', পরে প্রাচীন-তমিলে 'কুতিরৈ', কানাডী ভাষায় 'কুদুরে', তেলুগুতে 'গুর্র' ('*গুদ্র' হইতে)। এইরূপে আদি-দ্রাবিডের ঘোষবদ্ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি, প্রাচীন-তমিলে সর্বত্র অঘোষ অল্পপ্রাণে পর্য্যবসিত হয়। আর্য্যভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে শব্দ প্রাচীন তমিলে আসিলে, সেই সব শব্দের অন্তর্গত ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিরও সেই অবস্থা ঘটিত; যথা—সংস্কৃত 'মুখ, উদ্বেগ, গণেশ, রাজা, কথা, নাথ, গদা, রাধা, দৃষ্টান্ত, স্বয়ম্ভূ' = প্রাচীন-তমিল 'মুকম্, উত্তুরেকম্ কণেচন্, অরচন্, কতৈ, নাতন্, কতৈ, ইরাতৈ, তিরুট্টান্তম্, চযম্পূ', ইত্যাদি। †

সংস্কৃতে 'শ, ষ, স'-এর অনুরূপ ধ্বনি প্রাচীন তমিলে ছিল না; দক্ষিণ ভারতের তাবৎ দ্রাবিড ভাষাগুলিতে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় হইতে খ্রীষ্টের পরের তৃতীয় শতকের মধ্যে, সর্বত্র, কি শুদ্ধ দ্রাবিড শব্দে, কি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে, Sibilant বা ঊষ্ম ধ্বনি বিলুপ্ত হয়। পরে নূতন করিয়া গৃহীত সংস্কৃত শব্দসমূহে, এই ঊষ্ম ধ্বনিগুলি 'চ, ত, য, ট' প্রভৃতিব দ্বারা প্রাচীন-তমিলে নির্দেশিত হইত। প্রাচীন-তমিলে 'হ'-এর ধ্বনি ছিল না। পরবর্তী কালে, মধ্য-তমিলেব যুগে, তমিল ভাষায ঘোষবৎ 'গ, জ, ড, দ, ব'-এর ধ্বনি, শব্দেব অভ্যন্তবে (আদিতে নহে), একক অবস্থিত 'ক, চ, ট, ত, প'-এর বিকারে উদ্ভূত হয; এবং বর্তমানে কালের কথিত নব্য-তমিলে আবার এই নব-সৃষ্ট, শব্দাভ্যন্তরস্থিত 'গ, দ, ব'-এর spirant বা ঊষ্ম উচ্চারণও আসিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ 'গ'-স্থানে আরবী-ফারসীর 'ঘয়ন্' অক্ষরের ধ্বনি, বা ক্বচিৎ 'হ'-এর ধ্বনি; 'দ-'স্থানে ইংরেজী this, then, that-এর th-এর ধ্বনি; এবং 'ব'-স্থানে ওষ্ঠ্য v-এর ধ্বনি)। এই

† এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য আমাব প্রবন্ধ Old Tamil, Ancient Tamil and Primitive Dravidian (মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত Tamil Culture পত্রিকায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত, Volume V. no. 2, April 1956)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সমস্ত কারণে, প্রাচীন-তমিল অনুযায়ী তমিল বানানে, এবং আধুনিক-তমিল উচ্চারণে, এক বিরাট্ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তমিলে তাই 'গণপতিকে' লেখে 'কণপতি', এখন উচ্চারণ করে 'ক-ণ-ব-দি' বা ka-ṇa-va-thi (this, that-এর উষ্ম 'দ')। ইংরেজী-শিক্ষিত তমিলগণ সেইজন্য অনেক সময়ে th-দ্বারা 'ত' ও উষ্ম 'দ' এই উভয়বিধ ধ্বনি প্রকাশ করেন : Thamotharan = 'তামোদরন্ = দামোদর'। আধুনিক-তমিলে 'চ'-এর উচ্চারণ 'শ' বা 'স'-রূপেও শোনা যায়। সংঘ-যুগের প্রাচীন-তমিল নাম বা শব্দ, রোমান বা ভারতের অন্য প্রদেশের লিপিতে লিখিতে গেলে, আজকাল পণ্ডিতগণ মূল তমিল বর্ণ-বিন্যাসের অক্ষরান্তরীকরণ মাত্র করিতে অনুমোদন করেন—আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া লিখিবার প্রযাস, প্রাচীন-তমিলের পক্ষে ঠিক হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নলিনী-বাবুর ভূমিকাতে প্রদত্ত কতকগুলি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে: এইগুলির নিয়ম-সিদ্ধ বর্ণান্তরীকরণ এইরূপ হইবে: 'ময়িলাপুর্' ('মলয়াপুর' নহে, পৃঃ ২), 'এল্লেলে-চিঙ্কন্' (পৃঃ ৩), 'উরৈয়ুর্, করিরিপ্-পট্টম্, কলিৎ-তোকৈ, ইনন-নর্পতু, নেটু-নল্-বাটৈ, কুরিঞ্চিপ্-পাট্টু, তিরু-মুরুকার্-রুপ্-পটৈ' (পৃঃ ৪১), ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচীন-তমিলের উচ্চারণ অনুসারে গঠিত তমিল বানানকে, আধুনিক-তমিলের রকমারি উচ্চারণ ধরিয়া, রোমান লিপিতে এখন তমিল লেখকেরাই বিভিন্ন-রূপে লিখেন; সেইজন্য তমিল ভাষায় প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস-রীতি এবং সঙ্গে-সঙ্গে তমিল ধ্বনিতত্ত্বের খোঁজ না লইয়া, ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় তমিল শব্দের বর্ণান্তরীকরণ করিতে গেলে, অল্প-বিস্তর বিভ্রাট্ অবশ্যম্ভাবী।*

সংস্কৃত-প্রমুখ আর্য্য-ভাষার কতকগুলি ধ্বনি যেমন তমিলে নাই, তমিলের তেমনি কতকগুলি স্বকীয় বিশিষ্ট ধ্বনি আছে। বাঙ্গালায় ইহাদের উপযোগী বর্ণ না থাকায়, আমি নাগরী হইতে তিনটি বর্ণ, ও একটি বাঙ্গালা

* ৪৬-এর পৃষ্ঠায় নলিনীবাবু যে তমিল শ্লোকটি দিয়াছেন, সেটি 'কুরল্'-এর সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদের দশম শ্লোক নহে, সেটি হইতেছে ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছদের দশম শ্লোক (অনুবাদ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৭৬)। G. U. Pope-এর সংস্করণের মূলের পাঠ অনুসরণ করিয়া লিখিলে, উহার যথাযথ বাঙ্গালা বর্ণান্তরীকরণ এইরূপ হইবে—

নামম্ রেকুঞ্চি মযক্‌ককমি রৈমুনরি
নামঙ্ কেটক্‌কেটু নোায়্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বর্ণ, বিশেষ-চিহ্নযুক্ত করিয়া লইয়া, ব্যবহার করিলাম। মূর্ধন্য ল (= বৈদিক ळ—বাঙ্গালা ছাপাখানায় ळ অক্ষর না মিলিলে, 'ল.'-রূপে লেখা চলে) প্রাচীন সংস্কৃতে ছিল, এখনও পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী ও উড়িয়াতে মিলে; জীভ মুখের ভিতরে উল্‌টাইয়া লইয়া, এই 'ळ' উচ্চারণ করিতে হয়। র ও ন—সাধারণ র ও ন-এর উচ্চারণের সঙ্গে এই দুই দ্রাবিড়-ধ্বনির যে পার্থক্য আছে, আমরা তাহা সহজে ধরিতে পারি না; এই দুই 'র, ন' দন্তমূলীয় ধ্বনি; সাধারণ 'র, ন' যে-স্থানে উচ্চারিত হয়, তাহার ঊর্ধ্বে এই দুইটি উচ্চারিত হয়। এই দুইটিকে (অর্থাৎ 'র, ন'-কে) তালব্য 'র, ন' বলাও চলে। 'র'-এর দ্বিত্ব হইলে, 'র্‌র' আধুনিক-তমিলে দন্তমূলীয় 'ত্ত(ৎত)'-য়ে—অর্থাৎ আমাদের মূর্ধন্য 'ট্ট' নহে, দন্ত্য 'ত্ত' নহে—ইংরেজীর tt-র ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এখনকার তমিলে 'ন্‌র'-ও ইংরেজীর ndr-তে রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের কাহারও-কাহারও মতে, এই 'র' প্রাচীন-তমিলে র-জাতীয় ধ্বনি ছিল না, ইহার আদি উচ্চারণ ছিল দন্তমূলীয় 'ত'।

'ঝ" ' তমিল ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। বাঙ্গালায় অক্ষরের অভাবে ইহার জন্য 'ঝ" ' এই চিহ্নযুক্ত 'ঝ'-বর্ণ ব্যবহার করিলাম; এই ভূমিকায় তমিল শব্দে 'ঝ" '-এর উচ্চারণ, 'ঝ = জ্‌+হ, j-h'-এর মতো হইবে না, zh-এর মতো হইবে,—মাত্র একটি ধ্বনির, ঘোষবৎ মূর্ধন্য 'ষ'-এর, প্রকাশক হইবে; জীভ উল্‌টাইয়া ঘোষবৎ 'ষ' = sh, অর্থাৎ zh উচ্চারণ করিতে হইবে। তমিলে 'ঝ' = মহাপ্রাণ 'জ্‌হ' ব্যঞ্জন-ধ্বনি নাই। দন্ত্য 'স' বা 's'-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে z; তালব্য 'শ'-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে ফরাসীর j, ইংরেজী pleasure, leisure শব্দের s-এর ধ্বনি; তেমনি মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে এই তমিল ধ্বনি; ইহা কতকটা r (খাঁটি ইংরেজের spirant বা ঊষ্ম r-এর মত) এবং zh-এর মিশ্রিত ধ্বনির মতো লাগে। ইহা-ই হইতেছে সংস্কৃত মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষবৎ রূপ, এবং তমিলের বিশিষ্ট ধ্বনি। ইংরেজীতে l বা l, ও ক্বচিৎ বা zh রূপে ইহা লিখিত হয়। *

* ভূমিকা-রূপে প্রথম প্রকাশিত এই প্রবন্ধে, তমিলের এই মূর্ধন্য zh ধ্বনিকে 'ধ' রূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এখন 'ঝ" ' ব্যবহার করিতেছি—ইহা মূর্ধন্য zh-এর অনেকটা কাছাকাছি হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রাচীন-তমিলে এক প্রকার বিসর্গ-ধ্বনি ছিল, ইহার উচ্চারণ ছিল 'খ্' (ফারসীর 'খে্' বর্ণের ধ্বনি)।

তমিল অক্ষরের দ্বারা শুদ্ধভাবে সংস্কৃত লেখা সম্ভব নহে; সেই হেতু তমিল দেশে সংস্কৃত লিখনের জন্য আর একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা প্রচলিত আছে—ইহার নাম 'গ্রন্থ-লিপি'। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রসাদে, উত্তর-ভারতের নাগরী লিপি দক্ষিণের গ্রন্থ-লিপিকে অনেকটা অপ্রচলিত করিয়া দিলেও, গ্রন্থ-লিপিতে ছাপা সংস্কৃত পুস্তক তমিল দেশে এখনও পাওয়া যায়, এবং কিছুকাল হইল এই লিপির অল্প-স্বল্প পুনঃ-প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীনকালে তমিল-দেশে সব সংস্কৃত পুঁথি-ই এই লিপিতে লিখিত হইত। আধুনিক-তমিলে সংস্কৃত ও অন্য ভাষার শব্দের ধ্বনি যথাযথ জানাইবার জন্য, প্রচলিত তমিল বর্ণমালায় গ্রন্থ-লিপি হইতে এই কয়টি বর্ণ গৃহীত হইয়াছে —'ঙ, ঘ, স, হ, ক্ষ শ্রী'; শুদ্ধ তমিল রচনায় এই অক্ষরগুলি পাওয়া যায় না।

তমিলের প্রাচীন ও অর্বাচীন উচ্চারণ ও বানান লইয়া এত কথা বলা গেল এই জন্য যে, এই উচ্চারণ-রীতিকে আশ্রয় করিয়া এ ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের সমক্ষে দেখা দিতেছে। তমিল ভাষা আমাদের আর্য্য-ভাষা—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষা—হইতে যে কতটা পৃথক্, ধ্বনি-বিষয়ে ও শব্দ-বিষয়ে, তাহা উপরের কতকগুলি দুরুচ্চার্য্য ও দুর্বোধ্য নাম হইতেও কতকটা প্রণিধান করা যাইবে। আধুনিক-তমিলে বহু সংস্কৃত শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে; প্রাচীন-তমিলে সংস্কৃত শব্দ তত আসে নাই; শব্দ-বিষয়ে তমিল ভাষা নিজ বিশুদ্ধি বহুল পরিমাণে অটুট রাখিয়াছিল; এবং যে-সব সংস্কৃত শব্দ তমিলে তখন স্থান লাভ করিত, তমিলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বহুশঃ সেগুলির আকার এতটা পরিবর্তিত হইত যে, তাহাদের সংস্কৃতত্ব ধরা পড়া কঠিন ব্যাপার। সংস্কৃত 'শ্রী, সভা, ঋষি, কৃষ্ণ, সহস্র, স্নেহ' প্রভৃতির প্রাচীন তমিল বিকার 'তিরু, অরৈ, ইরুটি, কিরুট্টিণন্, আয়িরম্, নেয়্ বা নেচম্' প্রভৃতির মধ্যে, মূল শব্দ বাহির করা কঠিন।

* * * * *

ভাষায় যেমন প্রাচীন-তমিল নিজস্ব দ্রাবিড় বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রাখিয়াছে, সাহিত্যেও তদ্রূপ বিশুদ্ধ তমিল মনোভাব, তমিল সংস্কৃতি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তজ্জাত সাহিত্যিক বাতাবরণ সুরক্ষিত আছে। এই বিশুদ্ধ তমিল সংস্কৃতির আবাস-ভূমি, মৌলিক বা আর্য্য-পূর্ব তমিল জগৎ যে কী প্রকারের ছিল, তাহা সংঘ-যুগের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং প্রাচীনতম তমিল ব্যাকরণ 'তোল্-কাপ্পিয়ম্'-এর তৃতীয় 'অধিকার' বা অধ্যায় আলোচনা করিয়া জানা যায়। 'তোল্-কাপ্পিয়ম্' ব্যাকরণ ১,২৭৬ সূত্রে গ্রথিত। 'এঝু"ত্ততিকারম্' নামে ইহার প্রথম অধ্যায়ে, 'এঝু"ত্তু' অর্থাৎ বর্ণ বা উচ্চারণ এবং লিখন আলোচিত হইয়াছে; 'চোল্লতিকারম্' নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শব্দ- ও ধাতু-রূপ এবং বাক্য-রীতির বিচার আছে। 'পোরুল্তিকারম্' নামে তৃতীয় অধ্যায়ে, কাব্যে আলোচিত বিষয়-বস্তু, ছন্দ ইত্যাদির বিচার আছে। এই তৃতীয় অধ্যায় হইতে দেখা যায় যে, কাব্যে বর্ণিত বিষয়গুলিকে প্রাচীন তমিল বৈয়াকরণ ও আলংকারিকগণ দুইটি মুখ্য ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) 'অকম্' অর্থাৎ আভ্যন্তর, (২) 'পুরম্' অর্থাৎ বাহ্য। 'অকম্' অর্থে প্রেম, 'পুরম্' অর্থে প্রেম ভিন্ন জীবনের অন্য সমস্ত দিক্, বিশেষতঃ লড়াই। প্রাচীন-তমিল সাহিত্য আলোচনা করিয়া, 'অকম্' ও 'পুরম্'-এর প্রকাশ তমিল-জীবনে কিভাবে হইত, তাহার কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল হইল ইংরেজীতে প্রথম লেখেন স্বর্গীয় ভী. কনকসভৈ পিল্লৈ, তাঁহার Tamils Eighteen Hundred Years Ago-নামক বিখ্যাত পুস্তকে (প্রথম সংস্করণ ১৯০৪; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬)। তমিল সাহিত্য বিষয়ে পূর্বে তমিল লেখকদের যে কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলিতে; এবং স্বর্গীয় পী. টী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর-রচিত History of the Tamils from the earliest times to 600 A.D. (C. Coomaraswamy & Sons, Madras, 1929) গ্রন্থে তথা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Pre-Aryan Tamil Culture পুস্তকে; 'তোল্-কাপ্পিয়ম্'-এর তৃতীয় অধ্যায় 'পোরুল্তিকারম্'-এর শ্রীযুক্ত আর্. বাসুদেব শর্মা কর্তৃক প্রস্তুত সটীক ইংরেজী অনুবাদে (Muruga Vilasa Jnanankkula Press, Trichinopoly, 1933), এবং তদ্রূপ অন্নমলৈ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উক্ত 'পোরুল্তিকারম্' অধ্যায়ের শ্রী পী. এস্. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী কর্তৃক প্রস্তুত সম্পূর্ণ সটীক অনুবাদে (১৯৪৫ সাল), তথা ঈ. এস্. বরদরাজ অয়্যর-কৃত আংশিক সটীক অনুবাদে (১৯৪৮ সাল); —প্রাচীন সংঘ-যুগের ও তৎপূর্বকালের তমিল সভ্যতার এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তমিল সাহিত্যে আলোচিত বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইবে। 'অকম্' ও 'পুরম্' যেভাবে প্রাচীন তমিল সাহিত্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া 'তোল্কাপ্পিয়ম্'-এর রচয়িতা প্রমুখ তমিল বৈয়াকরণ, আলংকারিক ও কবি, তমিল-সাহিত্যের উপজীব্য এক অভিনব, সংস্কৃত অলংকার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র অলংকার-শাস্ত্র, এবং তমিল বা দ্রমিড় জীবন-যাত্রার আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত এক জীবন-দর্শন রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন তমিল সাহিত্যের 'অকম্' ও 'পুরম্'-এর সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের Subjective and Reflective Poetry ও Objective and Narrative Poetry, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের 'পদ' বা গীতি-কবিতা ও 'মঙ্গল' বা দেবলীলা অথবা মানব-জীবন লইয়া কাব্য, এবং উর্দু সাহিত্যের Bazm 'বজ্‌ম্' অর্থাৎ 'সভা' বা 'গোষ্ঠী' অর্থাৎ নিভৃতে সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে আলোচ্য প্রেম, ব্যঙ্গ বা শান্তভাবের কবিতা ও Razam 'রজ্‌ম্' অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি রাজ-জীবন লইয়া রচিত কাব্য—এই দুই প্রকার শ্রেণী-বিভাগের কথা মনে করাইয়া দেয়।

আভ্যন্তর প্রেম এবং বাহ্য প্রেমেতর বিষয়—'অকম্' ও 'পুরম্'—প্রাচীন যুগের তমিল কবিরা জীবনকে এই দুই বর্গে বা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য চিন্তায়, মানব-জীবনের কর্তব্য বা মানবের অনুষ্ঠেয় বিষয়কে চারিটি ভাগে—চতুর্বর্গে—বিভক্ত করা হইল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চতুর্বর্গ-বিষয়ক ধারণা, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে, দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে, তমিলদের মধ্যেও আসিল। চতুর্বর্গের চারিটি বর্গকে তমিলেরা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিষয়টি আত্মসাৎ করিয়া লইল; ধর্ম='অরম্'; অর্থ='পোরুল্'; কাম='ইন্‌পম্'; এবং মোক্ষ='বীটু'। তিরু-বল্লুবর্-এর ভগিনী, কবি ঔবৈ বা অব্‌বৈ, 'নালটি' ছন্দের একটি শ্লোকে এই চারি বর্গের একটি করিয়া সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন: নিম্নে G.U. Pope-এর Hand-book of the Tamil Language হইতে তাহার "চেন্-তমিঝ্" মূলটি এবং Pope-এর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে তমিল শব্দগুলির নীচে প্রত্যেকটির আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল:—

ঈতল্ অরম্; তীরিনৈ রিট্টু-ঈট্টল্ পোরুল্; দান(ই) ধর্ম; পাপকে ছাড়িয়া, সংগ্রহ-করা(ই) অর্থ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এঞ্ঞান্‌রুম্ /	কাতল্	ইরুবর্	করুত্তুর	বৈত্তু-
সদা (সদৈব)	প্রীতি	দুইজনে	মনে	রাখিয়া
আতরর্‌ /	পট্টটতে			ইন্‌পম্ ;
আশ্রয়	যাহা-অনুভব-করিয়াছে,			(তাহাই) কাম ;

পরনৈ নিনৈন্তু— ইম্-মুন্‌রুম্ /
পরব্রহ্মকে চিন্তা-করিয়া এই-তিনটি
ৱিট্টটতে পেৱ্-ইন্‌প ৱীটু ॥
যাহা-পরিত্যাগ-করিয়াছে, (তাহাই) মহা-কাম (বা আনন্দময়) মোক্ষ ॥

এই চতুর্বর্গময় জীবন-ই কবিগণের উপজীব্য। চতুর্বর্গের মধ্যে ত্রিবর্গ—'ধর্ম' বা জীবনে মানুষের কর্তব্য এবং আদর্শ, 'অর্থ' বা মানুষের পার্থিব লাভালাভ, এবং 'কাম' বা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ—এই তিনটি, চতুর্থ বর্গ 'মোক্ষ' বা পরমার্থ লাভের পথ। এই তিনটির সাধনায় মানবকে পবিচালিত করিবার জন্য বা মানবকে সহায়তা দিবার জন্য, জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা ধর্মশাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র ও কাম-শাস্ত্র প্রণীত হইযাছে। ব্যবহারিক জীবনের সহিত এই তিনটির সম্বন্ধ ; এবং এই তিনটিকে লইযা যে শাস্ত্র, যে শাস্ত্র বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—সে শাস্ত্র, আধুনিক ভাবের কথায় বলিতে গেলে, বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ জড-বিজ্ঞান-মূলক এবং মানব-বিজ্ঞান-মূলক—'ভৌতিকী' ও 'মানবিকী'কে আশ্রয় করিয়া। মোক্ষ-বিষয়ক শাস্ত্র—'আধ্যাত্মিকী'—হইতেছে দর্শন- এবং অনুভূতি-মূলক ; এখানে বিশেষ বিশেষ প্রকারের দর্শন ও অনুভূতির অবকাশ আছে। ত্রিবর্গাত্মক ব্যাবহারিক জীবন, মানব-সাধারণ ও বস্তুনিষ্ঠ ; ত্রিবর্গের উত্তরাবস্থা মোক্ষ-ধর্মের সাধনা লইয়া, দর্শন ও অনুভূতি লইয়া, মতভেদ থাকিতে পারে। এইজন্য, পরমার্থ লাভ করিয়াছেন এমন দিব্যজ্ঞান-যুক্ত ঋষি ও তত্ত্বজ্ঞ ছাড়া, সাধারণ পণ্ডিত বা উপদেশক ত্রিবর্গ লইয়া-ই আলোচনা করিতে বা উপদেশ দিতে পারেন। তিরু-ৱল্লুৱর্ ত্রিবর্গ লইয়া-ই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; 'নার্-পাল্' অর্থাৎ চতুর্বর্গের পরিবর্তে, তিনি মাত্র 'মুপ্-পাল্' বা ত্রিবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। 'অরম্', 'পোরুল্' ও 'ইন্‌পম্' অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের বর্ণনা, বিচার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিশ্লেষণাত্মক শ্লোকাবলী লইয়া-ই তাঁহার 'মুপ্পাল্' অর্থাৎ 'ত্রিবর্গ-কাব্য'; 'কুরল্' নামক দ্বিপংক্তিময় ক্ষুদ্র ছন্দে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া, এই 'মুপ্পাল্'-কাব্যের অন্যতম নাম 'কুরল্'। 'মুপ্পাল্' ও 'কুরল্ ব্যতীত' এই কাব্যের আরও কতকগুলি নাম আছে, যথা—'উত্তর-বেদ (উত্তিররেবেতম্), পোয়্য়-মোঝি", তমিঝ্"-মরৈ, তিরু-ৱল্ল্লুৱপ্পয়ন্, তৈৱনূল্,' ইত্যাদি।

নীতি- ও প্রেম-বিষয়ক শ্লোকের সংগ্রহ বলিয়া, কুরলের অনেক শ্লোক প্রবাদের মতো লোকের মুখে-মুখে ফিরিত, এবং এখনও এগুলির প্রভাব খুবই বেশী। এই কারণে, তমিলদের মধ্যে কুরল্-সম্বন্ধে এক উচ্চ ধারণা বিদ্যমান। অনেক তমিল লেখক ও সমালোচকের মতে কুরল্ হইতেছে তমিল ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কুরলেব প্রশংসা লইযা একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়া থাকে। নিম্নে প্রদত্ত তমিল শ্লোকটিতে, কুবল্-প্রশস্তি কতদূব পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহা দেখা যায়—

আরিয়মুম্ চেন্-তমিঝ্'ম্ আবাযিন্ত—
অতন্ ইনিতু, চীরিয চেপ্পরিতু ;
আরিয়ম্ রেৱতম্ উটেত্তু,
তমিঝ্" তিরুৱল্ল্লুৱর্-পা উটেত্তু ॥
'আর্য্য-ভাষা (সংস্কৃত) ও তমিল, ইহাদের তুলনা করিলে,
কোনটি বড়ো তাহা বলা কঠিন ;
আর্য্য-ভাষায় যেমন বেদ আছে,
তেমনি তমিল-ভাষায আছে তিরুবল্লুবরব পদ ॥'

বেদের মতন বিরাট্ সাহিত্যের সঙ্গে, ধর্ম- অর্থ- ও কাম-বিষয়ক নীতি-কবিতার সংগ্রহ তুলিত করা অবশ্য অত্যন্ত অতিশয়োক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেদ সমগ্র মানব-জীবনকে লইযা, একটি জাতির জীবনের পরিচায়ক মহাগ্রন্থ ; হোমরেব মহাকাব্য-দ্বয়, আমাদের সংস্কৃত মহাভারত, ইহুদি পুরাণ ও শাস্ত্র, শেক্স্পিয়রের গ্রন্থাবলী, গ্যোটের গ্রন্থাবলী, টলস্টয়ের রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী—এইরূপ বরাট্ সাহিত্য সম্পুট-ই বেদের সম-পর্য্যায়ের। তমিল ভাষায় কুরল্ একখানি শ্রেষ্ঠ বই, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ সাহিত্য-দৃষ্টিতে, মৌলিক এবং জাতির প্রাণের পরিচায়ক, জাতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আত্মার পরিচায়ক সাহিত্যের কথা চিন্তা করিলে, তমিল সাহিত্যে প্রথম স্থান দিতে হয়, প্রাচীনতম 'সংঘম্'-যুগের কতকগুলি গ্রন্থকে—যেমন 'পত্তুপ্পাট্টু' (বা দশখণ্ড-কাব্য), 'এট্টুত্তোকৈ' (অষ্ট-সংগ্রহ), প্রাচীনতম দুই মহাকাব্য 'চিলপ্পতিকারম্' ও 'মণিমেকলৈ' ; তাহার পরে ধরিতে হয়, 'পতি-নেণ্-কীঝ্"-কণক্কু' (অর্থাৎ 'অষ্টাদশ নীতি-শ্লোক গ্রন্থ'—'কুরল্, ্যালটিয়ার্, ইন্ন-নাৎপ্পতু' প্রভৃতি আঠারো খানি বই এই শ্রেণীতে পড়ে) ; এবং কুরলের আগেই, সঙ্গে-সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়, 'নযন্মার্' অর্থাৎ তমিল শৈব ভক্ত-গণের আধ্যাত্মিক সাধনার কাব্য, কবিতা ও সংগীত ('তেৱারম্'—বিশেষ করিয়া মাণিক্ক-বাচকের কবিতাবলী) ও 'অঝ্"ৱার' বা বৈষ্ণব ভক্তদের পদের সংগ্রহ (নাল্-আযিরপ্-পিরপন্তম্'—চারি সহস্র প্রবন্ধ-পদের গ্রন্থ)।

কুরল্-ছন্দে রচিত ১৩৩০টি বিচ্ছিন্ন শ্লোকের সংগ্রহাত্মক এই কাব্য। ইহা মণিহার বা পুষ্পমালা—অবিচ্ছিন্ন ধারাব স্রোতস্বতী নদী নহে। 'মুপ্পাল্'-এর তিনটি পৃথক্ বিভাগ—'অরত্তুপ্-পাল্' বা ধর্ম-বর্গ, 'পোরুট্-পাল্' বা অর্থ-বর্গ, এবং 'কামত্তুপ্-পাল্' বা 'কাম-বর্গ। ধর্ম-বিষযে ৩৮০টি শ্লোক, অর্থবিষযে ৩৮১ হইতে ১০৮০ পর্য্যন্ত ৭০০ শ্লোক, এবং অবশিষ্ট ২৫০টি শ্লোক কাম-বিষয়ে। ধর্ম ও অর্থ বিষযে তমিল কবি যাহা লিখিযাছেন, তাহার মধ্যে সংস্কৃত ধর্ম-নীতি- ও অর্থ-শাস্ত্রের বহু শ্লোকের প্রতিধ্বনি পাওযা যায—মনু-স্মৃতি, কামন্দকীয় নীতিসার, কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্র, রাজনীতি-রত্নাকর, রামাযণ, মহাভারত (বিশেষতঃ গীতা), বৌধাযন ধর্ম-সূত্র, প্রভৃতির উক্তির সঙ্গে কুরলের উক্তির সামঞ্জস্য, স্বর্গত অধ্যাপক রামচন্দ্র দীক্ষিতর্ মহাশয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, ধর্ম-বর্গ ও অর্থ-বর্গেব এবং বিশেষ করিয়া কাম-বর্গের শ্লোকগুলি, পরিমেলঝ"কর্ প্রমুখ টীকাকারগণের মতে, প্রাচীন তমিল পদ্ধতি বা বিচার অনুসারে সজ্জিত। যেমন, ধর্ম-বর্গে দুই খণ্ড—'ইল্লরম্' বা গার্হস্থ্য-ধর্ম, এবং 'তুরৱরম্' বা সন্ন্যাস-ধর্ম ; অর্থ-বর্গে তিন খণ্ড—'অরচিয়ল্' বা রাজ-ধর্ম, 'অঙ্কৱিয়ল্' বা রাজ-কার্য্য, এবং 'ওৱিপিয়ল্' বা সামান্য বা সাধারণ কর্তব্য। সংস্কৃতের ধর্ম ও অর্থের পর্য্যায়ের সহিত এগুলির অসংগতি নাই। কাম-বর্গের শ্লোকগুলি বিশুদ্ধ তমিল বিচার-পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত। কাম-বর্গ দুই খণ্ডে বিভক্ত—'কল্লৱিয়ল্' বা 'কল্লর্' অর্থাৎ গুপ্ত প্রেম ও গান্ধর্ব-বিবাহ বিষয়ক, এবং 'করপিয়ল্'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অর্থাৎ প্রকাশ্য বিবাহ বিষয়ক। তমিল প্রেম-বিষয়ক অলংকারের সহিত অনেকে কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ শাস্ত্রের একটা সংগতি দেখিয়া থাকেন।

আমি G. U. Pope-এর, এবং নলিনী-বাবু কর্তৃক অনুস্থত ভী. ভী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর-এর—এই দুইটি অনুবাদ দেখিয়াছি। পোপ ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরি, তথাপি তিনি কুরলের মহত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিরু-বল্লুবর্-এর মতো উচ্চ আদর্শের প্রচারক এবং কবি, শৈব সাধক ভক্ত-কবি মাণিক্ক-বাচকের মতো দিব্যোন্মাদ-যুক্ত ঋষিকল্প ব্যক্তি, খ্রীষ্টান না হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই নরকে যাইবেন—পোপ-সাহেবের ধর্ম-বিশ্বাসে তাহাই বলিত। অথচ এত উচ্চ কোটির আদর্শবান্ কবি বা ভক্ত যদি নরকেই যান, তাহা হইলে সেটা নিজ ধর্মে আস্থাশীল অথচ গুণগ্রাহী পাদরির পক্ষে একটা অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল। তাই পোপ আশা পোষণ করিতেন যে, পরলোকে ঈশ্বরের কৃপায় ইঁহারা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান ধর্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়া, অন্য খ্রীষ্টানদের মতো স্বর্গবাসের অধিকারী হইয়াছেন। পোপের অনুবাদ অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দোময় ইংরেজীতে করা হইয়াছে। ছন্দের খাতিরে পোপকে মূলের কথার কিছু-কিছু সংক্ষেপ বা বিস্তার করিতে হইয়াছে। ভী. ভী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর্ পোপের অনুবাদ সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অনুবাদ, পোপের *পদ্যানুবাদ অপেক্ষা সহজবোধ্য।*

কুরলের অন্য ইংরেজী অনুবাদও আছে। স্বর্গত অধ্যাপক ভী. আর. রামচন্দ্র দীক্ষিতর্ সমগ্র কুরলের মূল তমিল, রোমান লিপিতে রূপান্তরিত করিয়া, এক পৃষ্ঠায় তমিল আর তাহার সামনের পৃষ্ঠায় ইংরেজী অনুবাদ দিয়া প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন (Tirukkural of Tiruvalluvar, in Roman Transliteration, with English Translation : Madras, the Adyar Library, 1949)। তমিল লিপির বাধা এই সংস্করণে দূরীভূত হইয়াছে। আধুনিক তমিলেও কুরলের অনুবাদ বাহির হইয়াছে—প্রাচীন তমিল-ভাষা সকল তমিল-ভাষীর বোধগম্য নহে। জরমান, ফরাসী, চেখ ও রুষ ভাষায়, এবং হিন্দীতেও কুরলের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে।

কুরল্-এর মতো সুবিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মূল ভাষা হইতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শীঘ্র তাহা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন অধ্যাপক নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুবাদ-দ্বারা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকগণের কাজ চলিবে। ভী. কনকসভৈ পিল্লৈ-এর The Tamils Eighteen Hundred Years Ago পুস্তক অবলম্বন করিয়া, নলিনী-বাবু প্রাচীন তমিল সভ্যতার যে পরিচয় তাঁহার অনুবাদের পরিশিষ্টে দিয়াছেন, তদ্দ্বারাও মোটামুটি-ভাবে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে উপকার হইবে। নলিনী-বাবুর অনুবাদটি প্রাঞ্জল ও সুপাঠ্য; এবং স্বজাতির প্রতি ও তিরুবল্লুবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তমিল-ভাষী অনুবাদকের ইংরেজী অনুসরণ করায়, মূলের অনেকটা-ই তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

সৎসাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা দেশে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

[অধ্যাপক ডাক্তার নলিনীমোহন সান্যাল কর্তৃক কুরল্-এর বঙ্গানুবাদের ভূমিকা-রূপে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া, এই নিবন্ধ দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোল-জাতির সংস্কৃতি

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, কয়েকটি বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতির নিজ-নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল। ভারতের অধুনাতন অধিবাসিগণের পূর্ব-পুরুষ ছিল বিভিন্ন প্রকারের মানব, বিভিন্ন যুগে বাহির হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল—ভারতের মধ্যে কোনও প্রকার মানব উদ্ভূত হইবার প্রমাণ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। যে-যে বিভিন্ন জাতির জনগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে নবীনতম মতবাদ, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগের নৃতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের রচিত ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান্ পুস্তক The Racial Elements in the Indian Population (Oxford Pamphlets on Indian Affairs, No. 22) মধ্যে পাওয়া যাইবে। দৈহিক গঠন ধরিয়া আলোচনা করিয়া, আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, ভারতে ছয়টি বিভিন্ন জাতির মানুষ তাহাদের নয়টি শাখায় বিভিন্ন কালে ভারতে আসিয়াছে; এবং ইহাদের মিশ্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণ-ক্রিয়া কোথাও বা গভীর-ভাবে হইয়াছে, কোথাও বা উপর-উপর হইয়াছে। এই ছয়টি জাতি হইতেছে এই: [১] হ্রস্বকায় কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকপাল ঊর্ণাকেশ পৃথুনাসিক উচ্চহনু স্থূলাধর Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রো-বটু জাতি—eolithic অর্থাৎ "উষঃপ্রস্তর" যুগে আফ্রিকা হইতে স্থলপথে আরবদেশ হইয়া ইহাদের ভারতে আগমন ঘটে; এই জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে ছিল, পরবর্তী জাতিদের আগমনে ইহারা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ভারতে কচিৎ ইহাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ-মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহাদের ভাষা এখন সম্পূর্ণ-ভাবে লুপ্ত। [২] Proto-Australoid "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতি—ইহারা মধ্যমাকার, শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, পৃথুনাসিক, দীর্ঘকপাল জাতি—পশ্চিম-এশিয়া হইতে ইহারা আইসে, এবং সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহাদের প্রসার হয়। ভারতের মধ্যেই এই জাতির মানুষ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করে; এবং পরে ভারত হইতে, অতি প্রাচীন কালে, ইহাদের একদল দক্ষিণের মহাদ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ায়, গিয়া উপনীত হয়, এবং তদনন্তর অন্য দল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এশিয়াতে এবং Indonesia বা দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, Melanesia বা কৃষ্ণদ্বীপপুঞ্জে, এবং Polynesia বা পুরুদ্বীপপুঞ্জে প্রসৃত হয়, ও নানা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ-সমস্ত অঞ্চলের আধুনিক অধিবাসী-রূপে পরিণত হয়। এই Proto-Australoid বা "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" মানব এখন ভারতের প্রায় সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর জনসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, এবং বহুশঃ ইহারা পরবর্তীকালে আগত নানা জাতির মানুষের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভাষায় ইহারা কী ছিল তাহা জানা যায় না; তবে অনুমান হয়, ইহাদের ভাষা (এই ভাষাকে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ" ভাষা নাম দেওয়া যায়) ভারতখণ্ডে আধুনিক কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষায় পরিণত হইয়াছে—যে ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, কোরকু, কোর্‌রা, শবর, গদব প্রভৃতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং আসামে মোন্-খ্‌মের শ্রেণীর ভাষা খাসিয়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ইহাদের ভাষা, মোন্-খ্‌মের, ইন্দোনেসীয় বা মালাই-শ্রেণীয় ভাষা, এবং মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় ভাষা রূপে বিদ্যমান। অন্য জাতির লোকেদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর মিশ্রিত হইলেও, কোল-জাতি মুখ্যতঃ এই "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির বংশধর; এই কোলদিগের সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রবন্ধে করা যাইতেছে। [৩] "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির পরে আইসে শ্যাম বা শ্যামাভ-বর্ণ মধ্যমাকার দীর্ঘকপাল সরলনাসিক Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির মানব। ইহাদের আদি বাসভূমি হইতেছে পূর্ব-ভূমধ্য-সাগরের দেশ—এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া ও পালেস্তীন, মিসর, গ্রীস ও Ægean ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। দৈহিক সমাবেশে কিঞ্চিৎ পৃথক্ ইহাদের তিনটি শাখা ভারতে আইসে। ইহারাই ভারতে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে; এবং অনুমান হয়, দ্রমিড বা আদি-দ্রাবিড় ভাষা ভারতে ইহাদের দ্বারাই আনীত হয়। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা, যাহার সূত্রপাত সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০ বৎসর হইতে, তাহা ইহাদের কীর্তি বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে, হিন্দুধর্মের রূপ-গ্রহণে, এই দ্রাবিড়দের আনীত উপাদান বিশেষ মূল্যবান্। [৪] চতুর্থ জাতির মানব যেটি ভারতে আইসে, সেটি হইতেছে Western Brachycephals অর্থাৎ "পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল" জাতি। ইহাদেরও তিনটি শাখা; অনুমান হয়, ইহারা, এবং [৫] Nordic "উদীচ্য'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নামে বৈজ্ঞানিকগণ-কর্তৃক আখ্যাত একটি জাতির মানবগণ, আর্য্য-ভাষা লইয়া, ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরে, ঈরান ও আফগানিস্থানের পথ ধরিয়া এশিয়া-মাইনর ও মেসোপোতামিয়া হইতে ভারতে আগমন করে। ভাষা ইহাদের এক ছিল; কিন্তু জাতি-হিসাবে এই "পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল" জাতি ও "উদীচ্য" জাতি ছিল একেবারে পৃথক্; সম্ভবতঃ আর্য্য-ভাষা ছিল দীর্ঘকপাল উদীচ্যদেরই ভাষা, ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হ্রস্বকপালগণ পরে এই ভাষা গ্রহণ করে। উদীচ্যগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, ঋজুনাসিক, হিরণ্যকেশ ও নীলচক্ষু। বৈদিক সভ্যতার ও ধর্মের এবং বৈদিক সাহিত্যের মূলসূত্র ইহারাই এদেশে আনয়ন করে, এবং পরবর্তী কালে ইহাদের ভাষাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও "ভাষা", এই তিন বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় মিশ্র সভ্যতার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়ায়। উপরের এই পাঁচ প্রকার মৌলিক জাতির মানুষদের সকলেই পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, পূর্ব ও উত্তর হইতে আসাম ও ব্রহ্ম-সীমান্তের পথে এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া আইসে [৬] Mongoloid বা "মোঙ্গোলাকার" জাতির মানুষ। এই শ্রেণীর মানুষ কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে ও দক্ষিণ হিমবন্ত প্রদেশেই মিলে, ঐ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে এই উপাদান বেশী করিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু উত্তর-ভারতের সমতল ভূভাগে, এবং দক্ষিণে রাজস্থান ও মধ্য-ভারতেও ইহাদের প্রসার ঘটিয়াছিল। আর্য্যগণ কর্তৃক পর্বতবাসী মোঙ্গোল-জাতীয় মানব প্রথম-প্রথম "কিরাত" নামে অভিহিত হয়।

ভারতীয় জনগণের মধ্যে অধিকতর [২], [৩], [৪] ও [৫] জাতির মানবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে; ভারতের সভ্যতা—বাস্তব বা ভৌতিক সভ্যতা, মানসিক প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক বোধ বা বিচার—এ সমস্ত-ই হইতেছে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ" (অথবা সংক্ষেপে Austric বা "দাক্ষিণ"), দ্রাবিড় ও আর্য্য-ভাষীদের সম্মিলিত জীবনের ফল। উত্তর-ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গার দেশে যাহারা পাশাপাশি বাস করিতে থাকে, এমন দাক্ষিণ, দ্রাবিড ও আর্য্য-ভাষী জনগণ, রক্তে ও সভ্যতায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। মনে হয়, দ্রাবিড়দের আগমনের পর হইতেই এই মিশ্রণ দ্রাবিড় ও দাক্ষিণদের মধ্যে আরব্ধ হয়; এবং পরে আর্য্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেও, এই মিশ্রীকরণ বা জাতীয় সমীকরণ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, ও খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বার্ধেই এই সমীকরণ নিজ বিশিষ্ট পথে চালিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়;—আর্য্য-ভাষী হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি তখন দাক্ষিণ, দ্রাবিড ও আর্য্যের এবং কিছু পরিমাণে মোঙ্গোলেরও মিশ্রণের ফলে প্রথম নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

পূর্ব-ঈরানে—পূর্ব-পারস্যে ও আফগানিস্থানে—এবং পাঞ্জাব প্রদেশে যে প্রাগ্-আর্য্য জনগণের সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া ও মেসোপোতামিয়া হইতে আগত আর্য্যদের সংঘাত ঘটে, তাহাদের দুইটি জাতীয় নাম ছিল—"দাস" ও "দস্যু"। সম্ভবতঃ এই দুইটি নাম একই পর্য্যায়ের, এই দুইটির মূলে এক-ই অজ্ঞাতার্থ "দস্" শব্দ বা ধাতু বিদ্যমান। ঋগ্বেদে এই "দাস" ও "দস্যু" শব্দদ্বয় জাতি-বাচক নাম-হিসাবে পাওয়া যায়। আর্য্য ও দ্রাবিডের প্রথম সংঘাতের যুগে, বিদেশী শত্রু আর্য্যের কাছে, আর্য্য-সম্বন্ধে প্রতিরোধ-পরায়ণ অনার্য্য দস্যুর বৈরি-ভাব মনে করিয়া, "দস্যু" এই নামটি 'লুণ্ঠনকারী' অর্থে আর্য্যের ভাষায় রূঢি হইয়া যায়; তেমনি বিজিত "দাস" জাতির নর-নারী আর্য্যের ঘরে কেনা-গোলামের কাজে বহুশঃ অবনমিত হওয়ায়, "দাস" নামটি 'ক্রীতদাস' বা 'ভৃত্য' অর্থ গ্রহণ করে। ইউরোপেও তেমনি Slav "স্লাব"-জাতির লোকেরা একসময়ে জর্মানিক জাতির লোকেদের দ্বারা বিজিত হইয়া এত অধিক পরিমাণে ক্রীতদাস-পর্য্যায়ে নীত হইত যে, জর্মান প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় জাতি-বাচক নাম Slav বা Sklav হইতে 'দাস'-বাচক slave, Sklav শব্দ উদ্ভূত হয়। (Slav শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ হইতেছে "শ্রবঃ" অর্থাৎ 'গৌরব, সম্মান'—Slav অর্থে গৌরবময় জাতি; এই ভাবে অবস্থাগতিকে পাওয়া শব্দটির অর্থগত অবনমন ঘটিয়াছে)। "দাস"-জাতির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ, "দস্যু-হত্যা" অর্থাৎ যুদ্ধে "দস্যু"-জাতির হনন—এ-সমস্ত ঋগ্বেদের যুগের লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। এই প্রথম সংঘাতের পরে, এক-ই দেশে বাস করার ফলে, আর্য্য ও দ্রাবিডের মিলন ক্রমে অবশ্যম্ভাবী রূপে ঘটিতে থাকে।

আর্য্যগণ প্রথম হইতেই Austric-ভাষী Proto-Australoid বা আদিম দাক্ষিণ জাতির লোকেদের "নিষাদ" নামে অভিহিত করিত বলিয়া অনুমান হয়; "শবর" ও "পুলিন্দ" এই নাম দুইটিও ইহাদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত। অস্টিক বা দাক্ষিণ বা নিষাদ জাতির লোক, নগরিয়া সভ্যতার ধার ধারিত না বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের হাতে ভারতের কৃষিমূলক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গ্রাম-নিবদ্ধ সভ্যতা-ই গড়িয়া উঠে। নাগরিক সভ্যতার পত্তন ঘটে মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দের হাতে। আর্য্যেরা প্রথমতঃ যাযাবর ছিল—শর্য্যাত মানব প্রভৃতি তাহাদের গোত্রপতি "গ্রামেণ চচার"—অর্থাৎ নিজ-নিজ "গ্রাম" বা কুল বা গোত্র (ইংরেজীতে যাহাকে tribe বা clan বলে তাহা) লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। অনেকগুলি "গ্রাম", সাধারণ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার জন্য যখন একত্র হইত, তখন হইত "সংগ্রাম"—বিভিন্ন গোত্রের যুদ্ধার্থ মিলিত হওয়া। আর্য্যদের পশ্চিম-এশিয়ায় ও মেসোপোতামিয়ায় উপনিবিষ্ট হওয়ার পরে, পশু(অর্থাৎ গো, মেষ, অশ্ব ও উষ্ট্র)-পালনের সঙ্গে-সঙ্গে, যব, ব্রীহি ও গোধূমের কর্ষণ আরম্ভ হয়। এই কৃষিও তাহারা ভারতে আরও বেশী করিয়া আশ্রয় করিতে থাকে। নগরের পত্তন, দাস-দস্যু বা দ্রাবিড়দের দেখাদেখি আর্য্যদের মধ্যে আরম্ভ হয়; আর্য্যভাষার "পুর্, পুব, পুরী" শব্দ মূলে নগর-বাচক ছিল না, ইহার মৌলিক অর্থ হইতেছে 'গড' বা 'সুরক্ষিত স্থান'; এবং সংস্কৃত "নগর" শব্দ যে মূলে দ্রাবিড শব্দ, ইহার প্রাথমিক অর্থ প্রাচীন তমিল প্রভৃতি ভাষায় ছিল 'বাসভূমি, প্রাসাদ', এই শব্দের এইরূপ নিরুক্তি-ও সম্প্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে [দ্রষ্টব্য, T. Burrow: Some Dravidian Words in Sanskrit, *Transactions of the Philological Society for 1945*, London 1946, pp. 107-108]। গোরু, ভেড়া ও ঘোড়ার পাল লইয়া ভ্রমণশীল যাযাবর আর্য্য "গ্রাম" বা গোত্র অনার্য্যের "পুর" বা "নগর" আক্রমণ করিয়া ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিত; সেইজন্য তাহাদের প্রধান দেবতা, আর্য্যজাতির নেতৃ-স্বরূপ ইন্দ্রকেও তাহারা "পুরন্দর" অর্থাৎ নগরধ্বংস-কারী আখ্যা দিয়াছিল।

নিষাদ বা দাক্ষিণ জাতি, সাঁওতাল প্রভৃতি আধুনিক কোল-জাতির পূর্বপুরুষ, এক সময়ে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল, ইহা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। দ্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ উপনিবিষ্ট হয় পশ্চিম- ও দক্ষিণ-ভারতে—এই-সব অঞ্চলে ইহাদের ঘন বসতি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, এবং সেইজন্য এখানে ইহাদের ভাষা প্রবল হইয়াছিল। তবে উত্তর-ভারতে, পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সর্বত্র, দাক্ষিণদের পাশাপাশি দ্রাবিড়দেরও বাস ছিল। ধীরে-ধীরে আর্য্য-ভাষার প্রসারের ফলে, পাঞ্জাবে ও সিন্ধু-প্রদেশে, দ্রাবিড় ও দাক্ষিণ উভয় শ্রেণীর ভাষার লোপ ঘটে; কেবল বেলুচিস্থানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্রাহুইদের মধ্যে এই দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রের একটু অবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাট, অন্ধ্রদেশ, দ্রাবিড়দেশ বা তমিল্‌নাড়ু এবং কেরলে এখনও অবিচ্ছিন্ন-ভাবে দ্রাবিড-ভাষার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিদ্যমান। রাজস্থানে এবং মালবে-ও দাক্ষিণদিগের প্রসাব বা বাস অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়—এই অঞ্চলের ভীল-জাতি (মধ্য-যুগের আর্য্য-ভাষায়, প্রাকৃতে, যাহাদের "ভিল্ল" বলিয়া অভিহিত করা হইত) এখন আর্য্য গুজরাটী রাজস্থানী ও মালবী বুলী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা কোল-শ্রেণীর অনার্য্য-ই ছিল—বহ্রাড বা বেরার প্রদেশের কোর্‌কুগণ এখন এই অঞ্চলের দাক্ষিণ অধিবাসীদেব একটি অবশেষ-রূপে বাঁচিযা আছে। পাঞ্জাবে ও গঙ্গার উপত্যকায, আফগানিস্থান হইতে পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম পর্য্যন্ত, প্রথম আগত দাক্ষিণদের পাশে-পাশে নবাগত দ্রাবিডদেবও বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজস্থান-মালব হইতে আবম্ভ কবিযা পশ্চিম-বঙ্গ পর্য্যন্ত, গঙ্গার দেশের দক্ষিণে অরণ্যময় ও গিরিসঙ্কুল কৃষি-বিবল অঞ্চলে, মধ্য-ভাবতে, ছোট-নাগপুবে, উডিষ্যায ও মধ্য-দাক্ষিণাত্যে, দাক্ষিণ কোল জাতিবই প্রসার বেশী হইয়াছিল—যদিও ইহাদের প্রতিবেশী-রূপে অনুরূপ আবণ্য ব্যাধ-সংস্কৃতির অধিকাবী দ্রাবিড জনগণও বাস করিত। এই হেতু, আমবা এই অঞ্চলে এখন যেমন কোর্‌কু, কোবরা, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, সাঁওতাল, গদর, শবর প্রভৃতি কোল-ভাষী গণসমূহকে দেখিতে পাই, তেমনি-ই গোণ্ড, কন্ধ বা কুই, কুড়ুখ বা ওরাওঁ এবং মালের্ বা মাল-পাহাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড-ভাষী আটবিক বা আরণ্য জাতির লোকেদেরও পাই।

গঙ্গার তীরের কৃষি-প্রধান সমতল-ক্ষেত্রেব অধিবাসী দাক্ষিণ জাতিব লোক এবং তাহাদের প্রতিবেশী দ্রাবিড জাতির লোক—হয তো ইহাদের মধ্যে, অর্থাৎ প্রাচীন কালের দাস-দস্যু-দ্রমিড এবং নিষাদ-ভিল্ল-কোল্ল-শবর-পুলিন্দগণের মধ্যে, প্রথমটায় সংঘাত ঘটিয়াছিল; পরে ইহাদেব পাশাপাশি অবস্থান শান্তিপূর্ণ ভাবেই হইয়াছিল—যেমন আমরা ছোট-নাগপুবে ওবাওঁ ও মুণ্ডাদের মধ্যে দেখি। তবে একসঙ্গে দুই বিভিন্ন জাতির এবং ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ, গঙ্গার দেশে পাশাপাশি থাকাতে, তৃতীয় জাতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতির, অর্থাৎ আর্য্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে, স্থান করিয়া লওয়া এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে দুই প্রকার অনার্য্য ভাষাকে কোণ-ঠেসা করিয়া ক্রমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহাদের স্থান দখল করিয়া লওয়া, সহজ হইয়াছিল। ক্রমে উত্তর-ভারতে আর্য্যের সঙ্গে দাক্ষিণ ও দ্রাবিড়-ভাষী (এবং কিছু পরিমাণে মোঙ্গোল জাতির মানুষ) মিলিয়া, ভাষায় এক হইয়া গেল ; কোল-ভাষী দাক্ষিণ জনগণ, উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য-ভাষী জনগণে বিলীন হইল।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা এই দাক্ষিণ কোল-জাতির সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতায় ইহাদের দ্বারা আনীত উপাদানের, কিছু-কিছু পরিচয় আমরা পাইতে পারি। এই জাতির লোকেরা প্রথমটায় 'জুম'-চাষের মতো চাষ করিত—সূক্ষ্মাগ্র বৃহদাকার যষ্টিখণ্ড দ্বারা ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ দিয়া চাষ করিত। নেপালের নেয়ার জাতির মতো কোদালি দিয়া মাটি কোপাইয়া চাষ করাও সম্ভবতঃ তাহাদের রীতি ছিল। পরে, খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-ভাষীদের কাছে, তাহারা লাঙ্গলে গোরু মহিষ জুড়িয়া রীতিমত ধান চাষ করিতে শিখে। কেবল নদীমাতৃক অঞ্চলেই, কৃষি দাঁড়াইয়াছিল ইহাদের সংস্কৃতির মুখ্য আধার বা প্রতিষ্ঠাভূমি। অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশে কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ শবর বা ব্যাধের জীবন যাপন করিত ; পরে চাষও সেখানে অল্প-স্বল্প করিত। সমতল নদীমাতৃক দেশে ও অন্যত্র ইহারা কতকগুলি স্থানীয় ফল ও শাক-তরকারীর চাষ-ও করিত—যেমন কলা, নারিকেল, লাউ, কুমড়া, বেগুন, কচু, লেবু। পান ও সুপারীর ব্যবহার ইহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় সভ্যতায় গৃহীত হয়। সরিষা, হলুদ, আদা ও মরিচ (পিপুল) ইহারা চাষ করিত। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহারাই ভারতের অরণ্যাবৃত দেশে হাতীকে পোষ মানায়। মাংসের জন্য ও ডিমের জন্য ইহারা শূকর ও মুরগী পুষিত। কার্পাস হইতে সূতা কাটিয়া তুলার কাপড় প্রথমতঃ এই দাক্ষিণ জাতির মানুষেই তৈয়ারী করে। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুক প্রধান ছিল।

দাক্ষিণ জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন প্রমাণ তেমন কিছুই নাই। বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-যুগ পর্য্যন্ত সংস্কৃতাদি সাহিত্যে ক্বচিৎ কখন দুই-চারিটি কথা বা আভাস যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়া বিচার তো করিতেই হয় ; এতদ্ভিন্ন ভারতের ও ভারতের বাহিরের দাক্ষিণ-ভাষা-ভাষী জনসমূহের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও অনুষ্ঠান, মানসিক প্রবণতা ও ধর্ম-বিশ্বাস—এই-সবেরও আলোচনা করিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাক্ষিণ শ্রেণীর ভাষাগুলিকে এই ভাবে শ্রেণী-বদ্ধ করা হয়। এগুলি দুইটি প্রধান বিভাগে পড়ে—[১] Austro-Asiatic বা দক্ষিণ-আসিয়া-স্থিত, ও [২] Austronesian বা দক্ষিণ-দ্বীপপুঞ্জাশ্রয়ী।

এই দুই বিভাগের অন্তর্গত ভাষাগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ ও এগুলির অবস্থান নীচে দেওয়া দুইটি বংশলতিকা দ্বারা দেখানো যাইতেছে।

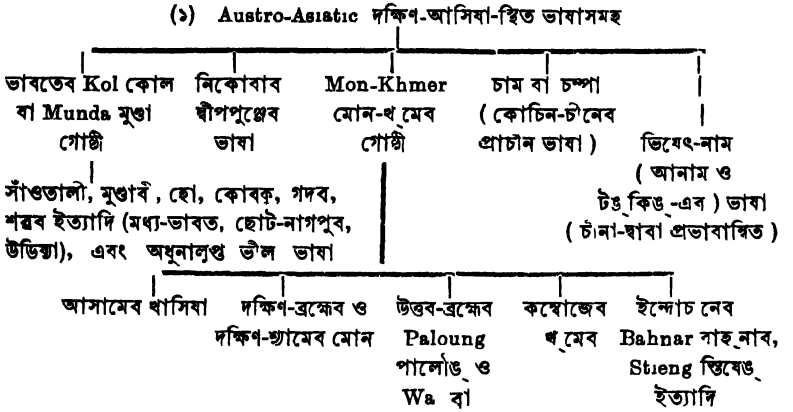

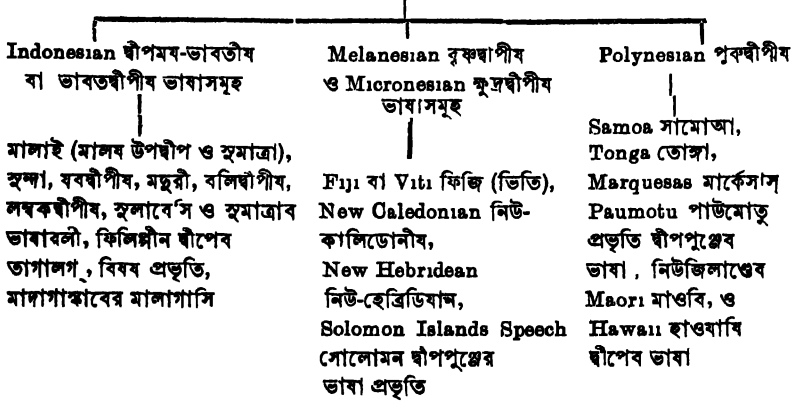

এই-সমস্ত বিভিন্ন ভাষা ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির আলোচনার আধারে, আদিযুগের দাক্ষিণ সংস্কৃতি ভারতবর্ষে কী ভাবের ছিল তাহার বিচার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুমান করা চলে। তবে মোটামুটি বলা চলে যে, ধর্ম-জগতে লিঙ্গ-প্রতীকে পূজা আংশিক ভাবে দাক্ষিণ জাতির দান। ভারতীয় দর্শনে পুনর্জন্মবাদ, দ্রাবিড়ের নিকট হইতে না হইয়া দাক্ষিণদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়—আর্য্যদের মধ্যে পুনর্জন্মবাদ উদ্ভূত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়; আর্য্য-মতে, মৃতব্যক্তি পিতৃলোকে বা এক অনির্দিষ্ট পরলোকে তাহার পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হইত; এ সম্বন্ধে এক প্রকার আবছা-আবছা ধারণা-ই তাহাদের সম্বল ছিল। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ধার্মিক নিষেধ—taboo—দাক্ষিণদের মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিল। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা দাক্ষিণদের নিকট হইতে-ই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বপ্রপঞ্চকে অণ্ডবৎ ("ব্রহ্মাণ্ড"-রূপে) কল্পনা, এবং মৎস্য কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারের কল্পনা, মূলতঃ ইহাদের-ই বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের তিথি ধরিয়া কাল নিরূপণ-ও সম্ভবতঃ ইহাদের-ই রীতি ছিল। নাগ-পূজা, ও কতকগুলি উপাখ্যান (যেমন মৎস্যগন্ধার উপাখ্যান) মূলে দাক্ষিণ জাতির। Totemism বা কোনও মানবেতর প্রাণীকে মানববংশ-বিশেষের আদিপুরুষ-রূপে কল্পনা, ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মৃতের বৃক্ষ-সমাধি (মহাভারতে যে রীতির উল্লেখ আছে), এবং মৃতের উপর স্তূপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ছিল। পূর্ব-ভারতে হিন্দু বিবাহে 'স্ত্রী-আচার', এবং সিন্দুর হরিদ্রা প্রভৃতির ব্যবহার, দাক্ষিণ জাতির-ই রীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালাদেশে (বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গে) যে ধর্ম-পূজা প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোনও যোগ নাই; অনুমিত হয় যে এই ধর্ম-পূজা হইতেছে বঙ্গদেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মের বিকৃত অবশেষ। এই ধর্মের অন্যতম দুইটি প্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে লুইয়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করা, এবং ধর্মের গাজন—এই দুইটি বস্তু প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির বিশিষ্ট বস্তু। প্রচলিত ধর্ম-পূজার সঙ্গে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক কিছু মিলিয়া গিয়া জিনিসটিকে সম্পূর্ণ মিশ্রিত বা হিন্দু-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। [এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত প্রবন্ধ India and Polynesia: Austric Bases of Indian Civilisation and Thought—*Bharata Kaumudi* (Studies in Indology in honour of Dr Radha Kumud Mookerji), Part I, Allahabad 1945, pp. 193-208; এবং B. C. Law Volume, Part I,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Calcutta 1945, pp. 75-87-তে প্রকাশিত মৎ-প্রণীত অন্য একটি প্রবন্ধ Buddhist Survivals in Bengal।]

ইহা তো হইল মিশ্র ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীন নিষাদ বা দাক্ষিণ-জাতির আহৃত উপাদানের কথা। নিষাদ বা প্রাচীন দাক্ষিণ-জাতির ভাষার—প্রাচীন যুগের কোল ও মোন-খ্‌মের গোষ্ঠীদ্বয়ের দাক্ষিণ ভাষার—বহু শব্দ, কিভাবে প্রাকৃত সংস্কৃত, ও আধুনিক আর্য্য-ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার-ও আলোচনা কিছু-কিছু হইয়াছে ও হইতেছে। [লক্ষণীয়—প্রবোধচন্দ্র বাগচীর Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India: Calcutta University, 1929—Jean Przyluski ঝাঁ প্‌শিলুস্কি, Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক্ ও Sylvain Lévi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি কর্তৃক লিখিত কতকগুলি ফরাসী প্রবন্ধের অনুবাদ, ও তৎসঙ্গে মুদ্রিত অন্য কতকগুলি প্রবন্ধ; এবং মৎপ্রণীত প্রবন্ধ Two New Indo-Aryan Etymologies, *Zeitschrift fuer Indologie*, Berlin 1932, এবং Non-Aryan Elements in Indo-Aryan, *Journal of the Greater India Society*, 1936, Vol. III, pp. 43 ff.; দ্রাবিড় ভাষায় আগত দাক্ষিণ ভাষার শব্দের আলোচনা কোচিন-এরনাকুলম্-এর অধ্যাপক স্বর্গীয় ল-ব রামস্বামী অয়্যর্ তাঁহার একটি প্রবন্ধে ইতিপূর্বে করিযাছেন।]

ভারতের কোল-বংশীয়-দাক্ষিণ-জাতির এবং কোল-ভাষার সম্বন্ধে হঙ্গেরীয় লেখক Vilmos Hevesy ভিল্‌মোশ্ হেভেশি কিছুকাল হইল একটি নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোল-ভাষা, Ural উরাল (অথবা Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়) গোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধ—ভারতের বাহিরের মোন্-খ্‌মের ও Austronesian দাক্ষিণ-দ্বীপাশ্রয়ী ভাষাগুলির সঙ্গে নহে। হেভেশির মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়-ভাষী কোনও জাতি নিজ ভাষা লইয়া ভারতে আইসে, এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কোল-জাতিতে পরিণত হয়। ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা-গোষ্ঠীতে মিলে—Hungarian হঙ্গেরীয় বা Magyar মজর, Finn ফিন্, Esth এস্ত্, Lapp লাপ, এবং রুষ-দেশের কতকগুলি স্বল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত আদিম-জাতীয় ভাষা, যথা Vogul ভোগুল্, Ostyak ওস্ত্যাক্, Mordvin মোর্দ্‌ভিন্, Cheremis চেরেমিস্, Siryen সির্‌য়েন্ প্রভৃতি; এবং এই গোষ্ঠী, Altaic আলতাই-গোষ্ঠীর ভাষা তুর্কী মোঙ্গোল মাঞ্চু প্রভৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সহিত সংপৃক্ত। হেভেশির এই মত, যে-টুকু এখনও ভালো করিয়া যাচাই করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহা যুক্তি- বা বিচার-সহ নহে; দাক্ষিণ ভাষাসমূহের যে বংশচিত্র পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহা-ই এখনও মানিতে হয়,—ফিন্নো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর সহিত কোল ভাষার সংযোগ এখনও প্রমাণিত হয় নাই বলিতে হয়।

আধুনিক কোল-জাতি, সুপ্রাচীন দাক্ষিণ- বা নিষাদ-জাতির বংশধর। ভাষাগত অল্প-বিস্তর পার্থক্য ধরিয়া এই জাতির গণ-সমূহকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব-প্রধান হইতেছে এই কয়টি: [১] সাঁওতাল, সংখ্যায় প্রায় ২৭ লাখ; দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও মোঙ্গোল নির্বিশেষে, ভারতের Aboriginal আদিবাসী বা ভূমিপুত্র অর্থাৎ Tribes গণ-সমূহের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সব-চেয়ে অধিক। সাঁওতাল-পরগণায়, সিংহভূমে, বাঙ্গালাদেশে, মানভূমে, উড়িষ্যায় এবং আসামের চা-বাগানসমূহে সাঁওতালদের বাস; [২] মুণ্ডারী-ভাষী মুণ্ডাজাতি, সংখ্যায় ৬॥০ লাখ, রাঁচীকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের বাস; [৩] হো, সংখ্যায় ৪॥০ লাখ, চাঁইবাসার আশে-পাশে ইহাদের অধিষ্ঠান-ভূমি; ছোট-নাগপুরে [৪] খাড়িয়া, ১ লাখ ৮০ হাজার, ও [৫] ভূমিজ, ১ লাখ ১৩ হাজার; এবং [৬] কোর্‌কু—বহ্নাড (বেরার) ও মধ্য-প্রদেশে, ১ লাখ ৬০ হাজার; এবং এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যায় [৭] শবর, ১ লাখ, ১৬ হাজার ও [৮] গদর, ৪৪ হাজার।

ইউরোপীয় ভাষা-তাত্ত্বিকদের পরিভাষায়, Austric অর্থাৎ দাক্ষিণ ভাষার অন্তর্গত Austro-Asiatic বা দাক্ষিণ-আসিয়া-স্থিত বিভাগের এই কোল-শাখাকে Munda "মুণ্ডা" নামে সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়। কিন্তু "মুণ্ডা" নামটি তেমন উপযোগী নহে। ভারতবর্ষে ইহা কোল-জাতির মাত্র একটি বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়—রাঁচীর আশ-পাশের কোল-জাতীয়দের জন্য সীমিত এই নামকে, ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের কোনও আবশ্যকতা নাই। Kol "কোল" এই নামটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারীরা "কোল" বলিলে, দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁ, কন্ধ এবং মাল-পাহাড়ীদের বাদ দিয়া, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ভূমিজ, খাড়িয়া, প্রভৃতিদেরই বুঝে; সুতরাং এই ব্যাপক সুপরিচিত সংজ্ঞা ব্যবহার করা-ই ভালো। কোলদের নাম হইতে ছোট-নাগপুরের একটি অঞ্চলের নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইয়াছে "কোল্‌হান" অর্থাৎ কোলদের দেশ (যেমন "ভোটান" = ভোটদের দেশ, "গোণ্ডবানা" = গোণ্ডদের দেশ, "রাজপুতানা" = রাজপুতদের দেশ, "ঈরান" বা "এরান" = আর্য্যদের দেশ)। আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য ভাষার এই সুপরিচিত "কোল" শব্দটি, মধ্য-যুগের ভারতীয়-আর্য্য ভাষার (প্রাকৃতের) "কোল্ল" শব্দ হইতে উদ্ভূত ; এবং মারাঠী ও গুজরাটী ভাষাতেও এই জাতীয় মানুষের জন্য "কোলী" শব্দের প্রয়োগ আছে। কোনও মতে, কোল-জাতীয় সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি দিন-মজুরী করিবার জন্য কলিকাতায় ও অন্যত্র আসিত বলিয়া, ইহাদের নাম হইতেই "কুলি" শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এ ব্যুৎপত্তি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। মধ্য-ভারতের অরণ্য- ও পর্বত-বাসী অনার্য্য নিষাদগণকে এখন হইতে দেড় হাজার বছর আগে "ভিল্ল" ও "কোল্ল" বলিয়া উল্লেখ করা হইত। "কোল" শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃতেও পাওয়া যায় —ইহার অর্থ হইতেছে 'শূকর'—একটি জাতি-বাচক নামের ঘৃণা-প্রকাশক অপপ্রয়োগ মাত্র। সাঁওতালেরা নিজেদের "হড্" বলে, মুণ্ডারা বলে "হোডো", হো-রা বলে "হোও" বা "হো" (হো-ভাষায় ড-ধ্বনি লোপ পায়), এবং কোর্‌কু-রা বলে "কোরো" ; উহাদের ভাষায় এই শব্দের অর্থ হইতেছে—'মানব বা মানুষ'। বহু জাতির মধ্যে, স্বকীয় নাম হিসাবে, তাহার ভাষার মানব-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত ; "কোল" জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কোল-জাতির দৃষ্টিতে, সমগ্র মানব-জাতি দুইটি বিভাগে বিভক্ত—এক, সত্যকার মানব, "হোডো, হড, কোরো", যাহাদের ভাষা বুঝি, ও যাহারা আমাদের আপন জন ; এবং দুই, যাহাদের ভাষা বুঝি না, যাহারা পর, তাহারা হইতেছে Diku "দিকু"। ইহা যেন প্রাচীন আর্য্যদের বা হিন্দুদের "আর্য্য" তথা "ম্লেচ্ছ" বা "বর্বর", প্রাচীন গ্রীকদের Hellenes ও Barbaroi, ইহুদীদের Benim Yisrael ও Goyim বা Gentiles অর্থাৎ 'জাতি-সমূহ', জর্‌মানিক জাতির Thiudiskoz ও Walhoz, শ্লাবদের Slavu ও Nyemetsu, আরবদের "আরব" ও "আজম"—এইরূপ 'স্বজাতি' ও 'বিজাতি' এই দুই ভাগে মানব-জাতিকে বিভক্ত করার মতো। এখন ইহা অনুমিত হয় যে আধুনিক কোল-ভাষীদের "হোড়ো, হড়, কোরো" প্রভৃতি শব্দের একটি প্রাচীন রূপ, দেড়-হাজার দুই-হাজার বৎসর পূর্বে আর্য্য-ভাষীদের কানে যেরূপ শুনাইয়াছিল, তাহার-ই আধারে "কোল্ল" শব্দ গঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইয়াছে। অর্থাৎ "কোল্ল" শব্দকে প্রাচীন কোল-ভাষায় মানব-বাচক শব্দ বলিয়া ধরিতে পারি। তাহার-ই আধুনিক রূপ, এই জাতির স্বকীয় নামের অন্যতম প্রাচীন রূপ বলিয়া, এই জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী নাম। Kolarian বলিয়া একটি নাম ইংরেজীতে ইহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু অর্থহীন বলিয়া তাহা প্রায় সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বি-অক্ষর "কোল্ল", "কো-ল" Kolla, Kola, বা আধুনিক উচ্চারণে একাক্ষর "কোল্" Kol শব্দটি, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বা 'নগ্ন' বিবেচিত হইতে পারে: সেইজন্য ইহাকে একটু পরিবর্ধিত করিয়া, আমরা "কোলীয" বা "কোল্লীয" (ইংরেজীতে Kolian) শব্দ অক্লেশে প্রয়োগ করিতে পারি।

কোলদের জ্ঞাতি, সমতল নদীমাতৃক পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির (নিষাদগণের) নানা গণ, দেশের অন্য-জাতীয় দ্রাবিড ও মোঙ্গোল এবং আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া, এখন উত্তর-ভারতের হিন্দু (অথবা মুসলমান-ধর্মান্তরিত) জন-সমূহের মধ্যে নিলীন হইয়া গিয়াছে, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বন ও পাহাড়ের দেশ মধ্য-ভারত ও ছোট-নাগপুরে ইহাদের সংস্কৃতি একটু অন্য ধরণের হইতে বাধ্য হয়—কৃষি ও পশু (গো, মহিষ, শূকর, কুক্কুট)-পালনের সঙ্গে-সঙ্গে মৃগয়া ইহাদের আজীবিকার একটি প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কৃষিকে (বিশেষতঃ গো-মহিষ ও লাঙ্গল যোগে ধান-চাষকে) ইহারা সভ্য জীবনের ও উন্নত জীবনের প্রথম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। ইহারা ধীরে-ধীরে মধ্য-ভারতের ও ছোটনাগপুর ঝাড়খণ্ডের অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছিল। ইহাদের আদিম সংস্কৃতি, ধর্ম-মত প্রভৃতি, নানা দিকে পরিবর্তিত হইয়া যায়; Bir-Buru "বির্-বুরু", অর্থাৎ অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে বাস করার দরুন, Ote-Serma "অতে-সের্মা" অর্থাৎ ধরিত্রী ও আকাশ, অথবা দ্যাবা-পৃথিবী, আসমান-জমীন, বা স্বর্গ-মর্ত্য সম্বন্ধে ইহাদের ধারণাও পরিবর্তিত হয়—বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইহারা একটি স্বকীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। এখনকার কোলদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি এবং তাহাদের সংস্কৃতি, তাহাদের অধুনা-অধ্যুষিত দেশ ছোট-নাগপুরের অরণ্য ও পর্বত-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাঙ্গালার প্রত্যন্ত বা সীমান্ত প্রদেশে এই দেশ ; বাঙ্গালার "সামন্ত" বা "সম্-অন্ত" অর্থাৎ সীমাসংলগ্ন ভূখণ্ডে যে কোল জনগণ বাস করিত, দ্বিসহস্রাধিক-বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালা দেশের আর্য্য-ভাষীরা তাহাদের নাম দেয় "সামন্ত-পাল" ; ইহা, প্রাকৃত "সাবঁন্ত-বাল" শব্দের মধ্য দিয়া, আধুনিক বাঙ্গালা "সাওঁতাল—সাঁওতাল", এই শব্দের রূপ ধরিয়াছে। (তুলনীয়—"সামন্ত-রাজ" হইতে পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দু পদবী "সাঁতরা"।) "মুণ্ডা" শব্দ সাঁওতালদের পশ্চিমে অবস্থিত কোল জনগণের নাম—ইহা আর্য্য-ভাষার শব্দ—মূলে অনার্য্য হওয়া সম্ভব—কিন্তু ইহা এই জাতির লোকেদের head বা chief, মুণ্ড বা মাথা অর্থাৎ প্রধানদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত ; পরে সৌজন্য করিয়া ইহা এই গণের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে থাকে, ও সমগ্র গণের নাম হইয়া দাঁড়ায়। সাঁওতালদের মধ্যে সম্মান-সূচক পদবী হইতেছে "মাঝি", ইহাও আর্য্য-ভাষার শব্দ—"মধ্য—মাধ্যিক" হইতে উৎপন্ন ; অনুরূপ অর্থের শব্দ হইতেছে ভদ্রব্যক্তি-বাচক বাঙ্গালা মুসলমান পদবী "মিয়াঁ", যাহার অর্থ ফারসী ভাষায় হইতেছে 'মধ্য' বা 'মধ্যস্থ'।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা, উড়িয়া, বিহারী বা হিন্দী সাহিত্যে কোলদের কোনও উল্লেখ নাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় "শবর", ও মধ্যযুগের বাঙ্গালায় "রাঢ়" বা "রাড়" ও "চুহাড়" বা "চোয়াড়" শব্দ, সম্ভবতঃ কোল-ভাষীদের সম্বন্ধে-ই ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্য-ভাষার প্রসার ধীরে-ধীরে কোল-অধ্যুষিত প্রদেশকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু এই ভাষা-সংঘাতের কোনও ইতিহাস নাই। আর্য্য-ভাষীর সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রায় সর্বত্র হিন্দু-সমাজের জাতিগুলিতে পরিণত হইতেছিল। হয়তো কচিৎ ইহাদের রাজা বা স্থানীয় ভূম্যধিকারী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করিয়া, ক্ষত্রিয় বলিয়া ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছিল—কিন্তু ভাষা-ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে, সাংস্কৃতিক অধঃপতন-ই হইতেছে ইহাদের অতি আধুনিক ইতিহাস।

প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী কোলেদের সম্বন্ধে, অর্থাৎ ভিল্ল-কোল্ল-নিষাদ-শবর-পুলিন্দদের সম্বন্ধে, আমাদের আর্য্য-ভাষী পূর্বপুরুষগণ খুব বেশী কৌতূহল দেখান নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাণভট্ট তাঁহার "শ্রীহর্ষচরিত" গ্রন্থের অষ্টম উচ্ছ্বাসে জনৈক শবর-যুবকের বর্ণনা খুঁটিনাটির সহিত করিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিন্ধ্যাচলের কোল বা শবরগণ স্থানীয় দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর উদ্দেশে নরবলি-দানের সময়ে উপস্থিত হইয়াছে—হয় তো বা ইহার বর্ণনা "গউড়বহ" নামে নবম শতকের প্রাকৃত-কাব্যে পাওয়া গেল ; হয় তো কোনও পুরাণে কেবল ইহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হইল। পুরাণে নানা স্থানে পুলিন্দ শবর প্রভৃতিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে মধ্য-ভারতবাসী পুলিন্দদের সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। "বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ" পুস্তকে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কৌতূলোদ্দীপক কাহিনীর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনের কৌতূহল ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রথম নূতন করিয়া সচেতন করিয়া দিল, বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে। ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় কিছু পরেই, ছোট-নাগপুরে ইংরেজ রাজপুরুষদের ইহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইল, এবং তৎপরে বিগত শতকের দ্বিতীয় অর্ধ হইতে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণও ইহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তখন ইহাদের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম প্রভৃতির চর্চা আরম্ভ হইল। মিশনারিরা বাঙ্গালা ও নাগরী এবং রোমান, এই তিন লিপিতে ইহাদের ভাষা লিখিয়া, এবং ইহাদের ভাষায় বাইবেল-আদির অনুবাদ করিয়া, এবং ইহাদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক পুরাণ-কাহিনী, গান, ছড়া প্রভৃতি ধীরে-ধীরে সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করিলেন, এবং খ্রীষ্টান ধর্মের সাহায্যে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে ইহাদের বিলীন হইয়া যাওয়া অনেক অংশে বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে বিদেশী মিশনারিদের দলের বাহিরে আমাদের মধ্য হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে দরদী অনুসন্ধিৎসু ও ইহাদের অকৃত্রিম বন্ধু বাহির হইলেন ; কোল ও অন্য বন্য জাতির এইরূপ উদার-হৃদয় প্রেমীদের মধ্যে রাঁচীর স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুণ্য নাম প্রথম করিতে হয়। ইহার পূর্বে বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের কেহ-কেহ ইহাদের সম্বন্ধে সহানুভূতির দৃষ্টিতে আলোচনা করেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কোলদের বর্ণনা করিয়া লেখা ইঁহার সরস ও সদ্ভাবপূর্ণ ভ্রমণ-কথা। "পালামৌ" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাহির হয়। তাহার পরে, সাঁওতালদের ও ক্বচিৎ অন্য কোল জনগণের জীবনকথা লইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাঙ্গালী লেখকের ছোট গল্প ও উপন্যাস বাহির হইয়াছে, সাঁওতাল রূপকথার সংগ্রহ এবং কচিৎ কবিতার অনুবাদও বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী শিল্পী সাঁওতাল ও অন্য কোলদের সংস্পর্শে আসিয়া বিশেষ প্রীতির সঙ্গে তাহাদের জীবন-চিত্র আঁকিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মতো শিল্পীর কথা বলিতে হয়—নন্দলালের আঁকা রঙ্গীন ও এক-রঙ্গা বহু চিত্র ও রেখাঙ্কন সাঁওতালী জীবন ও সাঁওতালী স্ত্রী-পুরুষদের লইয়া, এই জাতির সম্বন্ধে ইহা তাঁহার অসীম স্নেহ-ভাবের পরিচায়ক। শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতী কলাভবনের শিল্পীরা এ বিষয়ে তাঁহাদের গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবিতে, হাতে-গড়া মূর্তিতে সাঁওতালী জীবনের সৌন্দর্য্য অমর হইয়া থাকিবে। নন্দলাল ও তৎশিষ্যগণের বহু-বহু প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিত্রে সাঁওতাল জীবনের নানা দিক্ প্রদর্শিত হইয়াছে—বেশীর ভাগ ইহাদের ঘরোয়া জীবন; যেমন সাঁওতাল যুবক বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার স্ত্রী বা প্রণয়িনী; সাঁওতাল রাখাল বালক; সাঁওতাল শিশু ও মাতা; সাঁওতাল মেয়েদের সারি দিয়া গমন; নাচের দৃশ্য; ধান রোয়া ও ধান কাটার দৃশ্য; সাঁওতাল ঘর-বাড়ি, গ্রাম; ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য নন্দলালেব বৃহৎ চিত্র, মাদল-বাদকের সঙ্গে কয়েকটি সাঁওতাল কন্যার নৃত্য—ইহা তাঁহার এক মহনীয় কৃতি। শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ও সাঁওতালকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—বহু পূর্বে আঁকা তাঁহার একখানি ছোট ছবি উল্লেখযোগ্য—পাহাড়ে স্রোতস্বতীর জল জমিয়া একটি ছোট জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, মাথায় পলাশ ফুল গুঁজিয়া প্রসাধন-কার্য্যে নিরত একটি সাঁওতাল মেয়ে আরশীর মতন তাহাতে নিজের মুখ দেখিতেছে; সাঁওতালী নাচের দৃশ্যও তিনি নিজ বিশিষ্টতাময় রেখাপাতের দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন। মোট কথা, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে সাঁওতাল বা কোল জীবন তাহার আদিম সারল্য লইয়া একটি আদরের বস্তু, এমন কি কতকটা যেন আদর্শ জগতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক। সাঁওতাল ও অন্য কোল ভাষায় মৌখিক সাহিত্য এবং কোল জীবন, ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি লইয়া যে-সব বই ও প্রবন্ধ ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেগুলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বৈজ্ঞানিক মূল্য অসাধারণ, সেগুলি নানা তথ্যের ভাণ্ডার; এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনায় দুই-চারিজন ভারতীয়ের—বাঙ্গালীর—দানও আছে।

পরম্পরাগত আদিম জীবনের ধারা যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছে বলিয়া, কোল-ভাষী জনগণকে ভারতের সব-চেয়ে প্রাচীন জাতি বলা চলে। প্রাচীন জাতি ও বনচারী জাতি বটে—কিন্তু তাহারা অতি পরিচ্ছন্ন জাতি, নানা নৈতিক গুণে মণ্ডিত জাতি, সম্পূর্ণরূপে ভালো-বাসার যোগ্য জাতি। তাহাদের আদিম এবং অজ্ঞ বনবাসী অবস্থায় তাহাদিগকে শিশু-মনোবৃত্ত বলা চলে—সরল, সত্যবাদী, সৎ, এবং সব বিষয়ে সোজা-ভাবে তাহারা বিচার করিতে ও চলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের ধন-মূলক 'সভ্যতা' এখন তাহাদের সারল্য নষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের নূতন অভাব দেখা যাইতেছে; অর্থনৈতিক ও অন্য দিকে তাহারা ভারতের অন্য অংশ হইতে আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবে না। তাহাদের সারল্যের ও অজ্ঞানের সুবিধা লইয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ভারতীয় এবং রোমান-ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট অথবা জর্মান-বেলজীয়-ইংরেজ-নির্বিশেষে বিদেশী "দিকু"-রা, তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা হানি করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহারা কোমল প্রকৃতির এবং শান্তিপ্রিয় মানব-ই রহিয়াছে। তাহারা কঠোর পরিশ্রমী, নিজের সামান্য অভাব-মোচনে নিজেরাই তৎপর, এবং তদুপরি সদানন্দ জাতি; তাহারা সকলেই মাদল-বাজানো, নাচ ও গান ভালোবাসে, এবং সময় পাইলেই তাহার দ্বারা চিত্তবিনোদন করে। তাহাদের পারিবারিক জীবন সাধারণতঃ নিষ্পাপ, প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা স্বস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। নর-নারীর প্রেম ইহাদের কবিতায় ও রূপ-কথায় একটা লক্ষণীয় অংশ জুড়িয়া আছে—ইহাদিগের দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া ইহাদিগকে romantic বা রমন্যাস-প্রিয় জাতিও বলিতে পারা যায়। আমাদের আধুনিক নগরিয়া সভ্যতার নানা পঙ্কিলতা ও আবর্জনার পাশে ইহাদের এই সরল বন্য বা গ্রাম্য জীবন পবিত্র ও কাব্যময় বলিয়া মনে হয়। বিহারের সুপরিচিত সিভিলিয়ান, আদিবাসীদের দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত W. G. Archer আর্চার সাহেব ওরাওঁ-দের কথা লইয়া রচিত তাঁহার অতি সুন্দর পুস্তক *The Blue Grove* (London, 1940)-এ দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এক-ই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত কোলদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য : A few notes should be added on Uraon 'character'. To the earliest observers, a capacity for cheerful hard work was the most notable character of the Uraons ; a sturdy gaiety, an exultation in bodily physique and a sense of fun are still their most obvious qualities. These are linked to a fundamental simplicity —a tendency to see an emotion as an action, and not to complicate it by postponement or obligation ·····the final picture is of a kindly simplicity and smiling energy.

কোলদের ধর্মকে আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় Animism অর্থাৎ "অজ্ঞাত-দেবশক্তি-বাদ" পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। এই মতবাদ বা বিশ্বাস অনুসারে, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক অদৃষ্ট অজ্ঞাত দৈবা শক্তি বা আত্মা কার্য্যকর হইয়া সদা-বিদ্যমান আছে। সেই শক্তি কখনও মানুষের শত্রু, কখনও মিত্র ; নানা ভাবে পূজা-উপচারের দ্বারা, সেই শক্তিকে, শত্রু হইলে দূর করা বা শান্ত রাখা, এবং মিত্র হইলে তাহাকে পরিপোষক করিয়া রাখা, এই ধর্মের অনুষ্ঠান রূপে দেখা দেয়। কোলেরা পর্বত, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতিতে ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত দেবশক্তি বা দেবতাত্মা বা দেবপ্রাণের বিভিন্ন প্রকাশ বা মূর্তিকে, Bonga "বোঙ্গা" বা "বঙ্গা" নামে অভিহিত করে। আকাশ, পাহাড়, ভূমি, নদী, বন, গ্রাম, বাড়ি, মাঠ—সব-ই অদৃশ্য বোঙ্গাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ; আবার বিশেষ করিয়া পাহাড়ে, বনে, গিরিগুহায়, গাছের মধ্যে, পাহাড়িয়া নদী বা ঝরনার মধ্যে, এবং মাটির ভিতরেও দেবতারূপে কল্পিত এই বোঙ্গাদের বাস। সকল বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পরম বোঙ্গা, প্রধান দেবতা বা পরমেশ্বর আছেন, Singi-Bonga "সিঙি-বোঙা", Sin-Bonga "সিঞ্-বোঙ্গা" বা Sing-Bonga "সিং-বোঙ্গা" ; ইঁহাকে আর্য্য-ভাষীদের ভাষায় সাঁওতালেরা কখনও-কখনও "ঠাকুর বাবা" বলিয়াও অভিহিত করে। ইঁহার কাছে সাঁওতাল ও অন্য কোলদের চরম আবেদন উদ্দিষ্ট হয়। সিঞ্-বোঙ্গা হইতেছেন সমস্ত বিশ্বের অদৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা, সকলের পালক, পোষক ও শাসক, সকলের চেয়ে মহান্ প্রধান দেবতা, মানুষের পাপ-পুণ্যের, সকল কাজের দ্রষ্টা ও সাক্ষী ; মানুষ দুঃখ-কষ্টে তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরাম বা স্বস্তি পায়, এবং তিনি আপৎকালে মানুষকে প্রতীকারের উপায় জানাইয়া দেন। এই পরমেশ্বর পরমাত্মা হইতেছেন, কোলদের ভাষায়, "মারাঙ্-উতের্নি"—'সকলের চেয়ে মহান্'; তাঁহাকে "হানি" অর্থাৎ 'উনি, ঐ পুরুষ' বলিয়া অনেক সময়ে অভিহিত করা হয়। এই পরমাত্মার প্রচলিত নাম "সিঙ্-বোঙ্গা" শব্দের "সিঙ"-অর্থে দিন, বা সূর্য্য; ইঁহাকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা আলোকের দেব বলিয়া উল্লেখিত করা হয়। আলোর সঙ্গে ইঁহার যোগ স্মরণ করিয়া কোল-জাতীয় "সোকা" ও "দেওঁডা" অর্থাৎ পুরোহিত ও ভবিষ্যদ্বক্তারা কখনও-কখনও সিঙ্-বোঙ্গার উদ্দেশ্যে সাদা মোরগ বা পাঁঠা বলি দিযা থাকে। সিঙ্-বোঙ্গা আর সমস্ত বোঙ্গাব স্রষ্টা। "বোঙ্গা" শব্দ আজকাল সাধারণতঃ 'দেবতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু Korwa কোর্‌য়া প্রভৃতি দুই-একটি ভাষার নজীবে এবং মুণ্ডাবী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, "বোঙ্গা" শব্দের মূল অর্থ ছিল 'চাঁদ'। আজকাল সাঁওতালী মুণ্ডারী প্রভৃতিতে 'চাঁদ' ও 'সূর্য্য' উভযকেই বুঝাইবার জন্য আর্য্যভাষার শব্দ "চান্দো, চান্দুক" শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং চাঁদের জন্য "বোঙ্গা" শব্দ ব্যতিরেকে অন্য দুইটি শুদ্ধ কোল শব্দ আছে—খাডিযা ও জুয়াঙ্ "লেবাঙ", শবর "আঙাই", গদব "আঙ্গায়িতা"। "সিং" অর্থে 'দিন বা সূর্য্য', ; "ঞিন্দা, নিদা" অর্থে 'রাত্রি'; এইজন্য 'চাঁদ' অর্থে "ঞিন্দা চান্দো" বা "ঞিন্দা বোঙ্গা" শব্দও কোল-ভাষায় (সাঁওতালী ও মুণ্ডারীতে) পাওযা যায। "সিঙ্-বোঙ্গা" (অথবা "সিঙ্-চান্দো"—"চান্দো" এখানে 'সূর্য্য' অর্থে) অর্থাৎ 'দিনের বা আলোর দেবতা', যেন পরমেশ্বর বা দেবরাজ, এবং "ঞিন্দা চান্দো" অর্থাৎ 'রাত্রির দেবতা' চন্দ্রদেবী হইতেছে দেবতাদের রাণী, সিঙ্-বোঙ্গার স্ত্রী; সাঁওতালী ও অন্য কোল পুরাণে এইরূপ কল্পনা আজকাল পাওয়া যায়। "সিঞ্"='আলো, বা দিন, বা সূর্য্য', "ঞিন্দা" ='আঁধার, বা রাত'; এই দুইটি প্রাচীন কোল শব্দের মূল অর্থ এখনও সাঁওতাল সমস্ত-পদ "সিঞ্-ঞিন্দা"-তেও মুণ্ডারী "ঞিন্দা-সিঙি"-তে মিলে—"সিঞ্-ঞিন্দা" ও "ঞিন্দা-সিঙি" মানে 'দিন-রাত', 'অনবরত'। মূল কোল-জাতির কল্পনায়, আমাদের 'আলো-ও-ছায়া শিব-শিবানী'র মতো স্ত্রৈণী শক্তির দুইটি বিকাশ রূপেই, জ্যোতিঃ ও তমঃ অনুভূত হইয়াছিল, ইহা এই শব্দ দুইটি হইতে অনুমান করা অসংগত হইবে না। যাহা হউক, সিঙ্-বোঙ্গার কল্পনায়, যে-কোন সভ্য সমাজের উপযোগী একটি দেব-কল্পনায় কোল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জাতি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রধান দেবতা সিঙ্-বোঙ্গা এবং নানা অপ্রধান বোঙ্গা বা দেবতা ব্যতীত, কোলদের মধ্যে পিতৃপুরুষ বা প্রেতগণের সম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে, এবং এই পিতৃপুরুষদের পূজার অনুষ্ঠানে কবিত্বময় বা কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কোলদের মধ্যে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে নানা হিন্দু ভাব ও অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়া গিয়াছে, এবং এখন ইহাদের মধ্যে খাঁটি কোল জিনিস পৃথক্ করিয়া বিশ্লেষ করা কঠিন। আবার ওদিকে লৌকিক বা গ্রাম্য হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে, কোল (বা প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির) জগৎ হইতে লব্ধ বহু ব্যাপার যে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সভ্যতা' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, অর্থাৎ পার্থিব-বস্তু-নিষ্ঠ যান্ত্রিক সভ্যতা, যাহাব ফলে বড়ো-বড়ো বাড়ি-ঘর, মন্দির-ইমারত, উচ্চ কোটির শিল্প, সাহিত্য, নাট্য, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি—তাহা কোলদের নাই; কিন্তু স্বকীয় প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকেব মধ্যে শান্তিতে ও মনের সুখে বাস করিবার উপযোগী মানসিক সংস্কৃতি তাহাদের আছে, তদুপযোগী সাধনও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ভাষার সঙ্গে ও সমবেত জীবনের সঙ্গে এই সংস্কৃতি জড়িত। কোল জীবনে বিভিন্ন ঋতুতে পর্ব ও অন্য অনুষ্ঠান, তাহাদের হাট ও মেলা, তাহাদের নাচের রীতি, তাহাদের বাঁশী ও মাদল বাজানো এবং গান, তাহাদের সরল এবং আদিম মণ্ডন-শিল্প, তাহাদের ফুল ও রঙের প্রতি প্রীতি, বংশানুক্রমে প্রবাহিত তাহাদের গান কবিতা ছড়া ও রূপ-কথা এবং পুরাণ-কথার ধারা, এবং চারিদিকের আরণ্য প্রকৃতির সম্বন্ধে তাহাদের মনঃকল্পিত ভাবজগৎ ও চিত্তেব রসানুভূতি—এই-সমস্তের মাধ্যমে এই সংস্কৃতি সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই-সমস্ত জীবনধারা ও ভাবধারাই ইহাদের জীবনকে ইহাদের নিকটে শোভন ও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্তকে নষ্ট করিয়া দিয়া, যদি কেবল ভৌতিক বা পার্থিব 'সভ্যতা', যাহার এক মুখ্য আবেদন হইতেছে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি, তাহা আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সভ্যতার মধ্যেও মানুষ বর্বর হইয়া পড়ে। এরূপ 'সুসভ্য বর্বর' ইউরোপে ও আমেরিকায় দুর্লভ নহে, ভারতেও দুর্লভ নহে; এই বর্বরেরা ধন এবং ধনায়ত্ত শক্তি ব্যতীত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিছু-ই বুঝে না। কিন্তু কোলদের জীবন, তাহার সেই আদিম অবস্থায় আর থাকিতে পারিতেছে না। বাহিরের জগৎ—তাহাদের দেশে অর্থগৃধ্নু হিন্দু ও মুসলমান 'দিকু'-দের দলে-দলে আগমন, এবং খ্রীষ্টান মিশনারিদের বহুস্থলে অজ্ঞ ও অন্ধ (এবং ক্বচিৎ রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক) ধর্মপ্রচারের তাগিদ—তাহাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে।

বিশেষ ভাবে সজ্ঞান এবং দলগতস্বার্থ-প্রণোদিত সক্রিয় চেষ্টা না থাকিলেও, হিন্দু ভাবধারা সহজ ভাবে ধীরে-ধীরে কোলদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—হিন্দু প্রতিবেশীদের দেখাদেখি কোলেরা তাহাদের অনেক কিছু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে কোল-জীবনের প্রতিষ্ঠায় বা বুনিয়াদে আঘাত পড়ে নাই। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের আগমনে তাহা হয় নাই। বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে (এই শ্রেণীর সমস্ত ধর্মমতেই এটি দেখা যায়) একটি বর্বরোচিত মনোভাব বিদ্যমান—পারমার্থিক সত্য তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি, পরমেশ্বর কেবল তাহাদেরই হাতে নিজেকে ধরা দিয়াছেন; সুতরাং, অন্য কোনও প্রকার ধার্মিক অনুভূতি তাহারা বুঝিবে না, বুঝিতে চেষ্টাও করিবে না, এবং নির্মম ভাবে তাহার ধ্বংস করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হয় (ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় তাহা কেবল তাহারাই জানে, আর কেহ নহে), পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে আছে—ইউরোপীয় পার্থিব সভ্যতার দম্ভ, কোল প্রভৃতি আদিম আরণ্য সংস্কৃতির প্রতি প্রকট অথবা চাপা ঘৃণার ভাব। ইহার ফলে, অন্য নানা পশ্চাৎপদ জাতির মতো কোলদের সমূহ হানি হইয়াছে। হয়-তো তাহারা পার্থিব জগতে কতকগুলি সুখ ও সুবিধা পাইয়াছে; কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাদের দুরপনেয় আত্মদৈন্য ঘটিয়াছে; এবং এই আত্মদৈন্যের অর্থ-ই হইতেছে আত্মাবনতি। আদিম জাতির মনোভাব যাহারা বুঝে না, সম্পূর্ণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্য উদ্ভূত অন্য প্রকারের ভাবজগৎ বা চিন্তাজগৎ এবং জীবন-পদ্ধতির কোনও-কোনও অংশ যাহারা একটি আদিম জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের হাতে কোলদের মতো জাতিকে ছাড়িয়া দেওয়া একটি অমার্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।

আমি নর-দেব বা ব্রহ্ম-নারায়ণ রূপে পূজিত মহাপুরুষ যীশু-খ্রীষ্টের শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতেছি না। Skrefsrud স্ক্রেফ্‌স্‌রুড্‌,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Hoffmann হফমান্, Bodding বডিং, Nottrott নোট্‌রোট্ প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিত পাদরিরা কোলদের ভাষার চর্চায় ও তাহাদের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সংরক্ষণে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা চিরকাল কোলদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন, কোলদের বন্ধুরাও তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহাদের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, প্রথম যুগে 'খ্রীষ্টান সভ্যতার প্রসার' যে রীতিতে হইতেছিল, তাহাতে, যাহাদের মধ্যে এই সভ্যতার প্রসার ঘটিত তাহারা আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইত, নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসহায়, ইউরোপীয়দের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়াই ভাবিত ; এবং তাহাদের মধ্যে এই ধারণা আসিত যে, সাহেবদের আগমনের পূর্বে তাহাদের ইতিহাস হইতেছে আত্মঘাতী অজ্ঞতার ইতিহাস। সুখের বিষয়, মিশনারিদের অনেকে এখন স্থানীয় কোল পারিপার্শ্বিকের মূল্য উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার ফলে, নিজ ভাষা ও নিজ কোল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং নিজ গ্রামীণ সরল জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন এবং গৌরবভাব-পোষণকারী খ্রীষ্টান কোল, এবং নিজধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত অখ্রীষ্টান ও অহিন্দু কোলও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আত্মদৈন্য-মুক্ত কোল পুরুষ ও স্ত্রী, সকল সমাজের মানব কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দনের পাত্র।

উচ্চ কোটির মানসিক সংস্কৃতির পথে চলা কোলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে কোনও লিপিবিদ্যার উদ্ভাবন করে নাই, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের পূর্বে প্রতিবেশী হিন্দুদের নিকট হইতেও কোনও লিপি গ্রহণ করে নাই। সেই হেতু তাহাদের সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন ব্যাহত হইয়াই ছিল। সম্প্রতি আত্মসম্মানবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জনৈক সাঁওতাল শিক্ষিত ব্যক্তি, রোমান লিপির অনুকরণে কতকগুলি চিহ্ন উদ্ভাবিত করিয়া, একটি সম্পূর্ণ নূতন 'কোল-লিপি' তৈয়ারী করিয়াছেন, এই লিপির হরফও টাইপে ঢালা হইয়াছে, দুই একখানি বইও ইহাতে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই লিপি গৃহীত হয় নাই—হওয়া সম্ভবপরও নহে, এবং রোমান ও বাঙ্গালা লিপির পাশে এই নবীন লিপির প্রচলনের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই—ইহাতে অনাবশ্যকভাবে একটি নূতন জটিলতা আসিবে মাত্র, তাহাতে কাহারও কোনও উপকার হইবে না, বরঞ্চ কোলদের অন্য সম্প্রদায় হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া দিয়া এই নবীন লিপি তাহাদের সমূহ অপকারই করিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খ্রীষ্টান মিশনারিরা প্রথমটায় বাঙ্গালা ও নাগরী এবং উড়িয়া লিপিতে ও পরে রোমান লিপিতে তাহাদের ভাষা লিখিয়া, তাহাতে সাহিত্য-সৃজন ও সাহিত্য-সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। সজ্ঞান বা সচেতন ভাবে সাহিত্য-সর্জনার পথে তাহাদের সংস্কৃতি এখনও চালিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গান-বাঁধা ও গল্প-বলার রীতি বিশেষভাবে বিদ্যমান। স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষ মাদল ("দুমাং") ও উন্মাদনাকর বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া নাচ ও গান ইহাদের জীবনের এক সুন্দর রীতি। পাদ্রি নোট্‌রোট্, পাদ্রি হফমান, এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের মুণ্ডারী গীতির সংগ্রহ ও অনুবাদের সাহায্যে বাহিরের জগতের কাছে এই আদিম ও সুমধুর প্রকৃতি-বিষয়ক এবং প্রেম-বিষয়ক কবিতার উৎসমুখ উন্মোচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার রস আস্বাদন করা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর হইয়াছে। W. G. Archer আর্চর সাহেবের চেষ্টায়, মুণ্ডারী খাড়িয়া সাঁওতালী ও হো ভাষায় চারি খণ্ডে যে কোল জাতির কয়েকটি বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত গীতি-কবিতার সংগ্রহ বিহার প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রাচীন ভারতের আর্য্যদের গীতি-কবিতার ও ছড়ার সংগ্রহ ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সহিত তুলিত করা যায়; এইরূপে সংগৃহীত অভিনব সমগ্র 'কোল্ল-বেদ-সংহিতা'-র ইংরেজী অনুবাদ (মূলের সহিত) বাহির হইলে, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি মূল্যবান্ কার্য্য সাধিত হইবে। সাঁওতালীর অনুরাগী বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দ্বারাও দুই-দশটি সাঁওতালী গান সংগৃহীত ও অনূদিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঁওতালের চিত্ত সংগীত-রস-রসিক বটে, কিন্তু সাঁওতাল নিজের মানসিক প্রকাশ গান বা কবিতা অপেক্ষা মনে হয় যেন কথা ও কাহিনীতেই বেশী-করিয়া করিয়াছে। এ হিসাবে মুণ্ডারা গীতি-কবিতার রাজা। মুণ্ডারী ভাষায় রচিত কতকগুলি গান, সরল ও আদিম কবিতার অতি মনোহর নিদর্শন রূপে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। চীনাদের ও জাপানীদের মধ্যে প্রকৃতির সম্বন্ধে যে ধরণের স্পর্শকাতরতা দেখা যায়, ইহাদের কবিতাতেও সেরূপ ভাব বিরল নহে। ভারতীয় কাব্যোদ্যানে ইহাদের কতকগুলি প্রেমের কবিতা হইতেছে কোমলবর্ণময় ও সুমধুর-সৌরভযুক্ত পুষ্প। এইগুলির মধ্যে কথোপকথন-মূলক দুই-পাঁচটি কবিতা আছে, সেগুলির মধ্যে নিহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বন ও পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের অশিক্ষিত কলাকৌশল এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্বভাবজাত কারুকার্য্য, ভাবের সারল্য ও শুদ্ধি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলি কোল (মুণ্ডারী) ভাষার পদ দেওয়া হইতেছে।

১। চিকান্ বাহা বাহা-লেনা-ম্ মাইঁ ?
বাহা বাহা সোআনাম্।
চিকান্ দাণ্ডিঃদ্ দাণ্ডিঃদ্ লেনা-ম্ মাইঁ ?
দাইলি দাইলি সিরিন্‌জাম্।

২। বাহাতে চি উমেম্-তানা-ম্ ?
বাহা বাহা সোআনাম্।
দাণ্ডিঃদ্-তে চি বেআরান্-তানা-ম্ ?
দাইলি দাইলি সিরিন্‌জাম্।

(পাদরি হফমানের সংগ্রহ হইতে)

১। "কোন্ ফুলে তুমি ফুটে' উঠেছ, কন্যা ?
তুমি যে ফুলের মতন সৌরভময।
কোন্ ফুলেব গোছায তুমি বডো হ'য়ে উঠেছ, কন্যা ?
ফুলের গোছার মতো তুমি সৌরভে ভ'রে উঠেছ।

২। (কি বা) তুমি কি ফুলের মধ্যে স্নান ক'রে থাকো, কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের মতন সৌরভময় ?
(কি বা) তুমি কি ফুলেব গোছার মধ্যে নেযে থাকো, কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের গোছার মতো সৌরভে ভ'রে উঠেছ ?"

আর একটি কবিতায় মুণ্ডা প্রেমিক যুবা তার প্রেমের পাত্রী কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে (কবিতাটি স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় সংগ্রহ করেন ও ইংরেজী কবিতায় ইহার অনুবাদ করেন)—

বো তামা রিসা রিসা
সুপিদ্-কেদাম্ রাঙ্গা নাচা,
ঞিন্দা-সিঙি, বাগে-ম্ গুতুতানা,
নামা নাগেন্ জিগে জিতানা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আন্দু তাদা-ম্, সাকোম্ তাদা-ম্,
হোতোরে দো হিসির্-মেনা,
পোলা-তা-ম্ দো চিল্কা সারিতানা,
নামা নাগেন্ জিগে লোতানা ॥

"ঢেউ-খেলানো চুলের ভারে তোমার মাথা কি সুন্দর,
লাল দড়ীতে মাথার চুল কেমন গোল খোঁপায় বাঁধা !
রাত-দিন, তুমি ফুলের মালা গাঁথো—
তোমার তরে আমার মন পোড়ে, আমার হৃদয় কাঁপে ॥
তোমার হাতে কাঁকন আর তাড় কেমন সুন্দর দেখায়,
তোমার গলা বেড়ে আছে কি সুন্দর হাঁসুলি !
তোমার পায়ে 'পোলা' কি সুন্দর ঝুমঝুম করে,
তোমারে তরে আমার মন দহে, ভয়ে কাঁপে ॥"

নীচের মুণ্ডারী কবিতাটিতে প্রথম অংশ কুমারীকন্যা তাহার প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, এবং দ্বিতীয় অংশ হইতেছে যুবকের উত্তর—

(কুড়ি) নাতা-মাতা বির্-কো তালারে, নালোহোম্ নির্জা বাগিঙ্গা,
রামেকান্ মারেচারে, নালোহোম্ নজর রারাইঙ্গা।
কাচিহোম্ ঞেলে-লেদিঙ্গা, সেঙ্গেল্-লে কাইঙ্ ঃলেতান্রে ?
কাচিহোম্ চিনা লেদিঙ্গা, দাঃক্-লে কাইঙ্ লিঙ্গিতান্রে ?
(কোড়া) কাগে চোআইঙ্ ঞেলেজাদ্মে, নোতে-রে দো নোতে হুদ্গার্
কাগে চোআইঙ্ চিনাজাদ্মে—সিঙ্-মা-রে দো সিঙ্-মা
কোআঁসি।

"(কুমারী) গহন বনের মধ্যে, কুমার, তুমি পালিয়ে যেও না,
আমাকে ফেলে যেও না।
এই বিশাল তেপান্তর মাঠের মাঝে, কুমার,
আমাকে ফেলে পালিয়ে যেও না।
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার,
যখন আমি আগুনের মতো জ্বলে উঠি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার,
যখন আমি জলের মতো গ'লে যাই ?
(কুমার) সত্যই আমি তোমায় দেখি নি,
কারণ তখন পৃথিবী জুড়ে' ছিল ধূলা আর আঁধি ;
সত্যই আমি তোমায় দেখি নি,
কারণ আকাশে তখন ছিল মেঘের মতো কোয়াসা ॥"

শিকারের আনন্দ নীচের কবিতাটিতে সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে (শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদ হইতে)—

"ঐ মহুয়া গাছের তলায় ঐ রে ঐ হরিণ-শিশু চরে ;
বন-পথ দিয়ে নীচু হ'যে ব্যাধ যুবক চলে, হেঁট হ'য়ে চলে।
মহুয়ার মিষ্টি ফলেব লোভে হরিণ হোথায় আসে, হরিণ ঘোরে ;
হরিণের গায়ে বাণ বিঁধ্‌বার তবে ব্যাধ হঠাৎ দাঁড়ায় খাড়া হ'য়ে,
হাতে ধনুক নিযে ;
মহুয়ার ছায়ার তলে যায প'ড়ে হরিণ-শিশু. হঠাৎ পড়ে ;
ঐ শোনো, ব্যাধ খুশী গলায আনন্দেব ধ্বনি কবে,
খুশীর রা ক্লাডে ॥"

আনন্দের মধ্যেও যে দুঃখেব বীজ আছে, হরিষে বিষাদের ভাব এই রূপে মুণ্ডা কবি প্রকাশ করিতেছে—

একাসি-কো পিরি-রে দো রুতু-তেকো সেসেন্-তানা,
রুতু-তেকো সেসেন্-তানা,
তেরাসি-কো বাদিরে দো বানাম্-তেকো তুদাঙ্-তানা,
বানাম্-তেকো তুদাঙ্-তানা।
রুতু-তেকো সেসেন্-তানা, রুতু চুটিহলাঃকু-জানা,
বানাম্-তেকো তুদাঙ্-তানা—বানাম্-দাণ্ডি দোরাঙ্-জানা
বানাম্-দাণ্ডি দোরাঙ্-জানা।

"একাশির টিলা-ভূঁইয়ে পথিকেরা যায় বাঁশীর সুরে, বাঁশীর সুরে ;
তিরাশির নামাল-ভূঁইয়ে পথিকেরা যায় দোতারার তালে,
দোতারার তালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাঁশীর সুরে চলে তারা, হায়, বাঁশীর মুখ গেছে ভেঙে,
বাঁশীর মুখ গেছে ভেঙে ;
দোতারার তালে যায় গো তারা, হায়, দাণ্ডী তার হ'য়েছে চুর,
হ'য়েছে চুর ॥"

বিবাহের কন্যার মুখ দিয়া মুণ্ডা কবি বলিতেছে—

বা-তৈঙ্-মে গা নেআঙ্ বা-তৈঙ্-মে হো।
ডালি-তৈঙ্-মে গা নাপাঙ, ডালি-তৈঙ্-মে।
সারজোম্-বা-তে নে-আঙ্. বা-তৈঙ্-মে হো।
সুডা-সাংগেন্-তে গা নাপাঙ্ ডালি-তৈঙ্-মে ॥

"ওগো মা, ফুল দিয়ে আমায় সাজাও, ফুল দিয়ে সাজাও ;
বাবা গো, দাও মাথায় ফুলের মুকুট, মাথায় ফুলের মুকুট।
শালের ফুলে, মা গো, আমায় দাও সাজিয়ে ;
শালের কচি ডালে, বাবা গো, মুকুট বানাও আমার তরে,
মুকুট আমার তরে ॥"

নাচের আহ্বান করিয়া যখন মাদলে ঘা পড়ে, তখন কোল যুবক-যুবতীদের দেহে মনে যে সাড়া পড়িয়া যায়, বহু পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "পালামৌ"-তে তাহাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাটি এই নাচের রসে পরিপূর্ণ—

"কোট-কারাম্বুতে মাদল বাজে ;
আমার হৃদয় নাচে, ঐ আওয়াজে—ঐ আওয়াজে।
বারিগারায় করতাল ঝম্‌ঝম্ করে—
আনন্দে আমার হৃদয় যেন লাফ দেয়, যেন লাফ দেয়।
কোট-কারাম্বুতে মাদল বাজে—
ত্বরা করো, প্রিয়া আমার, চলো যাই নাচে, চলো যাই নাচে।
বারিগারায় খরতাল খন্‌খন্ করে—
ওঠো, প্রিয়া আমার, ছাড়ো উদাস ভাব, চলো যাই নাচে ॥"

সাঁওতাল যুবকও অনুরূপ ভাবে গায়—

"(মাদলের) বাজনা শুনে,
মন আমার যেন তাওয়ার তাপে তাতে ॥"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুণ্ডারী ভাষার মতো সুন্দর-সুন্দর কবিতা সাঁওতালীতে তত বেশী পাওয়া যায় না। ছয়-সাত ছত্রের কবিতা মুণ্ডারীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সাঁওতালী কবিতা বেশীর ভাগ দুই ছত্রের, বড়ো জোর চারি ছত্রের; পাঁচ-ছয় ছত্রেরও অবশ্য দুর্লভ নয়। আজকাল মুণ্ডা ও সাঁওতাল কবিরা বড়ো-বড়ো কবিতা ও গান লিখিতেছেন। মালাই জাতির Pantum "পান্তম্" কবিতার মতো, জাপানী Tanka "তাঙ্কা" আর Uta "উতা"-র মতো, সাঁওতালীদের সাহিত্যিক বোধ বা অনুভূতি, এই-রূপ ছোট কবিতার মধ্যেই সীমিত। শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই-রূপ সাঁওতালী কতগুলি কবিতার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলির বাঙ্গালা অনুবাদও করিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি নিম্নে মুদ্রিত হইল। এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথকেও খুশী করিয়াছিল, এবং Visvabharati Quarterly-র ১৯২৫ এপ্রিল সংখ্যায় সন্তোষ-বাবুর সংগ্রহ হইতে কতকগুলি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চারুলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ বি-এল্ মহাশয় "দেশ" পত্রিকাতে কতকগুলি সুন্দর সাঁওতালী কবিতার বঙ্গানুবাদ মূলের সহিত প্রকাশিত করেন। W. G. Archer আর্চর সাহেবের প্রকাশিত সংগ্রহও ইংরেজী অনুবাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এরূপ কয়েকটি সাঁওতালী কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে; এগুলিতে ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখের কথা বিশেষ অকপট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী বলিতেছে—

"আমি ভাত রাঁধি, আমি বেন্নন বাঁধি, ওর পাতে
খুব ঢেলে ঢেলে দিই।
তবুও বলে, এ বউ আমি ঘরে রাখ্‌বো না॥"

মাতৃহারা পুত্র মায়ের জন্য খেদ করিতেছে—

"হায় হায়, আগেকার দিনে
কোথাও থেকে আমরা ঘরে ফিরে আসার সময়ে
দোয়ারের ধারে মা থাকৃত ব'সে—
বাচ্ছা ময়নার মতো আমাদের পেয়ে আদর ক'র্‌ত॥"

শ্রীযুক্ত চারু-বাবুর সংগ্রহ হইতে দুইটি সাঁওতালী গান—

বুরুরে নাতাল্-বাহা, দলপ্-দলপ্ নাতাল্-বাহা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জাহা লেকাতেইঞ্ তিয়কৃগিয়া হরিঞ্ চিপিরেঃ সুতদ কচেরেঃ
জাহা লেকারেইঞ্ বাহাইগিয়া।

"পাহাড়ের উপরে নাতাল ফুল, দুল্‌ছে নাচ্‌ছে নাতাল ফুল।
আমি সুন্দরী নই, খোঁপার দুই ধারে ফুল দোলে—
আমি সুন্দরী নই, কিন্তু ঐ ফুল চুলে আমি খুঁজ্‌বো॥"

নাদ্-দ কিসাঁড়্-হপন্ নিঞ্-দ রেঞ্জেঃচ্
হপন্ চেকা লেকাতে-ম্ বুলাও।
কিদিঞ্ নালো সারিম্ রাগ, সারিনালো,
সারিম হমরা, বানা হড়্-গে চংলাং সমান্‌গিয়॥

"(কন্যা) ধনীর ছেলে তুমি, গরীবের মেয়ে আমি,
কি ক'রে আমায় ভোলালে?
(তরুণ) কেঁদো না, মনে ব্যথা পেয়ো না,
আমরা দুজনে দুজনার সাথী॥"

মনে হয়, জীবনের সব দিক্ লইয়া টুকরা-টাকরা অভিজ্ঞতা বা চিত্রাঙ্কন সাঁওতালদের কবিতায় অধিক করিয়া পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ্ বা গাথা ছন্দে রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতায়, প্রাচীন তমিল পদে, হিন্দীর দোহায়, অনেক সময়ে বাচংযমতার সঙ্গে প্রেম বা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবির দর্শন বা উপলব্ধির যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, সাঁওতালী, মুণ্ডারী প্রভৃতি কোল-ভাষার ছাট-ছোট কবিতা যেন সেই পর্য্যায়ের।

আজকালকার বিভিন্ন গণের কোল ছেলেমেয়েরা (কি মুণ্ডারী, কি সাঁওতাল, কি হো) তাহাদেরপ্রাচীন গানগুলি ভুলিতে বসিয়াছে। তবে কোল-সমাজের বাহিরের—ভারতীয় ও ইউরোপীয়—সাহিত্য-রসিকদের আলোচনার ফলে, শিক্ষিত কোল দুই-চারিজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে দরদ আসিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়ে আবশ্যক বা প্রার্থিত হইতেছে এমন ব্যবস্থা, যাহাতে অশিক্ষিত কোল জনসাধারণ নিজেদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত এই রিক্‌থ হেলায় হারাইয়া না ফেলে। এজন্য আবশ্যক, তাহাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং শান্তিময় জীবনযাত্রা। কিন্তু এই দুইটি বস্তু এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোল জাতির পুরাণ-কথা ও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত গল্প ও কাহিনী আংশিক ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। সাঁওতালদের মধ্য হইতেই বেশী করিয়া এই-সব কথা ও কাহিনী পাওয়া গিয়াছে, এবং দুমকার স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারিদের চেষ্টাতেই কয়েক খণ্ডে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০-৭১ সালে স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি Rev. L. O. Skrefsrud স্ক্রেফ্‌স্‌রুড সাহেব, কলেয়ান (কল্যাণ) নামে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল 'গুরু' অর্থাৎ পুরোহিতকে পান, এবং তাহার নিকট হইতে সাঁওতালদের পুরাণ-কথা ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি এবং সামাজিক রীতিনীতির কথা যাহা শুনেন তাহা লিখিয়া লন, ও ১৮৮৭ সালে মূল সাঁওতালী ভাষায় রোমান অক্ষরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন—এই বইয়ের নাম দেন "হড্‌কো-রেন্‌ মারে-হাপ্‌ডাম্‌-কো-রেআঃক্‌ কথা" অর্থাৎ 'সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের কথা'। এই বইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, ইহা শুদ্ধ সাঁওতালীর মূল্যবান্‌ নিদর্শন, এবং ইহা একাধারে সাঁওতাল পুরাণ ও স্মৃতি-গ্রন্থ। ১৯৬১ সালের ভারতের জন-গণনার অধিকর্তা শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র আই. সী. এস-এর চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হাঁসদাঃক্‌ কর্তৃক এই বইয়ের এক সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঁওতাল জাতির পুরাণ-কথা ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুরূপ আর একখানি মূল্যবান্‌ সংগ্রহ-গ্রন্থ ("খেরওয়াল-বংশ-ধরম-পুথি") বাঙ্গালা অক্ষরে সাঁওতালী ভাষায় প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে সিংহভূম জেলার ঘাটশিলার অন্তর্গত আতু-কাড়ুয়াকাটা গ্রামের স্বর্গীয় রামদাস টুডু রেস্কা কর্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে রামদাস টুডুর আঁকা কতকগুলি ছবি কাঠ-খোদাইয়ে ছাপা হয়। বইটি এখন প্রায় অপ্রাপ্য। ধলভূম-রাজের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তীর আগ্রহে ১৯৫১ সালে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ, আমার একটি ক্ষুদ্র ভূমিকার সহিত, পূর্ববৎ বাঙ্গালা অক্ষরে ঘাটশিলা হইতে প্রকাশিত হয়। রামদাস টুডু প্রায় একশত বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও তাহার আঁকা কতকগুলি ছবি ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই বইয়ের তেমন প্রচার হইল না, ইহার বাঙ্গালা বা ইংরেজী অনুবাদও বাহির হইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই দুইখানি বই ছাড়া, নরওয়ের মিশনারি পরলোকগত Rev. P. O. Bodding বডিং সাহেব, Kristiania ক্রিস্তিয়ানিয়া (পরে Oslo অস্‌লো) নগর হইতে কয়েক খণ্ডে সাঁওতালী উপাখ্যান, ইংরেজী অনুবাদ সমেত রোমান অক্ষরে মূল সাঁওতালীতে প্রকাশিত করিয়াছেন। বডিং সাহেব সাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধও লিখেন। মুণ্ডাদের কথা লইয়া রোমান-কাথলিক পাদরি Hoffmann হফমান সাহেব ১৪ খণ্ডে বিরাট্ এক মুণ্ডারী বিশ্বকোষ Encyclopaedia Mundarica পাটনা হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯৩০-৩২ সাল)।

বডিং সাহেবের সাঁওতালী গল্পের সংগ্রহের কতক অংশের ইংরেজী অনুবাদ ১৯০৯ সালে সিভিলিয়ান Cecil Henry Bompas বম্পাস কর্তৃক Folklore of the Santal নামে লণ্ডন হইতে প্রকাশিতহইযাছিল। Rev. Dr.A. Campbel ক্যাম্প্‌বেল নামে আর একজন মিশনারি ১৮৯১ সালে কতকগুলি সাঁওতালী কাহিনী প্রকাশ করেন। এই-সমস্ত সংগ্রহের সব গল্পগুলিই কিছু লক্ষণীয় নহে। কতকগুলি গল্প ভারতের সাধারণ সম্পত্তি—জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের মতো পশুপক্ষীকে অবলম্বন করিযা নীতিকথা; কতকগুলি আবার সাধারণ রূপকথা, যাহা বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি আর্য্য-ভাষাতেও পাওয়া যায়। কতকগুলি গল্প বিশেষ ভাবে সাঁওতালদের জীবন লইয়া। এই-সমস্ত গল্পের মধ্যে সব-চেয়ে লক্ষণীয় এবং চিত্তগ্রাহী হইতেছে বোঙ্গাদের লইয়া কতকগুলি গল্প, যেগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক। এই ধরণের গল্পই বেশী সংখ্যায় মিলে —একদিকে মানব তরুণ তরুণী, অন্যদিকে "বোঙ্গা-কুড়ি" বা "বোঙ্গা-কোড়া" অর্থাৎ দেবকন্যা বা দেবকুমার—এবং ইহাদের মধ্যে ভালোবাসার কথা লইয়া গল্প। এইরূপ গল্পের কাঠামো বা মূল কথাবস্তু মাত্র দুই-চারি প্রকারের পাওয়া যায়। একটি সাধারণ কথাবস্তু হইতেছে এই ধরণের—সখীদের সঙ্গে সাঁওতাল-কন্যা বনে গিয়াছে শাক-পাতা তুলিতে। সেখানে এক তরুণ বোঙ্গার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ। এই বোঙ্গা-কোড়া বাস করে পাহাড়ের গুহায়। কন্যা তাহার পত্নীরূপে সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে থাকে। কিন্তু তাহার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে এই বোঙ্গা-সঙ্গ প্রীতিকর না লাগায় তাহাদের চেষ্টা হয়, যাহাতে বোঙ্গাকে মারিয়া ফেলিয়া বা তাহাকে ঠকাইয়া, কন্যাটিকে আবার ঘরে ফিরাইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আনিতে পারে। কখনও-কখনও তাহারা কৃতকার্য্যও হয়। কিন্তু বোঙ্গা তাহার মানবী স্ত্রীকে ছাড়িবে না—কন্যা বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত হয় ও প্রাণত্যাগ করে, এবং এইরূপে মৃত্যুর পরে বোঙ্গা-লোকে গিয়া তাহার বোঙ্গা-পতির সহিত মিলিত হয়। আবার এই ধরণের গল্পও কতকগুলি পাওয়া যায়—তরুণ সাঁওতাল রাখাল, পাহাড়ের কোলে বনে গোরু মহিষ চরাইতেছে। জ্যোৎস্নার রাত্রে বনের মধ্যে সে বাঁশী বাজাইতেছে। বোঙ্গা-কন্যা তাহাকে দেখিয়া, তাহার প্রেমে পড়ে, সুন্দরী মানব-কন্যার রূপে আসিয়া তাহাকে দেখা দেয়। ইহা যেন প্রাচীন বৈদিক উর্বশী ও পুরূরবাঃ, গ্রীক পুরাণ-কথার দেবী Aphrodite আফ্রোদিতে ও রাখাল রাজপুত্র Ankhises আঙ্খিসেস্, এবং টিউটনিক জাতির Valkyrie বা রণদেবী Alvit আল্‌ভিট্ ও তরুণ কারু-শিল্পী Weland বেলাণ্ড-এর কাহিনীর অনুরূপ সুন্দর ও কাব্যময় কাহিনী। সাঁওতালী উপাখ্যানের বোঙ্গা-কন্যা একটি পাহাড়িয়া নদীর উৎসের মধ্যে বাস করে। সাঁওতালী কথাকার, উৎসটির ছোট একটুখানি বর্ণনাময় চিত্র দিয়াছেন—'বোঙ্গা-কন্যার বাসস্থান উৎস-মুখের তীরে, গাছে প্রচুর লালরঙ্গের সুগন্ধময় আকাড ফুল ফুটিযা আছে।' রাখাল তরুণ জলে নামে, গাছ হইতে কন্যার জন্য ফুল তুলিবার উদ্দেশ্যে। জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই রাখাল বোঙ্গা-কন্যার শক্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে—কন্যা যেন কোনও জাদুমন্ত্রে তাহার প্রেমিককে সম্মোহিত করিয়া, জলের ভিতরে লইয়া যায়, ও নিজেদের বোঙ্গা-লোকে আনিয়া উপস্থিত করে। সেখানে বোঙ্গাদের বসিবার আসন হইতেছে কুণ্ডলী-পাকানো বড়ো বড়ো সাপ, এবং থাবা পাতিয়া বসা বাঘ আর চিতা হইতেছে বোঙ্গাদের শিকারের কুকুর। বোঙ্গারা মাঝে-মাঝে এই-সব কুকুর লইয়া বনে শিকার করিতে যায়, তাহাদের শিকারের পশু হইতেছে বনের ভিতরের কাঠুরিয়া মানুষ। কচিৎ সাঁওতাল, তরুণ বোঙ্গা-লোক হইতে মানব-লোকে ফিরিয়া আসে, এবং সাধারণ মানুষের মতো আর পাঁচজনের সঙ্গে বাস করে, বিবাহও করে, কিন্তু তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর সহিত মাঝে-মাঝে সে বনের ভিতরে অথবা পাহাড়িয়া নদী বা পুষ্করিণীর তলে গিয়া মিলিত হয়। তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে সেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ হয়, এবং সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জনসমাজে সম্মানিত "জান-গুরু" বা ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া দাঁড়ায়, ও সকলের সম্মানের পাত্র হয়, অর্থশালী হয়। প্রাচীন রোমের পুরাণ-কথায় উৎস-বাসিনী দেবী Egeria এগেরিয়ার উপাখ্যান আছে, ইনি রোমের রাজা Numa নুমার পত্নী হন, এবং ইঁহারই প্রসাদে নুমা ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন—এই সাঁওতালী উপাখ্যানও ঐ ধরণের।

বোঙ্গাদের কখনও-কখনও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে-ছোকরার ভাবে দেখা হয়—ইঁহারা নানাভাবে মানুষকে বিপদে ফেলিয়া বা অপদস্থ করিয়া আনন্দ পায়। কিন্তু মানুষও কখনও-কখনও ইহাদিগকে নিজ বুদ্ধিবলে কায়দায় আনিতে পারে। মধ্য-যুগের উত্তর-ইউরোপে বামন দেবযোনির সম্বন্ধে যে-সমস্ত গল্প আছে, এই সাঁওতালী গল্পগুলি তদনুরূপ। বোঙ্গাদের এই প্রকারের চরিত্র-কল্পনার পিছনে, হয়-তো সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন Austric বা দাক্ষিণ জাতির আগমনের পূর্বে ভারতে যে বামনাকার Negroid নিগ্রোবটু জাতি বাস করিত, তাহাদেব স্মৃতি বিদ্যমান আছে। ভারতে বৈদিকযুগে আর্য্যগণ বনের অধিষ্ঠাত্রী "অরণ্যানী দেবী"-কে দেখিয়াছিলেন; এখন সুন্দরবন অঞ্চলের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কাঠুরিয়া ও কৃষক, "বন-বিবি"র কল্পনা করে। বৈদিক আর্য্যের কল্পনায়, বন, পর্বত, হ্রদ সমস্ত ছিল দেবতাদের অধ্যুষিত, অপ্সরা ও গন্ধর্বদের বিচরণভূমি। প্রাচীন গ্রীকেরা Dryad বা বৃক্ষকাদেবী, Naiad অর্থাৎ অপ্সরা বা জলদেবী, এবং Nereid বা সাগরদেবীদের অধিষ্ঠান সর্বত্র দেখিত; তাহাদের চোখে, বনের মধ্যে Pan পান্-দেব এবং Dionusos দিওনুসস্ ও তাঁহার গণ, Satyr "সাতিব" নামে আরণ্য অর্ধ-পশু-অর্ধ-মানব-দেবযোনি ও Bacchante অর্থাৎ দিব্যোন্মাদযুক্ত রমণীবৃন্দ বিচরণ করিত। কোল-জাতীয় লোকেরা তেমনি বনে, পাহাড়ে,নদীতে, জলাশয়ে,বোঙ্গা-কোড়া ও বোঙ্গা-কুড়িদের দেখিত, এখনও দেখিয়া থাকে। তাহাদের ছোট-ছোট গ্রাম ঘিরিয়া, মধ্য- ও পূর্ব-ভারতের অনাদিকালের অরণ্যে, এখনও এই-সব দেবযোনির বাস তাহাবা দেখে। মুণ্ডা দেবলোকের এই-সমস্ত দেবতার খবর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় দিয়াছেন;—"বুরু-বোঙ্গা", ইনি পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা বোঙ্গা (ইঁহার এক সাধারণ নাম "মারাঙ্-বুরু" অর্থাৎ 'মহাগিরি'—আজকাল কোনও-কোনও অঞ্চলে সাঁওতালেরা "মারাঙ্-বুরু"-কে শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে); "ইকির্-বোঙ্গা"—গভীর জলের মধ্যে ইঁহার বাস, "নাগা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বোঙ্গা"—টিলা-ভূমি ও পাহাড়ের খদ ইঁহার বিচরণ-স্থান, "দেসৌলি-বোঙ্গা"—ছায়াশীতল তরুবহুল সুন্দর বনভূমি ইঁহার বাস-স্থান; "চন্দর-ইকির-বোঙ্গা"—ইঁহার নিবাস স্ফটিকোজ্জ্বল-জল-ময় ঝরণার তীরে, এবং "চান্দি-বোঙ্গা"—ইঁহার বেদি হইতেছে কুঞ্জবনে, খোলা মাঠে ও পাহাড়ের মাথায়।

সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপযোগী করিয়া, কোল ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে একটি discipline অর্থাৎ বিশেষ ধরণের মানসিক ব্যায়াম বা পরিপাটী বা কসরৎ অথবা শ্রমসাপেক্ষ শিক্ষা রূপে ধরা যায়। নূতন মানবিকতার বা মানব-প্রীতির দৃষ্টি লইয়া আমাদের দেশের Aborigines অর্থাৎ আদিবাসী বা ভূমিপুত্রদেব জীবনেব প্রতি অবলোকন করা আরম্ভ হইয়াছে—ইহা এই যুগের নৃতত্ত্ববিদ্যার আলোচনার একটি লক্ষণীয় সুফল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, Verrier·Elwin ভেরিযার এল্‌উইন, শ্যামরাও হিবলে, W. G. Archer আর্চর, ইঁহারা এই কাজে পদপ্রদর্শক বা পথিকৃৎ। ভারতের আদিম জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনও অংশ এই অবলোকন এবং আলোচনা হইতে বাদ দিলে চলিবে না। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী—ইহাদের ভাষার মাধ্যমেই প্রধান বা মুখ্য প্রকাশ লাভ কবে। কোল-জাতিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তাহাদের ভাষায়; মানুষের চিন্তার ধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে ইহাতে প্রবাহিত দেখা যায—কোল-ভাষার গতি বা ধারা, আর্য্য বা দ্রাবিড ভাষার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের একটি আদিম বা প্রাচীন জাতির মনোভাবের পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। কোল-ভাষার কতকগুলি রীতি মৈথিলী, মগহী, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষাতেও সংক্রামিত হইয়াছে। তাহার বিচার করিতে গেলে, এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, কোল-জগতের খবর লওয়া অপরিহার্য্য॥

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাও

ঋষি Lao Tsi লাও-ৎসি* চীনদেশে খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের কিছু পূর্বে আবির্ভূত হন। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতক মানব-চিন্তার ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় যুগ। এই সময়ে ভারতে উপনিষদের যুগের প্রসার ও অবসান; ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের দর্শন লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। বুদ্ধ ও মহাবীর এই সময়ে ও ইহার অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হন; পারস্যে ঋষি Zarathushtra জরথুশ্‌ত্র (জবতুষ্ট্র) বা Zoroaster জোরোআস্তের্ দেখা দিয়াছেন; যিহুদী ভাববাদীদেব কেহ কেহ এই সময়ে আবির্ভূত হন; এবং প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেবাও এই সময় হইতেই প্রকট হইতে আরম্ভ করেন। ৬০৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে উত্তব-চীনে লাও-ৎসির জন্ম হয—তখন চীনা জাতি ও চীনা সভ্যতা উত্তর-চীনে Hwang-ho হ্বাঙ্-হো বা পীত-নদীর উপকূল আশ্রয় করিয়া ছিল, মধ্য বা দক্ষিণ-চীনে, Yang-tsze-kiang য়াঙ্-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীর কূলে ও তাহাব আরও দক্ষিণে Si-kiang সী-কিযাঙ্ নদীর তীরে প্রসৃত হয় নাই। ইঁহার তিরোভাবের সময় জানা যায় না; জীবনের কথাও বেশী সংরক্ষিত হয় নাই। চীন-দেশ অর্থাৎ উত্তর-চীন ঐ সমযে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। লাও-ৎসি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজকীয় ঐতিহাসিক স্বরূপ, রাজ্যের গোপন বা রাজকীয় কাগজ-পত্রের অধিকারী ছিলেন; প্রাচীন ভারতের ভাষায়, 'পুস্তপাল' ছিলেন। 'কাগজ-পত্র' না বলিয়া, 'বংশ-ফলক'-সমূহের অধিকারী বলা উচিত, কারণ তখন কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও উত্তরকালে চীনারাই এই অত্যাবশ্যক বস্তুর আবিষ্কার করে; এবং চীনারা লিখন-কার্য্যে ভারতবাসীদের মতো ভূর্জত্বক্ বা তালপত্র বা অন্য কোনও 'পত্র' ব্যবহার করিত না, গ্রীক ও পারসীকদের মতো 'পুস্ত্' বা মেষচর্মও ব্যবহার করিত না, মিসরীয়দের মতো papyrus 'পাপিরস্' অর্থাৎ জলজ উদ্ভিদ্-বিশেষের বল্কলও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল; তাহারা বাঁশের পাতলা বাঁখারি বানাইয়া লোহার লেখন দিয়া তাহাতে আঁচড় কাটিয়া

* নামটি নানাভাবে ইংবেজীতে লেখা হয়—Lau Tzu Lao Tse, Lao Tsze ইত্যাদি। প্রাচীন উচ্চাবণ ধবিয়া আমি এই নামটি বাঙ্গালায় লাও-ৎসি রূপে লিখিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লিখন-কার্য্য সমাধা করিত, বাঁখারি বা বংশ-ফলকে উপর হইতে নীচে লেখা নামিত। লাও-ৎসি যে পণ্ডিত ছিলেন, তখনকার দিনের চৈনিক বিদ্যা বা শাস্ত্রে তাঁহার পূরা অধিকার ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীনকালের, তাঁহার পূর্ববর্তী চীনা দার্শনিকদের চিন্তাধারার অধিকারী তিনি ছিলেন, এবং তাঁহার নামের সহিত জড়িত 'তাও'-বাদ অন্ততঃ আংশিক ভাবে তিনি তাঁহার পূর্বজ পথিকৃৎদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত।

দার্শনিক পণ্ডিত অথবা চিন্তানেতা ঋষি বলিয়া জীবৎকালেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। চীনদেশের সর্বপ্রধান ও সর্বজন-পূজিত চিন্তানেতা, ঋষিকল্প পণ্ডিত ও জ্ঞানী খুঙ্-ফু-ৎসি (Khung Fu-tsze, Confucius রূপে ইঁহার নাম ইতালীয় খ্রীষ্টান মিশনারিগণ কর্তৃক সপ্তদশ শতকে লাতীন ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে); তিনি ছিলেন লাও-ৎসির সমসাময়িক, লাও-ৎসি অপেক্ষা বয়সে তিনি বিশেষ নবীন ছিলেন। খুঙ্-ফু-ৎসির দার্শনিক চিন্তা, অন্তর্মুখিতা অপেক্ষা ব্যাবহারিকতার পরিপোষক ছিল। খুঙ্-ফু-ৎসি ছিলেন নীতিবিৎ সমাজ-সংস্কারক, শাশ্বত সত্তা বা সত্যের উপলব্ধি তাঁহার বিচার-পদ্ধতির বা আলোচ্য বস্তুর বাহিরে ছিল। লাও-ৎসি ঠিক ইহার বিপরীত ছিলেন; ব্যস্তবাগীশ সমাজ-সংস্কারক, যাঁহারা মানুষকে ভালো করিবার ভার নিজের কাঁধে লইয়া জগতে চলেন, লাও-ৎসি তাঁহাদের পথের পথিক ছিলেন না; সার সত্যের উপলব্ধিই মানুষের পরমার্থ, এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, রাজ্যের বা সংসারের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি পণ্ডিত এবং ধীর স্থির আত্মসমাহিত ব্যক্তি, একথা শুনিয়া খুঙ্-ফু-ৎসি একবার তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। লাও-ৎসি খুঙ্-ফু-ৎসির এই আগ-বাড়া হইয়া সমাজ-সংস্কারকের বৃত্তি ও উপদেষ্টার পদ গ্রহণ পছন্দ করেন নাই; অপরকে ভালো করিয়া বেড়াইবার চেষ্টা অপেক্ষা নিজের আত্মার সংস্কৃতি, শাশ্বত সত্যের জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ঈপ্সিত পন্থা ছিল। সেই জন্য তিনি নীতিবাগীশ খুঙ্-ফু-ৎসিকে একটু অসহিষ্ণুতার সহিত ধমকাইয়া দিয়াছিলেন; সংস্কারকের পদ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর মধ্যে যে যথার্থ সত্যের সাধনার পথে অন্তরায় স্বরূপ অনুচিত একটু আত্মশ্লাঘা আসিতে পারে, তাহা লাও-ৎসি ধরিয়াছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়-তো খুঙ্-ফু-ৎসির মধ্যে তাহা লক্ষ্যও করিয়াছিলেন। সংস্কারক ও রাজনৈতিক খুঙ্-ফু-ৎসি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি লাও-ৎসিকে ঠিক-মতো বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; বাহ্য সাংসারিক জগৎ লইয়া ব্যস্ত সমাজ-রক্ষককে মুহূর্তের জন্য যেন অদৃশ্য জগতের একটা ঝলক আসিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। খুঙ্-ফু-ৎসি বিচলিত হইয়া, তাঁহার নিজের সযত্ন-পোষিত মতের বিপরীত লাও-ৎসির মতবাদটিকে ঠিক ধরিতে না পারিয়া, অথচ তাহার মধ্যে একটা বড়ো কিছু আছে তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়া, লাও-ৎসির নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিমূঢ় ভাবে নিজের অনুগামী শিষ্যদের বলিলেন—"পাখিরা উড়ে, মাছ সাঁতার কাটে, বন্য পশু দৌড়াইয়া বেড়ায়। যাহারা দৌড়াইয়া বেড়ায়, ফাঁদ পাতিয়া তাহাদের ধরা যায়; যাহারা সাঁতার কাটে, তাহাদের জন্য জাল বোনা যায়; উড়ন্ত পাখির জন্য বাণ ছোঁড়া যায়। কিন্তু গগনবিহারী Dragon বা মহানাগ—সে যে কি করিয়া আকাশ-মার্গী হইয়া বায়ু-মণ্ডলে ও মেঘ-মণ্ডলে সঞ্চরণ করে, তাহা তো জানি না। আজ লাও-ৎসি-কে দেখিলাম। তিনি কি এই মহানাগের মতো?"

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের বিখ্যাত চীনা ঐতিহাসিক Sze-ma Tsien সূজ্য-মা-ৎসিয়েন্ এই লাও-ৎসি-খুঙ্-ফু-ৎসি-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক অল্প কয়েকটি কথায় লাও-ৎসির যে জীবন-কথা লিখিয়া যান, তাহা ই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার সম্বন্ধে উত্তরকালে তাঁহার মতানুসারী দুই চারি জন অন্য দার্শনিক পরোক্ষ ভাবে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য ততটা নাই। যাহা হউক, সূজ্য-মা-ৎসিয়েন্-এর বৃত্তান্ত হইতে আমরা এই তথ্যটুকু পাই যে, লাও-ৎসি যখন অতি বৃদ্ধ হন, তখন স্বদেশের অবশ্যম্ভাবী নৈতিক অবনতি দেখিয়া, তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য চীনদেশের পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন Yin Hi য়িন্-হী নামে এক শুল্ক-গুল্ম বা চুঙ্গীর কর্মচারী তাঁহাকে বলেন—"মহাশয়, আপনি তো কোথায় চলিলেন ঠিক নাই; দয়া করিয়া আপনার শিক্ষা আমার জন্য পুস্তকাকারে লিখিয়া যান।" লাও-ৎসি তদনুসারে একখানি ছোট পুস্তিকা লিখিয়া অজ্ঞাত কোন স্থানে চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর কাল ও স্থান কেহ জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে, অর্থাৎ ৫২৫-৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব বৎসরের মধ্যে কোনও সময়ে, তাঁহার পরলোকগমন ঘটে। তখন খুঙ্-ফু-ৎসির খুব প্রতিষ্ঠা—খুঙ্-ফু-ৎসির জীবৎকাল ছিল ৫৫৪-৪৭৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। চীনা জাতি ছিল মুখ্যতঃ ইহলোক-সর্বস্ব, আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা সমাজ-পরায়ণতা এই জাতির কাছে বেশী বোচক ছিল, অন্ততঃ বেশীর ভাগ লোকের কাছে; সুতরাং ঋষি লাও-ৎসির গভীর দার্শনিক চিন্তা চীনা জাতিকে ততটা প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই, যতটা খুঙ্-ফু-ৎসির সমাজ-সংরক্ষণ-বাদ করিয়াছিল। তথাপি, লাও-ৎসি যে পুস্তকখানি দিয়া গিয়াছেন,—অথবা যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি এখন লাও-ৎসির নামে চলিতেছে, তাহাকে চীনা জাতির শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্ জ্ঞানে বহু ভাবুক ও পণ্ডিত, চীনা জীবনের প্রধান আশ্রয় বলিয়া, অবলম্বন করিযা ছিলেন ও আছেন; এবং নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে চীনা-দেশের বাহিরে ইহার প্রচারের ফলে, লাও-ৎসির নামেব সহিত জড়িত Tao-Teh-King "তাও-তেঃ-কিঙ্" বইখানি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুস্তক রূপে বিশ্বসাহিত্যে নিজ গৌরবময় আসন করিয়া লইযাছে, ও তৎসঙ্গে চীনা জাতির সংস্কৃতিব গৌরবকেও বাডাইযাছে। সহৃদয হিন্দু পাঠক অকুণ্ঠিত চিত্তে এই বইকে আমাদের প্রধান বারোখানি উপনিষদের পাশে স্থান দিবেন, নিজ আধ্যাত্মিক সাধনায় অথবা আধ্যাত্মিক রস-আস্বাদনে এই বইয়ের উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য জাতিব ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। এক ইংরেজীতেই ইহার দশ বারোটি অনুবাদ মিলিবে। তন্মধ্যে এই বইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিবার জন্য সব-চেয়ে উপযোগী হইতেছে Lionel Giles-এর অনুবাদ—ইহা ক্ষুদ্রাকার পুস্তক, লাও-ৎসিব মূল বইয়ের অধ্যায়গুলি ইহাতে নূতন ভাবে বিষয়বস্তু ধরিযা সাজানো হইয়াছে, সুপরিচিত Wisdom of the East গ্রন্থমালায় উহা প্রকাশিত হইযাছে। এতদ্ভিন্ন, Paul Carus-এর অনুবাদ আছে, উহাতে চীনা মূল, আধুনিক চীনা উচ্চারণ ধরিয়া মূলের রোমান্ প্রত্যক্ষরীকরণ ও আক্ষরিক অনুবাদও মিলিবে—এই বইখানি বিশেষ উপযোগী সংস্করণ। সম্প্রতি জনৈক চীনা পণ্ডিত কর্তৃক প্রস্তুত ইহার এক অনুবাদ মূলের সহিত বাহির হইয়াছে; এবং চীনা গ্রন্থের বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক Arthur Waley-কৃত ইহার অনুবাদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইংরেজী সাহিত্যেরও একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে বিদ্যমান। আমাদের কোনও ভারতীয় ভাষায় মূল চীনা ধরিয়া অনুবাদ এ যুগে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে—শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ, নয়া-দিল্লীর "সাহিত্য আকাদেমী" হইতে ১৯৬০ সালে বাহির হইয়াছে। এই অনুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাবের পূরণ হইয়াছে। ইহার পূর্বে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত Lionel Giles-এর অনুবাদ অবলম্বনে বাঙ্গালায় "চীনের ধূপ" নাম দিয়া একখানি পরিচয়-পুস্তক লিখেন; সেখানিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে লাও-ৎসির বইয়ের অনুবাদ হইয়াছিল সংস্কৃত ভাষায়; এই সংস্কৃত অনুবাদের কথা পরে বলিতেছি।

লাও-ৎসির নামে প্রচলিত Tao-Teh-King "তাও-তেঃ-কিঙ্" (বা "চিঙ্") বইখানি যে তাঁহার লেখা নহে, এইরূপ মত কোনও-কোনও চীনা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য বহু পণ্ডিতের অভিমত এই যে, উহাতে আমরা হয়-তো ঠিক লাও-ৎসি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা না পাইতে পারি, কিন্তু উহাতে তাঁহার দার্শনিক মত ও শিক্ষা অনেকটা-ই সংরক্ষিত আছে; এবং অন্ততঃ পক্ষে দুই হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরিয়া এই বই লাওৎসির বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে।

"তাও-তেঃ-কিঙ্"-এ প্রতিপাদ্য লাও-ৎসির মতবাদের সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসিবার মতো শক্তি ও সাহস আমার নাই। সাধারণ পাঠকের চোখে, উপনিষদের অনুরাগী হিন্দুর চোখে আমার এই বই দেখা; ইহার মূল ভাবগুলি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই বই চিরকালের সাথী হইয়া আমার কাছে আছে। কেহ-কেহ লাও-ৎসির বইয়ে ভারতের উপনিষদের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন। চীন ও ভারতের প্রাচীন সংযোগের ঐতিহাসিক বিচার করিয়া এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে করি না। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে আর্য্য-ভাষী ভারত এবং চীনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে নাই বলিয়াই মনে হয়; বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে, অথবা পঞ্চম শতকে, মধ্য-এশিয়া অথবা Yun-nan য়ুন্-নান্ বা দক্ষিণ-পূর্ব চীনের পথ দিয়া ভারত ও চীনের মধ্য বাণিজ্য-সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়া থাকিতে পারে মাত্র। আমার মনে হয়, লাও-ৎসির প্রতিপাদিত 'তাও'-বাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও আমাদের ব্রহ্মবাদ বা ঋতবাদ, দুইটি বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত এক-ই প্রকারের চিন্তার ফল। এই এক ধরনের উপলব্ধির দ্বারা বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে ভাব-সাম্য প্রকটিত হয়; এবং এই প্রকার ভাব-সাম্যের মধ্যে, হয়-তো আমরা এই উপলব্ধির সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা সম্ভাব্যতা দেখিতে আদিষ্ট হইতেছি।

লাও-ৎসির দর্শনের মূল কথা হইতেছে Tao 'তাও'; 'তাও' আধুনিক উচ্চারণ, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে শব্দটির প্রাচীন উচ্চারণ 'ধাউ' Dhau ছিল বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্থির করিয়াছেন। চীনা ভাষায় 'ধাউ' বা 'তাও' শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে 'পথ'। ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালার সাহায্যে চীনা ভাষা লিখিত হয় না—চিত্রদ্যোতক অথবা ভাবদ্যোতক বিভিন্ন অক্ষর বা বর্ণ, যাহা ধ্বনির অপেক্ষা রাখে না, তদ্দ্বারাই প্রধানতঃ চীনা শব্দ লিখিত হয়। ধ্বনিদ্যোতক কতকগুলি চিহ্ন অবশ্য চীনা লিপিতে আছে। কিন্তু মুখ্যতঃ Pictogram বা চিত্রলিখন, Ideogram বা ভাবলিখন এবং আংশিক ভাবে Phonogram বা ধ্বনি-নির্দেশন, ইহার আধারে চীনা লিখন-রীতি। চানা ভাষার তাবৎ শব্দ monosyllabic বা একাক্ষর। Dhau বা Tao শব্দটি যে অক্ষরের সাহায্যে চীনা ভাষায় লিখিত হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ এই—"যাহার সাহায্যে কোনও পদার্থের মুখ বা আরম্ভে পহুঁছানো যায়"। নিম্নে এই অক্ষরের প্রাচীন ও আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল। প্রাচীন রূপে অক্ষরের মধ্যে মূল ভাব-

চিত্রের প্রকৃতি অনেকটা সংরক্ষিত আছে; পূর্বোল্লিখিত বংশ-ফলকের উপরে লোহার লেখনীর আঁচড়ে লেখা অক্ষর এইরূপ। পরবর্তী রূপটির উদ্ভব হইল খ্রীষ্ট-জন্মের আশেপাশে, তখন চীনারা পুরাতন বংশ-ফলকের ও লোহার লেখনীর পরিবর্তে, রেশমের কাপড় বা পটের উপর তুলির সাহায্যে কালি দিয়া লিখিবার রীতি আবিষ্কার করে। যাহা হউক, মৌলিক অর্থ 'পথ', তাহার প্রসারে 'চলা', তদনন্তর 'বিচার করা', এবং তাহা হইতে ভাবার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাঁড়ায় Reason 'বিচার-শক্তি' ; কিন্তু Reason বা 'বিচার-শক্তি' বলিলে যাহা বুঝিব, লাও-ৎসির 'তাও' তদপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক বস্তু। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার অনুরূপ ভাবের কল্পনা বা প্রকাশ আমরা ভারতের উপনিষদে 'ব্রহ্ম' শব্দের মধ্যেই পাই ; এবং 'তাও' শব্দের 'পথ' এই অর্থের প্রতিরূপ, আমাদের প্রাচীন বৈদিক চিন্তায়, 'ঋত' ('ঋ'-ধাতু হইতে, 'চলা' অর্থে) শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে ; 'ঋত'—'যাহার মধ্যে সব কিছু বাহিত বা চালিত হইতেছে'। উপনিষদে ব্রহ্মের যেমন নির্গুণ ও সগুণ এই দুই অবস্থার বিচার বিদ্যমান, লাও-ৎসি-ও তদ্রূপ 'তাও'-কে আপন সত্তায় বিরাজমান নির্গুণ রূপে দেখিয়াছেন, এবং তাহাকে সগুণ, বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রকাশমান ও ক্রিয়াশীল রূপেও দেখিয়াছেন।

'তাও' শব্দের প্রকৃষ্ট সংস্কৃত প্রতিশব্দ লইয়া চীনা ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা বহু পূর্বে চিন্তা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউএন্-ৎসাঙ্ যখন ভারতে আসেন, তখন ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংযোগ ও সহযোগিতার মধ্যাহ্নকাল। চীনদেশীয় বিদ্যার্থীরা ভারতে আসিতেন, ভারতীয় বৌদ্ধ গুরু ও উপদেশকেরা চীনে যাইতেন ; চীনারা সংস্কৃত শিখিতেন, ভারতীয়েরা চীনে গিয়া চীনা ভাষা শিখিতেন, এবং উভয়-জাতীয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় প্রায় সমগ্র ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা-ভাষায় অনূদিত হয়। হিউএন্-ৎসাঙ্ ভারতের নানাপ্রদেশে পর্য্যটন করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপে গিয়াছিলেন। তখন সেখানকার রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মা ; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৌদ্ধ চীনা পণ্ডিতকে তিনি সমাদর করিয়া নিজ রাজ্যে আহ্বান করেন। চীনদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভাস্করবর্মা কৌতূহল প্রকাশ করেন, এবং চীনা সাহিত্যের কোনও শ্রেষ্ঠ বই ভারতীয় পাঠকদের জন্য যাহাতে সংস্কৃতে অনূদিত হয়, তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হিউএন্-ৎসাঙ্ রাজার ঔৎসুক্যের কথা স্মরণে রাখেন ; কিন্তু চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া এবিষয়ে কিছু করিতে পারেন নাই। ভারতের পণ্ডিতদের উপযোগী একমাত্র পুস্তক হিসাবে লাও-ৎসির "তাও-তেঃ-কিঙ্"-এর সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া ভাস্করবর্মার সভায় প্রেরণ করিবার কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে, ওয়াঙ্ হিউএন্-ৎসি ও লী য়ী পিয়াও-নামে দুইজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চীনা রাজপুরুষ ভারতে আসেন। ইঁহাদের একজন রাজা ভাস্করবর্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন, ও এবিষয়ে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া চীন দেশে ফিরিয়া গিয়া চীন-সম্রাট্‌কে সমস্ত কথা নিবেদন করেন। সম্রাট্ তখন হিউএন্-ৎসাঙ্ প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত, এবং তাও-ধর্মের প্রধান কয়েক জনকে ডাকিয়া, সম্মিলিত চেষ্টায় এই পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করান। নানা মতান্তরের মধ্য দিয়া শেষটায় সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়, এবং যথাকালে রাজা ভাস্করবর্মার নিকট প্রেরিত হয়। এ-সব কথা আমরা চীনা ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ হইতে পাই। ফরাসী চীনবিৎ পণ্ডিত Paul Pelliot পোল্ পেলিও চীনা বইয়ে এই-সব খবর পাইয়া ভারতে—আসাম-অঞ্চলে—এই বইয়ের জন্য আগ্রহ-সহকারে অনুসন্ধান করান; কিন্তু "তাও-তেঃ-কিঙ্"-এর এই প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ হয়-তো এখনও মিলে নাই; তাহা চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে এই অনুবাদ কখনও পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা এক অপূর্ব বস্তু হইবে—"তাও-তেঃ-কিঙ্"-এর প্রাচীন পাঠ-নির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া এই সংস্কৃত অনুবাদ চীনা সাহিত্যেও আদরণীয় হইবে। যাহা হউক, "তাও-তেঃ-কিঙ"-এর অনুবাদ-কালে, 'তাও' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে যে আলোচনা চলিয়াছিল, চীনা গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ আছে; হিউএন্-ৎসাঙ্ এই চীন শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ হিসাবে 'মার্গ' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাহেন, তাও-ধর্মের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রস্তাবিত 'বোধি' শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। (এই সংস্কৃত অনুবাদ সম্বন্ধে সংবাদ আমি সর্বপ্রথম পাইয়াছি আমার বন্ধু, বিশ্বভারতীর চীন-ভবনের সংস্কৃতাধ্যায়ী গবেষক ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Ta-fu Chou তা-ফ চোউ-এর নিকট হইতে)।

আমি নিজে কিন্তু আমাদের সংস্কৃত 'ঋত' শব্দের দ্বারা 'তাও' শব্দের অনুবাদ করিতে চাই। 'ঋত' বৈদিক শব্দ; হিউএন্-ৎসাঙ্ ভারতে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি এই শব্দ কেন তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল, জানি না। 'ঋত' শব্দের উৎপত্তি গমনার্থক 'ঋ'-ধাতু হইতে; 'ঋ'-ধাতুর উত্তর 'ত'(ক্ত) প্রত্যয় করিয়া 'ঋত' শব্দ। বিশেষণ-রূপে ইহার অর্থ, 'সংগত, প্রভাবিত; উচিত, সত্য, সাধু'; এবং 'পূজিত, প্রবুদ্ধ, প্রোজ্জ্বল'; বিশেষ্য-রূপে ইহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অর্থ, 'নির্ধারিত ক্রম, ধর্ম, রীতি, দৈবধর্ম, দেব-নির্দিষ্ট পথ বা ধর্ম, দিব্য সত্য ; ব্রত, প্রতিজ্ঞা ; সূর্য্য ; যজ্ঞ' ; ইত্যাদি। 'ঋ'-ধাতু ধরিয়া, ইহার মূল অর্থ হইবে 'গত' ; তাহা হইতে, করণাত্মক 'গতি', 'গতিপথ, পথ,' এবং তদনন্তর 'দেবদিষ্ট পথ, শাশ্বত ধর্ম' ইত্যাদি অর্থের বিকাশ। যে পথের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সব কিছু, চালিত বা বাহিত হইতেছে বা গমন করিতেছে, সেই পথ-ই 'ঋত', তাহা-ই সত্য। বৈদিক 'ঋত' শব্দের প্রাচীন-পারসীক প্রতিরূপ 'অর্ত' ও অবেস্তা-ভাষায় প্রতিরূপ 'অষ', 'সত্য'-অর্থে ঈরান দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ঋ'-ধাতু হইতে 'ঋত' শব্দ, অর্থ-বিষয়ে স্থূল বা ভৌতিক স্তর হইতে মানসিক বা আত্মিক স্তরে উন্নীত হইযাছে ; কিন্তু গত্যর্থক অনুরূপ 'সৃ'-ধাতু হইতে কৃৎ-ত-প্রত্যয়ের-যোগে গঠিত আর একটি শব্দ, অর্থ-বিষয়ে স্থূল বা পার্থিব স্তরেই পড়িযা রহিয়াছে ; 'সৃ'—'সৃত', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'সট', তদনন্তর 'সড', ও এই 'সড' পদে প্রাকৃতে স্বার্থে তদ্ধিত 'ক' বা 'ক্ক' প্রত্যয জুড়িযা দিয়া হইল 'সডক' বা 'সডক্ক', এবং ইহা হইতেই আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতিতে পথ-বাচক 'সডক' শব্দের উৎপত্তি। আধ্যাত্মিক অর্থে উন্নয়ন, পথ-বাচক চীনা শব্দ 'তাও' (বা 'ধাউ') এবং সংস্কৃত শব্দ 'ঋত', উভযেই বিদ্যমান ; ব্রহ্ম-নির্দিষ্ট এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সত্য পথ অর্থে 'ঋত' শব্দকে অতএব ব্রহ্ম-বাচক 'তাও'-শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সুধীগণ এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন।

'তাও' হইতেছে জগতের এবং জাগতিক তাবৎ চেষ্টার অন্তর্নিহিত এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি। 'তাও' নিজ অব্যক্ত স্বরূপে অনাদি ও অনন্ত, অপরিবর্তনীয়। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষদের উক্তি—"তদেজতি, তন্নৈজতি, তদ্দূরে, তদ্বন্তিকে ; তদন্তরস্য সর্বস্য, তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ",—'তাও'-সম্বন্ধে চীনা ঋষির উক্তি দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। 'তাও' অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অপার্থিব, শাশ্বত, ভূমা, অবাঙ্‌মনোগোচর। অব্যক্ত 'তাও' হইতেছে বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিচালক চিৎ-শক্তি, ইহা বিশ্বপ্রপঞ্চের নামরূপহীন রহস্যময় আদিকারণ, বিশ্বের মূলাধার। আবার 'তাও' মানুষের চিত্তে ব্যক্তরূপ, ব্যক্তগুণ, মানুষী চিৎ বা বোধ বা বিচার-শক্তিরূপে ক্রিযাশীল ; 'তাও'-ই জগতে কার্য্যকর শক্তিরূপে বিচরণ করে। 'তাও' জগতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেও, ইহা জগৎ-নিরপেক্ষ ধর্ম বা 'ঋত'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্যক্ত হইলে, 'তাও' মানবের মধ্যে 'তেঃ' অর্থাৎ সদ্‌গুণরূপে দেখা দেয়। যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপে ভূমা 'তাও'-কে জানেন, জগতের সব-কিছু 'তাও' দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এই বোধ বা উপলব্ধি বা অনুভূতি যাঁহার হইয়াছে, তিনি সংসারের কোনও কিছুর দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না; ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের সঙ্গে-সঙ্গে যেমন মানুষের কর্মফল-স্পৃহা বিদূরিত হয়, তেমনি নিজ চিত্তে 'তাও'-এর স্বরূপের উপলব্ধি অন্তে, মানুষ নিজজীবনে নৈষ্কর্ম্য-সাধন করে। 'তাও'-গত-চিত্ত এবং 'তাও'-গত-কর্মা মহাপুরুষ নিরর্থক কর্ম-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত না হইয়া, জগতের উদ্বেগাকুল কর্ম-স্রোত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্ম-সমাহিত থাকেন। এই নৈষ্কর্ম্য-সাধন কেবল negative বা অভাবাত্মক নহে, ইহার মধ্যে positive বা ভাবাত্মক অথবা স্থিতি-ময অবস্থা বা গুণও আছে। মানুষকে যখন তাহার প্রত্যেক চিন্তায়ও আচরণে in tune with the Infinite অর্থাৎ অসীমের সঙ্গে, শাশ্বতের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হয়, যখন মানুষ rest in God অর্থাৎ ব্রহ্ম-ধামের অধিকারী হয়, তখন-ই সে এই নৈষ্কর্ম্য-সাধন করিতে পারে। তখন মানুষের পক্ষে জীবনের সব কাজ সরল ও সহজ হইয়া উঠে; 'তাও'-এর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলিতে পারা যেন তাহার পক্ষে প্রবাসের পরে গৃহে প্রত্যাগমন-স্বরূপ হয়—সারল্য, অকপটতা, শুচিতা, সাধুতা, সত্য প্রভৃতি গুণ তাহার জীবনের স্বাভাবিক অলংকার হয়। জীবনের প্রত্যেক কাজ, বল-প্রয়োগ না করিয়া সে সমাধা করিতে পারে;—বুদ্ধদেবের উপদেশ, "অসাধুং সাধুনা জিনে" অর্থাৎ 'অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে', তাহার প্রাক্‌কথন লাও-ৎসি এই ভাবে করিয়া গিয়াছেন—'ঘৃণার পরিবর্তে প্রীতি দাও।' আমেরিকার এক নিরক্ষর নিগ্রো জ্ঞানী নিজের নিরুদ্বেগ আনন্দময় জীবনের রহস্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—Ah just tries to co-operate wid de Inevitable 'আমি অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলিবার চেষ্টা করি'; এই মনোভাব, 'তাও'-বাদীর-ই মনোভাব।

পৃথিবীর সমস্ত জাতির শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে কেবল ভারতের ব্রহ্ম-বাদ ও চীনের এই 'তাও'-বাদ নিজেকে মিলাইয়া লইতে বা তাহাদের সম্পূর্ণতা দিতে পারে। উপনিষৎ, তথা গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি-ও উপলব্ধি-মূলক ভারতের অন্য শাস্ত্রের মতো, ঋষি লাও-ৎসির "তাও-তেঃ-কিঙ্" সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক অমূল্য রিক্‌থ। ইহার এক প্রামাণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মূলানুসারী অনুবাদ ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ রূপে অপেক্ষিত। উপস্থিত শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদে বাঙ্গালা ভাষার অভাব এ বিষয়ে মিটিবে। অধুনালুপ্ত সংস্কৃত অনুবাদটির জন্য আমাদের মনে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা জাগে—কিন্তু মহাকালের বিধানে এ বিষয়ে আমরা এখন নিরুপায়।

নিম্নে 'তাও'-এর সম্বন্ধে লাও-ৎসির একটি শিক্ষা-পদের (ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করিয়া ও মূল চীনা ধরিয়া) বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়া আমার প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। ৮১টি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে 'তাও-তেঃ-কিঙ্' বিভক্ত ; ২৫-এর অধ্যায়ের ভাবানুবাদ এই :—

২৫-এর অধ্যায় ॥ (অজ্ঞাত) রহস্যের চিত্রণ ॥

নিখিল পদার্থকে পূর্ণরূপে ধারণ করিয়া একটি সত্তা বিদ্যমান।
দ্যৌঃ এবং পৃথিবীর পূর্ব হইতেই ইহা আছে।
শান্ত, আহা! অশরীরী, আহা! (অর্থাৎ কি আশ্চর্য্য ভাবে ইহা শান্ত এবং অরূপ!)
ইহা একা স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ইহা পরিবর্তিত হয় না ॥১॥

ইহা সর্বত্র যায় এবং (কোথাও) বাধা পায় না।
এই হেতু ইহা স্বর্গ-মর্তের মাতা (অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি কারণ)।
আমি ইহার নাম (নাম-রূপ) জানি না।
(যদি) ইহার বর্ণনা করি, বলি 'তাও' ('ঋত') ॥২॥

যদি ইহার নাম দিতে হয়, বলি 'মহান্' (বা 'ভূমা')।
এই ভূমাকে বলি, এড়াইয়া-যাওয়া (বা পলায়ন-শীল)।
এই এড়াইয়া-যাওয়াকে বলি 'সুদূর'।
এই সুদূরকে বলি 'ফিরিয়া-আসা' (বা প্রত্যাবর্তন)॥৩॥

কারণ, ঋত মহৎ।
দ্যৌঃ মহান্।
পৃথিবী মহতী।
রাজশক্তি (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ- বা পরিচালন-শক্তি)-ও মহতী।
জগতে এই চারি মহৎ বস্তু বিদ্যমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং রাজশক্তি (বা নিয়ামক অথবা পরিচালক শক্তি) এক অখণ্ড বস্তু রূপে এগুলিতে বাস করে ॥৪॥

মানুষ পৃথিবীকে অনুসরণ করে (অর্থাৎ মানুষ বিশ্বদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়)।
পৃথিবী দ্যৌঃকে অনুসরণ করে।
দ্যৌঃ 'তাও'-কে (ঋতকে) অনুসরণ করে।
'তাও' (ঋত) কিন্তু আপনাকেই অনুসরণ করে ॥৫॥

মন্তব্য। এই প্রবন্ধে ঋষি লাও-ৎসির যে চিত্র দেওয়া গেল, তাহা জাপানী চিত্রকর Keichyu Yamada কেইচ্যু য়ামাদা কর্তৃক অঙ্কিত; কেবল কল্পনার সাহায্যে এই চিত্র অঙ্কিত, ঐতিহাসিকতা ইহাতে নাই। Paul Carus কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত 'তাও-নীতি' সম্বন্ধে চীনদেশে লোকপ্রিয় একখানি আধুনিক বই Thai Shang Kan-Ying Phien-এর মুখপত্র হইতে গৃহীত। চীন ও জাপানের লোকেরা কিভাবে লাও-ৎসির মূর্তির কল্পনা করে, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। তলায় চীনা অক্ষরে লেখা, ডাহিন হইতে বামে পড়িতে হইবে—Thai Shang Lao Chun 'থাই শাঙ লাও চ্যুন্' অর্থাৎ 'মহান্ উচ্চ প্রভুপাদ লাও'॥

[বঙ্গাব্দ ১৩৪৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সূফী অনুভূতি ও দর্শন

নবী মুহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ইস্‌লাম অর্থাৎ মুসলমান-ধর্ম গত ১৩০০ বৎসর ধরিয়া মানব-জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে কার্য্যকর শক্তির ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি প্রধান উৎস হইয়া আছে। "তৌহীদ" অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর আল্লাহের প্রতি অনন্যনিষ্ঠ এবং অনন্যদৃষ্টি আস্থার উপরে ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা ; নবী মুহম্মদের অনুভূতি, উপদেশ ও জীবনী ইহার মুখ্য আধ্যাত্মিক আদর্শ ; এবং খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মানব-জাতিকে একটি-মাত্র বিশিষ্ট ধর্মের পাশে একত্র বাঁধিয়া রাখিবার উচ্চাশাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় ইহার প্রবলতম মানসিক প্রেরণা। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মুহম্মদ, ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের ফলে শক্তিমান্ ও বিভূতিমান্ পুরুষ ছিলেন, এবং নিজের সত্য আগ্রহ ও মানসিক বলের দ্বারা দুর্ধর্ষ আরব-জাতিকে তাঁহার অনুরাগী ও ভক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত কোরান-গ্রন্থে, শাণিত তরবারির মতো সংশয়-চ্ছেদী তাঁহার সুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস, শক্তিময়, ঐশ্বর্য্যময় ও করুণাময় ঈশ্বরের সত্তায় ও নিয়ন্তৃত্বে মানুষের আস্থা ও নির্ভরতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহার তূর্য্য-স্বন আহ্বান-বাণী, ও যাহারা তাঁহার মতো আস্থাশীল নহে তাহাদের অবশ্যম্ভাবী ঐহিক ও পারত্রিক বিনাশ বিষয়ে সতর্কতা-বাণী—এইগুলি-ই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অভিভূত করে। প্রধানতঃ আরব-জাতির সমাজের পরিধির মধ্যে মানুষের কর্তব্য লইয়াই বেশী ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া, এবং বিদ্যা ও বিচার-শীলতার আব-হাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হন নাই বলিয়া, হজরৎ মুহম্মদ দার্শনিক চিন্তা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ পান নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া, কোরান গ্রন্থে, এবং কোরান-বহির্ভূত হদীস্ বা তাঁহার বচন-সমূহে ও তাঁহার আচরণে, গভীর অধ্যাত্মিক দৃষ্টির ও পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধির পরিচায়ক উক্তির অভাব নাই।

জগতে সমস্ত-ই গতি-শীল, কিছু-ই স্থিতি-শীল নহে ; অন্য সমস্ত ব্যাপারের মতো ইস্‌লামের মধ্যেও আমরা গতি বা ক্রম-বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জাতির সংঘাত ও মিলনের ফলে যখন নূতন-নূতন ভাব-ধারা আসিয়া ইস্‌লামীয় জনগণকে উন্মুখ করিল, অভিভূত করিল তখন কোরানের ও হদীসের বচনের মধ্যে এই সব নবীন ভাব-ধারার মূল খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইল; এবং মূল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় এরূপ বচন-সমূহের অভাবও হইল না। প্রাচীন-পন্থী মুসলমান যাঁহারা কোরান-নির্দিষ্ট সংকীর্ণ কিন্তু সরল পথকেই মুহম্মদ-প্রোক্ত মূল ইস্‌লামের পথ (শরিয়ৎ) বলিয়া মানিতেন, তাঁহারা এই সমস্ত নবীন মত ও নবীন ব্যাখ্যা অস্বীকার করিতেন; নূতন মতের ন্যায়-সংগত পর্য্যবসান, ইস্‌লামের মৌলিক তত্ত্বসমূহ হইতে দূরে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কা তাঁহাদের মনে সদা-জাগ্রত ছিল। সেই জন্য, যখন ইস্‌লামের প্রথম প্রসার এবং আরব-জাতির সঙ্গে সুসভ্য ঈরানী, সিরীয়, বিজাতীয় গ্রীক, মিসরীয় প্রভৃতি জাতির প্রথম সংঘর্ষ ও সংঘাত ঘটিল, ও পরে অর্থনৈতিক মানসিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে যখন প্রথম বোঝা-পড়া আরম্ভ হইল, এবং ইহার ফলে নানা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মত-বাদ ধর্মের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করিল, তখন কোরান ও শরিয়ৎ আশ্রয় করিয়া প্রাচীন-পন্থী আরব ও অন্য মুসলমান, যাহাদের নিষ্ঠা বিচার অপেক্ষা কর্মকেই আশ্রয় করিতে চাহিত, তাহারা এই সকল মত-বাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল।

এই-সকল নূতন দৃষ্টি এবং মত-বাদ বা বিচারের মধ্যে, ধীরে-ধীরে সূফী মত-বাদও গড়িয়া উঠিল। মুসলমান সাধকগণের অনুভূতি ও সাধনা, দর্শন ও আচরণ, ক্রমে মুহম্মদ-প্রচারিত ইস্‌লামের পরিধির বাহিরে, প্রসারিত হইল। ইহাকে ইস্‌লামের স্বাভাবিক গতি বা বিকাশ বা পরিণতি বলিয়া লইবার মতো বিচারশক্তি বা ধৈর্য্য অনেকের ছিল না; বিশেষতঃ যখন আপাত-দৃষ্টিতে এই সমস্ত নূতন অনুভূতি ও দর্শনের কথা, কোরানের শরিয়ৎ অপেক্ষা কল্পনায় ও ভাবুকতায় আরও ভরপুর, আরও জটিল ও বিচিত্র হইয়া দেখা দিল। সূফী অনুভূতি ও দর্শন যাঁহাদের মধ্যে উদ্ভূত হইতেছিল, তাঁহারা কেবল কোরান লইয়া-ই সন্তুষ্ট ছিলেন না—গ্রীক, ঈরানীয় ও ভারতীয় চিন্তার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ অথবা ভাসা-ভাসা পরিচয় ঘটিয়াছিল। শরিয়তী ইস্‌লাম, সহজ ও সরল বুদ্ধির মানুষের পক্ষে, কর্মী মানুষের পক্ষে, সোজা পথ ধরাইয়া দিবার জন্য, এবং সমাজের মধ্যে ঈশ্বর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভীরু ও কর্তব্য-পরায়ণ, জন-হিতৈষী ও আচার-নিষ্ঠ গৃহস্থ সজ্জন তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য, যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইস্‌লামী জগতের বাহিরেকার সাধারণ বিশ্বমানব, চিত্তকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য, আত্মাকে অনুভূতির রঙ্গে ও রসে রঙ্গাইয়া দিবার ও রসাইয়া দিবার মতো বিশিষ্ট ও স্বকীয় কিছু, ইহার মধ্যে সহজে পাইবে না। যিহুদী নবী বা ভাববাদীদের দ্বারা প্রচারিত, যিহুদী পুরাণে (Thorah "থোরাহ্" অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র বা মোশোহ্-লিখিত পঞ্চ-গ্রন্থ, Nebhiim 'নেভীইম্" অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও ভাববাদীদের রচিত ২১ খানি গ্রন্থ, এবং Kethubhim "কেথুভিম্" অর্থাৎ প্রার্থনা, স্তোত্র, উপাখ্যান, ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত কতকগুলি গ্রন্থ—এই-সমস্ত মিলাইয়া, ইংরেজীতে Old Testament নামে পরিচিত যিহুদী শাস্ত্রে) ও যিহুদী ব্যবহার এবং শাস্ত্রার্থে (Talmud "তাল্‌মুদ"-গ্রন্থে) বিশেষ দৃঢ়-প্রত্যয় সহকারে প্রস্থাপিত একেশ্বরবাদ, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মুহম্মদ-প্রচারিত ইস্‌লাম-ধর্মেও অনুরূপ, এমন কি, অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ়তার সহিত গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ এক ঈশ্বরে আস্থা, জগতে কিছু নূতন বস্তু ছিল না। কিন্তু অন্তরঙ্গ ও গভীর ঈশ্বরানুভূতি, জীব ও ঈশ্বরের অভেদত্ব ও সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বর অথবা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রেমের সম্বন্ধ—মানবাত্মাকে প্রেমিক ও ঈশ্বরকে প্রেমিকা বা প্রেমাস্পদের রূপকের দ্বারা বর্ণনা,—এইরূপ বোধ ও কল্পনা, ধ্যান ও ধারণা, এবং সাধনা ও আরাধনা লইয়া, যখন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্যেই সূফী মত নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল, তখন জগতের ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে একটি নূতন জিনিস দেখা দিল। এই মত-বাদের গঠনে ও ক্রম-বিকাশে নানা জাতির আহরিত উপাদান আসিয়াছিল—সজ্ঞানে, অথবা অজ্ঞানে। আরব্য ইসলামের অদ্বিতীয়-ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস; গ্রীক দার্শনিক প্লাতোন্ ও তদনুবর্তী নব্য-প্লাতোনিক দার্শনিকদের ঐশ্বরিক সত্তা ও কার্য্য বিষয়ে চিন্তা ও বিচার; এবং ভারতের বেদান্তের 'সর্বভূতে-ব্রহ্মাধিষ্ঠান'-বাদ, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অভেদ কল্পনা ও 'অহং-ব্রহ্মাস্মি'-বাদ; তথা খ্রীষ্টানদের ও বৌদ্ধদের পরিব্রাজক-জীবন; ঈরানের জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের সত্য-বস্তুর প্রতি নিষ্ঠা ও তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা, মিথ্যার পরিহার ও নৈতিক একাগ্রতা; এবং পরবর্তী কালের মধ্য-যুগের পারস্যের নাগরিকতা, ভাবুকতা, সৌন্দর্য্য-প্রীতি ও রোমান্স্ বা রমন্যাস; —এ-সবে মিলিয়া একটি অতি মনোহর emotional অর্থাৎ অন্তর্বেগময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল, বিশ্বমানবের সমক্ষে তাহা একটি অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল; ইস্‌লাম-সম্পৃক্ত ভাব-রাজির মধ্যে সূফীদের সৃষ্ট এই কল্পলোক, বিশ্বমানবের পক্ষে সাগ্রহে গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল। আরব-জাতির নিজ মৌলিক প্রকৃতিতে অতীন্দ্রিয়তার প্রতি তাদৃশ আকর্ষণ না থাকায়, কর্মপ্রবণ আরব-জাতি সাধারণ-ভাবে বা ব্যাপক-ভাবে এই জিনিস গ্রহণ করিতে পারে নাই; কিন্তু সূফী অনুভূতির ও দর্শনের ধারার আরম্ভ আরব মুসলমান সাধকদের মধ্য হইতেই ক্ষীণ স্রোতে দেখা দিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শরফুদ্দীন ওমর ইব্‌ন্‌-অল্‌-ফরীদ (১১৮১—১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও মুহ্‌য়িউদ্দীন্‌ মুহম্মদ বিন্‌ আলী ইব্‌ন্‌-'আরবী (১১৬৫—১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ), ইঁহারা সূফীমতের দুইজন প্রধান সাধক ও উপদেষ্টা, কবি ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন; ইঁহাদের দুইজনেরই মাতৃভাষা ছিল আরবী। তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, ঈরানীদের মধ্য হইতেই সূফী মতের শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিকদের উদ্ভব হয়, এবং সেইজন্য কেহ-কেহ Tasawwuf "তস্বব্‌র্‌ফ্‌"-কে, অর্থাৎ সূফী অনুভূতি ও দর্শনকে, আরব বা শেমীয় ধর্ম ইস্‌লামের বিরুদ্ধে ঈরানের আর্য্য মনের প্রতিক্রিয়ার ফল বলিয়া মনে করেন। সূফী সাধক আবু য়জীদ বিস্তামী, জুনয়্‌দ্‌ বগ্‌দাদী, হুসয়্‌ন্‌ বিন্‌ মন্‌স্বর অল্‌-হল্লাজ, সূফী কবি ও দার্শনিক আবু সঈদ ইব্‌ন্‌ আবী-ল্‌-খয়্‌র্‌, আবু-ল্‌ মজ্‌দ্‌ মজদূদ সন্যাঈ, ফরীদুদ্দীন অত্তার, জলালুদ্দীন রূমী ও তাঁহার গুরু শম্‌স্‌-ই-তব্রীজী, দার্শনিক আবু হমীদ মুহম্মদ অল্‌-ঘজ্জালী, কাব মুহম্মদ শম্‌সুদ্দীন হাফেজ, কবি নূরুদ্দীন আব্‌দুর-রহ্‌মান জামী—ইঁহারা সকলেই ঈরানী ছিলেন।

যাহা হউক, তুর্কী ও ঈরানীদের দ্বারায় উত্তর-ভারত-বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ইস্‌লামের অন্তরঙ্গ সাধনার একটি লক্ষণীয় পথ হিসাবে, তস্বব্‌র্‌ফ্‌ ভারতবর্ষেও আসিয়া পহুঁছায়। সূফী ফকীর বা যাযাবর পরিব্রাজক, ভারতের নানা স্থানে সূফী-মতের ইস্‌লাম প্রচার করেন, এবং ইহার ফলেই ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধেরা অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম-ধর্ম গ্রহণ করে। ভারতের ধর্ম-চিন্তা ও সাধনা, আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশক কবিতায় সূফী-মতবাদ নিজ প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়ে এখনও বিশেষ কিছু অনুসন্ধান হয় নাই; কিন্তু ভারতের মধ্য-যুগের ভক্তি-মূলক সাধনায়, সন্ত-মার্গীয় বৈরাগী ও সাধুদের চিন্তায়, গৌড়ীয়-মতের বৈষ্ণব প্রমুখ প্রেমাশ্রয়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধর্ম-সম্প্রদায়ে ও সাহিত্যে, সূফী অনুভূতির প্রভাব ও সূফী সাহিত্যের ছাপ আছে কি না, এবং থাকিলে কতটা আছে, তাহা বিচার্য্য।

আরবদের মধ্যে নবী মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বেই কতকগুলি ধর্মপিপাসু তত্ত্বানুসন্ধানীর জন্ম হয়, ইঁহারা "হানীফ" (:হনীফ) নামে অভিহিত হন। ইঁহারা ঈশ্বর-লাভের আশায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া পর্বতে ও মরুতে একাকী বাস করিতেন। ইঁহাদের কোনও সম্প্রদায় ছিল না; তবে ইঁহারা সকলেই, আরব-জাতির মধ্যে যে আদিম ভাবের পৌত্তলিকতা ছিল, তাহা বর্জন করিয়া, এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্য সাধনা করিতেন, এবং বর্বর যুগের আরবদের অনেক নিষ্ঠুর ও কুৎসিত প্রথা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তস্বর্‌রুফের জড এক দিকে আরব-জগতে এই সব হানীফদের সাধনায় গিয়া পহুঁছায়। হজরৎ মুহম্মদ নিজে প্রথম জীবনে, হানীফদের ন্যায় কিছুকাল পর্বতে গিরি-গুহায় বাস করিয়াছিলেন, সেখানে হানীফদের আচরিত সাধনা বা তপস্যা (তঃহন্নুথ) করিতেন। কিন্তু মুহম্মদ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না—সন্ন্যাস-মার্গ তাঁহার মনোমত ছিল না। তাঁহার উক্তিতে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরানুভূতির প্রচুর প্রমাণ ও আভাস থাকিলেও, তিনি মনে করিতেন যে তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ মানুষের মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিবার জন্য আগত প্রচারক—"রসূল" অর্থাৎ 'প্রেরিত পুরুন', এবং "পযগম্‌বর" অর্থাৎ 'সন্দেশ-বহ' দূত (প্রথমটি আরবী ও দ্বিতীয়টি ফারসী শব্দ)। নবী মুহম্মদের মৃত্যুর পরে, কয়েক পুরুষ ধরিয়া আরবেরা রাজ্য-জয় ও ইস্‌লাম-প্রচারের কার্য্যে লাগিয়া গেল; তখন তাহাদের মধ্যে গভীর চিন্তার বা রহস্য-বাদের সূক্ষ্ম বিচারের সময় ছিল না। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে গৃহ-ত্যাগী ঈশ্বর-ভক্ত দুই-জন চারি-জন করিয়া দেখা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের অনুভূতিতে, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ, প্রভুর সহিত ভৃত্যের সম্বন্ধ মাত্র ছিল; পরবর্তী সূফী মতের প্রেমের সম্বন্ধ তখনও কল্পিত হয় নাই। আত্মদমন ও সংযম, শাস্ত্রানুবর্তিতা ও শান্তিপ্রিয়তা, একান্তে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন জপ-তপ, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, এবং ব্যর্থ আচার-নিষ্ঠতার বর্জন—এই-সব ছিল ইঁহাদের সাধনার অঙ্গ। এইরূপ সাধকদের মধ্যে, সাধক আবু হাশিম শামী, যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, তিনি-ই সর্ব-প্রথম "সূফী" নামে অভিহিত হন; পরে কোরান-বহির্ভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পথে যাঁহারা তত্ত্ব বা সার সত্যের অনুসন্ধান করিতেন, তাঁহারা এই নামেই অভিহিত হইতে থাকেন। "সূফী" (সূফী) শব্দের নানা ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে; তন্মধ্যে "সূফ" (সূফ) অর্থাৎ 'উনী বা পশমের কাপড়', এই শব্দ হইতে যে ব্যুৎপত্তি, তাহা-ই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ সূফীরা প্রথম হইতেই কালো পশমের খদ্দরের ("সূফ"-এর) আলখাল্লা পরিতেন; ইহা আমাদের দেশের সন্ন্যাসীর গৈরিক-বস্ত্রের মতো ছিল: সেইজন্য এই সূফ-বস্ত্র, গৃহত্যাগী বা সংসার-নিস্পৃহ সাধুর বর্ণ-চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়। "সেক শুভোদয়া"-গ্রন্থে গৌড়-বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় যে "সেক" অর্থাৎ "শেখ" (শয়্খ্) বা মুসলমান সাধুর আগমনের কথা বর্ণিত আছে, তিনিও নিশ্চয়ই সূফী ছিলেন, তিনি "কৃষ্ণাম্বরধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টনতৎপরঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; ইহা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষের দিকের কথা। "সূফী" নাম, এই-সব সাধকের বিশেষ সংজ্ঞা রূপে প্রচলিত হয়, এবং সূফী ভাবকে আরবী ব্যাকরণ মতে "তস্বর্রুফ্" বলা হইতে থাকে। এই শব্দ পরে আমাদের 'তত্ত্বজ্ঞান' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' অথবা 'ঈশ্বরানুভূতি' বা 'পরানুরক্তিময় ঈশ্বর-ভক্তি' প্রভৃতি শব্দের পর্য্যায়ের হইয়া পড়ে।

প্রথম যুগের ইস্‌লামে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত), কোরানের সহজ সরল ঈশ্বর-বাদের অনুযায়ী দাস্য-ভাবের সাধক কতকগুলি সূফী দেখা দেন—ইঁহারা সংখ্যায় ১২।১৪ জন হইবেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন নারী ছিলেন, তিনি হইতেছেন বিখ্যাত তাপসী রাবেয়া (রাবি+অৎ); ইনি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে দেহরক্ষা করেন। ঋষিকা রাবেয়াকে 'আরব-জগতের মীরাবাঈ' বলা যায়। ইনি সূফীদের মধ্যে প্রথম প্রেম-ভক্তি আনয়ন করিলেন—ফলাফল- বা স্বর্গ-নরক-নিরপেক্ষ ঈশ্বরে পরা অনুরক্তি ছিল ইঁহার সাধনার মূল কথা। প্রথম যুগের এই-সকল সূফীর মধ্যে কতকগুলি ঈরানীও ছিলেন—প্রথম হইতেই সূফী সাধনায় ঈরানীদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা লক্ষণীয়।

সূফী মত-বাদের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষ এবং দশম শতকের প্রারম্ভ হইতে। এই সময়ে আবু য়জীদ বিস্তামী ও জুনয়দ্ বগ্‌দাদী নামে দুইজন ঈরানী সূফীর অনুভূতিতে ও শিক্ষায় 'সর্বভূতে ঈশ্বরাধিষ্ঠান' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাদ, ইস্‌লামীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রকটিত হয়। ইহার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয়;—'অহং ব্রহ্ম অস্মি' এই সংস্কৃত মহাবাক্যের অনুরূপ যে মহাবাক্যটি আরবী-ভাষায় প্রচারিত হয়—" 'অন-ল্-ঃহক্ক্" aan-l-Haqq, (প্রচলিত বাঙ্গালা বানানে "আনাল্-হক্") —তাহার অর্থ হইতেছে 'আমি-ই ('অন) সত্য (অল্-ঃহক্ক্)'; পরব্রহ্মের নাম হিসাবে এখানে "ঃহক্ক্" বা "হক্" অর্থাৎ 'সত্য' এই বিরুদ হইয়াছে। এই মহাবাক্য পরে হুসয়ন্ বিন্-মন্সুর অল্-হল্লাজের মুখে তাঁহার প্রাণদণ্ডের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই কারণে ইহা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখন, ইসলামী জপ-মালায় (তস্বীহ্-তে) ঈশ্বরের যে একোনশত বা নিরানব্বইটি (নব্বদ্-ও-নৌ) নাম জপ করা হয়, তন্মধ্যে "অল্-ঃহক্ক্" তাঁহার একটি নাম। কিন্তু ঈরানের সূফীদের মধ্যে এই নামটি, ঈশ্বরের সর্ব-প্রধান আরবী নাম "অল্লাহ্" শব্দের প্রায় প্রতিস্পর্ধী হইয়া উঠে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে মুসলমান-সমাজে সেদিন পর্য্যন্ত পত্রের আদিতে "শ্রীশ্রীহকনাম" বলিয়া দেবতা-প্রণামের পাঠ লিখিবার যে রেওয়াজ ছিল, তাহার মূলে এই সূফী প্রভাব বিদ্যমান। ঈশ্বর বা ঐশী শক্তির জন্য "হক্"(অর্থাৎ সত্য)-শব্দের এই অধিক প্রযোগ যে ঈরানীয় সূফীগণের মধ্যেই আরম্ভ হইল, তাহার কারণ কী? একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইস্লাম-ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ঈরানীদের মধ্যে যে জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল দ্বৈতবাদ-মূলক। পৃথিবীতে ঈশ্বর ও পাপ-পুরুষ, অহুর-মজ্দ ও অঙ্গ্র-মন্যু, সত্য ও মিথ্যা—ইহাদের দ্বন্দ্ব সতত লাগিয়া আছে। মানুষের কর্তব্য, সজ্ঞানে সত্যের পক্ষ লইয়া, ঈশ্বরের পক্ষ লইয়া, অহুর-মজ্দের দাস হইয়া, মিথ্যা ও পাপের বিরুদ্ধে, অঙ্গ-মন্যুর বিরুদ্ধে, লড়াই করা। পাপ-পুণ্যের যুদ্ধে মানুষ হইতেছে ঈশ্বরের সৈনিক মাত্র। প্রাচীন ঈরানের ভাষায়, 'সত্য' অর্থে "অর্ত" বা "অষ" শব্দের ব্যবহার হইত; এই দুইটি শব্দ হইতেছে আমাদের সংস্কৃত "ঋত" শব্দের ঈরানী প্রতিরূপ, প্রাচীন-পারসীকে "অর্ত" ও অবেস্তার ভাষায় "অষ"; তদ্রূপ, 'মিথ্যা'-অর্থে আমাদের "দ্রোহ" শব্দের প্রতিরূপ প্রাচীন-পারসীকে "দ্রউজ" ও অবেস্তার ভাষায় "দ্রুজ্" শব্দ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে, ইস্লামেও এই দ্বৈতভাব, পুণ্য ও পাপের বা সত্য ও মিথ্যার শাশ্বত বিরোধ, দেখা যায়। ঈরানীদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালেখ প্রভৃতিতে, অবেস্তা গ্রন্থে ও হখামনীষীয় বংশের সম্রাট্দের লিপিতে, সর্বত্র দেখিতেছি, "অর্ত"-র (বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"অষ"-র) পক্ষ লইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষ লইয়া, "দ্রউজ"-র (বা "দ্রুজ্"-এর), অর্থাৎ মিথ্যা, অজ্ঞান, পাপ বা শয়তানেব বিরুদ্ধে লড়াইযের কথা, বিশেষ জোর দিয়া বলা হইতেছে। সত্যের প্রতি আস্থা প্রাচীন ঈরানীয় চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণীয় গুণ ছিল, হেরোদোতস্-প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ঈরান। স্ফীগণের চিন্তায় ও ভাষায়—ঈশ্বর বা পবম-পুরুষ বা সত্যময-পবব্রহ্ম-ই যে 'ঋত'—এই প্রাচীন আর্য্য ভাব, আরবী-ভাষায় "অল্-লাহ্"-কে জানাইবার জন্য "অল্-ঃহক্ক্" শব্দের প্রযোগেব বাহুল্যে, নূতন কবিয়া কি আত্মপ্রকাশ করিল?

প্রথম যুগের স্ফীবা কতকগুলি নূতন চিন্তাধাবা আনযন করেন। বগদাদের স্ফী ম'রূফ্ অল্-করখী (মৃত্যু খ্রীষ্টাব্দ ৮১৫; ইনি ঈরানী-বংশীয় ছিলেন. যদিও ভাষায আরব হইয়া গিয়াছিলেন) একজন দিব্যোন্মাদ-যুক্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি তপস্যা ও কৃচ্ছ্র-সাধন অপেক্ষা অনুভূতিব দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছিলেন। ইনি যে কথা বলিতেন—"ভক্তি মানুষেব শিক্ষায মিলে না, ইহা ঈশ্বরেব দান, তাঁহার করুণায় পাওযা যায"—এই কথা, উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" এই শ্লোকেব যেন প্রতিধ্বনি। ম'রূফ্ প্রথম তস্বর্‌উফের সংজ্ঞা নির্ণয কবিযা দেন—"তস্বর্‌উফ বা ঈশ্বরানুভূতি হইতেছে সত্য বস্তু-সমূহেব বোধ, এবং সৃষ্ট জীবগণের হাতে যাহা আছে তাহার পরিত্যাগ" (আরবীতে—'অত্-তস্বর্‌উফু 'অল্-'অখ্‌ধু বি-ল্ ঃহকা'ইকি, র-ল্-য়'অস্থ মিম্-মা ফী-ল্-'অয্‌দী-ল্-খলা'ক্কি); অর্থাৎ, বিষয়-নিস্পৃহতার উপরেই তত্ত্ব-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। আবু সুলয্‌মান্ ইরাকী (মৃত্যু ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে) স্ফী চিন্তায় "মারিফৎ" (ম'রীফৎ) অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জগতের বিশেষ জ্ঞানকে, অর্থাৎ শাস্ত্রাতীত অনুভূতি-জাত আধ্যাত্মিক বোধকে একটি প্রধান স্থান দিলেন। এই মারিফৎ, গ্রীকদের gnōsis-এর কল্পনা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। ইঁহাদের পরে প্রকটিত হন আবু-ল্-ফয়য্‌ থওবান্ বিন্-ইব্রাহীম ধু-ন্-নুন্ অল্-মিস্‌রী (মৃত্যু ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি মিসর-দেশের অধিবাসী ছিলেন, ইঁহার উপনাম "ধু (বা জু)-ন্-নুন্" অর্থাৎ 'মৎস্যবান্' দ্বারাই ইনি বেশী পরিচিত। ইনি মারিফৎ-বাদকে পূর্ণ-ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বীকার করেন, এবং ঈশ্বরের সত্তায় নিলীন হইয়া মানুষ যে আনন্দ-রস (wajd রজ্‌দ্‌) অনুভব করে, তাহা-ই জীবনে একমাত্র কাম্য, এই শিক্ষা ইনি দেন।

"'অন-ল্‌-ঃহক্ক্‌"-মন্ত্রের প্রধান সাধক সূফী মহর্ষি হুসয়্‌ন্‌ বিন্‌-মন্‌স্বর অল্‌-হল্লাজের নাম বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে পরিচিত। স্বর্গীয় মোজাম্মেল হক্‌-রচিত "মহর্ষি মনস্বর" পুস্তকে প্রকাশিত তাঁহার জীবনী অনেকেই পাড়য়াছেন। মন্‌স্বরের জাবন-কথা ও তাঁহার মত-বাদ এবং শিক্ষা লইয়া ফরাসী পণ্ডিত Louis Massignon লুই মাসিঞ্জঁ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে যে তথ্য-পূর্ণ ও উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন (La Passion d'al-Hosayn Ibn-Mansour al-Hallaj, Martyr Mystique de l' Islam), তাহা হইতে ইঁহার সম্বন্ধে সব-কিছু খবর পাওয়া যাইবে। ইনি শীরাজের নিকটে বয়্‌জা (বয়্‌দ্বা) নামক গ্রামে ৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইরাকে বগ্‌দাদ নগরীতে ও অন্যত্র বেশী সময় অতিবাহিত করেন, তিন বার মক্কা-দর্শন করিয়া আসেন। ৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে যান; ভ্রমণের উদ্দেশ্য এই বলিয়া প্রকাশ করেন যে, তিনি ভারতের জাদুবিদ্যা শিখিতে এবং তথায় সত্য-ধর্ম প্রচার করিতে যাইতেছেন। জাহাজে চড়িয়া ইরাক হইতে যাত্রা করিয়া গুজরাটে অবতরণ করেন, পরে সিন্ধু-নদ ধরিয়া মুলতান হইয়া কাশ্মীরে যান; মধ্য-এশিয়ায় ও ঈরানে বহু ভ্রমণ করেন, যেরূশালেম-নগরও দর্শন করিয়া আনে। 'অন-ল্‌-ঃহক্ক্‌' মন্ত্র প্রচারের ফলে ইনি গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হন, তাঁহারা ইঁহার এই মন্ত্রকে ঈশ্বরত্বের দাবী বলিয়া ইস্‌লাম-বিরোধী পাপ-রূপে ঘোষণা করেন। সুদীর্ঘ বিচারের পরে নিষ্ঠুর-ভাবে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় (৯২২খ্রীষ্টাব্দে); প্রথম তাঁহাকে পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারা হয়, পরে তাঁহার দুই হাত ও দুই পা কাটিয়া ফেলা হয়, এক রাত্রি এই অবস্থায় তাঁহাকে তেকাঠায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পরদিন তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়।

এইভাবে প্রাণ দিয়া আপন বিশ্বাস অটুট রাখিয়া, সূফী মত-বাদকে হল্লাজ যে প্রতিষ্ঠা দান করিয়া গেলেন, তাহার ফলে তাঁহার পরে ইস্‌লামের অনেক-খানি সূফী অনুভূতি ও দর্শনের আওতায় আসিয়া পড়িল। মন্‌স্বরকে জুয়াচোর এবং মতলব-বাজ বলিয়া মনে করিত, এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকেরও অভাব ছিল না; তাঁহাকে নিন্দা করিয়া অনেক কথাও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহর প্রভাব কমিল না। মন্‌স্বর অল্‌-হল্লাজ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কথিত আছে তিনি ৪৬ খানি বই লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক মাসিঞ্‌ হল্লাজের রচনাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার কতকগুলি উক্তিও মহামূল্য। অনেক কবিতাও ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। হল্লাজের দর্শন ও অনুভূতি বুঝিতে না পারিযা প্রবল-প্রতাপ শবিয়তী কাজী ও মোল্লারা যেমন তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল, তেমনি ওদিকে অনুভব-শীল জন-সাধারণ তাঁহাকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের সম্মান দিল। হল্লাজ ইস্‌লামের জগতে এক শ্রেষ্ঠ "শহীদ" অর্থাৎ ধর্মার্থে প্রাণত্যাগীব আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁহার ব্যক্তিত্ব অদ্ভুত ছিল। তিনি ভারতবর্ষে আসিযাছিলেন—কেবল কি জাদু-বিদ্যা শিখিতে আসিয়াছিলেন? ভারতের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদেব সঙ্গে, যোগী ও সাধকদের সঙ্গে, তাঁহার কি দেখা হয় নাই—তাঁহাদেব নিকট হইতে তিনি কি কিছু-ই পান নাই? পাঞ্জাব ও কাশ্মীব তখন হিন্দুবই দেশ ছিল, হিন্দু জাতি তখন মরে নাই। "অহং ব্রহ্মাস্মি"-মন্ত্র কি তাঁহাকে "'অন-ল্‌-ঃহক্‌ক্‌"-মন্ত্র জপে আরও বেশী কবিযা উদ্বুদ্ধ কবে নাই? ইঁহাব গুরু জুনয়দ্‌ ইঁহাকে এই ভাবে এই মন্ত্র প্রচার কবিতে নিষেধ করেন; "আমি-ই সত্য বা ব্রহ্ম", একথা না বলিয়া, "আমি-ই সত্যেব জন্য" (অন-বি-ল্‌-ঃহ ক্‌ক্‌), এই কথা বলিতে উপদেশ দেন; হুসয়ন্‌ বিন্‌-মন্‌স্বব তাহা শুনেন নাই। সে যুগেব কথা আমরা সব জানি না; কিন্তু তখন দেশে-দেশে ধর্মে-ধর্মে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে লেন-দেন কিছু কম ছিল না। গ্রীক নব্য-প্লাতোনিক দর্শন স্‌ফী দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাভূমি হইলেও, বেদান্ত-মতের সহিত স্‌ফী দর্শনের সাম্য এত অধিক যে কতকগুলি প্রধান বিষযে প্রাচীনতর বেদান্তের প্রভাব মানিতেই হয়। যাঁহাদের মাধ্যমে এই প্রভাব গিযাছিল, হল্লাজ তাঁহাদের একজন হইতে পারেন। তবে বেদান্তের প্রভাব না বলিয়া, স্বাধীন ভাবে ভারত ও ঈরান উভয় দেশে এক-ই ধরণের অনুভূতি ও দর্শন আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে, একথাও বলা যায়।

মন্‌স্বর অল্‌-হল্লাজের প্রতি যখন নিষ্ঠুর মৃত্যু-দণ্ড জ্ঞাপন করা হইল, তখন তিনি অটল রহিলেন। ইঁহার মৃত্যুর দিনের কথা ইঁহার শিষ্যদের কেহ-কেহ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইঁহার পুত্র, এবং অন্য নিরপেক্ষ বা বিরোধী ব্যক্তিগণ লিখিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া বধ করিবার জন্য কারাগার হইতে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবস্থায় বাহিরে আনা হয়, তখন তিনি হাসিতেছিলেন। একজন শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু, তোমার এ অবস্থা কেন?"—তিনি উত্তর করিলেন—"তার রূপের আদর এই প্রকার; যারা তার সঙ্গে মিলন চায়, তাদের এই ভাবেই সে (=প্রেমিকারূপে কল্পিত ঈশ্বর) টেনে নেয়!" তাহার পরে আরবী-ভাষায় এই শ্লোক দুইটি রচনা করিয়া পাঠ করিলেন—

নদীমী ঘয়্‌র মন্‌স্থবিন্ ইলী শয়্'ইন্ মিন-ল্-ঃহয়্‌ফি।
সক্‌কা-নী—মিথ্‌ল মা য়শ্‌রিবু ক-ফিা'লি-দ্‌-দ্বয়্‌বি বি-দ্‌দ্বয়্‌ফি।
ফ-লম্‌মা দারতি-ল্-কাসি, দা'আ বি-ন্-ত্‌ই ব-স্-সয়্‌ফি।
ক-ণী মন্ য়শ্‌রিবু-র্-রাঃহ, মা'অ-ত্-তিন্নীনি ফী-স্-সয়্‌ফি॥

"আমাব বন্ধু,—সে দয়ামায়ার কোনও-কিছুর সহিত সম্বন্ধের বাইরে। আমায় সে পান করালে যেন যা সে নিজে পান করে, যেমন বন্ধু অতিথি-বন্ধুর সঙ্গে করে। সুরা-পাত্র ঘুরে' আসবার পরে, সে আনিয়ে' নিলে মাথা-কাট্‌বার জন্য চামড়ার আসন (নত্‌ত), আর তলোয়ার। এমনি-ই তার ঘটে, যে সুরাপান করে মহানাগেব সঙ্গে, গ্রীষ্মকালে॥"

("তিন্নীন্" অর্থে Dragon বা 'মহানাগ'; অধ্যাপক মাসিঞঁ-র মতে, সূফী দর্শনের ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ, ইহার আভ্যন্তর অর্থ হ'তেছে "য়কীন" অর্থাৎ 'স্থির বা ধ্রুব সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর'। শেষ ছত্র আমাদের ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৬ সূক্তের শেষ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধ মনে করাইয়া দেয়—"কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্ রুদ্রেণাপিবৎ সহ"—'যেহেতু, কেশী অর্থাৎ দিব্যোন্মাদযুক্ত দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী, রুদ্রের সঙ্গে এক-পাত্রে বিষপান করিয়াছেন।')

ইহার পরে, হল্লাজ যথারীতি নমাজ পড়েন, এবং সঙ্গীদের উপদেশ ও উৎসাহ দেন। চাবুক মারার কালে প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে "আহাদ! আহাদ্" (অঃহদ্, অঃহদ্) অর্থাৎ 'এক। এক!' (একমেবাদ্বিতীয়ম্) এই বীজমন্ত্র বলিতে থাকেন। হাত পা কাটিয়া ফেলিবার পরের দিনও ইনি সজ্ঞান অবস্থায় জীবিত থাকেন, এবং এই ধরণের কথাবার্তা করেন ও উপদেশ দেন বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শিগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হুসয়্ন বিন্-মন্সুর অল্-হল্লাজকে স্ফী সাধকমালার মধ্যমণি বলা যায়। তাঁহার তিরোধানের পরে স্ফী মত-বাদ—দর্শন ও চিন্তা—বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। মন্সুর অল্-হল্লাজ ও তাঁহার পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক সত্য-দ্রষ্টাদের অনুভূতির আধারে, পরবর্তী যুগের mystic বা 'মরমিয়া' কবি ও দার্শনিকগণ ইরাকে, আরবে, শাম বা সিরিয়ায়, মিসরে, মগরেবে ও স্পেনে এবং রূম বা তুর্কীস্থানে, ঈরানে, মধ্য-এশিয়ায় ও ভারতবর্ষে, আরবী এবং ফারসী ভাষায় কাব্য ও কবিতা এবং বিচার-পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া, বিরাট্ এক স্ফী সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন। মুসলমান ধর্মে ৭২টি সম্প্রদায় আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রায় সব সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে তস্বর্রুফ্ দেখিতে পাওয়া যায়; শরিয়তের সঙ্গে, কোরান ও হদীস-এর সঙ্গে, এই স্ফী অনুভূতির নানাভাবে আপসের চেষ্টা হয়। একটি আপস এইভাবে হইয়াছে। ভগবানের বাণী আরবী কোরানে প্রচারিত হইয়াছে—কিন্তু এই আরবী কোরান হইতেছে 'জাহিরা' অর্থাৎ প্রকাশিত কোরান; ইহা ব্যতীত এক 'গায়েবী' (ঘয়্বী) বা গুপ্ত কোরান আছে, তাহা হইতেছে গুরু-মুখে প্রাপ্ত স্ফী-বাদ। স্ফী সমাজে গুরুর (পীর বা মুর্শিদ-এর) স্থান অতি উচ্চে, আমাদের আধুনিক হিন্দু-সমাজে যতটা আছে বা ছিল, প্রায় ততটা।

স্ফী অনুভূতি ইস্লামের মধ্যে এক অভূত-পূর্ব কোমলতা ও ভাব-প্রবণতা আনিয়া দিয়া, ইহাকে বিশ্বমানবের দৃষ্টিতে সুন্দরতর ও শোভনতর করিয়া দিয়াছিল। অল্-গজালীর মতো দার্শনিক সেই কথা প্রণিধান করিয়া প্রাথমিক ইস্লামের সঙ্গে তস্বর্রুফের বিরোধকে যুক্তি-তর্ক ও বিচার দ্বারা মিটাইয়া দিয়াছিলেন। স্ফী মতের সহিত অন্য ধর্ম-মতের বিরোধ নাই; সকল ধর্মের মধ্যে এক-ই সার সত্য বিদ্যমান, সকল ধর্ম-ই ঈশ্বর-লাভের পথ, হিন্দু ধর্মের অনুমোদিত এইরূপ মনোভাব স্ফী সাহিত্যে সুস্পষ্ট; ইস্লামের মধ্যে স্ফীরাই এই কথা সাহসের সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। সর্ব জাতির মধ্যে বিদ্যমান ঈশ্বর-লাভের চেষ্টাকে সহানুভূতি-শীল, কবি ও ভাবুকের দৃষ্টিতে স্ফীগণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। ইব্নু-ল্-ফরীদ্, ইবনু-ল্-'অরবী, হকীম সনাঈ, মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী, শম্সুদ্দীন হাফেজ, নূরুদ্দীন জামী—ইঁহারা মানুষকে নূতন স্বর্গ দেখাইয়াছেন; তাহার মনের ও আত্মার সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া, তাহাতে জিন্নৎ বা ফির্দৌসের অর্থাৎ অমরার হাওয়া বহাইয়াছেন;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সমগ্র মানব-জাতির জন্য ইঁহারা ভাবুকতার, সৌন্দর্য্যের ও আধ্যাত্মিক আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সূফী পণ্ডিতেরা, দর্শন-শাস্ত্রের সাহায্যে বিশেষ খুঁটি-নাটির সঙ্গে সূফী অনুভূতি ও উপলব্ধি, কল্পনা ও কাব্যের প্রসারণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ প্রভৃতি করিয়া, জিনিসটিকে সাধারণ মানুষের পক্ষে হয়-তো একটু জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই: সাধারণ মানুষের জন্য তস্বর্‌র্‌ুফের মূল কথাগুলি আছে, অল্-হসয়্‌ন্ ব্‌ন্-মন্‌স্বর অল্-হল্লাজের জীবনী আছে, রাবেয়া ও অন্য সূফীদের উক্তি আছে, ইব্‌ন্-ল্-ফরীদ্, ইব্‌ন্-ল্-'অরবী, ফরীদুদ্দীন অত্তার, মৌলানা রূমী, হাফেজ ও জামীর আরবী ও ফারসী কবিতা আছে। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অনুভূতিতে বিশ্বমানবকে মুসলমান আরব ও পারস্যের ইহা-ই শ্রেষ্ঠ দান; ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বলিয়া ভারতেও আমরা, মিসর শাম ইরাক আরব ও পারস্যের ইস্‌লামের এই উপহার পাইয়া, সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, ও তদ্দ্বারা আমাদের নিজেদেরও আধ্যাত্মিক সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পারস্যের অন্তিম সূফী মহাকবি নূরুদ্দীন জামী(১৪১৪—১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ)-রচিত সূফী-মত-সার-সংগ্রহ স্বরূপ Lawā'iḥ "লবা'ইঃহ্" অর্থাৎ 'রশ্মিরাজি' বা 'কিরণাবলী' নামক গ্রন্থ হইতে গদ্যময় একটি প্রার্থনা অনুবাদ করিয়া দিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি (ইহার আরম্ভ আরবীতে, বাকী সমস্তটুকু ফারসীতে)—

"হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া রচিত থাকা হইতে আমাদের মুক্ত করো; এবং সমস্ত বস্তুর সত্য স্বরূপকে আমাদের দেখাও (র 'অরি-না ঃহকা'ইক-ল্-'অশ্‌য়া'ই ক-মা হিয়)। আমাদের বিচার-চক্ষুর উপরে যে গাফিলতীর (অমনোযোগের) পরদা পড়িয়াছে, তাহা সরাইয়া দাও, এবং প্রত্যেক বস্তু, যেমনটি আছে তেমনি আমাদের দর্শন করাও। নাস্তি বা অসৎকে আমাদের নিকট অস্তি বা সতের রূপে প্রকাশিত করিও না (নীস্তী-রা বর্‌ মা দর্‌ স্বরত্-ই-হস্তী জল্‌বহ্‌ ম-দিহ্), এবং সতের সৌন্দর্য্যের উপরে অসতের পরদা রাখিও না (র অজু্‌ নীস্তী বর্‌ জমাল্-ই-হস্তী পরদহ্‌ ম-নিহ্)। পরিদৃশ্যমান রূপ-সমূহকে তোমার সৌন্দর্য্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রতিচ্ছায়া (আয়না, আরশী) করো, এগুলিকে আবরণের এবং দূরত্বের কারণ করিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না, এবং এই-সকল মায়াময় কাল্পনিক চিত্রকে আমাদের জ্ঞান ও সত্য-দর্শনের সাধন করিয়া দাও—এগুলিকে অজ্ঞান ও অন্ধত্বের সাধন করিও না। আমাদের সব অভাব ও সব দূরীভবন (প্রবাস) আমাদের নিজের হইতেই ঘটে; আমাদের নিজেদের মধ্যে আমাদিগকে ফেলিয়া রাখিও না, বরং আমাদিগ-হইতেই আমাদের মুক্তি দাও, এবং আমাদিগকে তোমায় জানিতে দাও॥"

এই প্রার্থনাটি যেন উপনিষদের "অসতো মা সদ্ গময়" মন্ত্রের একটি অনুভূতিময় ব্যাখ্যা।

মন্তব্য।—আরবী ব্যঞ্জনবর্ণের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণ, এই রীতি অনুসারে আরবী শব্দ ও বাক্যগুলিতে করা হইয়াছে :—[', ব, ত, থ, জ, ঃহ, খ, দ, ধ, র, জ, স, শ, স্ব, দ্ব, ত্ব, ধ্ব, †, ঘ, ফ, ক্ক, ক, ল, ম, ন, ব, হ, য়, ৎহ বা ৎ]।

[বঙ্গাব্দ ১৩৫০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত

আবু রয়্হান মুহম্মদ ইব্ন্ অহ্মদ অল্-বীরূনী (অথবা অল্-বেরোনী) ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক খীবা রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের গজনী নগরে ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ে খীবা রাজ্যের নাম ছিল Khwarizm খ্বারিজ়ম্, এবং প্রাচীনকালে গ্রীকেরা এই দেশকে Chorasmia 'খোরাস্মিয়া' বলিত। অল্-বীরূনী মধ্যযুগের এক অতি বিরাট্ পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত। এই বহু-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত একাধারে গণিত এবং ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং দর্শন, রসায়ন এবং ঐতিহাসিক কাল-নির্ধারণ, ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, প্রভৃতি প্রায় তাবৎ বিদ্যায় সমান ভাবে পারদর্শী ছিলেন। উপরন্তু তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ভারত-বিদ্যাবিৎ ছিলেন, এবং তাঁহার মতো ভারত-সম্বন্ধে এত বড়ো পণ্ডিত, বিদেশীদের মধ্যে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একদিকে ছিল তাঁহার সূক্ষ্ম ও সর্বগ্রাহী পাণ্ডিত্য, আর অন্যদিকে ছিল তাঁহার এক প্রশস্ত উদারতা বস্তুনিষ্ঠতা; এই উভয়বিধ গুণের জন্য অল্-বীরূনীকে সমগ্র মানবজাতির প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। বিখ্যাত জর্মান পণ্ডিত Elward Sachau এডুয়ার্ড জ়াখাউ, যিনি অল্-বীরূনীর দুইটি মুখ্য গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার নিকট আধুনিক জগৎ অল্-বীরূনীর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় পুস্তকের আরবী-ভাষার মূল এবং ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের জন্য বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ থাকিবে, তিনি (এডুয়ার্ড জ়াখাউ) অল্-বীরূনীর পাণ্ডিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবত্তা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। (মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, লণ্ডন হইতে, এবং ইংরেজী অনুবাদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। জ়াখাউ পণ্ডিত ও মানুষ হিসাবে অল্-বীরূনীর সকৃতির যে সশ্রদ্ধ প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন, সে প্রশস্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রাপ্য; উপরন্তু, ধীর বাচংযমতার জন্য যে প্রশস্তি সকলেরই মনে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা—এবং সর্বোপরি, অল্-বীরূনীর গ্রন্থের স্বকীয় মহত্ত্ব—এই-সকল মিলিয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অল্-বীরূনীর আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। অল্-বীরূনী, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, আরও বেশি করিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য, কারণ তিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রথম বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকার-রূপে দেখা দেন। মনে হইতেছে যে, এখন এতদিন পরে অল্-বীরূনী তাঁহার উচিত সমাদর কথঞ্চিৎ লাভ করিবেন; কারণ তাঁহার তিরোধানের প্রায় ৯০০ বৎসর পরে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে প্যারিসে যে একবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্-মহাসম্মেলন হয়, তাহাতে "অল্-বীরূনী সহস্রবার্ষিকী" উদ্‌যাপন করা হয়; তাহার পরে কলিকাতায় ঈরান-সমিতির উদ্‌যোগে অল্-বীরূনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যদিও অল্-বীরূনীর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য গভীর ও বিস্তৃত ছিল, কেবল তাহারই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তিনি কেবল নিছক পণ্ডিত ছিলেন না, ইহার চেয়ে তিনি আরও বড়ো ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়ধর্মী মানুষ; তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, সম্পূর্ণ অন্য বাতাবরণের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে এমন অন্য একটি জনগণের সভ্যতাবিষয়ক কৃতিত্বকে কখনো লঘু করিয়া দেখিতে দেয় নাই। বিশেষ-শাস্ত্র-নিবদ্ধ গোঁড়া-মতের ধর্মের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী—যাহা সত্যকে কেবল নিজেরই আয়ত্ত বলিয়া মনে করে, এবং অন্য ধর্ম-মতকে সেই এক-ই সার-সত্যের সন্ধানে সহযাত্রী-রূপে দেখিয়া সহানুভূতির সহিত তাহার আলোচনা ও প্রণিধানের পক্ষে যাহা প্রায়-ই অনুকূল নহে—অল্-বীরূনীর মন সেইরূপ সংকীর্ণতা হইতে বিশেষভাবে মুক্ত ছিল। সত্য বটে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অল্-বীরূনীর পুস্তকের সম্পূর্ণ আরবী নামকরণ হইয়াছিল একজন গোঁড়া মুসলমান-ধর্মে-বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকোণ হইতে, যথা—"যাহা স্বীকার্য্য এবং যাহা বর্জনীয়, এইরূপ উভয়বিধ বস্তু লইয়া হিন্দুচিন্তার সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের এক যথাযথ বর্ণনা" (কিতাব···ফী তহ্‌কীক মা-ল্‌-হিন্দ্ মিন্ মক্‌ূলহ্ মুকবূলহ্ ফী-ল্-আকল্ অউ মিরূ্‌লহ্), তথাপি এই পুস্তক বাগ্‌বিতণ্ডাময় অথবা প্রচার-মূলক নহে, এবং বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণকে অন্য সমস্ত দৃষ্টিকোণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে নাই। হিন্দুরা ঐ সময়ে জীবন-সংগ্রামে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তুর্কীদের নিকট হারিয়া যাইতেছিল, এবং সেইজন্য বাহির হইতে আগত একজন বিশ্বাসী মুসলমান ও উপরন্তু পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার মনে যে হিন্দুদের তুলনায় স্বজাতির সম্বন্ধে একটি সহজবোধ্য শ্রেষ্ঠতার ভাব থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক ছিল। এইজন্য হয়-তো ইনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এবং সহজভাবে একথা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, তাঁহার ইস্‌লামী মনোভাব, হিন্দু মনোভাব অপেক্ষা আরও অধিক আন্তর্জাতিক ও যুক্তিতর্কানুমোদিত বলিয়া, উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই বোধ সত্ত্বেও, তিনি তুলাদণ্ড সমান করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু-জগতে যে সমস্ত বস্তু এবং বিচার, অনুষ্ঠান এবং ভাবধারা, বৈজ্ঞানিক ও সহজবুদ্ধির মানুষ বলিয়া তাঁহার অনুমোদন লাভ করে নাই, তিনি সেগুলিকে কেবল beastly devices of the heathen "বিধর্মী বা কাফেরের পশুপ্রকৃতিক আচার-প্রণালী" বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। পৃথিবীর অন্য অংশের মানব-সমাজের মধ্যে, যেমন প্রাচীন গ্রীকদের অথবা প্রাচীন আরবদের মধ্যে, প্রচলিত অনুরূপ বিষয় বা বস্তুর নজির সংগ্রহ করিয়া তিনি ইহা প্রমাণিত করিতে সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন যে, এই-সব বিষয়ে হিন্দুরা ছিল সাধারণ মানবের মতোই। তাঁহার আরবী গ্রন্থের মুসলমান পাঠকবৃন্দের মনে যদি ভারতবর্ষের লোকেদের সম্বন্ধে ঘৃণা বা তুচ্ছতার ভাব দেখা দেয়, তিনি এই উপায়ে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-পূত মনের উপযুক্ত এই পৃথক্ বা ঊর্ধ্বে অবস্থান অথবা নৈর্ব্যক্তিকতা, এবং ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত অথবা জাতি-সংক্রান্ত বিষয়ে অপক্ষপাতিতা, অল্-বীরূনীর এই গুণ থাকার দরুন, ভারতবাসী আমাদের (বিশেষ করিয়া হিন্দুদের) তাঁহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং এই জন্য সমগ্র বিজ্ঞান-অনুশীলক পণ্ডিতসমাজেরও উচিত তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। মানবিকতার দিক্ হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, অল্-বীরূনীর এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিছক পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আরও অধিক মহার্ঘ্য বস্তু।

তাঁহার সময়ে অল্-বীরূনী ছিলেন একজন অদ্ভুত দৃষ্টির পণ্ডিত। যখন তিনি তাঁহার মানসিক জীবনের পূর্ণ পরিণতিস্তরে ছিলেন, ধরা যাউক অনুমানিক ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৯০০ বৎসরেরও অধিক কাল আগে, তখন নিঃসন্দেহ-রূপে তিনি সমগ্র জগতের মধ্যে সকলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চেয়ে বিদ্বান্ এবং সকলের চেয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বম্বর পণ্ডিত ছিলেন। সে সময়ে চীনদেশের এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দৃষ্টি কেবল চীন অথবা ভারতবর্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল ; এই দুই দেশের বিদ্বান্দের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যাঁহার মনে পশ্চিমের অর্থাৎ ইস্লামিক জগতের—তথা প্রাচীন গ্রীসের এবং প্রাচীন রোমের—বিরাট্ সভ্যতার সম্বন্ধে অল্পমাত্র ধারণাবও অবকাশ ছিল। ওদিকে ইতালি সমেত সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে ঐ যুগ ছিল এক অন্ধকারময় যুগ— লাতিন ভাষার মাধ্যমে একটু খ্রীষ্টান ধর্মের জ্ঞান, এবং প্রাচীন লাতিন লেখকদের দুই চারিখানি গ্রন্থ যাহার পাঠ অল্প কয়জন উৎসাহী পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত, এইটুকু-ই ছিল তখন পশ্চিম-ইউরোপে বিদ্যার পরিধি। পূর্ব-ইউরোপে খ্রীষ্টান গ্রীক অর্থাৎ Byzantine বা বিজান্তীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও তেমনি আরব ও অন্য প্রাচ্যদেশীয় জাতিব সাহিত্য অথবা সংস্কৃতির সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। মুসলমান আরব সাম্রাজ্য, সিরিয়া, মিসব, উত্তর-আফ্রিকা, স্পেনও সিসিলি-দ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, ইউবোপে বিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার উদ্ভব হইল। অল্-বীরূনীর মধ্যে এই আন্তর্জাতিকতা অসাধারণ-ভাবে দেখা দেয়। তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ফারসী ; কিন্তু তুর্কীভাষী খ্বারিজ্ম্ দেশের মানুষ ছিলেন তিনি, এবং পরে তিনি গজ্নী নগরের তুর্কীভাষী অভিজাত সমাজে বিচরণ করিতেন, এইজন্য তুর্কীভাষাও তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তাঁহার মতন জিজ্ঞাসু এবং সর্ববিষয়ে রসগ্রহণেচ্ছু পণ্ডিত, এই দুই ভাষার যতটুকু সাহিত্য হাতের কাছে পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, এমন অনুমান করা যায়। আরবী ভাষা তখন ছিল সমগ্র ইস্লামিক জগতের ধর্মশাস্ত্র এবং সংস্কৃতির ভাষা ; এই আরবী তিনি খুব ভালো রকমই জানিতেন—ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজী-লেখকগণের মধ্যে ইংরেজীর জ্ঞান যতটা গভীর ও ব্যাপক রূপে দেখা যায়, অল্-বীরূনীর আরবীর জ্ঞান অন্ততঃ ততটা ছিল, ইহা অনুমান করা সহজ ; সম্ভবতঃ তাঁহার আরবীর জ্ঞান আরও গভীর ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং বিজান্তীয় বা মধ্যযুগের খ্রীষ্টান গ্রীক, তথা সিরিয়ান, জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকটার সহিত, উপরন্তু গণিতে ও জ্যোতিষ-বিদ্যায় ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তারও একটা বড়ো অংশের সহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই আরবী ভাষায় অনুবাদের মারফৎ তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। বগদাদ-নগরে আরবের ইস্‌লামী সভ্যতার দ্বিতীয় যুগ হইতে, আরবী ভাষা, আরবদেশের আশ-পাশের দেশগুলিতে প্রাচীনতর যে-সমস্ত সভ্যতা ছিল, সেগুলিতে সঞ্চিত সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অল্-বীরূনী Plato প্লাতোন এবং Aristotle আরিস্তোতল-এর লেখা হইতে তাঁহাদের বক্তব্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন; এই প্রাচীন গ্রীক লেখকদের গ্রন্থের সহিত, সিরিয়ান ভাষায় অনুবাদের আরবী অনুবাদ হইতে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই ভাবে দুই হাত ঘুরিয়া আসিলেও, তিনি মূল দার্শনিকগণের ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য এবং উপযোগিতা ভালো ভাবেই বুঝিতেন। এদিকে আবার তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত কপিল ও ব্যাস হইতে, বরাহ-মিহির হইতে, সংস্কৃত পুরাণ-সমূহ হইতে নানা উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন—এবং আরও বড়ো কথা এই যে, এই ভারতীয় লেখকগণের মূল ভাষা তিনি জানিতেন—এবং এইরূপ জ্ঞান তাঁহার স্বজাতির মধ্যে নিতান্তই বিরল ছিল। ভারতীয় হিন্দু, আরব-ঈরানীয় ও তুরানীয় অর্থাৎ তুর্কী-সমেত সমগ্র ইস্‌লামীয়, উপরন্তু সোজাসুজি গ্রীক হইতে না হইলেও সিরীয় ও আরবী ভাষার মারফৎ প্রাচীন গ্রীসের—এতগুলি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্য জগতের সহিত তুল্য পরিচয় রাখা, আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০-এর দিকে, সরল বা সহজ ব্যাপার ছিল না; এবং যতদূর জানা যায়, সমগ্র সভ্য জগতে এইরূপ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সেই যুগে একজন মাত্র ছিলেন—তিনি হইলেন অল্-বীরূনী।

যে রাজার অধীনে অল্-বরূনী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে—তাঁহার ৪৪ বৎসর বয়স হইতে ৫৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—বাস করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মহামহিম গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ; কতগুলি রাজনীতিক ঘটনা-পরম্পরার কারণে, এই রাজার পক্ষে অল্-বীরূনীর একজন বিদ্যোৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, যদিও এইরূপ পৃষ্ঠপোষক হওয়া তাঁহার উচিত ছিল। কেন যে এইটি হয় নাই, তাহার কারণাবলী জ্বাখাউ বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহ্‌মূদের দরবারে, মহ্‌মূদের শত্রুপক্ষীয় অন্য রাজ্যের প্রতিভূ বা জামিন হিসাবে অল্-বীরূনী আসিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য নিশ্চয়ই সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত, কিন্তু রাজনীতিক কারণে তিনি উপযুক্ত সহায়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। গজনীর সুলতান মহ্‌মুদ এক অতি শক্তিশালী রাজা ছিলেন; অন্ধবিশ্বাস-পূর্ণ ধর্মীয় আগ্রহ এবং ধনরত্ন লুণ্ঠনের উগ্র প্রবৃত্তি, এই উভয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইয়াছিলেন; এই অভিযান-সমূহের দ্বারা তিনি প্রতিবেশী হিন্দুগণের সমূহ ও অনপনেয় ক্ষতি করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তিনি বধ করেন, এবং দাস করিয়া ধরিয়া লইয়া যান, এবং বহু নগর, মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেন, ও কোটি কোটি টাকা লুঠ করিয়া লইয়া যান। এই সকল অভিযানের ফলে, হিন্দু জনসমূহের মনে মহ্‌মুদ ও তাঁহার তুর্কী সেনার প্রতি কোনো অনুকূল বা মিত্রতার ভাব আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং হিন্দুদের মধ্যে "তুর্ক" এই নামটি, ভয়ের এবং ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়ানো স্বাভাবিক ছিল। ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে মহ্‌মুদ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। দেশের অধিবাসী প্রায় সকলেই হিন্দু হইলেও, এই ভাবে একজন মুসলমান রাজার অধীনে আসায়, এই দেশ এক "শান্তির দেশ" (দারু-স্‌-সলাম) হইযা দাঁড়াইল, যেখানে অবাধে মুসলমান ধর্মের প্রসার হইতে লাগিল, এবং যেখানে, সিপাহি হোউক অথবা পণ্ডিত হোউক, যে-কোনো মুসলমানের অবাধ চলাফেরা সহজ হইল। এইরূপ অবস্থা অল্‌-বীরূনীর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল—তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এবং সেখানে অবস্থান করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির আলোচনা করিবার এক বিশেষ সুযোগ পাইলেন। ইহার পূর্বে, জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচক-রূপে তাঁহার নিকট এই দুই বিজ্ঞানের বিষয়ে হিন্দুদের লেখা বই আরবী অনুবাদের মারফৎ যাহা পহুঁছিযাছিল, তাহা-ই তাঁহাকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাধ্য হইয়া তাঁহার নিজের দেশ খারিজ্‌মের জামিন-রূপে ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাকে গজনীতে থাকিতে হইল। তখন-ই সম্ভবতঃ হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সোজাসুজি জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ তাঁহার ঘটিল। ঐ-সময়ে গজনী-নগরী ছিল এশিয়া খণ্ডে অন্যতম বিশাল মুসলমান রাজ্যের কেন্দ্র; এবং মহ্‌মুদের মতো শক্তিশালী ও কৃতকর্মা শাসকের রাজধানী বিধায়, নিঃসন্দেহ-রূপে Near East বা অন্তিক-প্রাচ্য এবং মধ্য-এশিয়ার সমস্ত অংশ হইতে লোকে গজনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিত; গজনীর নানাজাতীয় জনসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষেরও অভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছিল না। বহু ভারতীয় সৈন্য ও শিল্পী, রাজা-রাজড়া ও পণ্ডিতলোক গজনীতে যুদ্ধবন্দী-রূপে ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে হয়তো ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়া ঘটিলেও, ভারতবর্ষে ঐ যুগে সাধারণ হিন্দুজনগণের এতদূর মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিয়াছিল যে, তাহারা নিজেরা তুর্কীদের নিকট হইতে বহুদূরে থাকার জন্যে অথবা অন্য কোনও কারণে বাঁচিয়া গেলেও, এই-সমস্ত হিন্দু যুদ্ধবন্দীদের বিদেশী ম্লেচ্ছ তুর্কীদের মধ্যে বাস করা, তাহাদের পক্ষে এক অমার্জনীয় ও অনপনেয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, এবং স্বসমাজে এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠ হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এ ছাড়া, আফগানিস্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস করিয়া আসিতেছে এমন হিন্দু প্রজাও ছিল, ইহারা ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মতো মূলোৎখাত হয় নাই; এবং মুসলমান তুর্কী শাসনের প্রথম যুগে এই হিন্দু প্রজাগণ, নিজেদের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। অনুমান করিতে পারা যায় যে, ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এবং আফগানিস্থানের হিন্দু প্রজা, এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এইরূপ সুবুদ্ধি লোক নিশ্চয়-ই ছিল, যাহারা তুর্কী রাজার জাতির একজন বিশিষ্ট ও সম্মানিত পণ্ডিতের মনে তাহাদের ধর্ম এবং চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতি ও আগ্রহ দেখিয়া খুশী-ই হইত। সম্ভবতঃ গজনীতে বসিয়াই অল্-বীরূনী ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর চর্চা আরম্ভ করিয়া দেন, এবং গজনীতে তিনি সংস্কৃত তথা পশ্চিম-পাঞ্জাবের কথ্যভাষা (যাহা সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল) শিখিতে আরম্ভ করেন। পাঞ্জাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, সম্ভবতঃ তিনি পশ্চিম-পাঞ্জাবের কোনো-কোনো স্থানে গিয়াছিলেন, এবং এই-সব স্থানে তিনি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। ঐ সময়েই মূলতান-নগরী হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। বহুদূর হইতে হিন্দু যাত্রীরা মূলতানের সূর্য্যমন্দিরে আসিত, এবং এরূপ একটি তীর্থস্থানে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম অর্ধ ধরিয়া সংস্কৃত জ্ঞানের চর্চা কিছুটা থাকা সম্ভব ছিল। অল্-বীরূনী মূলতানে হয়-তো কিছুকাল অবস্থান করিয়া থাকিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অল্-বীরূনীর সংস্কৃতের জ্ঞান কি ধরণের ছিল, সে সম্বন্ধে জাখাউ তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু ইহা কার্য্যকর ছিল। ইতালীয় পণ্ডিত তমিলভাষাবিৎ Constantino Beschi কন্স্তান্তিনো বেস্কি, ফরাসী পণ্ডিত Abbe Dubois আবে দ্যুবোআ, ও প্রথম ইরেজ সংস্কৃতজ্ঞ Charles Wilkins চার্ল্স্ উইল্কিন্স্ ও William Jones উইলিয়াম জোন্স্-এর সময় হইতে, ভারতে বসিয়া যে-সমস্ত ইউরোপীয় সংস্কৃতবিদ্ গবেষণার কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের মতো অল্-বীরূনী-ও সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রী বা পণ্ডিতের সহায়তা লইয়াই কার্য্য করিতেন। অনুমান হয, অল্-বীরূনী তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ সহায়ক বা সহকর্মীর উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই-রূপ পণ্ডিতগণ, যে-সমস্ত গ্রন্থপাঠ তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল, সেগুলির অনুবাদ করিযা দিয়া তাঁহার সহায়তা করিতেন—এই অনুবাদ, নিশ্চয়-ই উভয় পক্ষের পরিচিত কোনো ভাষাতেই হইত, এবং সেই ভাষা নিশ্চয় ছিল, হয পশ্চিম-পাঞ্জাবের কথ্যভাষা যাহা অল্-বীরূনী কিছুটা শিখিয়া লইয়াছিলেন, অথবা ফারসী ভাষা। ইহা-ই তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যেব প্রধান আধাব ছিল। তবে তিনি নিজেও এইরূপ অনুবাদের অথবা ব্যাখ্যার সাহায্য লইয়া কোনো-কোনো মূল সংস্কৃত বই পডিযা থাকিবেন, তবে মুখ্যতঃ এই-সকল অনুবাদের আধারে তিনি ফারসী বা আরবীতে তাঁহার মাল-মশলা সংগ্রহ করিযা থাকিবেন। কথিত আছে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষাতে কতকগুলি পুস্তক অনুবাদ বা রচনা করেন, এবং এ ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয পণ্ডিত তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন—বিষয়-বস্তু বা আশয় মুখে-মুখে শুনিয়া এই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শ্লোকে অল্-বীরূনীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। জাখাউ সংস্কৃত ভাষায় অল্-বীরূনীর কৃতিত্বের অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত মূলের সহিত তাঁহার আরবী অনুবাদ মিলাইয়া অল্-বীরূনীর কৃতিত্ব কত দূর এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অধিকারের সীমা কত দূর ছিল, তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান্ জর্মান পণ্ডিত, যিনি একাধারে অদ্ভুতভাবে আরবী ও সংস্কৃত দুইটি-ই দখলে আনিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ আলোচনা কম কথা নহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঈরানের ইতিহাসে, সাসানায় সম্রাট্‌দের যুগে (২২১-৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ) খানকয়েক সংস্কৃত পুস্তক মধ্য-যুগের ফারসী ভাসা পহ্লবীতে অনূদিত হইয়াছিল। পরে এই-সব বই পশ্চিমের ভাষা সিরিয়ান, আরবী ও গ্রীকে পহ্লবী হইতে অনূদিত হয়। আরব মুসলমান আব্বাস-বংশীয় খলীফা বা রাজাদের রাজত্ব-কালে বগ্‌দাদ-নগরে গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে কতকগুলি সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়, সেই অনুবাদ এই-সকল সাসানী অনুবাদের ধারা অনুসরণ করিয়াই হয়। ঈরান ও পশ্চিম-এশিয়াতে ভারতবর্ষের চিন্তার প্রচারের এই ধাবা, গ্রীকদের যুগ এবং তাহার আগেও গিয়া পহুঁছায়। কমপক্ষে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক হইতে কতকগুলি ভারতীয় পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসী (ইঁহারা প্রায় সকলেই ভবঘুরে'-প্রকৃতির ছিলেন, এবং বিদেশ-যাত্রার অসুবিধা ও বিপদ্‌কে ইঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না—এই ধরণের ভ্রমণশীল ভারতীয় পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী এখনও ভারতের বাহিরে মাঝে-মাঝে দেখা দেন) পশ্চিমের দেশসমূহে পর্য্যটন করিতে যাইতেন এবং গ্রীস পর্য্যন্ত গিয়া পহুঁছিতেন। ইঁহারা বিদেশে রসজ্ঞ সমানধর্মা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিতেন, এবং আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ব্যাপারে ইঁহারা নিজেদের বিচার-ধারা লইয়া আলোচনা করিতেন। এইরূপ অন্ততঃ একজন ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের কথা গ্রীক-সাহিত্যে আমরা পাই; ইনি খ্রীঃ-পূঃ ৪০০-এর পূর্বে আথেন্স-নগরীতে গিয়াছিলেন এবং গ্রীক দার্শনিক Sokrates সোক্রাতেস্-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী বীর Alexander আলেক্সান্দর ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে Kalanos কালানোস্ অর্থাৎ "কল্যাণ" নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিতকে নিজের সঙ্গে লইয়া যান; কিন্তু এই পণ্ডিত বাবিলন পর্য্যন্ত যান, সেখানে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করেন। মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং অন্তিক-প্রাচ্যের কতকগুলি দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন—সিরিয়াতে, মাসিডনে, এপিরসে, মিসরে এবং উত্তর-আফ্রিকায় কিরেনে বা সাইরিনি দেশে। সম্ভবতঃ এই-সকল ব্যক্তি ভারতীয় দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে মৌখিক উপদেশ দিতেন, এবং এই উপদেশেরই আধারে গ্রীক ও সিরিয়ান জগতের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরা ভারতীয় চিন্তাজগৎ সম্বন্ধে অল্প-কিছু সংবাদ পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সকল পণ্ডিত, প্রাচীন পারসীক, সিরিয়ান অথবা গ্রীক প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষায়, সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ অথবা রূপান্তরিত করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই; এইরূপ কোনো বই অনূদিত হইয়া থাকিলেও, টিঁকিয়া যাইতে পারে নাই—এবং এই প্রকারের কোনো বইয়ের উল্লেখও পাওয়া যায় নাই। ইহার পরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন ঈরানের পরাক্রান্ত সাসানীয় রাজবংশ, ভারতবর্ষে ইহার সমসাময়িক আর্য্যাবর্তের গুপ্ত সাম্রাজ্যের এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্য সাম্রাজ্যের রাজবংশের সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে, তখন হইতে সাসানীয় রাজাদের আনুকূল্যে পহ্লবী ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থসমূহের অনুবাদ রীতিমত ভাবে হইতে থাকে। (ইতিপূর্বে অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায় মধ্য-এশিয়ার ঈরানী ভাষায়—প্রাচীন খোতনী ভাষায় এবং চুলিক বা Sogdian সোগ্‌দীয় ভাষায়—বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ-কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রভাব ঈরানের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজ-দরবারে, তেমন করিয়া পড়িতে পারে নাই।) বিরাট্ এবং শক্তিশালী সাসানীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরবের দিনে, ঈরান-দেশে এক নবীন মানসিক ও সাহিত্যিক পুনর্জাগৃতি আরম্ভ হইয়াছিল; এবং ঠিক সেই সময়েই, একদিকে গ্রীক ও সিরিয়ান ভাষা হইতে যেমন চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ হইতে থাকে, তেমনি অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থেরও পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ হইতে আরম্ভ করে। পহ্লবী ধর্ম-গ্রন্থ Den-kart "দেন-কর্ত" হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে গ্রীস হইতে দার্শনিক পণ্ডিত (pat Hrōm Filisōkfāy অর্থাৎ রোম বা বিজান্তিয়ম হইতে আগত দার্শনিক) সুপ্রাচীন গ্রীস বা হেল্লাস্-এর এবং অর্বাচীন রোমান-প্রভাবিত বিজান্তীয় গ্রীসের বিদ্যা (Yonāyīk এবং Hromāyīk অর্থাৎ য়োন বা যবন বা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় বা অর্বাচীন গ্রীক—এইভাবে সাসানীয় যুগে ঈরানীয়গণ গ্রীকবিদ্যায় এই পরম্পরা নির্দিষ্ট করিয়াছেন) ঈরান-দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই উপায়ে ঈরানের মন ও ইহার সাহিত্য, এই উভয়কে, তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদের দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তুলেন। অনুরূপ কতকগুলি ভারতীয় জ্ঞানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(pat Hindūkan damāk) সাসানীয় রাজাদের সভায় তাঁহাদের গুণের জন্য এবং তাঁহাদের দর্শন ও বিজ্ঞানের জন্য আদর প্রাপ্ত হন; কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদের কথাও আমরা জানিতে পারি। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, H.W. Bailey-কৃত বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ Zoroastrian Problems in Ninth-Century Books—Ratanbai Katrak Lectures, Oxford, 1943, পৃষ্ঠা ৮০-৮৬।) এই-সমস্ত বইয়ের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান (Kalatak u Damnak অর্থাৎ 'করটক ও দমনক', পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত এই দুই বৃষের কাহিনী) পাওয়া যায়, এবং trk' অর্থাৎ তর্ক-শাস্ত্রের বইয়ের অনুবাদের কথা জানা যায়। যে-সকল ভারতীয় পণ্ডিত ঐ যুগে ঈরান-দেশে আসা-যাওয়া করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈরানের ধর্মীয় ও সামাজিক বাতাবরণ প্রতিকূল ছিল না—ঈরান-দেশের তখনকার দিনের জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম ও তাহার অগ্নি-প্রতীকের মাধ্যমে উপাসনা, ভারতীয় হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান বা আচারের সঙ্গে খাপ খাইত। সাসানীয় যুগে হিন্দুদের মধ্যে ছুঁৎমার্গের এত বাড়াবাড়ি দেখা দেয় নাই; এবং আর্য্য ও ম্লেচ্ছ, জাতিভেদ ও জাতিনাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা, তুর্কী মুসলমানদের আগমনের পরে ভারতে যতটা কঠোর হইয়াছিল, তখনও ততটা কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই; এবং এইহেতু অনুমান হয় যে, ঐ সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতেরা সহজে ঈরানে যাইতেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজে ঠেকা হইয়া থাকিতেন না। আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের জন্মের দুই-এক শত বৎসরের মধ্যে ঈরানীয় বা "মগ"-নামধারী পুরোহিতগণ (গ্রীকেরা ইহাদের Magos—Magoi বলিত) ভারতবর্ষে নূতন করিয়া "মিহির" নামে সূর্য্যদেবের পূজা লইয়া আসেন, এবং তাঁহারা হিন্দু-সমাজে "মগ-ব্রাহ্মণ" বা "শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত হন। ("মিহির" শব্দটি পহ্লবী Mihr-এরই ভারতীয় রূপ; সংস্কৃত "মিত্র" = অবেস্তা "মিথ্র", এবং ইহা হইতে পহ্লবী Mihr।) খ্রীষ্ট-পূর্ব কালে প্রাচীন যুগে এ-বিষয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ আরও উদার ছিলেন। কিন্তু ঈরান-দেশে ইসলামের মতো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, যে-ধর্মের সাধারণ অনুষ্ঠাতৃগণ অন্য কোনও জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি বা সমন্বয়ের ভাব রাখিত না এবং ইসলাম-বহির্ভূত প্রায় তাবৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধর্ম ও মত-বাদকে "কাফের" অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করিত —ঈরানের অবস্থা অন্য প্রকারের হইয়া দাঁড়াইল। যে স্বল্পসংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত বগ্‌দাদ-এর মতো মুসলমান-বহুল স্থানে যাইতেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা সেইখানেই থাকিয়া যাইতেন; এবং আমরা এই-রূপ ভারতবাসীর ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণের কথাও পাঠ করি। ইহা হইতে মনে হয় যে, যাহারা কোনো ক্রমে ইরাকের মতো মুসলমান-দেশে গিয়া প্রবাস করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বসমাজে পুনর্গৃহীত হওয়ায় বাধা ঘটিত, বিশেষতঃ যখন সে সময়ে হিন্দুভারত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান তুর্ক ও ঈরানীর সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

এই-সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও বিঘ্ন সত্ত্বেও, বিদেশ-ভ্রমণ বা বাণিজ্য উপলক্ষে পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলের বিদেশে গিয়া অবস্থানের এই প্রাচীন ধারা, সিন্ধু-প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে উৎসাহী ভারতীয় হিন্দু ও শিখ বানিয়ারা সে-দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছিল; তাহারা আফগানিস্থানে, মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্থানে (কাশগর, য়ারকন্দ, খোতন, সমরকন্দ প্রভৃতি নগরে), ককেসস্ অঞ্চলে (বাতুম ও বাকুতে, জর্‌জিয়ায়, আর্মেনিয়ায়), ইরাকে, সিরিয়ায়, মিসরে গিয়া বসবাস করিত, দেশের সহিত সংযোগও রক্ষা করিত, বিদেশে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের ধর্মও বজায় রাখিত।

গজনী-নগর ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হওয়ায়, এবং অল্-বীরূনীর মতো জিজ্ঞাসু পণ্ডিতের পক্ষে, তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান ও বিচার-ধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পাওয়া সহজ হওয়ায়, এই ঈরানীয় মহাপণ্ডিত, আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে, নিজে মুসলমান থাকা সত্ত্বেও, এবং সেই হেতু হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দু বিজ্ঞান ও দর্শনের রুদ্ধ-দ্বার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অল্-বীরূনী তাঁহার গ্রন্থে কুত্রাপি "সংস্কৃত" এই শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি একবারও "প্রাকৃত" ও "অপভ্রংশ" শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন নাই। মধ্যযুগে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল (এবং আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পর্য্যন্ত প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যমান আছে) যে, সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষাগুলি বস্তুতঃ পৃথক্ ভাষা নয়, পরন্তু এক-ই আর্য্য বা সংস্কৃত ভাষার দুই বিভিন্ন "পাঠ" বা রূপ; অল্-বীরূনীও ইহার অনুরূপ মত মানিয়া লইয়াছিলেন। কেবল ধ্বনি- বা উচ্চারণ-গত পরিবর্তন আনয়ন করিয়া, ও "সুপ্-তিঙ্" ও বিভিন্ন প্রত্যয়ে এবং ব্যবহৃত শব্দে অল্প-স্বল্প পরিবর্তন আনয়ন করিয়া, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষাকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা সহজ ছিল; এবং ইহার বিপরীতও অনুরূপ-ভাবে সহজ ছিল। অল্-বীরূনীর মৃত্যুর শত বৎসরের মধ্যে, উত্তর-ভারতে—সম্ভবতঃ কাশীতে—বসিয়া, লোক-ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য দামোদর পণ্ডিত নামে এক আচার্য্য "উক্তি-ব্যক্তি-প্রকরণ" আখ্যা দিয়া যে একখানি বই লেখেন, তাহাতে তিনি এই কথা-ই বলিয়াছিলেন: যেমন, "পতিতা ব্রাহ্মণী প্রায়শ্চিত্ত্য করিলে পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়া পায়", সেইভাবে প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার শব্দ ও রূপ সংস্কৃতে পুনরায় উন্নীত হইতে পারে। ঐ যুগে যেরূপ লোক-ব্যবহার ছিল, তদনুসারে, শুদ্ধ ব্যাকরণানুগত সংস্কৃত, এবং লোক-ভাষার প্রয়োগ অনুসারে বিকৃত সংস্কৃত, ইহাদের মধ্যে পূরা পার্থক্য অল্-বীরূনী রক্ষা করেন নাই। স্থানে-স্থানে তিনি শুদ্ধ সংস্কৃত রূপের পরিবর্তে, অথবা তাহার সঙ্গে-সঙ্গে, প্রাকৃত বা ভাষার রূপও দিয়াছেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ সম্বন্ধে আবার তিনি সব সময়ে অবহিত হন নাই। তাঁহার উচ্চারণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। ইহার একটা কারণ এ হইতে পারে যে, তিনি যে-সকল সংস্কৃত-জানা লেখক অথবা সহকর্মীর সহযোগিতা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হয়-তো এক-ই প্রকারের সংস্কৃত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে জাখাউ নিজেই এ কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইঁহারা ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক।

প্রশ্ন এই, এই-সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রধানতঃ ভারতের কোন্ অংশের লোক ছিলেন? জাখাউ অল্-বীরূনীর পুস্তকে ব্যবহৃত সমস্ত সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় নাম ও শব্দের সূচী দিয়াছেন—মূল গ্রন্থের আরবী লিপিতে লিখিত রূপ, এবং সেগুলির মূল সংস্কৃত রূপ, উভয়-ই। সে যুগে যে কুফী ছাঁদের আরবী লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহা নানা বিষয়ে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, অল্-বীরূনী এই অসম্পূর্ণ লিপির সাহায্যে সংস্কৃত শব্দের যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রতিলিখন দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে পশ্চিম পাঞ্জাবে সংস্কৃত ভাষার এবং স্থানীয় লোক-ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

অল্-বীরূনীর প্রতিলিখন বা প্রত্যক্ষর হইতে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণের হদিস আমরা পাই। তাঁহার প্রদত্ত শব্দগুলি হইতে আমরা বিশেষ এক মাত্র স্থানের উচ্চারণের প্রমাণ পাই না—শুধু পশ্চিম পাঞ্জাবের, অথবা মধ্যদেশ অথবা অন্তর্বেদের উচ্চারণ ইহা নয়, ইহার মুখ্য আধার হইতেছে—সংস্কৃত বানানের অনুসারী এক প্রকার উচ্চারণ, যাহাতে সংস্কৃতের লিপির প্রত্যেকটি বর্ণের সাধারণ সর্বজন-গৃহীত উচ্চারণের সহিত পরিচিত কোনও সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশীর প্রত্যক্ষর-করণের চেষ্টা দেখা যায়; এবং এই বিদেশী, বিভিন্ন প্রকারের প্রান্তীয় উচ্চারণের ধারা সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিফ-হাল ছিলেন না। অল্-বীরূনীর বইয়ে সাকল্যে ২৫০০-এরও অধিক ভারতীয় শব্দ আরবী লিপিতে লেখা পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যক্ষরীকরণে দুই দিক্ দিয়া ভুল-চুকের পথ মিলে। এক তো কুফী ছাঁদে আরবী লিপির একান্ত অসম্পূর্ণতা; এবং দ্বিতীয়, Schefer শেফর পুঁথি, যেখানিতে অল্-বীরূনীর ভারতবর্ষ-বিষয়ক গ্রন্থ রক্ষিত আছে, সেটি অল্-বীরূনীর নিজের হাতের লেখা পুঁথির ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নকল-করা প্রতিলিপি হওয়া সত্ত্বেও (খ্রীষ্টীয় ১০৩১ সালের প্রথমে অল্-বীরূনী নিজের লেখা সমাপ্ত করেন), নকল-নবিশ সংস্কৃত শব্দগুলির সহিত অপরিচিত থাকার দরুন, মূল পুঁথির অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষরে আরও ভুল-ভ্রান্তি আনয়ন করিয়াছেন। আজকালকার প্রচলিত আরবী (এবং ফারসী) লিপিতে নোক্তা বা বিন্দু দিয়া বর্ণের পার্থক্য প্রকাশিত হয়; যেমন, এক-ই অক্ষরে তলায় একটি বিন্দু দিলে "ব", তিনটি বিন্দু দিলে "প", এবং উপরে দুইটি বিন্দু দিলে "ত"। সেইরূপ আরও একটি বর্ণে বিন্দু না দিয়া যথাযথ লিখিলে ":হ"-ধ্বনি, উপরে একটি বিন্দু দিলে উষ্ম "খ", নীচে একটি বিন্দু দিলে "জ", ও তিনটি বিন্দু দিলে "চ"; তেমনি এই নোক্তার ব্যবহারের দ্বারা "দ" এবং উষ্ম "ধ", তথা "শ" এবং "স"—ইহাদের পার্থক্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অল্-বীরূনীর সময়ে প্রচলিত কুফী ছাঁদের আরবী লিপিতে এইরূপ নোক্তা বা বিন্দুর ব্যবহার বিরল থাকাতে, বিদেশী নামের পাঠ অতি কঠিন হইয়া দাঁড়ায় —যেমন পর-পর লিখিত অক্ষর তিনটি, ":হব্স্" পড়া যায়, আবার "জস্ন্"-ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পড়া যায়। অল্-বীরূনী, যতদূর এই Schefer শেফর পুঁথি বইতে দেখা যায়, নোক্তা ব্যবহারের দ্বারা ও অন্য চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা সংস্কৃত শব্দের ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, ভারতীয় ভাষার "প", "চ", "ত", "গ" প্রভৃতি কতগুলি বর্ণ বা ধ্বনির যথাযথ প্রতিলিখন সম্বন্ধে তিনি তেমন অবহিত হন নাই, এবং ভারতীয় ভাষার মহাপ্রাণ "খ", "ঘ", "থ", "ধ" প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লন নাই। তিনি সাধারণতঃ আমাদের ভারতীয় মহাপ্রাণ "ধ"-এর জন্য আরবী "ধাল" বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ এই আরবী বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজী this, then, bathe প্রভৃতি শব্দের th বা dh-এর মতো উষ্ম "ধ"-কারের উচ্চারণ। অল্-বীরূনী, কি ভাবে আরবী লিপিতে বিশিষ্ট ভারতীয় মূর্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির নির্দেশ করা যায়, তাহার পথ খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য তিনি "ট", "ড"-এর জন্য "ত", "দ" ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যেখানে শব্দের অভ্যন্তরে অবস্থিত "ড"-অক্ষর "ড়"-এর মতো উচ্চারিত হইত, সেখানে তিনি "র" ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন, krb="কুড়র", by'ry="ব্যাড়ি", drwr="দ্রবিড়", drmr="দ্রমিড়", n'ry="নাড়ী", byrwrj="বৈডূর্য", ইত্যাদি।*

অল্-বীরূনী কিন্তু মূর্ধন্য "ণ"-এর সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন, কারণ এই ধ্বনি এখনও পর্য্যন্ত সমগ্র পাঞ্জাবে—কি পশ্চিম-পাঞ্জাবে কি পূর্ব-পাঞ্জাবে —ও সিন্ধু-প্রদেশে প্রচলিত আছে, এবং উপরন্তু ইরানী-গোত্রের অন্তর্গত পষ্তো ভাষাতেও ইহা বিদ্যমান। কখনো-কখনো অল্-বীরূনী আরবী লিপিতে n+r বা r+n ব্যবহার করিয়া এই "ণ"-এর ধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; যেমন p'nrn="পাণিনি" (দুই এক স্থলে এই নাম ভুল-ক্রমে p'nrt লিখিতও হইয়াছে) এবং brnj="বণিজ্, রণিজ্";

*আলোচনার সুবিধার জন্য আমি এখানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আরবী-লিপির রোমান প্রতিলিখন অনুসরণ করিতেছি—মূল আরবীতে যেমন "হরকৎ" অর্থাৎ স্বরচিহ্ন সাধারণতঃ দেওয়া হয় না, এই প্রতিলিখনেও তদ্রূপ স্বরবর্ণ দেওয়া হইতেছে না; '='অলিফ", ʻ, "অলিফ হমজা"; b="বা (বে)"; t="তা (তে)"; θ="থা (বা সে)"; j="জীম"; c="চে"; h="হা (বা বড়ী-হে)"; x="খা (বা খে:)"; δ="ধাল (বা জাল)"; ġ="ঘে"; s' বা š ="শীন্"; s:="স্বাদ (বা সোআদ)"; d:="দ্বাদ (বা জ়াআদ)"; t:="ত্বা (বা তোএ)"; δ:="ধ্বা (জোএ)"; ŋ="অয়ন্": w="ৱাৱ (ওআও)"; y="য়া"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং কখনো-কখনো তিনি সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ ধরিয়া দন্ত্য "ন"-স্থানে মূর্ধন্য "ণ"-এর প্রতিলিখন করিয়াছেন—যেমন, bh'n, bh'nw = "ভানু", আবার bh'nr, bh'r = "ভাণু"। সংস্কৃত শব্দের হ্রস্ব বা দীর্ঘ ধ্বনি নিতান্ত অবহেলার সহিতই নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং বহুস্থলে হ্রস্ব স্বরধ্বনি দেখানোই হয় নাই, যেমন b'r = "বারু"।

অল্-বীরূনী তাঁহার প্রতিলিখনে বা প্রত্যক্ষবে সাধারণতঃ যে উচ্চারণ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা যাইতেছে। তিনি প্রায় সর্বত্রই সংস্কৃত অন্তঃস্থ "ব"-এর স্থলে b-, -b-, -b লিখিয়াছেন; শব্দের আদিতে কখনও w = "ব" লিখেন নাই, এবং অতি অল্প কয়েকবার ব-ফলার স্থলে অথবা শব্দের মধ্যে অবস্থিত "ব"-এর জন্য w লিখিয়াছেন। ব-ফলা বহুস্থলে আরবী প্রত্যক্ষরে প্রদর্শিত হয় নাই, এবং ইহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রাকৃত বা ভাষার অনুসারে উচ্চারণ ধরিয়া লিখিয়াছেন, যে-উচ্চারণে ব-ফলার দ্বারা পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব-ভাব আসিয়া যায় ও ব-ফলার উচ্চারণ হয় না। অল্-বীরূনীর প্রতিলিখনে "ব" = "ব"-এর নিদর্শন: blnb (= blmb) = "বিলম্বিন্"; 'bykt = "অব্যক্ত"; blbh = "বলভী"; prd অর্থাৎ brd = "বৃদ্ধি"; prk অর্থাৎ brk = "ব্রূক"; brn = "ব্রূর্ণ", ও "ব্ররূণ"; bdś = "বিদিশা"; b'lmyk = "বাল্মীকি"; b'mn = "বামন"; plb = "প্লব" (কিন্তু b'ndw অর্থাৎ p'ndw = "পাণ্ডব"); byn = byd + by'as = "বেদব্যাস"; t'mrbrn = "তাম্রবর্ণ"; śwyt = "শ্বেত", bywswt = "বৈবস্বত"; dṛśdbd = "দৃষদ্বতী"; rb = "রবি"; k'b = "কাব্য"; ইত্যাদি। সংস্কৃত "সরস্বতী" শব্দ দুই ভাবে লিখিত হইয়াছে—srst এবং srsft; "বৈশ্বানর" শব্দের প্রতিলিখন হইয়াছে byśf'nr, এবং "নন্দিকেশ্বর"-স্থানে লিখিত হইয়াছে nndkyśfr অর্থাৎ nrdkyśfr। এইখানে "শ্ব" ও "স্ব"-তে যে অন্তঃস্থ "ব" ব-ফলা রূপে আসিতেছে, তাহার "f"-রূপে উচ্চারণ আমরা দেখিতেছি—অর্থাৎ অঘোষ উষ্ম "শ"ও "স"-এর প্রভাবে পড়িয়া অন্তঃস্থ "ব" = v অঘোষ f-তে পরিবর্তিত হইত। ইহা একটু লক্ষণীয় ব্যাপার যে, অল্-বীরূনী গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া, অন্তঃস্থ ব-কার (w,v)-এর স্থানে বর্গীয় ব (b) লিখিয়াছেন। পাঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে কিন্তু প্রায় সর্বত্রই অন্তঃস্থ "ব" "ব"-ই রহিয়া গিয়াছে (v, w)—ইহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বর্গীয় "ব" অর্থাৎ b-তে পরিবর্তিত হয় নাই। অল্-বীরূনী কেন এইরূপ করিলেন? তাঁহার মনে কি এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের উচ্চারণ অপেক্ষা গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চারণ আরও প্রামাণ্য ছিল? অথবা তিনি এমন কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট এই বর্গীয় ব-উচ্চারণই (b-ই) শুনিয়াছিলেন, যাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল? ইউরোপীয় ভাষার দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি v-এর নির্দেশের জন্য মিসর-দেশে ও অন্যত্র আরবী লিপিতে আজকাল তিনটি নোক্তা-দেওয়া "ফা" বা "ফে" অক্ষর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, এবং অল্-বীরূনীর পুঁথিতে এই বিশেষ বর্ণটি-ও দুই-এক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, myv'r="মেরাড়"।

মধ্যযুগের ভারতে, ঠিক কখন তাহা আমরা জানি না, সম্ভবতঃ ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, যখন উত্তর-ভারতের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া পশ্চিমী বা শৌরসেনী অপভ্রংশ অন্যতম সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তখন সংস্কৃতের মূর্ধন্য "ষ"-য়ের "খ"-রূপে উচ্চারণও সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উচ্চারণ এতই সাধারণ হইয়া দাঁড়ায় যে, বহু স্থলে উত্তর-ভারতে লেখায় "খ"-বর্ণটির ব্যবহার হইত না, মূর্ধন্য "ষ" দিয়াই "খ"-এর কাজ চালানো হইত। পাঞ্জাবের গুরুমুখী লিপিতে নাগরী মূর্ধন্য "ষ"-ই এখন "খ"-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উচ্চারণ অতি সাধারণ থাকার দরুন, শাহ্-জাহানের পুত্র রাজকুমার দারা শিকোহ্ যখন ফারসী-ভাষায় সংস্কৃত উপনিষদের অনুবাদ করান, তখন "উপনিষৎ" শব্দটি ফারসীতে "উপনিখৎ" ('pnkht)-রূপেই লিখিত হয়। কিন্তু অল্-বীরূনী সাধারণতঃ সংস্কৃত মূর্ধন্য "ষ"-এর জন্যও ś-ই ব্যবহার করিয়াছেন: এবং "খ"-এর উচ্চারণ ধরিয়া আরবী লিপির "x" এবং "k"="kh"-ও অতি অল্প কয়েক স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন, skht="শিক্ষহিত" (উচ্চারণে śikkhahita "শিখ্যহিত"); এবং "নিষধ" শব্দটি, nxδh="নিখধ" এবং nśδ="নিষধ", এই দুই প্রকার উচ্চারণ ধরিয়া দুইভাবে লিখিত হইয়াছে; তদ্রূপ 'śryxyn="শ্রীখেণ"="শ্রীখেন", ghwk="ঘাষ', অর্থাৎ "ঘোখ"; bxw="বিযুর" (উচ্চারণে "বিখুর")। দর্শনীয়—pxkl'wt="পুষ্কলাবতী", pxkr="পুষ্কর"। এইরূপ বানান হইতে বুঝা যায় যে, অল্-বীরূনী মূর্ধন্য "ষ"-এর বিশুদ্ধ প্রাচীন উচ্চারণ (অর্বাচীন "খ"-উচ্চারণ নহে) প্রদর্শন করিবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের তালব্য "শ" প্রাকৃতের মধ্য দিয়া দন্ত্য "স"-এ পরিবর্তিত হইয়া যায়, এবং সংস্কৃত তৎসম শব্দেও তালব্য "শ"-এর এই দন্ত্য "স" উচ্চারণ সংক্রামিত হয়। কিন্তু অল্-বীরুনী মূল সংস্কৃতের তালব্য "শ"-এর উচ্চারণ বহু স্থলে ś অর্থাৎ "শীন্" অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একথা মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দী, পাঞ্জাবী, লহ্ন্দী (বা হিন্দ্‌কী) এবং সিন্ধী প্রভৃতি ভাষায়, তদ্ভব শব্দে মূল মূর্ধন্য "ষ" "খ" হয় নাই, দন্ত্য "স" হইয়া গিয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আদি-আর্য্য-ভাষার বা সংস্কৃতের "শ", "ষ", "স" প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া সর্বত্র দন্ত্য "স" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবে ও সিন্ধুর ভাষায় এই দন্ত্য "স"-এর স্থলে আমরা পাই "হ"; যেমন সংস্কৃতে "বিংশতি", "বিংশ"=হিন্দী "বীস" (bīs), কিন্তু পাঞ্জাবী "বীহ্" (wih); সংস্কৃত "দেশ" =হিন্দী "দেস্", সিন্ধী "ডেহ"; সংস্কৃত "মুষা"=মারাঠী "মুন্", পাঞ্জাবী "মুহ্"; সংস্কৃত "আষাঢ়"=হিন্দী "অসাঢ়", পাঞ্জাবী "হাড়"; সংস্কৃত "পৌষ" =হিন্দী "পোস, পুস", পাঞ্জাবী "পোহ্, পুহ্"; সংস্কৃত "ত্রাস"=পাঞ্জাবী "ত্রাহ"; ইত্যাদি। অল্-বীরুনীর প্রত্যক্ষরীকরণে তালব্য "শ" ও মূর্ধন্য "ষ"-এর স্থানে ś অর্থাৎ "শীন" অক্ষর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত: k'śy="কাশী", k'yśb =k'śyb="কাশ্যপ"; tś=তিষ্য; bbś, bhbś="ভবিষ্য", ; bh'rθbrś= "ভারথবর্ষ", থ-যুক্ত রূপ ("ভারতবর্ষ"-স্থলে); kśyr="ক্ষীর"; kśknd ="কিষ্কিন্ধ্যা"; kś="কুশ"; k'śt="কাষ্ঠা",; śnk="শঙ্খ"; śyś= "শেষ"; ś'ntn="শান্তনু"; śylst'pt="শৈলসুতাপতি"; śkt="শক্তি"; śślkś="শশিলক্ষ"; śś="শিষ্য"; ś'tr="শাস্ত্র"; śq="শক"; śkrbr= "শুক্রবার"; 'ś="ইষু", "আশা"; śr'bn="শ্রাবণ"; śrw="শরভ", "শরর"; śj=śc="শুচি"; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কতকগুলি অদ্ভুত বানান পাইতেছি, যেমন—tkrśl="তক্ষশীলা" (=tkśśl ?); pywrn="পয়োক্ষী; 'rt="অষ্ট"; m'nsrtg="মাংসাষ্টক"; pwr'rtk="পুরাষ্টক"—এই শব্দগুলিতে ś-স্থলে r পাইতেছি, ইহার কারণ ঠিক বুঝা যাইতেছে না; সম্ভবতঃ ইহা মূর্ধন্য "ষ"-এর বিকার-জাত কোনও ঘোষবদ্ উষ্ম ধ্বনি নির্দেশ করিবার চেষ্টায় হইয়া থাকিবে—ś (sh)-এর স্থলে z' (zh)-এর মতন ধ্বনি, এবং এই ধ্বনি সহজেই r বা "র" অক্ষরের মতো শুনাইতে পারে। (পূর্ববঙ্গের—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঢাকা বিক্রমপুরের—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উচ্চারণে আমি সংস্কৃত "কশ্চিৎ", "যক্ষশ্চক্রে" প্রভৃতি শব্দে "কর্চিৎ", "জৈখ্যর্চক্রে" এইরূপ শুনিয়াছি : পূর্ববঙ্গের এই "শ"-স্থানে "চ" উচ্চারণের মতো, অল্-বীরূনীও সংস্কৃত "ষ্ণ, ষ্ট"-স্থানে হয়-তো "র্ণ, র্ট" শুনিয়া থাকিবেন।) কতকগুলি স্থানে তালব্য "শ" এবং মূর্ধন্য "ষ" উভয়ের জন্য s "সীন" অক্ষর অর্থাৎ দন্ত্য "স" লিখিত হইয়াছে; জাখাউ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ অনবধানতা-বশতঃ ইহা হইয়া থাকিবে। nixrb="নিখর্"—এখানে সংস্কৃত অঘোষ মহাপ্রাণ "খ"-স্থলে অঘোষ উষ্ম x-ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওদিকে যেমন সংস্কৃত অন্তঃস্থ "র"-এর (w বা v-র) বর্গীয় "ব"=b-র উচ্চারণ পাইতেছি, সেইরূপ এদিকে অন্তঃস্থ "য়"-র (y-এর) বর্গীয় "জ"=j-উচ্চারণ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা লোক-ভাষার উচ্চারণের অনুসারী, এবং অল্-বীরূনী সাধারণতঃ এই বর্গীয় উচ্চারণ-ই মানিয়া লইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—jbn=j'wn="য়বন, যবন"; j'njblk="য়াজ্ঞবল্ক্য"; j'm="যাম্য"; j'dw="য়াদব"; 'jwdhh="অয়োধ্যা"; jnjw, Jujwy="*জঞ্জোঈ" (সংস্কৃত "যজ্ঞোপবীত" শব্দের পুরাতন পাঞ্জাবী রূপ); 'rjbhr="আর্যভট" (উচ্চারণে "আর্জভড"); 'rj'prt অর্থাৎ 'rj'brt, ও 'rj'wrt="আর্য্যাবর্ত"; jδśtr="যুধিষ্ঠির"; jm="যম"; 'rjk="আর্যক"; 'rjm—"অর্যমা"; jwz'n="য়োজন"; 'jrd'="আয়ুর্দা"; jwg="যুগ"; 'j'rj='c'rj="আচার্য"; njwt, nywtn="নিযুত"; p'rz'tr="পারিয়াত্র"; srjw="সরযূ"; srw="সরব্"("সরযূ" নামের প্রাকৃত রূপ); srjt="শর্যাতি"। সংস্কৃত "সহ্য" পর্বতের নাম δj-রূপে লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ অল্-বীরূনী বাঙ্গালার মতো "সজ্ঝ" এই-রূপ প্রাকৃত উচ্চারণ শুনিয়া লিখিয়াছিলেন।

অল্-বীরূনী সংস্কৃত "জ্ঞ" এই সংযুক্ত বর্ণের ভাষায় প্রচলিত উচ্চারণ "গ্যঁ" শুনিয়াছিলেন; এবং এই উচ্চারণ এখন প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত, দক্ষিণ-ভারতেও বহুস্থানে ইহা প্রসার লাভ করিয়াছে। তিনি "যজ্ঞ" শব্দ jgmn (="জগমঁ"?)-রূপে লিখিয়াছেন, এবং "যাজ্ঞবল্ক্য" শব্দ j'njblk এবং j'gbnlk এই উভয় পদ্ধতিতেই লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি সংস্কৃত "জ্ঞ"="জঞ"-স্থলে nj লিখিয়াছেন, এবং একস্থানে δn অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"শ্‌ন্"-ও লিখিয়াছেন : śnh=সংস্কৃত "জ্ঞ" । বহু স্থানে তিনি "ত"=t-এর স্থানে "দ"=d প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—mds, mts="মৎস্য" (উপরন্তু এই শব্দের প্রাকৃত "মচ্ছ" রূপও ধরিয়াছেন এবং এই রূপটির জন্য mj অর্থাৎ mc লিখিয়াছেন); 'dr="অত্রি" এবং "অদ্রি" (উপরন্তু "অত্রি"-র জন্য 'tr রূপও তিনি দিয়াছেন); 'dby—"আটব্য (=আডব্য)"; bds=bts= "বৎস"; ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে এবং তদ্‌বিষয়ে যে-মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাতে, কোন্ রীতি অনুসারে অল্-বীরূনী তাঁহার সময়ের প্রচলিত কুফী লিপিতে সংস্কৃত শব্দগুলিকে ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধান করা যাইবে। আরও কতকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় আছে, সেগুলি ভারতীয় ভাষায় উচ্চারণের ধারা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আরবী লিখন-প্রণালী, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিচার করিয়া ধরিতে হইবে। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর আশে-পাশে, যে-সময়ে নব্য ভারতীয়-আর্য্য ভাষাগুলি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, এবং যখন মধ্যযুগের এক অভিনব সংস্কৃত উচ্চারণের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির আলোচনায়, অল্-বীরূনীর পুস্তকে ভারতীয় শব্দের আরবী লিপিতে লিখন-প্রয়াস হইতে (এই প্রয়াসে নানা ভ্রম-প্রমাদ এবং লিপিকর-প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও) বহু তথ্য আমরা পাইতে পারি।†

অল্-বীরূনী ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে সাধারণ প্রচলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে পৃথক্ ছিল; অর্থাৎ লোকে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষায় কথাবার্তা কহিত, কিন্তু উচ্চ-সাহিত্যে সংস্কৃত ব্যবহার করিত। অল্-বীরূনী বিভিন্ন প্রকারের মধ্য-আর্য্য (অর্থাৎ প্রাকৃত বা অপভ্রংশ) অথবা নব্য-আর্য্য ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। তিনি সংস্কৃতেতর ভাষাগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ পশ্চিম-পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের হিন্দুদের ভাষা-ই শিখিয়া থাকিবেন, এবং এই দুইটি ঐ যুগে সম্ভবতঃ এক-ই ছিল, এবং

† এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য আমার লেখা প্রবন্ধ—Sanskrit in Perso-Arabic Script—A Sidelight on the Medieval Pronunciation of Sanskrit in Kashmir and North India, *Indian Linguistics*, Quarterly Bulletin of the Linguistic Society of India, Volume VII, Part 2, 1939, Calcutta, pp. 151-166.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সিন্ধু-প্রদেশের ভাষা ইহা হইতে বেশী পৃথক্ ছিল না। আভ্যন্তর-ভারতের অর্থাৎ "পছাহাঁ" বা পশ্চিমী-হিন্দী প্রান্তের, তথা "পূরব" অর্থাৎ মধ্য- ও পূর্ব-উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের ভাষাসমূহ, তথা গুজরাট-রাজস্থানের ভাষার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঐ যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশ, সমগ্র আর্য্য-ভাষী ভারতবর্ষে সংস্কৃতের পাশে একটি মুখ্য সাহিত্যের ভাষার মর্য্যাদা পাইয়াছিল। কোথাও কোথাও অল্-বীরূনী জ্ঞাতসারে তাঁহার বইয়ের মধ্যে, অপেক্ষিত সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে, উত্তর-পশ্চিমের কথ্য ভাষার রূপ ধরিয়াছেন, এবং তদনুসারে তিনি আরবী লিপিতে অক্ষরান্তর করিয়াছেন। এইরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণ- ও ধ্বনি-বিষয়ক অভ্যাস ও প্রবৃত্তি অনুধাবন করিতে পারি। প্রাকৃত হইতে লব্ধ "স"-এর ধ্বনি (যাহা সংস্কৃত "শ", "ষ", "স" হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল) এই ভাষায় "হ"-কারে পরিবর্তিত হইত—শব্দের মধ্যে, এবং কখনও-কখনও আদিতে। অল্-বীরূনী কর্তৃক ধৃত এইরূপ কয়েকটি শব্দ—krwh="*ক্রোহ"=সংস্কৃত "ক্রোশ"; by'h="*বিআহ, বিয়াহ=বিবাহ"=সংস্কৃত "বিপাশা"; ʾh'ry="*আহাড়ী"=সংস্কৃত "আষাঢিকা"; bhnd="বহন্দ"="বহন্দ"=সংস্কৃত "বসন্ত"; lwh'wr="*লোহাবর"="*হলাবর"=সংস্কৃত "শালাতুর"; dhyn="*দহী"=অপভ্রংশ "*দহরিঁঅ", সংস্কৃত "দশমিকা"; y'hy="*এআঅহী"=সংস্কৃত "একাদশিকা"; dw'hy="*দুবাহী"="দ্বাদশিকা"; তদনুরূপ trwhy, cwdhy, pnc'hy="ত্রিবহী, চৌদহী, পঞ্জাহী"="এয়োদশিকা, চতুর্দশিকা, পঞ্চদশিকা"। এই ভাষায়, আদ্য-ভারতীয়-আর্য্য অর্থাৎ সংস্কৃতের নাসিক্য বর্ণ+অঘোষ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, এই প্রকারের সংযুক্ত বর্ণ, নাসিক্য+ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়; এবং নাসিক্য বর্ণ+ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, দ্বিত্বরূপ নাসিক্য বর্ণে পরিণত হয়; যেমন, অল্-বীরূনীর উদাহরণ হইতে, সংস্কৃত "সাংখ্য"=s'ng="সাঙ্গ" অর্থাৎ "সাঙ্খ্য"; "বসন্ত"=bhnd "বহন্দ"; "সামন্ত"=s'mnd "সামন্দ"; "ত্রিপঞ্চাশিক"=trnj'y "ত্রিয়ঞ্জাহী"; এবং সংস্কৃত "ডোম্ব"=dwm="ডোম্ব"; সংস্কৃত "উদ্দণ্ডপুরী"='dnpr="উদ্দণ্ডপুরি"; তুলনীয়—আধুনিক পাঞ্জাবী "দন্দ্"=সংস্কৃত "দন্ত"; "চম্বা"=সংস্কৃত "চম্পক"; "চন্নণ"="চন্দন"; সিন্ধী "কাণ্ড"=

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কণ্টক", ইত্যাদি। পাঞ্জাবী "চন্নাব"="চন্নহা"=প্রাকৃত "চন্দহাআ", সংস্কৃত "চন্দ্রভাগা"; "চন্দহাআ"+ফারসী "আব্" (=জল), ইহা হইতে "চন্নাব, চনাব" নামের উৎপত্তি। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-র পূর্ব্বে আমাদের মহাভারতের উপাখ্যান সিন্ধুপ্রদেশে আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, এবং মহাভারতের এই আরবী রূপে "কুন্তী" qnd-রূপে লিখিত হইয়াছে, এবং এই qnd সিন্ধী ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভাষার রূপ "কুন্দি"-রই প্রত্যক্ষর। তদ্রূপ সংস্কৃত "পাণ্ডু"=প্রাকৃত "পণ্ডু", সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিমের ভাষায় ছিল "পণ্ন্", এবং এই "পণ্ন্"-রূপ আরবীতে fnn-রূপে লিখিত হইয়াছিল। এই ভাষাতে উপরন্তু আদি-আর্য্য-ভাষা বা সংস্কৃতের সংযুক্ত "ক্র", "ত্র" প্রভৃতি যথাযথ রক্ষিত হইয়াছিল; যেমন—সংস্কৃত "ক্রোশ"=krwh="ক্রোহ"; সংস্কৃত "তৃতীয়"=tryh="ত্রীয়"="ত্রিঈয়"।

এইভাবে দেখা যায় যে, অল্-বীরূনীর লেখা বইয়ের মধ্যে যে-সমস্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আরবী লিপিতে পাওয়া যাইতেছে, সেগুলি ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দের আরবী এবং অন্য বিদেশী ভাষায় এইরূপ প্রত্যক্ষরী-করণের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু।

•

অল্-বীরূনী সংস্কৃত হইতে আরবীতে কতকগুলি বইয়ের অনুবাদ করেন। কী কী বই তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়, এবং কোন্ পদ্ধতিতে তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয়ও জাখাউ দিয়াছেন। তাঁহার নিজেরই উক্তি প্রমাণে, তিনি উপরন্তু কতগুলি আরবী বইয়ের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার সহকর্মী ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। জাখাউ অল্-বীরূনীর মূল আরবী বইয়ের সংস্করণের ভূমিকায় ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ভারত-বিদ্যা বিষয়ে অল্-বীরূনীর কৃতি, সংস্কৃত হইতে আরবীতে কৃত অনুবাদ সমেত, জাখাউ উল্লেখ করিয়াছেন—এই-সমস্ত রচনা তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ "ভারত-বিবরণী" (অল্-তহ্‌কীক অল্-হিন্দ্)-এর বহির্ভূত। তিনি অন্ততঃ তিনখানি বইয়ের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন—গ্রীক গণিতবিদ্যাবিদ্ ইউক্লীড-এর জ্যামিতি-শাস্ত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লঘু সূত্র (Elements of Geometry), জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রীক ভৌগোলিক Ptolemy প্তোলেমি-র একখানি গ্রন্থ, এবং Astrolabe 'উস্তরলাব' অর্থাৎ সমুদ্রে দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের বিষয়ে রচিত তাঁহার নিজের একখানি পুস্তক। জাখাউ-এর উক্তি অনুসারে, "সম্ভবতঃ তিনি এই সকল বইয়ের অর্থ পণ্ডিতদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহার বক্তব্য তাঁহারা সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত করিয়া দিতেন।" অনুমান হয় যে, আরবী এবং ইসলামী বিজ্ঞান-গ্রন্থের এই-সকল সংস্কৃত অনুবাদের দ্বারা অল্-বীরূনী কাশ্মীর এবং আভ্যন্তর-ভারতের হিন্দু পণ্ডিতদের সহিত একটি যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-সমস্ত সংস্কৃত অনুবাদের অস্তিত্ব আর নাই।

একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে (ব্যাপারটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ ছিল), আমাদের মনে হয়, আমরা অল্-বীরূনীর হাত দেখিতে পাই, এবং ইহাতে অল্-বীরূনী কিভাবে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতেন তাহার একটা দিগ্‌দর্শন যেন পাই। উপরন্তু, এই ব্যাপারে অল্-বীরূনীকে দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অনুরাগী-রূপে, এবং প্রত্যেক জাতির পক্ষেই নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার যে আছে এইরূপ বিচারের মানুষ-রূপে।

১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহ্‌মুদ যখন স্বীয় রাজ্য জয় করিলেন, তখন অল্-বীরূনী তাঁহার দেশের জামীন-রূপে গজনীতে আসিতে বাধ্য হইলেন। মনে হয় যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কারণে সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, যদিও সম্ভবতঃ তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার কার্য্যের জন্য তিনি সুলতানের দরবারে কোনোরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বা দাক্ষিণ্য বা অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। সে যাহা হউক, তাঁহার সমসাময়িক এই পরাক্রান্ত সুলতানের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ হইবার কোনো কারণ তাঁহার ছিল না। উপরন্তু, তাঁহার গবেষণার কার্য্য চালাইবার জন্য সময় এবং অর্থ এই দুইয়ের-ই অভাব-হেতু তাঁহাকে যে প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইত, সে সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গজনীর সুলতান মহ্‌মুদের দরবারে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি কবি ফিরদৌসী; সুলতানের দাক্ষিণ্য-লাভের আশায় ইনি পারস্য-দেশের জাতীয় মহাকাব্য "শাহ্-নামা" বা 'রাজ-কথা' নামে বিরাট গ্রন্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সুলতানের নিকট হইতে আশানুযায়ী ও প্রতিশ্রুতির অনুরূপ অর্থ না পাইয়া বিশেষভাবে মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আন্তরিক সহানুভূতির অভাব এবং মহ্‌মুদের প্রধান মন্ত্রীর বিরোধিতা, এই দুই কারণে সুলতান মহ্‌মুদ তাঁহার সময়ের এই দুই মহান্ ব্যক্তির উপযুক্ত সমাদর করেন নাই, এবং অল্-বীরূনী ও ফিরদৌসী উভয়েরই পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

সুলতান মহ্‌মুদ একজন কৃতকর্মা শাসক ছিলেন। তিনি উদার-হৃদয় ও সত্যকার শূর-বীর ছিলেন, এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের একজন উচ্চদরের উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তিনি ইসলামের এবং তুর্কী জাতির ইতিহাসের দ্বিতীয় বীরযুগের ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলাম-ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল, তাহাতে একাধারে ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ এবং কাফেরের দেশ লুঠপাট করিয়া ধন-সংগ্রহের সহজ পন্থা, এই উভয়-ই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল। তাঁহার এক শতাব্দী পরে পশ্চিম-ইউরোপের Frank বা ফিরাঙ্গী অর্থাৎ ফরাসী ও জার্মান জাতীয় খ্রীষ্টান Crusader বা ধর্মযোদ্ধগণ নিজেদের সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস করিত, সুলতান মহ্‌মুদের মনেও তদ্রূপ বিশ্বাস ছিল; তাঁহার অনুমাত্র সংশয় ছিল না যে, তিনি এবং তাঁহার তুর্কী যোদ্ধগণ ঈশ্বরের সমক্ষে উচ্চ আদর্শের মানুষ-ই ছিলেন—তাঁহারা ছিলেন পরমেশ্বর আল্লার নির্বাচিত সেনা; বিধর্মী হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, তাহাদের ধনে-প্রাণে মারিয়া, লুঠপাট করিয়া, ও তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিয়া এবং মুসলমানের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারা ঈশ্বরেরই প্রত্যাদেশ বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছিল। আল্লার সেই সেবার জন্য তাহারা ভারত-বর্ষের বহুযুগের সঞ্চিত ধনরত্ন এবং বিজিত হিন্দুদের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র দাসদাসী পাইয়া ইহজগতে পুরস্কৃত হইত, এবং পরজগতে কোরানে বর্ণিত জিন্নৎ বা স্বর্গের সমস্ত সুখ ও আনন্দের অধিকারী হইত। এই-সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া, সুলতান মহ্‌মুদ ইসলাম-ধর্মের প্রচারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা শক্তিশালী হইয়া, তাঁহার সু-নিয়ন্ত্রিত তুর্কী ও অন্যান্য যোদ্ধাদের সাহায্যে, "খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" এবং দুর্বল ও অধঃপতিত হিন্দুদের জয় করিয়া নিজের শাসন-ক্ষেত্র আরও পরিবর্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন; এবং হিন্দুরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহাদিগের প্রাচীন ও সে-যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী যুদ্ধের রীতি লইয়া মহ্‌মুদের সম্মুখে কোথাও দাঁড়াইতে পারে নাই। অল্-বীরূনী এই ব্যাপারের সম্বন্ধে নিজে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন : "সুলতান মহ্‌মুদের বীর-কার্য্য অদ্ভুত ছিল, এবং ইহার সমক্ষে হিন্দুরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় হইয়াছিল ; এবং তাহাদের কথা, মানুষের মুখে প্রাচীন জনশ্রুতির মতন হইয়া দাঁড়াইতেছিল" ; ৩০ বৎসর ধরিয়া মহ্‌মুদ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে-সমস্ত ধ্বংস ও লুণ্ঠন-মূলক অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা, "দেশের সমৃদ্ধি একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন"। গজনীর মহ্‌মুদ কর্তৃক ভারতবর্ষের মধ্যে এই-সকল লুণ্ঠনের অভিযান, হিন্দুজাতির ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকর বিপত্তি-রূপে দেখা দিয়াছিল। হিন্দুদের মনে এই ভীষণ "বুত-শিকন্" অর্থাৎ মূর্তিভগ্নকারী মহ্‌মুদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব থাকা সম্ভবপর ছিল না, কারণ জাতি-হিসাবে তিনি তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবীবের মতন এ-যুগের একজন নিরপেক্ষ মুসলমান ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন যে, সুলতান মহ্‌মুদের আচরিত এই "তুর্কী পদ্ধতি"-তে ইসলাম-ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল ; বরঞ্চ ইহার বিপরীত ফল-ই হইয়াছিল। এই Blitzkriog অর্থাৎ "ঝঞ্ঝা আক্রমণ" এবং ধ্বংসের কার্য্য, যাহা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আফগানিস্থানের তুর্কীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, এবং পরবর্তী একাদশ শতকে যাহা আরও প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকর হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ঈরানের প্রখ্যাতনামা সূফী দার্শনিক ও রহস্যবাদী কবি জলালুদ্দীন রূমী (মৃত্যুকাল খ্রীষ্টীয় ১২৭৪ সাল) এইভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন—

"হিন্দুয়ক্-ই-হস্তী-রা তুর্কানা তু নঘ্‌মা-কুন্"।

[যেভাবে তুর্কগণ অপদার্থ হিন্দুদের নিজের অধীনে আনে,
সেইভাবে তুমি জীবনকেও নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনো।]

ক্রমে মুসলমান ঈরানী ও তুর্কী মুসলমান জগতে অনেকে বুঝিতে পারিলেন যে, মহ্‌মুদের এই তুর্কী পদ্ধতি—"তুর্কানা তরীকা"—অনুসারে লুঠপাট, হত্যা ও ধ্বংসের পথে ভারতবর্ষের লোকেদের—কি অভিজাত শ্রেণীর এবং কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হইবে না। অন্য এক পথ এদিকে ইসলাম-প্রচারের কার্য্য করিতেছিল, সে ছিল শান্তির পথ—হিন্দু জন-সাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা-যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে, সহানুভূতির সহিত ও সহজ সরলভাবে ইসলামের মূল তত্ত্বকথা প্রচার করিয়া এবং সঙ্গে-সঙ্গে নানা-প্রকারের অলৌকিক প্রক্রিয়া দেখাইয়া (অর্থাৎ "কেরামতি জাহির করিয়া") তাহাদিগকে স্বমতে অথবা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনা। এই "সুফিয়ানা তরীকা" অর্থাৎ সুফী সাধকের পদ্ধতি, ইসলাম-প্রচারে বিপুল সহায়তা করিয়াছে। কোমল ভাব, সকল ধর্ম-মত সম্বন্ধে উদারতা, এবং ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান-ধারণা লইয়া জীবন-যাপন, সুফী সাধক-গণ এই-সব গুণ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করায়, মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্রসমূহ হইতে বহু দূর অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ জন-সাধারণের মধ্যে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিতে এই রীতির শান্তিপূর্ণ প্রচার বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। এই জন্য দিল্লী, আগ্রা, লখ্‌নৌ, জৌনপুরের আশ-পাশে যেখানে শতকরা মাত্র ১৫ কি ২০ জন মুসলমান, সেখানে সুদূর পূর্ব-বঙ্গে কোনো-কোনো জেলায় শতকরা ৮০ জনের উপর হিন্দু এখন মুসলমান ধর্ম স্বীকার করিয়াছে। সুলতান মহ্‌মূদ অবশেষে যখন ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের এক অঞ্চল পাঞ্জাব অধিকার করিয়া গজনীর সাম্রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দিলেন, তখন পর্য্যন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান করা তাঁহার জীবনের যেন প্রধান ব্রত ছিল।

পাঞ্জাব জয় করিবার পরে এবং পাঞ্জাবকে গজনীর সাম্রাজ্যের এক অংশে পরিণত করিবার পরে, হিন্দুদের এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রবল শত্রু, মন্দির- ও দেবমূর্তি-ধ্বংসকারী বিদেশী মুসলমান রাজা, তাঁহার অধীনে আগত এই নূতন ভারতীয় প্রদেশের হিন্দু প্রজাবর্গের জন্য এক নূতন ধরণের মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই মুদ্রার উপরে তিনি যে লেখ উৎকীর্ণ করাইলেন, তাহাতে এমন একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল, যাহা মুসলমান coin legend বা মুদ্রালেখের ইতিহাসে ইহার পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, এবং ইহার পরেও আর কোনো মুসলমান শাসক কোথাও এরূপ করেন নাই। Omayya ওময়্য-বংশীয় আরব মুসলমান খলীফা বা সম্রাট্‌দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময় হইতে যে বিশিষ্ট ইসলামীয় রীতির মুদ্রা মুসলমান জগতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই কয়টি বিষয় সব সময়েই পাওয়া যায়: [১] প্রথম থাকে, কলিমা বা কলমা, অর্থাৎ আরবী ভাষায় রচিত ইসলাম ধর্মের বীজমন্ত্র—"লা-ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্, মুহম্মদ রসূলু-ল্লাহ্", অর্থাৎ অল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই, এবং মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ; [২] মুদ্রার প্রবর্তক রাজার বা শাসকের নাম ও বিরুদ; [৩] যে স্থানে বা টাঁকশালে মুদ্রাটি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ (আরবী ভাষায়)—"দ্বুরিবা (বা জুরিবা) হাধা অল্-দিরহম্ (অথবা অল্-দীনার) ফী··" (অর্থাৎ এই দিরহম বা রৌপ্য মুদ্রা, অথবা দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা, অমুক স্থানে আহত হইয়াছে বা প্রস্তুত করা হইয়াছে); এবং শেষে থাকিত—[৪] হিজরা সংবৎসর ধরিয়া মুদ্রা-প্রবর্তনের বর্ষের উল্লেখ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত সুলতান মহ্মুদের মুদ্রায় আমরা দেখি, দুইটি ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে—ইহা-ই হইতেছে ইহার প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। মুদ্রার একদিকে পাইতেছি (মুসলমান রাজাদের মুদ্রায় আমরা যেমন পাই) উপরে লেখা এই চার দফা উল্লেখ, আরবী ভাষায়; এবং অন্য দিকে পাইতেছি, এই সম্পূর্ণ আরবী লেখের ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে অনুবাদ—এবং এই ব্যাপারটি বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। একজন মুসলমান রাজা, যিনি সারা জীবন বিধর্মী বলিয়া হিন্দুদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছেন, এবং যে হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনো আস্থা বা দরদ থাকিবার কথা নহে, তিনি তাঁহার নিজ ধর্মের পবিত্র বীজ-মন্ত্রটি সেই বিধর্মী ঈশ্বরাভিশপ্ত জাতির দেবভাষা সংস্কৃতে অনুবাদ করাইলেন—ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা। এই মুদ্রায় সংস্কৃতে আরবী কলমার এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে:—"অব্যক্তম্ একম্, মুহম্মদ অবতার।" ইহা অবশ্য আক্ষরিক অনুবাদ নহে, এবং পাণ্ডত মুসলমান এই অনুবাদ সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইবেন না—বিশেষতঃ কলমার দ্বিতীয় অংশের অনুবাদটুকু। কারণ খ্রীষ্টান ও হিন্দুরা যেভাবে incarnation বা "অবতার" মানে, নবী মুহম্মদকে সে ভাবের "অবতার"-রূপে মুসলমানগণ কল্পনা করেন না। মুহম্মদ ছিলেন পুরাপুরি মানুষ, এবং তিনি নিজেও সে কথা বার-বার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শতকে ইসলামের জগতে, বিশেষ করিয়া ঈরান, আফগানিস্থান ও তুর্কীস্থানে, নবী মুহম্মদের ব্যক্তিত্ব প্রায় দেবত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল—ইসলামের অভ্যুত্থানের ৩।৪ শত বৎসর পরে। কোরানের সরল সহজবোধ্য ধর্মমত নানাভাবে অলংকৃত ও পল্লবিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছিল। সুফীগণের কল্পনা-প্রবণতার দরুন ইহা অনেকটা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র, নবী মুহম্মদের মানবাতিগতা সম্বন্ধে বিশ্বাস খুবই সাধারণ; এবং মিলাদ বা মৌলুদ-শরীফের মতো ধর্মকথার আসরে, মুসলমান পুরাণ-অনুসারে সৃষ্টির কথা এবং মুহম্মদের আবির্ভাব ও জীবনীর কথা, এবং শেষে "রোজ কিয়ামৎ" অর্থাৎ পৃথিবীর অস্তিত্বের শেষ দিনের কথা, যখন "ওয়াইজ" বা ধর্মোপদেশক বর্ণনা করেন, তখন ইহা প্রচারিত হয় যে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টির বহুপূর্বে, এমন কি পরমেশ্বরের সত্তার অংশ-রূপে, স্বর্গে আল্লা-তায়ালা "নূর-ই-মুহম্মদী" অর্থাৎ মুহম্মদের জ্যোতি বলিয়া এক বিশেষ জ্যোতির্ময় শক্তি সৃজন করিয়াছিলেন, এবং তাহা যুগ যুগ ধরিয়া স্বর্গে অবস্থিত ছিল; পরে এই জ্যোতির্ময় শক্তির অংশ লইয়া স্বর্গের "ফেরেস্তা" বা দেবদূত এবং অন্য নানা প্রকারের প্রাণী সৃষ্ট হয়; এবং অবশেষে এই "নূর-ই-মুহম্মদী" ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া মুহম্মদের মাতা দেবী আমিনার গর্ভে ভবিষ্যৎ নবী বা রসুল অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই কল্পনোজ্জ্বল পৌরাণিক কাহিনী, নবী মুহম্মদের জীবনকথা-রূপে এক অদ্ভুত রসপূর্ণ "ভক্তমাল" কথার ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া পঁহুছে, এবং বিশ্বাসী মুসলমান সকলেই আগ্রহের সঙ্গে এই কাহিনী গ্রহণ করেন। সুতরাং এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, মুহম্মদকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করা তেমন অনুচিত বলা যায় না; এবং ঐ সময়ে, জনপ্রিয় সুফী প্রচারকগণ, ভারতবর্ষের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের কাছে তথা যাহাদের ইসলাম ধর্মে আনা সম্ভবপর ছিল এইরূপ হিন্দুদের কাছে, মুহম্মদের ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কথা তাহাদের মানসিক চিন্তাধারা অনুসারে এইরূপ উপাখ্যানের সাহায্যে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছিলেন।

কলমা-মন্ত্রের এই সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া শেষে আলোচনা করিতেছি।

রাজার ও টাকশালের নাম এবং সন-তারিখের কথা লইয়া আরবীতে এই মুদ্রায় যাহা লেখা আছে, তাহা বেশ যত্নের সহিত যথাযথভাবে অনূদিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইয়াছে ("অয়ং টঙ্কঃ মুহম্মদপুরে ঘট্টে আহতঃ"—এই টঙ্ক বা টাকা মুহম্মদপুর অর্থাৎ লাহোরের ঘট্ট বা টাঁকশালে আহত হইয়াছে অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়াছে); "নৃপতি মহমূদ"; "জিনায়ন-সংবতি···" ("জিন" অর্থাৎ বিজেতা, অর্থাৎ নবী মুহম্মদের "অয়ন" অর্থাৎ নির্গমন বা যাত্রার···বর্ষে)। মুসলমান অব্দের নাম "হিজরা" (অর্থাৎ "পলায়ন" বা "নির্গমন"), বিশেষ চিন্তার সহিত এই শব্দটির সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হিজরা অব্দের সম্পূর্ণ নাম হইতেছে "হিজ্‌রতু-ন্-নবী" তর্থাৎ নবী ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের পলায়ন বা নির্গমনের বৎসর—ইহার সংস্কৃত করা হইয়াছে "জিনের বা বিজেতা পুরুষের, অথবা ধর্মগুরু বা ধর্মোপদেশক মহাপুরুষের অয়ন বা নির্গমন"। এই দুই ভাষার লেখ-সম্বলিত মুদ্রার বিভিন্ন তারিখের অঙ্ক সম্বলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রতি পাওয়া গিয়াছে (যথা ৪১২ হিজরী অব্দ ও ৪১৯ হিজরী অব্দ = যথাক্রমে ১০২১ ও ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দ), এবং এই বিভিন্ন প্রতিতে পাঠভেদও কিছু আছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে একটিতে "বি-স্মি-ল্লাহ্" এই বাক্যটি যথাযথ অনূদিত হইয়াছে এইভাবে—"অব্যক্ত-নামে" অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের নাম লইয়া।*

এইভাবে আরবী কলমার সংস্কৃত অনুবাদ দিয়া মুদ্রার প্রবর্তন, গোঁড়া মুসলমানের দৃষ্টিতে "জিম্মি অর্থাৎ কর-প্রদাতা বিজিত বিধর্মী প্রজার প্রতি অশেষ এবং অনুচিত অনুগ্রহ বলিয়া-ই মনে হইত। ঐ সময়ে, যখন প্রায় সর্বত্র সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাসী মুসলমানের মনে আরব-জাতির গে ব-স্বীকারের মনোভাব বিদ্যমান ছিল, এবং আরবী ভাষার পাশে এইভাবে বিধর্মী হিন্দুর

* এই মুদ্রা সম্বন্ধে প্রমাণপঞ্জী: (১) Edward Thomas, 'On the Coins of the Kings of Ghazni, 961-1171 A. D.', London, 1848, p. 57; (২) Charles J. Rodgers, 'Catalogue of Coins collected by Chas. J. Rodgers and purchased by the Government of the Panjab', Part II, Miscellaneous Muhammadan Coins, Panjab Government Publication, Calcutta, 1891, p. 28, coins no 88 ff.; (৩) Stanley Lane Poole, 'Catalogue of Coins in the British Museum', referred to by K. N. Dikshit; (৪) K. N. Dikshit, 'A Note on the Bilingual Coins of Sultan Mahmud of Ghazni', JRASL Letters, Vol. II, 1936, No. 8, issued 1938, Numismatic Supplement, p. 29; (৫) Stanley Lane Poole, 'Mediaeval India' ('Story of the Nations' Series), London, 1905, p. 27—৪১৮ হিজরা = ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত এই ধরণের একটি মুদ্রার চিত্র আছে; (৬) অক্ষয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—'ইতিহাস-প্রবেশ' (হিন্দী পুস্তক), প্রথম খণ্ড, প্রয়াগ, ১৯৩৯, পৃঃ ২১৩, ২১৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাষার স্থান দেওয়া অনেকেরই ভালো লাগিত না, তখন, আমাদের মনে আশ্চর্য্য লাগে, কেমন করিয়া গজনীর অধিপতি সুলতান মহ্‌মুদ, যিনি জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের সহিত লড়িয়াছিলেন, তাঁহার নব-বিজিত হিন্দু প্রজাদের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এবং ইসলামের মূল কথা তাহাদের নিকট তাহাদেরই আপন ভাষায় প্রকাশ করিলেন। রাজ্যের মুদ্রায় তাহাদের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনে হয়, তিনি যেন হিন্দুদের জাতীয়তা-বোধের পরিপোষক কর্ম-ই করিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, তিনি কূট রাজনীতিক চাল-রূপেই এই কার্য্য করিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ মহ্‌মুদ তাঁহার সাম্রাজ্যের নব-জিত হিন্দু প্রজাদের বিরোধী করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, কারণ এই হিন্দুরা তখন তাঁহার সাম্রাজ্যে সংখ্যায় বিশেষ অল্প ছিল না। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে, এ ব্যাপারে তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত উদারতার স্বাভাবিক প্রবণতা-ই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু আমরা ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না যে, এই সংস্কৃত অনুবাদ মুদ্রায় অঙ্কিত করার পিছনে হিন্দুজাতির প্রতি যে সহানুভূতিশীল তথা সংস্কৃতি-পূত এবং বিশ্বজনীন মনোভাব কার্য্য করিতেছে, তজ্জন্য অল্-বীরূনী-ই আমাদের সাধুবাদের পাত্র। যতদূর জানা যায়, সুলতান মহ্‌মুদের দরবারে অল্-বিরূনীর মতো ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না। হিন্দুদের ভাষাকে রাজকীয় মুদ্রায় স্থান দিয়া ইহার প্রতি যে মর্য্যাদা দেখানো হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদের বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ হইতে আগত কোনও ব্রাহ্মণ বা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের যে কোনো হাত ছিল, তাহাও মনে হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকদিগের উক্তি-অনুসারে, গজনীর সুলতান মহ্‌মুদ যে সকল প্রকার বিদ্যার বিষয়ে গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। একবার কতকগুলি তুর্কী সৈনিক ভারতবর্ষে জনৈক রাজপুত রাজার রাজধানীতে কতকগুলি ছাড়া হাতীকে আয়ত্তে আনিয়া শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল; তাহাদের এই সাহস ও শৌর্য্যের বিষয়ে, "হিন্দী" অর্থাৎ তখনকার যুগের অপভ্রংশ ভাষাতে কবিতা রচনা করিয়া, প্রশস্তিবাদ করা হইয়াছিল। ঐ রাজা পরে এই কবিতাগুলি সুলতান মহ্‌মুদের কাছে ভেট-স্বরূপ পাঠাইয়া দেন; মহ্‌মুদ ঐ ভাষা বুঝিতেন না বলিয়া, কতকগুলি পণ্ডিত অর্থাৎ উক্ত ভাষার সহিত পরিচিত ব্যক্তিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিয়া ঐ কবিতা অনুবাদ করাইয়া লন এবং পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হন। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি যে কোনও ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও হিন্দুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আপন মুদ্রায় এই সংস্কৃত অনুবাদ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

এই ব্যাপারে যদি কেহ সুলতান মহ্মুদকে প্রেরণা দিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র অল্-বীরূনী-ই হইতে পারেন; এবং যে ভাবে কতকগুলি আরবী শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ এই মুদ্রাতে করা হইয়াছিল, তাহাতে অল-বীরূনীর-ই চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী "নবী" বা "রসূল" অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ বা ভাববাদী অর্থে সংস্কৃত "জিন" শব্দ অনুবাদে ব্যবহার করা হইয়াছে। অল্-বীরূনী তাঁহার ভারত-বর্ণন গ্রন্থে "জিন" শব্দটি দুইবার ব্যবহার করিযাছেন, এবং এই শব্দটি "বুদ্ধ" শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে ধরিয়াছেন ("জিন্থু র-হুর অল্-বুদ্দু")। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, কাষায়-বস্ত্র পরিহিত "সামানী" অর্থাৎ "শ্রমণ" বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন "বুদ্ধ", এবং সম্ভবতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রচলিত "জিন" শব্দ (যাহার অর্থ হইতেছে "বিজেতা"), অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দের অভাবে, আরবী "নবী" বা "রসূল" শব্দের কাজ-চালানো প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কলমার প্রথম অংশের অনুবাদে অল্-বীরূনীর হাত দেখিতেছি। "অল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই", ইহার অনুবাদ হইয়াছে—"অব্যক্তম্ একম্"; অর্থাৎ যিনি -(-রূপ, তিনি এক বা অদ্বিতীয়। এই অনুবাদ একটু ব্যাখ্যাত্মক; কিন্তু অল্-বীরূনীর মত অনুসারে ইহার উপযোগিতা আছে। আরবী ভাষায় "ইলাহ্" শব্দের অর্থ "যাহাকে দর্শন বা স্পর্শ করা যায়, এমন কোনো সম্মান বা পূজার পাত্র"; অর্থাৎ "প্রতিমার আকারে কোনো দেবতা"। এই শব্দের দ্বারা কোনো দৈব শক্তি বা ভাব আরবদের মধ্যে প্রকাশিত হইত না। কিন্তু "অল্লাহ্" শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব একেবারে ইহার বিপরীত—"অল্লাহ্" কোনো দৃশ্যমান "ইলাহ্" বা দেবতা নন, ইনি দৃশ্যমান দেহ-রূপের অতীত ঈশ্বরীয় সত্তা। এইরূপ ঈশ্বরীয় শক্তি বা দেবতা, যাঁহার কোনো রূপ নাই, তিনি-ই একমাত্র সত্তা; এবং অন্য কোনো "ইলাহ্" বা রূপ-যুক্ত দেবতার কথা "অল্লাহ"-এর সমক্ষে উঠিতেই পারে না। অতএব "অ-ব্যক্ত বা অ-রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেবতা-ই এক"—এইরূপ অনুবাদ, কলমা-মন্ত্রের প্রথম অংশের অসংগত অনুবাদ বা অপব্যাখ্যা নহে, এবং এইরূপ অনুবাদের পিছনে আছে ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রধান মনোভাব—রূপ বা প্রতিমার বিরোধ। উপরন্তু এইরূপ অনুবাদ, হিন্দু আধ্যাত্মিক চিন্তা বা দর্শনের বাক্য-ভঙ্গীর অনুকূল ; এবং এইরূপ অনুবাদের দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রের "একং সৎ" এবং "একম্ এবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি কতকগুলি বচনকে মনে করাইয়া দেয়। অল্-বীরূনী তাঁহার পুস্তকে "অব্যক্ত" শব্দের আরবী ভাষায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'bykt 'y ʿy" bl' s:wrth অর্থাৎ "অব্যক্ত, অয়্য শয়্যান্ বিলা স্বূরথ" (যাহার কোনও রূপ বা আকার নাই, এইরূপ সত্তা)। "অব্যক্ত" শব্দের নানা অর্থের মধ্যে এইটি অন্যতম। মূল অর্থ অবশ্য "যাহা ব্যক্ত বা প্রতিভাত হয় নাই"—কিন্তু এই ব্যক্ত বা প্রতিভাত হওয়া কেবল রূপ-গ্রহণের মধ্যেই সীমিত নহে, এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু ধরিতে, ছুঁইতে, দেখিতে বা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহার সব-ই "ব্যক্ত"। "অল্লাহ্" শব্দের অনুবাদ-রূপে "অব্যক্ত" যে সুষ্ঠু অনুবাদ, তাহা বলা চলে না ; কিন্তু "অল্লাহ্"-এর "স্বূরত" বা রূপের অতীত থাকা-ই যদি এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত "অ-ব্যক্ত"-শব্দের ব্যাপক অর্থ-সমূহ হইতে যদি কেবল এইটিকেই নির্বাচিত করিয়া লইয়া, ইহাকে রূপাতীত "অল্লাহ্"-এর প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা খুব অনুচিত হয় না।

"অল্লাহ্"-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ যিনি-ই নির্ধারিত করিয়া থাকুন, তিনি যে এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট। চীনদেশের বিখ্যাত দার্শনিক লাও-ৎসি-রচিত "তাও-তেঃ-কিঙ্" গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে—আসাম (প্রাগ্‌জ্যোতিষ)-এর রাজা ভাস্করবর্মার আগ্রহে, চীনদেশের পণ্ডিতেরা চীনের সম্রাটের আহ্বানে এই কার্য্যে অবতীর্ণ হন। তখন চীনা শব্দ "তাও", যাহা লাও-ৎসি'র দর্শনের মুখ্য কথা, তাহার অনুবাদ লইয়া হিউএন্-ৎসাঙ্ প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লাও-ৎসি'র মতানুবর্তী চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। আজকালও দুইটি বিভিন্ন ভাষার ও ধর্মের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাব ও শব্দের সামঞ্জস্য সাধন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। অল্-বীরূনী যে সংস্কৃত দার্শনিক শব্দ আরবীতে অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করিবার কাজে অবতীর্ণ হইয়া বহুল অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সর্বগ্রাহিতার পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে—গ্রীক, ইসলামী ও হিন্দু দর্শনের তুলনাত্মক আলোচনা তাঁহাকে এইভাবে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল; এবং সেইহেতু Comparative Religion বা তুলনাত্মক-ধর্মানুশীলন বিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ তাঁহাকে বলা যায়।

অতএব অনুমান করিতে বাধা নাই যে, সুলতান মহ্মুদের মুদ্রায় "অল্লাহ্" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে "অব্যক্ত" শব্দের ব্যবহার অল্-বীরূনীর দ্বারাই হইয়াছিল। এবং ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে, অল্-বীরূনীর-ই চেষ্টায় এই মুদ্রায় আরবী লেখের পূর্ণ সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে অল্-বীরূনীর ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রের মধ্যে আমরা এক নূতন প্রকারের মহত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি। তিনি সংস্কৃতের ও ভারতের প্রতি আকৃষ্ট তো হইয়াছিলেন-ই—উপরন্তু তিনি এই ভাবের ভাবুকও ছিলেন যে, উচ্চ সভ্যতার উত্তরাধিকারী মানবসমাজ-সমূহের পক্ষে নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার অধিকার, সব জাতির পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা আবশ্যক। পৃথিবীর সর্বজাতির মানব নিজ নিজ ভাষায় তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করুক, ইহা-ই বুদ্ধদেব কামনা করিয়াছিলেন। একটি বিশেষ ভাষাকে ধর্মের ভাষা বা রাজার ভাষা বলিয়া, অন্য সমস্ত জাতির ঘাড়ে ইহাকে চাপাইবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র-ই দেখা যায়। ইহা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যেই, পাঞ্জাব তুর্কীদের দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই, পাঞ্জাবের ভারতীয় প্রজাগণ নিজ ভাষায় ইসলামের বীজ-মন্ত্রের সহিত পরিচিত হইবার অধিকার পাইয়াছিল। যাঁহার ন্যায়দর্শিতার ফলে সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই মানব-শ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ অল্-বীরূনীর স্মৃতির প্রতি তাঁহার জীবৎকালের প্রায় সহস্র বৎসর পরে, সমগ্র সভ্য জগতের শ্রদ্ধা নিবেদন করা কর্তব্য—তিনি তাঁহার কালের ও সর্বকালের বিশ্বমানবিকতার আদর্শের পুরোহিত ছিলেন, এবং মানবের মানসিক প্রগতির পথে এক আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন॥

মন্তব্য—এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পর বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাসুদেব-শরণ অগ্রবালের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি এই মুদ্রার সংস্কৃত লেখটির একটু অন্যভাবে পাঠ করিয়াছেন। তিনি প্রায় সমস্ত লেখটিব পূর্ব-আলোচকদের দ্বারা নির্ধারিত পাঠ একরকম মানিয়া লইযাছেন, কিন্তু "জিনায়ন-সংবতি" এই অংশটুকু, "তাজিকীয়ের-সংবতি" অর্থাৎ "তাজিক" বা আরব জাতির সংবৎ বা অব্দ বলিয়া পাঠ করিতে চাহেন। এই পাঠে "-যের" অংশটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য মনে হয না, কাবণ "-যেব" প্রত্যয়েব কোনও সংগত অর্থ মিলিতেছে না। ডাক্তার অগ্রবালও মনে কবেন যে, এই সংস্কৃত অনুবাদ অল্-বীরূনীর হওয়া-ই সম্ভব। ইঁহাব প্রবন্ধ Journal of the Numismatic Society of India, Vol. V. Part II-তে, ও পরে Journal of the United Provinces Historical Society, Vol. XVII, Part II, December 1944, Lucknow-তে প্রকাশিত হইযাছে।

[বঙ্গাব্দ ১৩৬২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরাপ খাঁ গাজী

সুরধুনি মুনিকন্যে, তারয়েঃ পুণ্যবন্তং—
স তরতি নিজপুণ্যৈস্—তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বং—তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

"হে স্বর্নদী জহ্নুমুনিকন্যা গঙ্গা, তুমি পুণ্যবান্‌কে তারণ করো, কিন্তু তাহাতে তোমার কী মহত্ত্ব? সে নিজ পুণ্যে তরে। কিন্তু যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে তারণ করো, তবেই পৃথিবীতে তোমার মহত্ত্ব, আর সেই মহত্ত্ব-ই (সত্যকার) মহত্ত্ব।"

দবাপ খাঁ গাজীব বচিত বলিয়া পরিচিত এই শ্লোকটি বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রচলিত, অন্ততঃ আমার বাল্যকালে প্রচলিত ছিল। নিজ ধর্মের দেব-দেবীর পূজার সঙ্গে এবং দেব-দেবী-সম্পর্কিত স্তব-স্তোত্রের সঙ্গে পরিচিত বাঙ্গালী হিন্দু বোধ হয় এমন কেহ নাই, যিনি দরাপ খাঁ-কৃত গঙ্গা-স্তোত্রেব, অন্ততঃ উপরে প্রদত্ত মালিনী-ছন্দের শ্লোকটি না জানেন, এবং আবেগের সহিত পাঠ না করেন। আমার পূজ্যপাদ পিতামহ প্রায় পঞ্চাই বৎসর বয়স ইংরেজী ১৯০৬ সালে দেহবক্ষা করেন, তখন আমার বযস ছিল ষোল বৎসর, তাঁহার নিকট বহুবার এই শ্লোকটি শুনিয়াছি, এবং শ্লোকটি মনে কাবয়া রাখিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। দবাপ খাঁ গাজী যে এই শ্লোকের রচয়িতা, তাহা তাঁহারই কাছে শুনি, এবং দরাপ খাঁর পরিচয়, তাঁহার জ্ঞান-মতো, তিনি এইটুকু আমাকে বলিয়াছিলেন যে (দরাপ খাঁর সময় সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণা ছিল না, কৌতূহলও ছিল না), দরাপ খাঁ নামে এক মুসলমান আমীব বা অভিজাত ব্যক্তি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ফকীব হইয়া যান, ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে তাঁহার মুসলমান ধর্ম ও শাস্ত্র অনুসাবে তিনি সাধন-ভজন করিতেন; তীর্থক্ষেত্র বলিয়া ত্রিবেণীতে বহু হিন্দু যাত্রী ভক্তিভরে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত, দরাপ খাঁ তাহা দেখিতেন। তাঁহার সাধন-ভজনে নিষ্ঠা দেখিয়া গঙ্গাদেবী প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেখা দেন; এবং দরাপ খাঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুসলমান হইলেও, উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন বলিয়া, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে ভেদ করিতেন না, গঙ্গার কৃপায় তিনি গঙ্গাভক্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার মুখ দিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি গঙ্গা-স্তব বাহির হয়, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটি হইতেছে একটি। পরে মুদ্রিত পুস্তকে দরাপ খাঁর (বা দরাফ খাঁর) রচিত বলিয়া শ্লোকটি বহু স্থলে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় কর্তৃক সংকলিত "বৃহৎ-স্তব-কবচ-মালা" পুস্তকে, দরাপ খাঁ-রচিত অষ্টশ্লোকময় গঙ্গা-স্তবটি সম্পূর্ণ পাইয়াছি (দশম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩২ সাল, পৃঃ ৫০৯।৫১০)। বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত এই গঙ্গাস্তবটি নীচে দিতেছি; অষ্টম বা শেষের শ্লোকটি-ই সুপরিচিত, এবং সেটি উপরে দেওয়া হইয়াছে।

শার্দূলবিক্রীড়িত

১। যৎ ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্‌বান্ধবৈঃ
যস্মিন্ পান্থদৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীকুর্বতী পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাঽসি ভাগীরথী॥

"যে মানবদেহকে মাতৃগণও ত্যাগ করিয়াছে, মিত্র ও আত্মীয়গণও যাহা ছোঁয় না, পথিকের দৃষ্টি যাহার উপর পড়িলে তাহারা শ্রীহরি স্মরণ করিয়া থাকে, এই প্রকার সেই মৃতমানবদেহকে নিজের কোলে তুমি ই তুলিয়া লও; এইজন্য, হে ভাগীরথী, তুমি-ই হইতেছ করুণাময়ী মাতা।"

আর্য্যা

২। অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিণি, শশিশেখর-মৌলি-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণ-সময়ে দেযা হরতা ন মে হরিতা॥

"হে বিষ্ণুচরণ-নিঃসৃতে, শিব-শিরোজটা-স্থিত শ্বেত-মালতা-মালা-স্বরূপিণী, তোমাতে (তোমার জলে) দেহত্যাগের সময়ে আমাকে যে হরতা বা শিবত্ব দান করা হইবে, তাহা হরিতা অর্থাৎ হরণ করা হয় নাই।"

মন্দাক্রান্তা

৩। শূন্যীভূতা শমন-নগরী, নীরবা রৌরবাদ্যা,
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সিদ্ধৈঃ সার্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥

"হে মাতঃ গঙ্গে, যে-দিন হইতে তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেদিন হইতে যমপুরী শূন্য হইয়া গিয়াছে, রৌরব-আদি নরক নীরব হইয়াছে, মর্ত হইতে স্বর্গে প্রতিদিন বহুবার যাতায়াতের ফলে স্বর্গীয় বিমান-সমূহ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে; এবং স্বর্গে সিদ্ধগণের সহিত স্বর্গবাসিগণ হস্তে কেবল অর্ঘ্যপাত্র ধরিযাই রহিয়াছেন।"

উপেন্দ্রবজ্রা-ইন্দ্রবজ্রা

৪। পয়ো হি গাঙ্গ্যং ত্যজতামিহাঙ্গং পুনর্নচাঙ্গং যদি বৈতি চাঙ্গম্।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গ্যম্ ॥

"এই পৃথিবীতে যাহারা দেহত্যাগ করে, যদি তাহাদের দেহে গঙ্গার জল লাগে, তাহাদের আর দেহধারণ করিতে হয় না—(তাহারা বিষ্ণুত্ব লাভ করে বলিয়া তাহাদের) করে চক্র, শয়নে অনন্তনাগ, যান-রূপে গরুড-পক্ষী এবং চরণে গঙ্গাজল আসে।"

শার্দূলবিক্রীড়িত

৫। কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি-দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোক-জননি ত্বদ্বারিপূরোদরে
মজ্জজ্জন্তু-কদম্বকং সমুদযত্যেকৈকমাদায় যৎ ॥

"কত অক্ষি, কত মস্তক-করোটি, কত চিতাবাঘ ও হাতীর চর্ম, কত কাক ও পেচক প্রভৃতি পক্ষী, কত সর্প, সুধাধাম চন্দ্রের কত খণ্ড; এমন কি, তুমিও কত, হে ত্রিলোক-জননি! কারণ তোমার বারিপূর্ণ গর্ভে মজ্জনশীল জন্তুসমূহ প্রত্যেকে তোমাকেই পাইয়া (স্বর্গলাভের জন্য) উদিত হয়।"

শিখরিণী

৬। কুতোঽবীচিবীচিস্তব যদি গ লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"যদি তোমার তরঙ্গ নেত্রপথে আগত হয়, তাহা হইলে অবীচি নামে নরক কোথায় থাকে? অল্প-পরিমাণে তোমার জল যদি পান করা যায়, তাহা হইলে যে পান করে তুমি তাহাকে পীতাম্বর নারায়ণের বৈকুণ্ঠপুরে নিবাসের ফল বিতরণ কব। যদি দেহধারী মানবের দেহ, হে গঙ্গে, তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে শতক্রতু ইন্দ্রের পদলাভও, হে মাতা, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র ব্যাপার হয়।"

শিখরিণী

৭। ত্বমম্ভো লোকানামখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগন্ত্রী নিম্নানামপি নয়সি সর্বোপরি নতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জনয়সি মুবারাতিনিবহান্
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে॥

"হে জলময়ী মাতা, তুমি জগতের অশেষ পাতক-সমূহ দহন করিয়া থাক; নিম্ন স্থানেও তুমি গমন কর, কিন্তু যাহারা (তোমার চবণে) নত, সকলের উপরে তুমি তাহাদের লইয়া যাও। তুমি নিজে বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত, কিন্তু তুমি বহু বহু মুরারি বা বিষ্ণুর উদ্ভব ঘটাইযা থাক; আহা, মাতর্ গঙ্গে, তোমার কি অদ্ভুত চরিত্র সদা জয়যুক্ত হইতেছে।"

এই শ্লোকগুলি যিনি রচনা করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় তিনি কিছু অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং শ্লোকগুলি হইতে প্রকাশিত তাঁহার মনোভাব যে সাধারণ গঙ্গাভক্ত, পৌরাণিক-দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুর-ই মতো ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। দরাপ খাঁ গাজী যদি সত্য-সত্যই এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংস্কৃত ভাষায় এতটা দখল যাঁহার ছিল এবং হিন্দুধর্মের প্রতি যিনি এতটা নিষ্ঠা বা প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মুসলমান সজ্জন কে ছিলেন জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সুখের বিষয়, দরাপ খাঁ গাজী সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যিক উল্লেখ আছে, এবং "পাথুরে' প্রমাণ"-ও আছে। ইনি ত্রিবেণীতে বাস করিতেন বলিয়া যে কিংবদন্তী আমার পিতামহের নিকট শুনিয়াছিলাম, সাহিত্যিক উল্লেখ এবং "পাথুরে' প্রমাণ" এই দুইয়ের দ্বারা সেই কিংবদন্তী সমর্থিত হইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরাপ খাঁর নামের সহিত "গাজী" উপাধি মিলিতেছে। "গাজী" অর্থে, যে মুসলমান ব্যক্তি ধর্মের নামে বিধর্মী অ-মুসলমানের বিপক্ষে আক্রমণে বা যুদ্ধে যোগদান করে ; এই উপাধি হইতে, দরাপ খাঁ যে কোনও কালে অন্ততঃ যোদ্ধা ছিলেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। "খাঁ" বা "খান্" পদবী তুর্কী ভাষার, ইহার অর্থ "রাজা", এবং ইহা উচ্চবংশের মুসলমানের—বিশেষতঃ তুর্কী-জাতীয় মুসলমানের—পরিচায়ক। "দরাপ" বা "দরাফ" নামটি লইয়া পরে বিচার করিব।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যতগুলি "ধর্ম-মঙ্গল" কাব্য পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর রচিত গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ১৬৫০-এর মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই বইখানি এতাবৎ অপ্রকাশিত ছিল, সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম্-এ পি এচ্-ডি এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল এম্-এ-র সম্পাদনায় বর্ধমান-সাহিত্য-সভা কর্তৃক অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৫১ সাল)। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের প্রারম্ভে বন্দনা-পালা অংশে, গণেশ, ধর্ম, ঠাকুরাণী বা দেবী, চৈতন্যদেব, সরস্বতী, বিপ্র—ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ বন্দনার পরে, দিগ্‌বন্দনা অংশে কবির পরিচিত বা শ্রুত বিভিন্ন স্থানের দেবতাদের বন্দনা আছে। দেবতাদের মধ্যে, মুসলমান পীরেরাও বাদ যান নাই। এই দিগ্‌বন্দনায় আমরা পাইতেছি—

ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয় কাজী ॥—পৃ. ১৫, মুদ্রিত সংস্করণ।

"ত্রিপর্ণী" বা ত্রিবেণীর দফর খাঁ গাজী ভিন্ন, কবি রূপরাম আরও অন্য পীরের স্মরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ার "শুভি খাঁ" বা শাহ্ সুফী অন্যতম। কথিত আছে, এই শাহ্ সুফী ছিলেন দফর খাঁ বা দরাপ খাঁর ভাগিনেয়।

কারবালার যুদ্ধ লইয়া ফারসীতে মহাকাব্যের আকারে কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। সেইগুলির আধারে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় "জঙ্গনামা" নামক কাব্য-ধারা বা কাব্য-মালা আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ জঙ্গনামা-গুলির মধ্যে বশীরহাটের অন্তর্গত জিকিরপুর-নিবাসী কবি য়াকুব আলীর রচিত বইখানি ("ছহি বড় জঙ্গনামা") ১১০১ বঙ্গাব্দে (১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে) লিখিত—এই বইখানি বাঙ্গালার মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সমাজে বিশেষ লোকপ্রিয়। এই বইয়ের প্রারম্ভে দরাফ খাঁর বন্দনা এই ভাবে আছে—

ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিমু দরাফ খান্।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান ॥*

ত্রিবেণীর ঘাটে যিনি বাস করিতেন, এমন মুসলমান সাধক গাজী দফর খাঁ বা দরাফ খান্‌কে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যাইতেছে। তিনি কয়েক শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

ত্রিবেণীতে দরাফ খান্ বা দফর খানের সমাধি ও তৎকর্তৃক স্থাপিত মসজিদ আছে, তাঁহার কীর্তির নিদর্শন আছে, তাঁহার সম্বন্ধে সেখানে কিংবদন্তীও আছে। এতদ্ভিন্ন ত্রিবেণীর সন্নিকট ভাগীরথী-তীরবর্তী নানা স্থানে দরাফ খান্ সম্বন্ধে নানা গালগল্প আছে। "গাজীর কুড়ুল" বলিয়া একটি লোকোক্তি ত্রিবেণী-অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে—'ত্রিশঙ্কুর মতো স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে অবস্থান' অর্থে এই উক্তি প্রযুক্ত হয়; বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন—"বাবা, মৃত্যু তো হয় না, গাজীর কুড়ুল হ'য়ে আছি"—অর্থাৎ জীবন্মৃত অবস্থায় আছি। কথিত আছে, "গাজীর কুড়ুল" নামে প্রসিদ্ধ দুইটি লৌহদণ্ড দরাফ খাঁ বা দফর খাঁর তপস্যার প্রভাবে শূন্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, ১৩০২ সালের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এই শ্রেণীর কতকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি গল্প এই ধরণের: দরাফ খাঁ ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার ধারে বাস করিতেন। নিজ ধর্ম-মতে সাধনার ফলে তাঁহার অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত হইয়াছিল, তিনি প্রেতযোনির কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিতেন। একটি লোককে ষাঁড়ে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলে; মৃত্যুর পরে তাহার স্বর্গলাভ হয়, কারণ ষাঁড়ের শিঙ্গে গঙ্গামাটি লাগিয়াছিল; এইভাবে মরণকালে গঙ্গামৃত্তিকার সংস্পর্শে তাহার সদ্‌গতি হয়—প্রেতমুখে এই কথা শুনিয়া দরাফ খাঁয়ের মনে গঙ্গাভক্তি জাগরিত হয়, এবং ইহার পর হইতে তিনি গঙ্গার সাধনা করেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়।

ত্রিবেণী-সম্বন্ধে উল্লেখ লক্ষ্মণসেন মহারাজের সভার কবি ধোয়ীর "পবনদূত"

* আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ" বা মুসলমান বাঙ্গালী কবিদের রচনা হইতে চয়ন, কলিকাতা, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকা—আবদুল কাদির-রচিত "বাঙ্গলা কাব্যের ইতিহাস, মুসলিম সাধনার ধারা", পৃঃ ৩১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাব্যে পাওয়া যায়। সুহ্মদেশের দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত এই তীর্থের নিকটে বিষ্ণুর একটি বড়ো মন্দির ছিল বলিয়া ধোয়ীর কাব্য হইতে জানা যায়। এখন হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৪৭ সালের Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার মে-মাসের সংখ্যায় বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসের D. Money মনি সাহেব An Account of the Temple of Triveni near Hugli নামে একটি প্রবন্ধে (৩৯৩-৪০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) ত্রিবেণীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-সমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, এবং দরাফ খান্ সম্বন্ধে যে-সমস্ত জনশ্রুতি ও অন্য তথ্য তিনি সংগ্রহ কবিতে পারিয়াছিলেন, সেগুলিও প্রকাশিত করেন। ত্রিবেণীর দরাফ খাঁর মসজিদে অবস্থিত দরাফ খাঁর নামযুক্ত একটি আরবী লিপির শেষাংশ পাইয়া মনি সাহেব সেটির অনুলিখন ইংরেজী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করেন ; ইহাতে হিজরীতে যে তারিখ দেওয়া আছে, মনি সাহেব তাহার সহিত খ্রীষ্টাব্দের সমীকবণে ভুল কবেন। পরে Journal of the Asiatic Society of Bengal-পত্রিকার XLI বা একচল্লিশের খণ্ডে H. Blochmann ব্লকমান সাহেব বাঙ্গালা-দেশের কতকগুলি আরবী ও ফারসী শিলালেখের পাঠোদ্ধার প্রকাশিত করেন (Notes on Arabic and Persian Inscriptions in the Hugli District প্রবন্ধে—pp. 280ff) ; তন্মধ্যে ত্রিবেণীতে দরাফ খান্ গাজীর সমাধিতে অবস্থিত ও মনি সাহেবের দ্বারা আংশিকভা · প্রকাশিত শিলালেখটি সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করেন, এবং দরাফ খানের আরও দুইটি আরবী-ভাষাময় শিলালেখ অনুবাদ-সহিত প্রকাশিত করেন। দরাফ খান্ সম্বন্ধে এই লেখাগুলি হইতেছে তাঁহার সময়ের প্রত্যক্ষ "পাথুরে' " প্রমাণ।

দরাফ খান্ বা দফর খানের নামের শুদ্ধ রূপ হইতেছে "ধ্ব.ফর্ খান্"—ইহার ভারতীয় অনুবাদ হইবে "বিজয় রায়" অথবা "জয়রাজ" ; "ধ্ব.ফর" শব্দ, ইহার আদিতে যে "ধ্ব.া" বা "জ্ঞোয়্" অক্ষর আছে, আরবীতে তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে dhw (ইংবেজী this, tnat, then প্রভৃতি শব্দের th- বা dh-এর ধ্বনির সহিত অন্তস্থ:-র বা w-র ধ্বনি মিশ্রিত)। ফারসীতে এই ধ্বনি সাধারণ জ z-তে পরিবর্তিত হয়। মূল আরবী উচ্চারণে যেন Dhwafar, ফারসী উচ্চারণে ও তাহার অনুকরণে ভারতীয় উচ্চারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Zafar। "খান্" শব্দ তুর্কী ভাষার, ইহার মূল অর্থ "রাজা"—ইহা তুর্কীদের মধ্যে ব্যবহৃত আভিজাত্য-ও সম্মান-বাচক পদবী ছিল। পরে ফারসী ভাষাতেও এই পদবী গৃহীত হয়, এবং ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও ইহার ব্যবহার ক্রমে সাধারণ হইয়া দাঁড়ায়; এবং কচিৎ হিন্দু, এমন কি ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই পদবীর প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রিবেণীর একটি আরবী লিপিতে দফর (দরাপ) বা জফর খাঁকে "খান জফর (ধ্ব.ফর)" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম-প্রথম এই "খান্" পদবী কেবল তুর্কীদের নামেই ব্যবহৃত হইত।

আরবীর ধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণ করিবার চেষ্টা এখন হইতে ৬।৭।৮ শত বৎসর পূর্বে ফারসী-ভাষীদের মধ্যে অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। এইজন্য Dhwafar হইতে Dafar "দফর" রূপেব উদ্ভব সহজেই হইতে পারে; ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে নামটি রূপরামের ধর্মমঙ্গলে এই "দফর" রূপেই লেখা হইয়াছে। "দফর" হইতে বর্ণ-ব্যত্যয়ে "দরফ", পরে "দরপ" ও শেষে "দরাফ, দরাপ" এইরূপ পরিবর্তন সহজ। ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব ত্রিবেণীতে "জফর"-এর স্থানীয় উচ্চারণ "দপর" শুনিয়া গিয়াছেন (JRAS, 1847, p. 394); ১৮৭০ সালে ব্লকমান সাহেবও ত্রিবেণীতে "জফর"-স্থলে "দপর" শুনিয়াছিলেন (JASB., 1870)। সুতরাং Dhwafar বা Zafar হইতে "দফর, দপর, দরফ, দরাফ, দরাপ"। "ধ্ব।" বা "জোয়্" অক্ষরের মতো "দ্বাদ্" বা "জোআদ" অক্ষরের এবং "ধাল" বা "জাল" অক্ষরেব উচ্চারণও কেহ-কেহ আরবীর মোতাবেক শুদ্ধরূপে করিতে চেষ্টিত হইতেন; ইহার ফলে "খিদির, খিজির", "জোহা, দোহা", "ফদল, ফজল", "দ্বাল্লীন্, জাল্লীন্", পুরাতন বাঙ্গালা "করধা"=আধুনিক বাঙ্গালা "কর্জ, কর্জা=কর্জ", "সিলিমাবাজ, ফতেয়ারাজ=সিলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ", "কাগদ, কাগজ", "তাকাজ্জা"-স্থানে "তাকাদা" বা "তাগাদা", "খেদমৎ, খেজমৎ", প্রভৃতি বানান ও উচ্চারণ, প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় দেখা যায়।

"জফর খান্ (ধ্ব.ফর খান্)" হইতে "দরাফ বা দরাপ খাঁ"—এই তো গেল নাম-রহস্য। দরাফ খানের শিলালেখ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কী জানা যায়? ত্রিবেণীতে দফর বা দরাফ খাঁর যে সমাধি আছে, সেই সমাধি এখন "গাজীর কুলুঙ্গি" নামে প্রসিদ্ধ; এই নামটি, সমাধি-মধ্যে দুইটি লোহার কীলের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইয়াছে। এই সমাধির সংলগ্ন একটি মসজিদ আছে। সমাধি ও মসজিদ উভয়-ই এখন নিতান্ত ভগ্ন অবস্থায়। সমাধি ও মসজিদ উভয়-ই, হিন্দু যুগের একটি কালো পাথরের মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া, তাহার প্রস্তরাদি মাল-মশলা লইয়া তৈয়ারী হইয়াছিল। হিন্দু মন্দিরের নক্‌শা-কাটা পাথর এবং বহু দেবমূর্তি ও রামায়ণ-মহাভারতের খোদিত চিত্র দ্বারা অলংকৃত পাথর, মসজিদ ও সমাধির গায়ে এখনও লগ্ন আছে; ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব এগুলির কয়েকটি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন, এবং ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ" নামে ইংরেজীতে যে মূল্যবান্ প্রবন্ধ Journal of the (Royal) Asiatic Society of Bengal-এ প্রকাশিত করেন (পৃঃ ২৪৫-২৬২), তাহাতে এই-সব মূর্তি ও চিত্রের কথা এবং তলায় সেন-যুগের রাজাদের সময়ের বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত-ভাষায় চিত্রের বর্ণনা-মূলক যে লিপি আছে, তাহার চিত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

দরাফ খাঁ গাজী ছাড়া তাঁহার আত্মীয় আরও কতকগুলি ব্যক্তির সমাধি এই স্থানে আছে।

দরাফ খাঁ গাজীর যে তিনটি লেখ পাওয়া গিয়াছে, সেই তিনটি-ই আরবী ভাষায় রচিত। প্রথমটির পাঠ সর্বত্র অটুট নাই, কষ্টে পড়িতে হয়, অনেকটা এখন পড়াই যায় না। ইহা হইতেছে ২৪ ছত্রের একটি আরবী "কসীদা" বা কবিতা। ইহাতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জফর খানের (দফর খানের) বীরত্বের কথা আছে, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আছে। ১৭, ১৮ ও ১৯-এর ছত্র হইতে এই তথ্যটুকু পাওয়া যায়: "...তুর্ক ধ্বফর খান্, সিংহের মধ্যে সিংহ ...জনহিতকর ইমারত-নির্মাতাদের মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন যোদ্ধাদের পরেই, কাফেরদিগকে তরবারি ও বর্ষা দ্বারা আঘাত করিয়া, ও প্রত্যেক (মুসলমান)-কে প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিয়া..." ইত্যাদি। শেষের ছত্রে তারিখ দেওয়া আছে—হিজরা ৬৯৮, অর্থাৎ ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই লেখটিতে না। ? আর একটি নাম পাওয়া যায়,—নাস্থির মুহম্মদ ওরফে বুরহান কাদী (কাজী)। দরাফ খাঁর সমাধির মাতোয়ালীর কাছে যে "কুর্সী-নামা" বা বংশাবলী মনি-সাহেব ১৮৪৭ সালে পাইয়াছিলেন, তাহাতে দরাফ খান্ (জফর খান্)-এর অন্যতম পুত্রের নাম পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যায়—"বরখান্ গাজী"। এই "বরখান্ গাজী" (বড় খাঁ গাজী?) ও শিলালেখের "বুরহান্ কাজী" সম্ভবতঃ এক-ই ব্যক্তি।

দরাফ খাঁর দ্বিতীয় লেখটির তারিখ হইতেছে হিজরী ৭১৩, ১লা মহর্‌রম, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৩১৩, ২৮এ এপ্রিল। ইহা দুইখানি প্রস্তর-খণ্ডে উৎকীর্ণ। ইহাতে "দারু-ল্-খয়্‌রাৎ" (অর্থাৎ "মঙ্গলালয়") নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত আছে। শম্‌সুদ্দীন সুলয়্‌মান বা ফীরোজ় শাহ্ (১৩০২-১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ) তখন বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান ছিলেন। এই লেখে, জ়ফর খান্‌কে "বিখ্যাত খান্" ও নানা সদ্‌গুণের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ও তাঁহার পুরা নাম হিসাবে "খান্ মুহম্মদ ধ্ব.ফর খান্" বলা হইয়াছে। তৃতীয় লেখটিরও তারিখ ৭১৩ হিজরী=১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ; ইহাতে কেবল ঈশ্বরের স্তুতি আছে, কাহারও নাম নাই।

লিপি তিনখানি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম জয়ের পরেই, পাথরে তৈয়ারী স্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু মন্দিরটি ধ্বংস করিয়া তাহার মাল-মশলা লইয়া, বিজেতা বিদেশী তুর্কীরা একটি মসজিদ তৈয়ারী করে। সম্ভবতঃ ধ্ব.ফর (জ়ফর) খান্ ছিলেন এই বিজয়ী তুর্কী সেনার নেতা, কাফের-বধ ও তাহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া যোগ্য মুসলমান পাত্রে দান-রূপ পুণ্য কর্ম তিনি-ই করিয়াছিলেন; এবং হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসের উপরে প্রস্তুত প্রথম মসজিদটি তাঁহার-ই কীর্তি ছিল; কারণ, ১২৯৮ সালের কাব্যময় আরবী লিপিটিতে, তাঁহাকে "জনহিতকর ইমারত-নির্মাতা" বলিয়া প্রশংসা করা হইতেছে। বাঙ্গালার মুসলমান সুল্‌তান রুকনুদ্দীন কৈকাউস শাহের আমলে, জফর খান্ এই স্থান জয় করিয়া, উহার জায়গীরদার বা শাসক-রূপেই উপনিবিষ্ট হন বলিয়া-ই মনে হয়; কারণ এই ঘটনার ১৫ বৎসর পরে, সম্ভবতঃ তাঁহার মসজিদের সংলগ্ন স্থানেই, তিনি যে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় আরবী লিপিটি হইতে পাওয়া যাইতেছে; আরবী ও ফারসী ভাষা এবং মুসলমান শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচারের জন্য বাঙ্গালা প্রদেশে ইহার অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও বিদ্যালয়ের খবর এতাবৎ পাওয়া যায় নাই—এই ভাবে মুসলমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে ইনি সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশে প্রথম পথপ্রদর্শক হন। তৃতীয় লিপিটি ঈশ্বরের স্তুতিময়—এটির তারিখও মাদ্রাসা তৈয়ারীর তারিখ, ইহার আরবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লেখটি অতি সুন্দর ছাঁদের, সম্ভবতঃ এই লেখা মাদ্রাসার ভিত্তি-গাত্র অলংকৃত করিবার জন্য উৎকীর্ণ হয়। ধ্ব.ফর খান্ পরে ত্রিবেণীতেই দেহরক্ষা করেন, এবং সেখানেই সমাহিত হন ; তাঁহার বংশের কয় জনের সমাধিও ঐ মজারে বা গোরস্থানে বিদ্যমান।

উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর গ্রামের মসজিদে একটি আরবী শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, সেটির নির্মাতা অথবা নির্মাণের জন্য আজ্ঞাদাতা বলিয়া একজন ধ্ব.ফর বা জ়ফর খাঁর নাম পাওয়া যায়। এই শিলালেখটির তারিখ হইতেছে ৬৯৭ হিজরা, অর্থাৎ ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ত্রিবেণীর জফর খাঁর আরবী কবিতাময় লেখের এক বৎসর পূর্বেকার। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় JASB, 1909-এ প্রকাশিত তাঁহার পূর্বোল্লিখিত সপ্তগ্রাম-বিষয়ক প্রবন্ধে এবং তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ"-এ গঙ্গারামপুরের মসজিদের নির্মাতা জফর খাঁকে আমাদের ত্রিবেণীর জফর খাঁর বা দফর খাঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে তাহা হইলে জফর খাঁকে এক জায়গা হইতে বহুশত মাইল দূর অন্য জায়গায় টানিয়া আনিতে হয়। গঙ্গারামপুরের মসজিদও বাঙ্গালার সুল্‌তান রুক্‌নুদ্দীন কৈকাউস শাহের আমলে প্রস্তুত হয়, ইহা শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, গঙ্গারামপুরের মসজিদের নির্মাতা জফর খাঁ, ত্রিবেণীর জফর খাঁ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ত্রিবেণীর জফর খাঁর লম্বা চওড়া পদবী নাই, কেবল "তুর্ক জ়ফর খাঁ" এবং "বিখ্যাত খাঁ—খাঁ মুহম্মদ জ়ফর খাঁ", এই বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; এবং ত্রিবেণীর মাদ্রাসার লেখে তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, ঈশ্বর যেন তাঁহাকে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী করেন, এবং তাঁহার মিত্রদের রক্ষা করেন ; ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার শাসন, বা ত্রিবেণীতে তাঁহার অবস্থান, তখনও নিঃশঙ্ক বা নিরুপদ্রব হয় নাই। গঙ্গারামপুরের জফর খাঁর কিন্তু খুব জমকালো নাম ও পদবী দেখা যায়—"শিহাবু-ল্-হ.ক্ক ওঅ-দ্-দীন, সিকন্দর থানী (=দ্বিতীয় আলেক্সান্দর), উলুঘ্ অধ্ব.ম (অজ়ম্) হুমায়ুন ধ্ব.ফর (জ়ফর) খান্ বহ্‌রাম্ অয়্-তকীন্ সুলত্তান।" এই এতগুলি বিরুদ যাঁহার নামে ব্যবহৃত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়-ই কোনও অতি উচ্চপদস্থ এবং রাজবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন—তিনি সম্ভবতঃ দিল্লীর তুর্কী রাজবংশেরই কেহ ছিলেন, যাঁহাকে প্রায় স্বাধীন রাজার সম্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই লেখে দেওয়া হইয়াছে; "দ্বিতীয় আলেক্সান্দর", ইহা তো মহামহিম সম্রাটেরই উপাধি হইতে পারে; "উলুঘ্" শব্দ তুর্কী ভাষার, "অজম" আরবী ভাষার, দুইয়েরই অর্থ এক—"মহান্"; "হুমায়ুন জফর খান্" তাঁহার ব্যক্তিগত নাম—ত্রিবেণীর জফর খাঁর ব্যক্তিগত নাম হইতেছে "মুহম্মদ"; "বহ্রাম" ফারসী নাম বা উপাধি; "অয়্-তকীন" অর্থে "চন্দ্রদেব"—ইহা তুর্কী নাম বা উপাধি; ইঁহাকে আবার "সুল্তান" বা 'স্বাধীন রাজা' বলা হইয়াছে, এবং ইঁহার সম্বন্ধে শেষ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে "ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন, ও তাঁহার জীবন দীর্ঘ করুন।" আর একটি জিনিস লক্ষণীয়; গঙ্গারামপুরের জফর খান্ নিজেকে "গাজী" বলেন নাই—"গাজী" অর্থে, যে বিধর্মীদের সঙ্গে লড়াই করে। এতগুলি বিরুদ ১২৯৭ সালে নিজের নামের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া, এক বৎসরের মধ্যেই (১২৯৮ সালে) যে তিনি সে-সমস্ত বিরুদ পরিত্যাগ করিবেন, ত্রিবেণীতে হিন্দুদের সঙ্গে লড়িয়া তজ্জন্য কেবল "গাজী" উপাধি পাইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, এক বৎসরের মধ্যে ত্রিবেণী জয় করিয়া তাহার পাথরের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে কারুকার্য্য-ময় মসজিদ বানাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিবেন—এক ব্যক্তির পক্ষে ইহা কঠিন ব্যাপার; সুতরাং বলিতে হয়, গঙ্গারামপুরের জফর খান্ সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি।

ত্রিবেণীতে ব্লক্‌মান সাহেবের সংগৃহীত "কুর্সী-নামা"-তে জফর খাঁ-দরাফ খাঁর বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কাহিনীও ঐ "কুর্সী-নামা"-তে আছে। এই "কুর্সী-নামা"-র কাহিনী একেবারে অবিশ্বাস্য—জফর খাঁর শিলালেখের সঙ্গে তাহার কোনও সামঞ্জস্য হয় না। শিলালেখের প্রমাণে বুঝিতে পারা যায় যে, জফর খাঁ ত্রিবেণী-জয়ের পরে সেখানে অন্ততঃ ১৫ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। "কুর্সী-নামা"র মতে, শাহ্ জফর খাঁ গাজী কেবল হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার উদ্দেশ্যেই আসেন, এবং প্রথমে "মান নৃপতি" নামে একজন হিন্দু রাজাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু হুগলীর হিন্দু রাজা ভূদেব কর্তৃক নিহত হন। জফর খাঁর পুত্র Ughwan অগ্‌ওয়ান খাঁ তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, রাজা ভূদেবকে নিহত করেন, বহু হিন্দুকে মুসলমান করেন, ও রাজা ভূদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। জফর খাঁ-দরাফ খাঁর অধস্তন পুরুষদের বংশলতা ("কুর্সী-নামা"-মতে) এই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

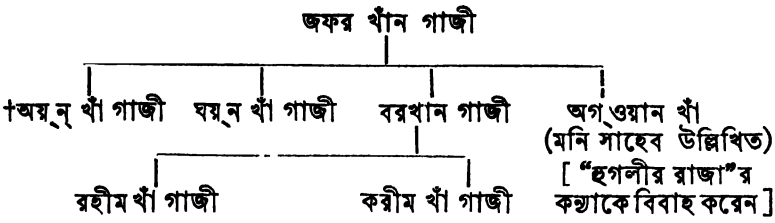

ইঁহাদের সকলের সমাধি ত্রিবেণীতে আছে—জফর খানের হিন্দু-রাজবংশ-জাত পুত্রবধূর-ও। এটি ছিল একটি গাজী-বংশ—সম্ভবতঃ এই বংশের প্রত্যেকেই আশ-পাশের হিন্দুদের সঙ্গে লড়িতেন। তবে ইঁহারা দুই পুরুষের পরে নিশ্চয়-ই আর খাঁটি তুর্কী রহিলেন না, এদেশের মেয়ে বিবাহ করিয়া ভারতীয় এবং বাঙ্গালীই বনিয়া গেলেন। তুর্কী-বিজয়ের একটি ধারা ইঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন—অর্থাৎ কোনও রাজ্যের রাজধানী দখল করিয়া, সেখানে উপনিবিষ্ট তুর্কী ও অন্য স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বাস কায়েম করা। সাতগাঁ ও ত্রিবেণী ত্রয়োদশ শতকের শেষে তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে, ঐ স্থান ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে মুসলমানদের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৪১৭ শকাব্দায়) বিপ্রদাস পিপ্লাই তাঁহার "মনসা-মঙ্গল" কাব্যে, চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা বর্ণনা-প্রসঙ্গে, সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর একটি উজ্জ্বল বিবরণ দিয়াছেন। হিন্দুতীর্থ সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কথা তিনি বলিতেছেন—

নিবষে জবন জতো তাহা বা বলি কতো মঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
ছয়দ মোলা কাজি কেতাব কোরান রাজি দুই ওক্ত করে তছলীম॥
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে ফয়তা কবরে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে॥

—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, JASB, 1909, পৃ. ২৫৪।

রূপরাম-ও ১৬৫৩ সালে বলিয়াছেন যে, দফর খাঁ গাজীর মোকামে ষোল শত কাজীর বা গাজীর বাস ছিল।

দফর খাঁ গাজীর গঙ্গাভক্ত হওয়ার কথা ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, "সুরধুনি মুনি-কন্যে" এই শ্লোকটিও অনুবাদের সহিত তিনি দিয়াছেন। মনি সাহেব যে একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন, তাহার পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি তাঁহার প্রবন্ধের শেষ অংশে ও অন্যত্র দিয়াছেন। হিন্দু দেব-বাদ তিনি বুঝিতে পারেন পাই, বুঝিতে চেষ্টাও করেন নাই; পতনের যুগের রোমানদের দেব-বাদের অনুরূপ বস্তু বলিয়া ইহাকে মনে করিয়া, দফর খাঁর গঙ্গাভক্তির এক উৎকট ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন; এবং অজ্ঞ ও নির্বোধের মতো যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা আবার কবিতার ভাষায় বর্ণনা করিবার হাস্যকর ও বিরক্তিকর প্রয়াস পাইয়াছেন। সাহেবের বিচার-বোধ ও কাণ্ড-জ্ঞান মতে, গঙ্গাদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া দফর খাঁ গঙ্গাভক্ত হইয়া উঠেন, এবং গঙ্গাকে মোক্ষদাত্রী ও মাতা বলিয়া স্তব করেন। এ সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন।

দফর খাঁর গঙ্গাভক্তির কোনও প্রমাণ আছে কি? কিংবদন্তী ও উপলব্ধ সংস্কৃত শ্লোকগুলি ভিন্ন আর কোনও পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে এই কিংবদন্তীকে তো একেবারে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। মুসলমান কবি য়াকুব আলী-ও প্রায় আড়াই-শত বৎসর পূর্বে দরাফ খানের প্রতি গঙ্গাদেবীর বিশেষ অনুগ্রহের কথা, মুসলমান আত্মসম্মান-জ্ঞান বজায় রাখিয়া, এইভাবে বলিয়াছেন—গঙ্গা তাঁহার ওজুর (অর্থাৎ নমাজের পূর্বে হাত মুখ ধুইবার) জল যোগাইতেন। কেবল তিনি যে সম্মুখে প্রবাহিত নদী গঙ্গার জলে ওজু করিতেন, এই কথাটুকু বলা-ই তাঁহার অভিপ্রেত নহে—মনে হয়, এখানে গঙ্গার সহিত দরাফ খাঁনের দেবী-ভক্ত সম্বন্ধ লইয়া যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রতি ইঙ্গিতও আছে।

আমার মনে হয়—প্রতিবেশ-প্রভাবের কারণে শেষ বয়সে দফর খাঁর হিন্দুয়ানির দিকে আকর্ষণ হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। প্রতিবেশ-প্রভাবে, দীর্ঘজীবন-লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে, বয়সের ধর্মে, অনেক কিছু-ই হয়। দফর খাঁ ছিলেন তুর্কী বিজেতাদের অন্যতম, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন যোদ্ধা, বিধর্মীর বিরুদ্ধে অভিযানকারী তুর্কী সওয়ার—chevalier বা knight; সেই জীবনের পরিচয় পাই তাঁহার ১২৯৮ খ্রীষ্টীয় সালের আরবী লেখের মধ্যে। ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার, প্রধানতঃ দুইটি বিভিন্ন পথ বা পদ্ধতি ধরিয়া হইয়াছিল—"তুর্কানা পদ্ধতি" ও "সুফিয়ানা পদ্ধতি"। তুর্ক সেনার দল, "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—"জিতিলে গাজী, মরিলে শহীদ", এইরূপ নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ চালাইত—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাফের-বধ, মূর্তি- ও মন্দির-ধ্বংস, মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ করা, জোর করিয়া মুসলমান করা, এই-সব ছিল পুণ্য কাজ ; আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিল, পরাজিত এবং ঈশ্বর-কর্তৃক অভিশপ্ত মূর্তি-পূজক বিধর্মী হিন্দুর ধন-রত্ন লুঠ করিয়া, তাহার নিকট হইতে পাওয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্যে নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া। তুর্কী-বিজয়ের প্রথম শতকে, সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া এই তুর্কানা ঢঙ্গে বা পদ্ধতিতে কাজ চলিতেছিল। ঐ শতকের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তেরর শতকের, বিখ্যাত সুফী মরমিয়া কবি পুণ্যশ্লোক সাধু মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী (জীবৎকাল খ্রীষ্টাব্দ ১২০৭-১২৭৩) সুদূর রূম বা এশিয়া-মাইনরে বসিয়া লিখিয়াছেন—

চুন্ মস্ত্-ই-অবদ্ গশ্তী, শম্শীর-ই অজল বি-সিতান্,
—হিন্দুয়ক্-ই-হস্তী-রা তুর্কানা তু নঘ্মা কুন্ ॥

"যখন তুমি ভবিষ্যতে অনন্তের (রসে) মাতাল হইবে, তখন অতীতের অনন্তের তলওয়ার লইবে ; তুমি জীবনকে লুঠিয়া লইবে, যে ভাবে (যে তুর্কানা ঢঙ্গে) তুর্ক হতভাগ্য হিন্দুকে লুঠ করে।"

কিন্তু এই জবরদস্তী রীতি কার্য্যকর হইল না—ইহার ফলে হিন্দুরাও আরও জোরে বাধা দিবার জন্য লাগিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আসিল সুফিয়ানা পদ্ধতিতে ইসলাম-প্রচার। সুফী সাধনার ও চিন্তাধারা এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান ও মনোভাব ছিল, যাহা হিন্দুরাও সমর্থন করিতে পারে। সুফী সাধকগণ শান্তিপূর্ণ-ভাবে হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা, সাধন-ভজন ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা, চারিত্র্যের দ্বারা, এবং কোথাও-কোথাও কেরামতি বা সিদ্ধাই জাহির করিয়া, আশ-পাশের হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুফী-বেশ-ধারী সকলেই যে সাধু পুরুষ ছিল, তাহা নহে ; ধর্মধ্বজী "পঞ্চম বাহিনী"র কাজ করিবার জন্য কেহ-কেহ হিন্দু রাজ্যে গিয়া বসিত, সুফী মতের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা কাহারও-কাহারও পক্ষে অসম্ভব হইল। সুফী-নাম-ধারী কতকগুলি মুসলমান, হিন্দু রাজ্যের অভ্যন্তরে আসিয়া, হিন্দু রাজার নিকট সাধন-ভজনের অনুমতি লইত। পরে ইহারা হিন্দুর নিকটে মহাপাতক-রূপে বিবেচিত গো-হত্যার অনুষ্ঠান করিত। রাজ্যস্বামী হিন্দু রাজা ইহাতে শাস্তি দিতেন। তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"অত্যাচারিত" মুসলমান, পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাজ্যে গিয়া ফরিয়াদ করিত; বিপন্ন মুসলমানকে রক্ষা করিবার অজুহাতে তখন মুসলমান রাজ্য হইতে বিজীগিষু মুসলমান সেনার আক্রমণ হইত। হিন্দু রাজার দেশে বহুদিন অবস্থান হেতু, তথা-কথিত এই মুসলমান সাধুর কাছে হিন্দু রাজ্যের সব খবর জানা থাকিত, তাহাতে মুসলমান সেনার পক্ষে হিন্দুদের জয়ে সহায়তা মিলিত। বাঙ্গালাদেশে ও অন্যত্র বহু হিন্দু রাজ্য মুসলমান অধিকারে আসার কাহিনী এই ধরণের। এইরূপ মুসলমান "সাধক"কে অবশ্য পরলোক-সর্বস্ব সত্যকার সূফী বলা চলে না। আবার আর এক শ্রেণীর সাধু ছিল, যাহারা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকের কাছে হিন্দু অনুষ্ঠানের, হিন্দু শাস্ত্রের এবং শাস্ত্রালোচনার নিন্দা করিত; কেবল বসিয়া বসিয়া নাম-জপ কর—শাস্ত্র-মত পূজা-পাঠ তীর্থ-যাত্রা প্রভৃতির কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহার ফলে, বহু সময়ে সাধনা না হইয়া সাধনার আভাস মাত্র দেখা দিত, এবং দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, যাহা সংস্কৃত সাহিত্যকে, ও তীর্থ-যাত্রার উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকে আশ্রয় করিয়া ছিল, তাহার উপরে আঘাত লাগিত। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে সাধনার দিকে যাঁহাদের ঝোঁক ছিল, তাঁহাদের মধ্যে তুলসীদাস-প্রমুখ সাধক ছিলেন—বিশেষ-ভাবে সংহত এবং শক্তিশালী মুসলমান রাজশক্তির সমক্ষে হিন্দু discipline বা পরিপাটী অথবা নিয়মানুবর্তিতাকে নষ্ট হইতে দিতে তাঁহারা চাহেন নাই। এই শ্রেণীর 'সূফী' সাধকদের দ্বারাও হিন্দু-সমাজের ভিতরে ভাঙ্গন ধরাইতে সাহায্য হইয়াছিল। হিন্দুজনগণের মধ্যে এইরূপ সূফী সাধকদের প্রভাব কতকটা নিশ্চয়-ই হইতেছিল। ইহার-ই প্রতিক্রিয়ার ফল—হিন্দু-সমাজে ভক্তিবাদের পুনঃপ্রচার, এবং সারা ভারত জুড়িয়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের ভাষানুবাদের সাহায্যে প্রাচীন সংস্কৃতির সংরক্ষণের চেষ্টা। কিন্তু তাহা হইলেও, সূফী প্রচারকদের মধ্যে সত্যকার জ্ঞানী ও দরদী সাধক, ঈশ্বরানুভূতি-যুক্ত বা দিব্যোন্মাদ-যুক্ত মহাপুরুষ কিছু-কিছু নিশ্চয়-ই ছিলেন। ইঁহারা-ই প্রকৃত-পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান চিন্তার সমন্বয়-কার্য্যে জ্ঞাত-সারে বা অজ্ঞাত-সারে আত্মনিয়োজিত হন। ব্যবহারিক জীবনে সূফীদের সব-চেয়ে বড়ো কথা ছিল—"সুলহ্-ই-কুল্ল্" অর্থাৎ 'বিশ্বমৈত্রী'। কেবল কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র, অন্য ধর্মের মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে সৌভাগ্য হইতে পারে না,—ঈশ্বরের অবমাননাকর এরূপ বিশ্বাস বা বোধ বা বিচার তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা নিজেরা অনেকেই অনুষ্ঠানিক-ভাবে ইসলামের সমস্ত নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম পালন করিতেন—ওজু, নামাজ, রোজা, সম্ভব হইলে জাকাত ও হজ, সব-ই করিতেন; কিন্তু অন্যধর্মাবলম্বী যাহারা তাহা করিত না, ভাবশুদ্ধির সঙ্গে যাহারা নিজেদের ধর্ম পালন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে ইঁহারা সহৃদয়তা ও উদার-ভাব পোষণ করিতেন। এই ভাবের ভাবুক হওয়ায়, সত্যকার সূফীদের চেষ্টায়, এবং উদারচেতা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, 'সন্ত', ভক্ত, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের সহযোগিতায়, প্রথম হইতেই ধীরে-ধীরে ভারতের পুণ্যভূমিতে একটি সত্যকার "মজ্‌মা-উ-ল্‌-বহ্‌রৈন্‌" অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সংস্কৃতি ও সাধনার 'মহাসাগরের সঙ্গম' হইতেছিল। কাশ্মীরের সুলতান জয়্‌নু-ল্‌-আবেদীন (১৪২০-১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে), মোগল সম্রাট্‌ আকবর ও তাঁহার কয়েকজন সভাসদ্‌, রাজকুমার দারা শেকোহ্‌, সন্ত কবীর, ভক্ত নানক, সন্ত দাদূ প্রভৃতি, ইঁহারা ছিলেন এই সমন্বয়ের নেতা। "তুর্কানা ঢঙ্গ"-এর অবসান কিন্তু এখনও হয় নাই; মুসলমান বলিয়া বিশেষ অধিকার যাহারা চায়, তাহারা সর্বদাই এই তুর্কানা ঢঙ্গকেই ভারতের মুসলমান সভ্যতার, মুসলমান রাজ্যের, মুসলমান জীবনের একমাত্র কথা বলিয়া, এই উৎকট আদর্শকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। ধর্মকে ইহারা বরাবর-ই অনুচিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পথ বলিয়া দেখিয়াছে, এবং সেই ভাবেই ধর্মকে অপমান করিয়াছে। এই মনোভাবেরই অবশ্যম্ভাবী বা সহজ পরিণতি ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এদেশে আসিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া, দফর খাঁ ত্রিবেণীতে বিজেতা তুর্কী রাজার জাতির সম্মানিত ব্যক্তি হইয়া বসিলেন। ধর্মের দিকে তাঁহার প্রাণের টান ছিল, সেই জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বাস-মতো মূর্তি-পূজার মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তুলিলেন। মোহম্মদীয় ধর্মের শাস্ত্রের জ্ঞান প্রচারিত হউক, এই উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসা স্থাপিত করিলেন, তাহার নাম দিলেন "দারু-ল্‌-খয়্‌রাৎ", অর্থাৎ 'পুণ্যকার্য্যের স্থান'। এই লেখে নিজেকে এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—"মুরব্বীউ-ল্‌-অর্‌বাবি-ল্‌-য়কীন", অর্থাৎ যাঁহারা নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী, "তরীকা" বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথের পথিক যাঁহারা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁহাদের মুরব্বা বা পৃষ্ঠপোষক। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে আকর্ষণের পরিচায়ক। জনশ্রুতি অনুসারে, তিনি গাজী অর্থাৎ তুর্কানা পথের যোদ্ধা হইতে, শেষে পীর অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার সাধক, প্রেমের সাধক, সুফী হইয়া যান। তখন তাঁহার কাছে হিন্দুর লৌকিক পূজার নূতন অর্থ প্রতিভাত হয়; হিন্দুর দেবতাবাদের সঙ্গে হিন্দুর দার্শনিক এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধারণার বিরোধ যে নাই, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশে একটি প্রধান তীর্থের শ্রেষ্ঠ মন্দির তিনি-ই হয়তো ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে মসজিদ বানান। কিন্তু অহরহঃ তাঁহার সমক্ষে সেই ত্রিবেণী তীর্থে হিন্দু ধর্ম-জীবনের, হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসের, সৌন্দর্য্য-সুষমাময় হিন্দু-ধর্মানুষ্ঠানের স্রোত, সম্মুখে প্রসারিত গঙ্গার স্রোতের মতোই প্রবাহিত ছিল। মনের গাঁঠ খুলিয়া গেলে সব-ই সহজ হয়; বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক ও রূপক যে বিভিন্ন ভাষারই মতো, এই উপলব্ধি তাঁহার আসিয়া যায়—গঙ্গা-ভক্তিকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারা যায়। এই সহানুভূতির ফল, এই মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভাষা-পরিবর্তনের ফল কি গঙ্গার স্তুতিময় শ্লোক—"সুরধুনি মুনিকন্যে"? ইহা অসম্ভব নহে যে, গঙ্গাষ্টকের শ্লোকগুলি কোনও সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দুর রচনা, পীর দফর খান্ গাজীর প্রতি রচয়িতা শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নামে এইগুলি তিনি প্রচারিত করেন;—সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু এই প্রশ্ন স্বতঃ মনে জাগে—তুর্কী বিজেতা খান্ দফর খান্ গাজী, বাঙ্গলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্থায়ী অধিবাসী হইয়া, পরিণত বয়সে কি জলালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ্ গাজীর অথবা আন্তোনি ফিরেঙ্গীর পূর্বাভাস-স্বরূপ হইয়াছিলেন? তাই কি তিনি গঙ্গার ভক্ত-রূপে বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন?

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মণিপুর-পুরাণ

আমাদের ভারতীয় হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা, এদেশে আগত আর্য্য এবং নানা অনার্য্য জাতির ধর্ম ও সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা এবং হোমাদি অনুষ্ঠান লইয়া, ইন্দ্র-অগ্নি-মিত্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজক আর্য্যগণ কবে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না—বিভিন্ন পণ্ডিত এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন ও করেন। কিন্তু যে-মতটি আমার নিকট যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে এই যে, আর্য্যেরা মেসোপোতামিয়া বা আধুনিক ইরাক দেশ হইয়া, পারস্য বা ঈরান ও আফগানিস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া, খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-এর পরে কোনও সময়ে ভারতে প্রবেশ করিতে থাকেন। ভারতে যে সমুদয় অন্-আর্য্য জাতির মানুষের সঙ্গে এই নবাগত আর্য্যদের সংঘর্ষ বা সংঘাত ও পরে মিলন ও মিশ্রণ ঘটিল, তাহারা ছিল তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর অথবা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ—[১] দ্রাবিড় (দাস বা দস্যু ও শূদ্র নামে আর্য্যদের দ্বারা অভিহিত); [২] নিষাদ (নিষাদদের উত্তর-পুরুষ পরে কোল্ল, ভিল্ল অর্থাৎ কোল ও ভীল নামে পরিচিত হয়—ইহাদের বংশধর হইতেছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোররা, হো, বীর-হড়, খাড়িয়া, ভুমিজ, কোর্কু, গদব, শবর এবং ভীল প্রভৃতি মধ্য- ও পূর্ব-ভারতের "আদিবাসী" জাতি); এবং [৩] কিরাত (ইহারা মোঙ্গোল-জাতীয়, ইহাদের নানা ভাষা হইতেছে ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—নেপালের ও হিমালয়ের সানুদেশের আদিম অধিবাসী নেবার, মগর, গুরুঙ্, কনাবরী, টীমাল, কিরান্তী, তামাঙ্, লেপ্চা, আবর, আকা, মিরি, ডফ্লা প্রভৃতি, এবং উত্তর-বঙ্গ ও আসামের তথা ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসিগণ—বোডো, মিকির, মিশ্মি, নাগা, কুকি, মেইতেই বা মণিপুরী প্রভৃতি এবং আসামে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আগত অহমগণ—ইহারা হইতেছে কিরাত-জাতীয় মানুষ। নিষাদগণ বোধ হয় ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী—ইতিহাস-পূর্ব যুগ হইতে ইহারা এদেশে বাস করিতেছে, ইহাদের-ই সত্যকার "আদিবাসী" বলা যায়। নিষাদগণের পরে পশ্চিম এশিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইতে দ্রাবিড়দের আগমন হয়—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০-এর পূর্বেই পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিরাট্ নাগরিক সভ্যতা (যাহার ধ্বংসাবশেষ এখন আমাদের বিস্মিত করিতেছে) খুব সম্ভব এই দ্রাবিড়-ভাষী মানুষের সৃষ্টি। নিষাদগণ ও দ্রাবিড়গণ প্রায় সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে কিরাতদের উপস্থিতির কথা আমরা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ হইতে জানিতে পারি; অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসরের পূর্ব হইতে কিরাতগণ আসাম ও হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালে, উত্তর-বিহারে, উত্তর- ও পূর্ব-বঙ্গে এবং আসামে উপনিবিষ্ট হইতে থাকে।

প্রভুশক্তিসমন্বিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুধীর এবং কল্পনাশীল আর্য্যগণ উত্তর-ভারতে দ্রাবিড, নিষাদ ও কিরাতগণের সংস্পর্শে আসিল, তাহাদের বিজেতা-রূপে। প্রথমটায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বলিয়া ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, যাহার আভাস আমরা ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাই। পরে আর্য্যগণ এদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বসিবার সঙ্গে-সঙ্গে, দেশের আদিম অধিবাসীরা আর্য্যদের ভাষা গ্রহণ করিতে থাকে,—দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং কিরাত গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষার মধ্যে ঈপ্সিত ও আবশ্যক যোগসূত্র রূপে আর্য্যভাষার বিশেষ উপযোগিতা বা কার্য্যকারিতা ছিল বলিয়া, আর্য্যভাষা সহজেই প্রসার লাভ করিতে থাকে। এক-ই আর্য্যভাষা লইয়া যখন আর্য্য, দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং উত্তরে হিমালয়-অঞ্চলে ও পূর্বে উত্তর-বিহারে ও উত্তর-বঙ্গে এবং পূর্ব-বঙ্গে ও আসামে একটি সমভাষিক জনগণ বা রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছিল, তখন হইতে জন-সমাজের অলক্ষ্যে ইহাদের ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত মিলন ঘটিতে থাকে। এই-সকল জাতির মধ্যে নিশ্চয়-ই এমন লোক কিছু-কিছু ছিল, যাহারা অন্য জাতির ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত মিশ্রণ চাহিত না। কিন্তু আর্য্যভাষী ব্রাহ্মণাদি চিন্তানেতাদের মনীষা, তাঁহাদের উদারতা ও দূরদৃষ্টি, এই সাংস্কৃতিক মিলনকে একটি পরিপূর্ণ নবীন সংস্কৃতির গঠনের পথে চালিত করিতে সমর্থ হয়। অনার্য্য দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাতের প্রাচীন দেব-বাদ ও পুরাণ-কথা, আর্য্য দেব-বাদ ও পুরাণ-কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত হইয়া, ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়া, হিন্দু পুরাণ-কথায় পরিণত হয়।

প্রাচীন-ভারতে হিন্দু ধর্মে এই দুই ধারার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সচেতন ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র ও অনুষ্ঠানকে দুইটি মুখ্য ভাগে ভাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করেন—বৈদিক শাস্ত্র বা "নিগম", এবং বেদেতর বা অবৈদিক শাস্ত্র বা "আগম" ; বেদান্ত শাস্ত্রও "নিগমান্ত বিদ্যা" নামে পরিচিত। হিন্দু মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনার্য্য জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহাদের নিজস্ব দেবতাদের ও প্রাচীন রাজাদের কাহিনী—এক কথায়, তাহাদের পুরাণ-কথা—নূতন মিলিত আর্য্যানার্য্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া, কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া, সংস্কৃত ভাষায় নব-কলেবর প্রাপ্ত হয়, ও তদনন্তর নিখিল ভারতের গ্রহণযোগ্য হয়। এই ভাবে বিশাল অরণ্যানীবৎ হিন্দু-জগতের পুরাণ-কথা সংস্কৃত রামায়ণে, মহাভারতে ও অষ্টাদশ মহাপুরাণে ও উপপুরাণে, দ্রাবিড় দেশের নানা স্থল-পুরাণে, "স্বয়ম্ভূ-পুরাণ" প্রভৃতি নেপালের বৌদ্ধপুরাণে, এবং প্রাকৃতে ও আধুনিক আর্য্য ভাষায় নিবদ্ধ, তথা বিভিন্ন অনার্য্য ভাষায় মৌখিক কাহিনীরূপে প্রচারিত, সমগ্র ভারতের পুরাণ-কথা গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহার একটা বড়ো অংশ প্রাচীন কালেই (অর্থাৎ এদেশে তুর্কীদের আগমনের পূর্বে) এবং কিছু পরেও সংস্কৃত পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, বহু স্থলে একটি সমগ্র অনার্য্য-ভাষী জাতি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া দুই-তিন পুরুষের মধ্যে হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে আমাদের চোখের সামনে বহু দ্রাবিড়-গোণ্ড জাতির লোক, কোল-জাতির লোক, এবং নেপাল ও অন্যত্র কিরাত-জাতির লোক হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মানুভূতি এবং পুরাণ-কথা যথারীতি সংস্কৃতে বিধৃত হইয়া, বৃহত্তর হিন্দু-পুরাণের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; বহুশঃ সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত হওয়ার ফলে, এই প্রকার অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও পুরাণ নিখিল-ভারতের দ্বারাও গৃহীত হইয়াছে।

বহুস্থলে আবার দেখা যায়, এইরূপ অনার্য্য পুরাণ আর্য্যানার্য্য বা হিন্দু পুরাণের প্রভাবে আসিয়া গেলেও, তাহার নিজের একটি সংস্কৃতেতর আদিম-গন্ধী রূপও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মধ্য-ভারতের বিভিন্ন দ্রাবিড়- ও কোল-ভাষী জাতির মধ্যে, এবং এখন আর্য্যভাষী হইলেও যাহার মূলতঃ দ্রাবিড়- ও কোল-ভাষা বলিত এমন (হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে গৃহীত) নানা জাতির মধ্যে, যে-সকল পুরাণ-কথা প্রচলিত আছে, সেগুলির সংগ্রহ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ Verrier Elwin ভেরিয়ার্ এল্‌উইন্ এ বিষয়ে লক্ষণীয় কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গত নভেম্বর মাসে (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) আমি মণিপুরে যাই—কেবল দুই দিনের "ঝাঁকী দর্শন" এবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কিছু বই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, মণিপুরের ইতিহাস ও folk-lore অর্থাৎ "লোকযান" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়নও করিয়াছি, এবং স্থানীয় দুই-চারিজন সুধী ও পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপও করিয়াছি। মণিপুরীরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, খ্রীষ্টিয় ১৫০০-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রসার লাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আদি কালের ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মণিপুরী হিন্দু-ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট হইতে আগত বাঙ্গালী হিন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন: ইঁহাদের অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর নগর, মণিপুরে হিন্দু সংস্কৃতির একটি প্রাচীন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। মণিপুরী (বা মেইতেই) জাতি, বিরাট্ কিরাত-জাতির ভোট-ব্রহ্ম-শাখার অন্তর্গত কুকি (বা চিন, অথবা কুকি-চিন) প্রশাখার একটি বিশিষ্ট উপজাতি। সৌন্দর্য্য-বোধে এবং কর্ম-কুশলতায়, তথা চিন্তাশীলতায় ও মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত-জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজেদের প্রাচীন দেব-কথা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই; ইহা একাধারে ইহাদের রক্ষণশীলতার ও জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আনুষঙ্গিক আত্মসম্মান-জ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক। আবার ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হিন্দু-পুরাণের সঙ্গে নিজেদের পুরাণ-কথাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টাতেও, অজ্ঞাত-সারে আর্য্যানার্য্য-সম্মেলনের মহৎ কাজে ইহাদের অংশ-গ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মণিপুরের প্রচলিত হিন্দু ধর্মে এক দিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতির সম্মানপূর্ণ স্থান আছে, অন্য দিকে তেমনি বিশিষ্ট মণিপুরী দেব-কাহিনী ও হিন্দু-পূর্ব যুগের নানা রীতি-নীতি অনুষ্ঠান পদ্ধতি ইহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অনেকটা জুড়িয়া আছে। মণিপুরের চিন্তাশীল নেতৃবর্গের আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, এই উভয়ের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা, এবং মণিপুরের জীবনে হিন্দু দর্শন ও উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ কথাগুলিকে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলা। মণিপুরকে নিখিল-ভারতের অংশ রূপেই ইঁহারা দেখেন। মণিপুরে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণ প্রচারে যিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, "মণিপুরী পুরাণ" ও সংস্কৃত পুরাণকে একত্র গ্রথিত করিয়া দিতে যিনি নিজ পাণ্ডিত্যের পূর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং যিনি মণিপুরী ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের সেবার জন্য নিখিল ভারতের সাধুবাদ পাইয়াছেন, মণিপুরের সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আতোম্‌বাপু শর্মা সাহিত্যরত্ন পণ্ডিতরাজের নাম এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরের দেব-কথা ও মণিপুরের ইতিহাস, কি ভাবে হিন্দু ভারতীয় দেব-কথা ও ইতিহাসের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, কি ভাবে মণিপুরের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের টানার উপরে ভারতীয় মিশ্র আর্য্যানার্য্য হিন্দুদের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের পড়িয়ান আনিয়া, মণিপুরী হিন্দুত্বের অভিনব ধূপছায়া বস্ত্র বয়ন করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই ভাবে, মিশ্র মণিপুরী (মেইতেই বা কুকি-চিন্) ও হিন্দু-শাস্ত্রীয় পুরাণ-কাহিনীকে আমরা "মণিপুর-পুরাণ" আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি। বলা বাহুল্য, এই পুরাণ-কথা সংস্কৃত ভাষায় অথবা বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ হয় নাই—আংশিক-ভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইংরেজীতে ইহা আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা এখনও মণিপুরীতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আসামের শান-গোষ্ঠীর অহম বা অসম জাতির পুরা-কথা লইয়া তেমনি একখানি অলিখিত "অসম-পুরাণ"-ও আছে। বাঙ্গালার ভগিনী, আর্য্য অসমীয়া ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ত-সার পাওয়া যায়। অনুরূপ অলিখিত "ত্রিপুর-পুরাণ" সম্ভবতঃ ত্রিপুরা বা টিপ্‌রা জাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতগণের মধ্যে ("চন্তাই"-গণের মধ্যে) অনুসন্ধান করিলে মিলিবে; এবং কাছাড়ীদের "হিড়িম্বা বা হেরম্ব-পুরাণ", এবং খাসিয়া ও জৈন্তিয়াদিগের "জয়ন্তী-পুরাণ"-ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া আছে।

নিম্নে এই "মণিপুর-পুরাণ"-এর কতকগুলি লক্ষণীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মণিপুরীদের প্রাচীন দেবতারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবতাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হন। "মৈ" হইতেছেন ব্রহ্মা, "ইশিঙ্" হইতেছেন বিষ্ণু, ও "মুঙ্শিৎ" শিব; তেমনি "শোরারেল্" বা "শোরারেন্" হইতেছেন ইন্দ্র, "মারুজিঙ্" কুবের, "খোরিফাবা" বরুণ, "বাঙ্ত্রেল্" যম, "ইরুম্" অগ্নি, এবং "তাওরোইনাই" হইতেছেন নাগ-রাজ অনন্ত।

শিব ও পার্বতী বিশেষ করিয়া মণিপুরে অবস্থানের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মণিপুরে "নোঙ্মাইজিঙ্" বা নীলকণ্ঠ-গিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কতকগুলি পর্বত বাসের জন্য তাঁহাদের মনঃপূত হইল। এই পর্বতগুলি এখন মণিপুরের বিভিন্ন তীর্থ-রূপে পরিচিত, এই-সব স্থানে সহস্র-সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। মণিপুরে শিব নূতন করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার একটি নূতন নাম হইল—"পোইরেইতোন্" অর্থাৎ 'যিনি নূতন স্থানে আসিয়াছেন'।

শিব মণিপুরে আসিয়া সপ্তশীর্ষ "সানাজিঙ্" বা স্বর্গভূমি হইতে সাত জন দেবতার আবির্ভাব ঘটাইলেন। ইঁহারা সাতটি গ্রহের রূপে বিদ্যমান আছেন—(১) "নোঙ্মাইজিঙ্" বা সূর্য্য, (২) "নিঙ্থোউকাবা" অর্থাৎ চন্দ্র, (৩) "লেইপাকপোকু" অর্থাৎ মঙ্গল, (৪) "য়ুম-সাইকে-সা" অর্থাৎ বুধ, (৫) "সাগোলসেল্" অর্থাৎ বৃহস্পতি, (৬) "ইরাই" অর্থাৎ শুক্র, ও (৭) "থাঙ্জা" অর্থাৎ শনি। ইঁহাদের মধ্যে মঙ্গলের মহিষমুণ্ড, বুধের গজমুণ্ড, বৃহস্পতির হরিণমুণ্ড ও শুক্রের ব্যাঘ্রমুণ্ড।

শিব ও পার্বতী তৎপরে মণিপুর রাজ্যের ঈশান-কোণে (উত্তর-পশ্চিমে) অবস্থিত "কোউ-ক্রু" বা কুমার-পর্বতে গিয়া অবস্থান করিলেন। মণিপুরে ইঁহাদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইঁহারা এখানে আসিয়া রাস-নৃত্য করিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাস-নৃত্য করিতেছেন, তখন গোপেশ্বর শিব ও দেবী রাস-মণ্ডপের বাহিরে দ্বারে দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত। ভিতরে রাস-নৃত্যের বাদ্য ও ধ্বনি শুনিয়া দেবীর আকাঙ্ক্ষা হইল যে, তিনিও রাস-দর্শন করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি শিব ও উমাকে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে গিয়া নিজেরা যাহাতে রাস-নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নির্দেশ করিলেন। মহারাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ইঁহারা মণিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং "কোউ-ক্র"পাহাড় রাসের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া, শিব ও উমা বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু দেশটি নানা নদীর জন্য জলময় ছিল। যাহাতে দেশটি শুষ্ক হইয়া যায়, তজ্জন্য শিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন আগমন করিলেন; একটি বিশেষ অঞ্চল জলশূন্য হওয়ায় উহা "বিষ্ণুপুর" নামে পরিচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সঙ্গে দশ জন দেবতা আসিলেন—"হাওবা শোরারেল" বা ইন্দ্র, "মার্‌জিঙ্‌" বা কুবের, "য়াঙ্‌ত্রেল্‌" বা যম, "খোরিকাবা" বা বরুণ, "ইরুম্‌-নিংথৌ" বা অগ্নি, "থাঙ্‌জিঙ্‌" বা অশ্বিনীকুমার অথবা নির্ঋতি, "চিঙ্‌খেই-নিঙ্‌থোই" বা ঈশান, "লোইয়া-লাকৃপা" বা বায়ু, এবং "নোঙ্‌সোবা" ও "কোঙ্‌বা-মেইরোম্‌বা"। ইঁহাদের চেষ্টায় সমস্ত দেশটি আর্দ্রতা হইতে মুক্ত হইল, এবং এই দশজন দেবতার প্রথম আটজন, অষ্ট দিক্‌পাল হইলেন, কেবল "নোঙ্‌সাবা" ও "কোঙ্‌বা-মেইরোম্‌বা" ইন্দ্রের সহিত পূর্বের অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিলেন। মণিপুরে শিব ও পার্বতী আসিয়া পর্বতের অধিবাসী-রূপে কেবল কিরাত-জাতীয় লোকেদের দেখা পান।

দেশটি পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত হইলে পরে, শিব ও উমার রাস-নৃত্যের আয়োজন হইল। জগৎপিতা ও জগন্মাতার মহারাস উপলক্ষ্যে দেবতারা নানা বাদ্য-যন্ত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্ত-নাগ নিজের মাথার মণির দ্বারা সাত দিন সাত রাত ধরিয়া, মহারাসের অবসান পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশ আলোকিত করিয়া রাখিলেন; সেইজন্য দেশটীর নাম হইল "মণিপুর"। মণিপুর এই ভাবে সৃষ্টির উষঃকালে হর-পার্বতী রাস-নৃত্যে দ্বারা পবিত্র হইল; দেবতারা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং মণিপুরের ভূমিকে আশীর্বাদ করিলেন—চিরকাল এই দেশ হরিদ্‌বর্ণ থাকিবে, এবং পরমেশ্বরের প্রতি দেশবাসীর অচলা ভক্তি থাকিবে। পূর্বে শিবের নাম অনুসারে দেশের নাম হইয়াছিল "শিব-নগর," মহারাসের পর হইতে ইহা "মণিপুর" নামেই প্রসিদ্ধ হইল।

দেবতারা শিবকেই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু শিব অনন্ত-নাগকে দেশের রাজা করিলেন। বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে মণিপুরের ভূমিতে এক স্থানে একটি সুরঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পার্শ্বে একটি পাহাড়ের উপরে অনন্ত-নাগের রাজপাট ও সিংহাসন স্থাপিত হইল। কার্ত্তিকেয় ও গণেশের মূর্তি রাজবাটীর সিংহদ্বারের দুই পাশে স্থাপিত হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজবাটী স্থাপনের পরে, সময় নির্দেশের জন্য একটি তালমান-যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল। অনন্ত-নাগ দেবতাদের প্রীতির জন্য নৌকা লইয়া বাইচ-খেলার প্রবর্তন করিলেন। এই বাইচ-খেলায় দেবতা ও অপ্সরোগণ যোগ দিয়া আমোদ পাইলেন। দোড়ি টানিয়া শক্তি-পরীক্ষা খেলার পরিবর্তে, লম্বা দণ্ড লইয়া টানাটানি খেলারও প্রবর্তন হইল। "মারুজিঙ্" বা কুবের-দেব, "কাঙ্-জেই" অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া পোলো-খেলা আবিষ্কার করিলেন; দেবতারা সাত জন সাত জন করিয়া দুইটি প্রতিযোগী দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম এইরূপ ক্রীড়া করিলেন। এই পোলো-খেলার দ্বারা দেবতারা প্রীত হন; সেইজন্য দেশে কোনও মহামারী দেখা দিলে, মণিপুরীরা দেবতাদের নামে পোলো-খেলার লাঠি ও গোলা উৎসর্গ করিয়া থাকে।

এই ভাবে মণিপুরের প্রথম রাজা হইলেন অনন্ত-নাগ। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া তিনি মণিপুর হইতে তাঁহার নিজ রাজ্য পাতালে ফিরিয়া গেলেন। অনন্ত-নাগ মণিপুরের প্রথম রাজা ছিলেন বলিয়া, মণিপুরের রাজাদের বিশেষ লাঞ্ছন হইতেছে, মুকুট মাথায় জটিল গ্রন্থির আকারে বিন্যস্ত নাগ-মূর্তি; এই মূর্তির চিত্র তাঁহাদের রাজকীয় পতাকায় অঙ্কিত থাকে।

অনন্ত-নাগের পরে মণিপুরের রাজা হন চিত্রভানু নামে গন্ধর্ব। কি ভাবে তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সম্বন্ধে মণিপুরের প্রাচীন পুরাণ-কথায় কিছু-ই উল্লিখিত নাই।

মণিপুরের প্রথম মানুষের সৃষ্টি কি করিয়া হয়, সে সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটিকে হিন্দু-পূর্ব বা আর্য্য-পূর্ব যুগের মেইতেই বা মণিপুরী সৃষ্টি-কথা বলিতে পারা যায়। মণিপুরী ভাষার পুরাণ ("লৈথাক্-লৈখারোল্") অনুসারে, শিব এই সৃষ্টি-কথা প্রথমে গণেশকে শুনান। এই সৃষ্টি-কথা হইতেছে এই প্রকার।

পরমেশ্বর "আতিয়া-গুরু-শি-দবা", স্বর্গে যাঁহার বাস ("আতিয়া" অর্থে আকাশ বা স্বর্গ, "গুরু" সংস্কৃত শব্দ, "শি-দবা" অর্থে অমর), তিনি মানব সৃজন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্বীয় দেহ হইতে "কোদিন্" নামে এক দেবতার সৃষ্টি করিলেন। কোদিন্‌কে আজ্ঞা দেওয়া হইল, এমন একটি প্রাণী সৃজন করিতে, যে জন্ম হওয়ার কারণেই মৃত্যুর অধীন হইবে। কোদিন্ তখন সাতটি ভেক ও সাতটি বানর সৃজন করিয়া,শি-দবা গুরুর সমক্ষে স্থাপিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করিলেন। শি-দবা গুরু কিন্তু ইহাতে খুশী হইলেন না; এই জীবগুলির জ্ঞান-বিচার এবং অনুভব-শক্তি ছিল না। তিনি কোদিন্‌কে বলিলেন—"দেখ, আমি এই দাঁড়াইয়া আছি; আমার রূপ বা ছায়া ধরিয়া কোনও প্রাণী সৃজন কর।" কোদিন্ তখন তদনুসারে নূতন একটি রূপ বা আকার গঠন করিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রাণ-শক্তি দেওয়া কোদিন্-এর সাধ্যের বাহিরে ছিল। তখন শি-দবা গুরু তাহাতে প্রাণ-বায়ু সঞ্চারিত করিলেন, এবং এইভাবে মানুষের উদ্ভব হইল। ভেক সাতটিকে তিনি জলে ছাড়িয়া দিলেন, ও বানর সাতটিকে পাহাড়ে পাঠাইলেন; মানুষ আসিয়া উপত্যকায় বাস করিতে লাগিল।

ইহার পরে আতিয়া-গুরু-শি-দবা মানবের রূপে সূর্য্য ("নুমিৎ") ও চন্দ্র ("থা") সৃজন করিলেন; সূর্য্যের নাম হইল "কোজিন্-তু থোক্‌পা" ও চন্দ্রের "আশিবা"। ইহার পরে গুরু শি-দবা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন।

আতিয়া-গুরু-শি-দবা পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে একটি সুরঙ্গ-পথ দিয়া, প্রথম প্রকট হন। এই সুরঙ্গ-পথ বা গহ্বর বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে প্রস্তুত হইয়াছিল। শি-দবা গুরুর সঙ্গে সাতজন অপ্সরা বা দেবীও পৃথিবীতে আসেন। এই সাতজন দেবী (মণিপুরী ভাষায় ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম আছে) সাত গ্রহ-দেবতার সহিত বিবাহিত হন; এবং এই সাত দেব-দম্পতীর প্রত্যেকের একটি করিয়া পুত্র হয়। সেই পুত্রেরা মণিপুরী জাতির সাতটি "শালৈ" অর্থাৎ উপজাতির অথবা গোত্রের পূর্বপুরুষ। আর্য্য বা হিন্দু গোত্রের সহিত এই সাতটি গোত্রের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যথা—(১) "অঙোম্" =ভারদ্বাজ, মতান্তরে কৌশিক; (২) "নিঙ্‌থৌজা"=শাণ্ডিল্য; (৩) "লুরাঙ্" =কাশ্যপ; (৪) "খুমোল্" বা "খুমোন্"=মৌদ্‌গল্য (এই গোত্র-নাম ক্বচিৎ "মধুকুল্য" রূপেও বিকৃত হইয়াছে); (৫) "খাবা-ঙাঙ্‌বা"=নৈমিষ্য, মতান্তরে ভারদ্বাজ; (৬) "মোইরাঙ্"=আত্রেয়; এবং (৭) "চেঙ্‌লোই" =ভারদ্বাজ। গুরু শি-দবা পরমেশ্বরের দ্বারা সাতটি গোত্রের আদি-পুরুষ নির্ধারণের কথা, হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার সাত মানস-পুত্র সপ্তর্ষি হইতে নানা ঋষি বা আর্য্য গোত্রের উদ্ভবের কথার অনুরূপ। মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আবার এই সপ্ত "শালৈ" বা গোত্রের আদি পুরুষগণের উদ্ভব হয় গুরু শি-দবার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে—সপ্ত গ্রহদেবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সহিত সপ্ত দেবী ও অপ্সরোগণের বিবাহের ফলে নহে। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস মত, যেমন ব্রহ্মার বা ঋগ্বেদোক্ত "পুরুষ"-এর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উদ্ভব হয়, তেমনি গুরু শি-দবার দক্ষিণ চক্ষু ও বাম চক্ষু, দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণ, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র ও বাম নাসারন্ধ্র, এবং দন্ত হইতে এই সাত "শালৈ"-এর আদি পুরুষগণ আবির্ভূত হন।

মণিপুরী পুরাণ "লৈথাক্-লৈখারোল্" গ্রন্থে অন্যত্র মণিপুরের আদিম দেবতাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটি হইতেছে "পাখাঙ্বা" (বা "সেন্ত্রেঙ্") ও "শেনামাহি" (বা "কুপ্ত্রেঙ্") দেবতাদ্বয়ের উপাখ্যান, ইঁহারা পরমেশ্বর গুরু শি-দবার পুত্র। ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইঁহারা পিতার অনুমতি লইয়া মণিপুরে আসিলেন। পিতার প্রতি ইঁহাদের ভক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে, গুরু শি-দবা মৃত গাভীর আকার ধারণ করিয়া বিজয়া-নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। সেন্ত্রেঙ্ দেব অনুমানে বুঝিলেন যে এই মৃত গাভী আর কেহ-ই নহে, গুরু শি-দবা। দুই ভাইয়ে তখন মৃত গাভার দেহ টানিযা ডাঙ্গায় তুলিলেন। গুরু শি-দবা গাভীর দেহ হইতে বাহির হইয়া স্বরূপে দেখা দিলেন ও পুত্রদেব বলিলেন যে, তিনি তাহাদের পিতার প্রতি শ্রদ্ধা দর্শনে তুষ্ট হইয়াছেন—সেন্ত্রেঙ্-কে তিনি নূতন নাম দিলেন "পাখাঙ্বা" অর্থাৎ 'যে পিতাকে চিনে' ("পা"=পিতা, "খাঙ্বা" =চেনা, জানা)। দুই ভাই মৃত গাভীর শরীর কাটিযা, সাত "শালৈ" বা গোত্র-পতির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। একজন পাইলেন চোখ দুইটি ও অধোদেহের কিছু অংশ, একজন মাথার খুলি, একজন হৃৎপিণ্ড, একজন চারিটি পা, ইত্যাদি। গোরুর চামড়া একস্থানে শুখানো হইল, সেই স্থানের নাম "কাঙ্লা" ("কাঙ্বা"=শুখানো হইতে)। সাত গোত্রপতি তখন মৃত গাভীর দেহের অংশ লইয়া অগ্নিতে যজ্ঞ করিলেন। এই প্রাচীন কুকি-উপাখ্যানে এই যজ্ঞের কথার অবতারণা করিয়া, ইহাতে হিন্দু বৈদিক ধর্মের হাওয়া একটু বহানো হইয়াছে।

গুরু শি-দবা বলিলেন, দুই ভাইদের মধ্যে যে প্রথম সারা জগৎ ঘুরিয়া আসিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি রাজা করিয়া দিবেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে কুপ্ত্রেঙ্ (বা শেন্যামাহি) জগৎ-পরিক্রমা করিবার জন্য কাঙ্লা হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিনির্গত হইলেন, কিন্তু "লেইমারেন্-শিদাবি" নামে দেবতার পরামর্শে সেন্‌ত্রেঙ্ (বা পাখাঙ্‌বা) পিতার সিংহাসনের চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। গুরু-শি-দবা ইহাতে প্রীত হইলেন, এবং সেই প্রদক্ষিণকেই তিনি জগৎ-পরিক্রমার অনুরূপ স্থির করিয়া, পাখাঙ্‌বা-কে রাজা করিয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বজগৎ ঘুরিয়া আসিয়া কুপ্‌ত্রেঙ্ দেখিলেন যে, ভাই রাজা হইয়া বসিয়াছেন। (মাতা পার্বতীকে পরিক্রমণ করা-ই জগৎ-পরিক্রমার তুল্য, এইরূপ একটি উপাখ্যান আমাদের মধ্যেও আছে—গণেশ এইভাবে কার্ত্তিককে বোকা বানান।) ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কুপ্‌ত্রেঙ পাখাঙ্‌বার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। পাখাঙ্‌বা ভয় পাইয়া অপ্সরা বা দেবকন্যাদের আশ্রয় লইলেন। দেবকন্যারা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, ও "আউগ্রিহাঙেন্" নৃত্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। কুপ্‌ত্রেঙ্ বা শেনামাহি তখন পাখাঙ্‌বার বিনাশের জন্য ভূমির উপরে নিজের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া চাপ দিলেন। ইহাতে পাতাল হইতে গুরু শি-দবা বাহির হইয়া আসিলেন। পাতালের অনন্ত-নাগ ("তাওরোই-নাই") ছিলেন তাঁহার বাহন। গুরু শি-দবা দুই ভাইয়ের বিরোধ শান্ত করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, পর-পর এক-এক বছর করিয়া দুইজন রাজত্ব করিবেন। যিনি রাজত্ব হইতে বিরত থাকিবেন, তিনি মণিপুরের প্রত্যেক ঘর হইতে লেইমারেন্-শিদাবি দেবতার সঙ্গে মিলিত-ভাবে রাজার যোগ্য পূজা পাইবেন। ইহার পরে গুরু শি-দবা অন্তর্হিত হইলেন, লেইমারেন-শিদাবি দুই ভাইকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গুরু শি-দবা হইতেছেন পরমাত্মা পরমেশ্বর। তখন ভগবান্ শিবও পঞ্চানন-রূপে দেখা দিলেন; এবং সূর্য্যদেব জ্বলন্ত অগ্নির রূপে অতি উজ্জ্বল মূর্তিতে প্রকট হইলেন।

পূর্বে বর্ণিত অনন্ত-নাগ ও দুই ভাই দেবতা পাখাঙ্‌বা ও শেনামাহির রাজত্বের পরে, গন্ধর্ব চিত্রভানু মণিপুরের রাজা হন। মণিপুরের আদি পুরাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের ও মহাভারতের সামঞ্জস্য করিয়া, অভিনব মণিপুর-পুরাণ গ্রথিত হয়। নারায়ণের নাভিকমল-জাত ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন মরীচি মুনি, তৎপুত্র কশ্যপ মুনি, কশ্যপের পুত্র সূর্য্যদেব, সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণ মুনি, তৎপুত্র চিত্রকেতু, তৎপুত্র চিত্রধ্বজ, তৎপুত্র চিত্রবীজ, তৎপুত্র চিত্রসর্ব, তৎপুত্র চিত্ররাজ, তৎপুত্র চিত্রভানু। চিত্রকেতু হইতে চিত্রভানু পর্য্যন্ত সকলেই গন্ধর্ব ছিলেন। অপুত্রক চিত্রভানুর একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তৃতীয় পাণ্ডব মহাভারতের নায়ক অর্জুনের পত্নী হন ; চিত্রাঙ্গদার ও অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন, বভ্রুবাহনের পুত্র সুপ্রবাহ, তৎপুত্র যবিষ্ঠ।

অর্জুনের আগমন-সম্পর্কে মণিপুরের কতকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-কথার সহিত এখানে মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলন ঘটানো হইয়াছে। মণিপুরের ইতিকথায়, ব্রাহ্মণ্য ও মণিপুরী পুরাণ মিলাইয়া প্রাচীন রাজাদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিন্তু ঐতিহাসিক স্থিরতা নাই। একটি মত অনুসারে, বভ্রুবাহনের পৌত্র যবিষ্ঠ, অন্য মত অনুসারে বভ্রুবাহনের পরে তেরো জন রাজা, তৎপরে যবিষ্ঠ। এই তেরোজনের মধ্যে প্রথম দুইজনের মাত্র সংস্কৃত নাম, তাহার মধ্যে একটি অতি আধুনিক ছাঁদের "কলাপচন্দ্র", অন্যটি "শক্তি" ; বাকী ১১টি মণিপুরী ভাষার। যবিষ্ঠের মণিপুরী নাম হইতেছে "পাখাঙ্‌বা" ; উপরে বর্ণিত গুরু শি-দবার পুত্র দেবতা ও রাজা পাখাঙ্‌বার নাম অনুসারে ইঁহার এই মণিপুরী নাম হয়। সম্ভবতঃ মণিপুরী ঐতিহ্যের নামী রাজা পাখাঙ্‌বার সহিত, গন্ধর্বরাজকুমারী ও পাণ্ডব অর্জুনের উত্তর-পুরুষ রাজা যবিষ্ঠকে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাখাঙ্‌বার সম্বন্ধে কতকগুলি লোকপ্রিয় উপাখ্যান আছে। মণিপুরী তারিখ-গণনার মতে, পাখাঙ্‌বা হইতেছেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মানুষ—৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নাকি তিনি মারা যান। রাজা "ইঙেউ-পান্‌বা" ইঁহার পিতা। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। জন্মকালে ইঁহার নাম দেওয়া হয় "মেইদিঙ্গু", পরে নাম দেওয়া হয় "পাখাঙ্‌বা"। পাখাঙ্‌বার রাজত্ব নানা কারণে মণিপুরীদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সময়ে মণিপুরী গোত্র এবং গোত্র-জাত বিভিন্ন বংশ বা পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, সামাজিক নানা নিয়ম বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত করা হয় (যেগুলি মণিপুরীদের সমাজে এখনও কার্য্যকর হইয়া আছে)। পাতলা কাঁসার খণ্ডের এক প্রকার মুদ্রা ইঁহার সময়ে প্রচলিত হয় ; এই মুদ্রার নাম "শেল্"। "চেইথারোল্-কুম্বাবা" নামে বর্ষপঞ্জী লিখিবার রীতি ইঁহার-ই রাজত্ব-কালে প্রবর্তিত হয় বলিয়া কথিত। "মাকেঙ্"-গোত্রের জনৈক সরদারের কন্যা "লাই-স্রা"-র প্রেমে পড়িয়া তাঁহাকে ইনি বিবাহ করেন—পাখাঙ্‌বা ও লাইস্রাকে লইয়া মণিপুরের পুরাণে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাখাঙ্‌বার পর হইতে মণিপুরের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রথম কতকগুলি রাজার সুদীর্ঘ রাজত্বের কথা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই ইতিহাস পুনর্গঠিত হইবার কালে কতকগুলি নাম পাওয়া যায় নাই। এই রাজাদের রাজত্ব-কালে প্রধান-প্রধান ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকলেরই দুইটি করিয়া নাম মিলে—একটি সংস্কৃত, অন্যটি মণিপুরী। যেমন "কোইবা-তোম্বা" বা ক্ষেমচন্দ্র, "কোম্বোউবা" বা কবিচন্দ্র সিংহ, "অয়াংবা" বা অখণ্ড-প্রতাপ সিংহ। খ্রীষ্টীয় ১১২৭ থেকে ১১৫৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন "লোয়াম্বা" বা লবঙ্গ সিংহ; ইঁহার-ই রাজত্বকালে মণিপুরের বিখ্যাত প্রেমমূলক উপাখ্যানের নায়ক "খাম্বা" ও নায়িকা রাজকুমারী "থোইবি" জীবিত ছিলেন—ইঁহাদের উপাখ্যানকে মণিপুরীদের 'জাতীয় উপাখ্যান' বলা যাইতে পারে; এই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা—বীর যুবক খাম্বা-র নানা বীরকার্য্য দেখাইয়া, শত্রুর নানা ষড়যন্ত্র ও বিরোধকে ব্যর্থ করিয়া, রাজকুমারী থোইবিকে বিবাহ করা, ও শেষে খাম্বা-র নির্বুদ্ধিতায় উভয়ের মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত গাথা মণিপুরীরা এখনও গান করিয়া থাকে; এবং এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক মণিপুরী কবি নাটক লিখিয়াছেন, ও আধুনিক মণিপুরের প্রধানতম কবি স্বর্গীয় হিজুম আঙাঙ্‌হাল্ সিংহ ৩৯,০০০ ছত্রের এক বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। খাম্বা-থোইবির উপাখ্যান মণিপুরীদের সম্বন্ধে প্রামাণিক ইংরেজী গ্রন্থ T. C. Hodson হড্‌সন্-রচিত The Meitheis (London, 1908)-তে পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয় তাঁহার "বিচিত্র মণিপুর" পুস্তকে (২য় সংস্করণ, ১৩৫৩) ইহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন।

পুরাণ ছাড়িয়া আমরা মণিপুরের ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া পঁহুছাই রাজা কিয়াম্বা বা ক্যাম্বার সময়ে (রাজত্বকাল, খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকে; ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন)। ইঁহার সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় প্রকারের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মণিপুর রাজবংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যায়। মণিপুরে ব্রাহ্মণের বাসও হইতে থাকে। "পা'মহেইবা" বা গরীব-নিরাজ অথবা গোপাল সিংহ অষ্টাদশ শতকে (১৭০৯-১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে) বিশেষ প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। ইনি রামানন্দী গোঁসাই সন্তদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, মণিপুরে রামচন্দ্রের উপাসনা প্রবর্তিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"মোরাম্বা" বা গৌরশ্যাম সিংহ মণিপুরের রাজা হন। ইঁহার নাম হইতে বুঝা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গৌরশ্যামের পরে, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ (বা "চিঙ্‌আঙ্‌-থাম্বা"), ১৭৫৯ হইতে ১৭৯৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার আমলে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম রাজার, রাজবংশের ও জনসাধারণের ধর্ম রূপে গৃহীত হয়। নবদ্বীপ হইতে গোস্বামী ও ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মণিপুরের বৈষ্ণব ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন।

মণিপুরের প্রাচীন দেবতা-বিষয়ক উপাখ্যানগুলি পূর্ণভাবে আলোচিত হয় নাই। আদিম মণিপুরী পুরাণ সমস্ত-ই প্রাচীন মণিপুরী ভাষায় লিখিত। "মুমিৎকাপ্পা" বলিয়া একটি প্রাচীন পুরাণ-কথা হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার বইয়ে প্রাচীন মণিপুরীতে, আধুনিক মণিপুরী ও ইংরেজী অনুবাদের সহিত, প্রকাশিত করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত নলিনী ভদ্র ইহার বাঙ্গালা করিয়া দিয়াছেন। মণিপুরী ভাষা কবে প্রথম লিখিত হয়, তাহা জানা যায় না। প্রাচীন মণিপুরী বর্ণমালায় এই-সমস্ত পুরাণ-কথার পুথি পাওয়া যায়, সেগুলির আলোচনার সূত্রপাত-ও ভালো করিয়া হয় নাই। এই বর্ণমালা বাঙ্গালা ও নাগরীর আধারের উপরে গঠিত হইয়া, কয়েক শত বৎসর পূর্বে হিন্দুধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে মণিপুরী ভাষার জন্য গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে মণিপুরীরা বাঙ্গালা লিপি গ্রহণ করিয়াছে; এখন মণিপুরী ভাষা বাঙ্গালা লিপিতেই লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে—কিন্তু কয়েকজন মণিপুরী লেখক ও স্বজাতীয়-সংস্কৃতি-প্রিয় অন্য ব্যক্তি, পুরাণো বর্ণমালাকে আবার ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন। *

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৪]

* এই প্রবন্ধ মুখ্যতঃ শ্রীযুক্ত মুত্তুম বুলন সিংহ-রচিত মণিপুরী ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিল্প-কলা

॥ শ্রীঃ ॥

॥ ওঁ নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ॥

তোমাকে নমস্কার ; তুমি চিৎ বা জ্ঞান-শক্তি ; সমস্ত
রূপ বা নেত্র-গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের আভ্যন্তর আত্মা তুমি ॥

পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের পরিচালকগণ আমাকে কলা-বিভাগের সভাপতি নির্বাচন করিয়া আমায় বিশেষ-ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার আলোচ্য বিদ্যা বা ব্যবসায় মুখ্যতঃ হইতেছে ভাষা-তত্ত্ব—এই বিদ্যা বা বিজ্ঞানের সহিত সুকুমার শিল্প বা কলার কোনও সংযোগ বাহ্যতঃ দৃষ্ট হয় না ; ভাষা-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা, আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পর-বিরোধী বলিয়া-ই মনে হয়। শিল্প-কলার সহিত আমার পরিচয় গভীর নহে, এবং আমার পরিচয় বিশেষজ্ঞের পরিচয় নহে—শিল্প-কলা আমার মুখ্য উপজীব্য বা আলোচ্য বিষয় নহে। তবে আমি শিল্প-কলার একজন অনুরাগী—শিল্প-কলার চর্চাকে আমার জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দ-রূপে গণ্য করিয়া থাকি, এমন কি ইহাকে আমার একটি ব্যসন বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ব্যবসায়ীর পরিবর্তে আপনা ব্যসনীকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং ব্যসনী কেবল বিষয়ের প্রতি আন্তরিক প্রীতির বলেই এই গুরুভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছে। অনধীতশাস্ত্র অব্যবসায়ীর আলোচনায় শাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে ; যদি এক্ষেত্রে শাস্ত্রের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা অশ্রদ্ধা-প্রসূত হইবে না—সুধীগণ তাহাকে অজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

* * *

ঘরবাসী-ই হই আর পরবাসী-ই হই, আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে ভালোবাসি। সাহিত্য, অর্থাৎ ভাষায় রচিত কাব্য নাটক উপন্যাস প্রবন্ধাদি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিবিধ প্রকাশের মধ্যে অন্যতম মাত্র। 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'সংযোগ', 'সঙ্গ' বা 'সংসর্গ' ; ব্যাকরণ, অলংকার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছন্দঃশাস্ত্রের 'সহিত' আলোচিত হয় বলিয়া-ই কেবল ভাষা-নিবদ্ধ রস-রচনার যে 'সাহিত্য' সংজ্ঞা আলংকারিকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাকে আমরা আধুনিক যুগে ধীরে-ধীরে আরও ব্যাপক করিয়া লইয়াছি। এখন জীবনের সহিত মিলিত হইয়া, জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাহা কিছু বিদ্যমান, সে-সমস্তের প্রকাশ যদি বাঙ্ময় রূপে দেখা দেয়, তাহা হইলে সেগুলিকেও 'সাহিত্য' নামে আমরা অভিহিত করিয়া থাকি ; গীতি-কবিতা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও অন্য গদ্য রচনা প্রভৃতি 'সুকুমার সাহিত্য'-ই কেবল সাহিত্য-পদবাচ্য নহে—বাঙ্ময় ইতিহাস, দর্শন, মানব-জীবনের বিশেষ কতকগুলি দিকের সহিত সম্বন্ধ রাখে এমন বিজ্ঞান (অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বাকৃতত্ত্ব প্রভৃতি), এগুলিকেও আমরা ব্যাপক-ভাবে সাহিত্যের পর্য্যায়েই ফেলিয়া থাকি। ভাষাশ্রিত সাহিত্য বা 'বাঙ্ময়' ভিন্ন, মানব-সংস্কৃতির আরও অন্য নানাপ্রকারের প্রকাশ আছে, যেমন—সংগীত ; নৃত্য ; বাদ্য ; নানাপ্রকারের অনুষ্ঠান ; এবং শিল্প-কলা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এগুলি বাঙ্ময়ের সহিত জড়িত (যথা, সংগীত) ; অথবা শ্রোত্রগ্রাহ্য বাঙ্ময়ের স্থলে, এগুলি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নেত্র-গ্রাহ্য এবং স্থিতিশীল রূপময় প্রকাশ (শিল্প-কলা—বাস্তুশিল্প, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা) ; কিংবা শ্রোত্র- ও নেত্র-গ্রাহ্য অথবা কেবল নেত্র-গ্রাহ্য গতিশীল ছন্দোময় বিকাশ (অভিনয়, নৃত্য)। কেবল বাঙ্ময়ের আলোচনায় সমগ্র সংস্কৃতির বোধ হয় না ; এই জন্য, বাঙ্ময়কে মুখ্য করিয়া ধরিলেও, কোনও জাতির সংস্কৃতিকে সব দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে, বাঙ্ময়ের সহিত আনুষঙ্গিক-ভাবে দর্শন ও বিজ্ঞান, সংগীত ও শিল্প, অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন বাঙ্গালীর সমগ্র সংস্কৃতির আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সেই হেতু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে আমরা অতি সহজ-ভাবে রসানুভূতি-গ্রাহ্য বঙ্গীয় বাঙ্ময়ের সঙ্গে-সঙ্গে, বঙ্গভাষার সাহায্যে দর্শন বিজ্ঞান আদি বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়েরও প্রসঙ্গ করিয়া থাকি, শিল্প-কলা ও সংগীতের আলোচনাকেও বর্জন করি না।

* * *

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'শিল্প-কলা'। বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তু-জগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ—এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের অনুভূতি এবং রূপের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্প-সৃষ্টি। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা আধিমানসিক জগৎ—ইহাদের বিরোধ কল্পনা করিলে, রূপ-শিল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কেবল অনুকৃতিতে শিল্প হইতে পারে না; এবং ভৌতিক জগতের আধারে বিদ্যমান চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রতীককে আশ্রয় না করিলে, আধ্যাত্মিক বস্তুর শিল্পময় প্রকাশও অসম্ভব। অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তি—প্রতিস্পর্ধন ও প্রকাশ—এই দুইটি-ই শিল্পের মৌলিক বা মুখ্য প্রেরণা। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জাতি ও সভ্যতার পারিপার্শ্বিক অনুসারে শিল্প-রচনা বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে বিভিন্ন কালে নানা বিশিষ্টতা বা স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়। কিন্তু এই বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও, মূল প্রেরণাদ্বয় এক অখণ্ড মানব-জাতির মধ্যে সর্বত্র-ই মিলে বলিয়া, এবং অনুকৃতি ও অভিব্যক্তি বিষয়ে সমগ্র মানব-জাতি এক-ই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া, মানবের মনের শিল্পময় প্রকাশও অখণ্ড এবং এক। তদনুসারে, সার্থক শিল্প দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ নহে—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, সকল দেশের রসিক-জনের আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। মানব-সমাজের কৃত্রিম জাতি-বিভাগের ঊর্ধ্বে যেমন সাধারণ একটি মানবিকতা বিদ্যমান, তেমনি বিভিন্ন জাতিতে ও কালে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন নানা প্রকারের শিল্পের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে, শ্রেষ্ঠ শিল্প-রচনার মধ্যে একটি সার্বজনীনতা বিদ্যমান আছে, তাহার অস্তিত্ব এবং প্রভাব এত অধিক যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্পগুলিকে পরস্পর-বিরোধী পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। মানসিক অন্য নানা ব্যাপারের মতো, শিল্পকে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্ত্য', Greek and Gothic, Western and Oriental', Ancient and Modern. প্রভৃতি বিভিন্ন বিরোধী শ্রেণীতে রাখা কঠিন। শিল্পের প্রকাশ-ভঙ্গী নানা প্রকারের, কিন্তু ইহার মুখ্য প্রাণ-বস্তু এক এবং দেশ-কালাতিগ—কোনও জাতির শিল্প আলোচনার কালে, বিশেষ করিয়া একাধিক জাতির শিল্পের তুলনা-মূলক আলোচনার কালে, আমাদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে।

* * *

শিল্প অনুকৃতিময় হইবে কিংবা ছন্দোময় হইবে, অথবা প্রতীকময় হইবে কিংবা ভাবময় হইবে, অথবা এই একাধিক প্রকাশ-ভঙ্গীর মিশ্রণ-জাত হইবে—ইহা নির্ভর করে, শিল্পের আবশ্যকতা, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের উপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুকৃতি ও প্রকাশ, এই মৌলিক প্রেরণাদ্বয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তৃতীয় প্রেরণা-রূপে আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনকে উল্লেখ করিতে হয়। সকল যুগে বা সকল জাতির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজন এক-ই প্রকারের থাকে না। আদিম প্রত্ন-প্রস্তর যুগে মানুষ যখন হাড় বা শিঙের উপরে পাথরের ছুরি চালাইয়া হরিণ, মাছ বা বুনো ঘোড়ার ছবি খুদিত, রঙ দিয়া পাহাড়ের গায়ে ঘোড়া, গোরু, মহিষ বা শূকরের ছবি আঁকিত, তখন তাহার যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য আজকালকার পরের মুখ চাহিয়া যাহাকে থাকিতে হয় না এমন প্রচুর-বৈভবশালী স্বাধীন শিল্পস্রষ্টার নহে; এবং যাহাকে ফরমাইশ-মতো বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ইহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক্। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিল্পী মূর্তি খুদিত বা ছবি আঁকিত, এই মূর্তি বা ছবির magic বা মায়াজাল বিস্তার করিয়া বন্য পশুকে সহজে মৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে; ছবির জাদুতে বা সম্মোহনী শক্তিতে পশু-মৃগয়াকে সহজ করিয়া আহার্য্য সুলভ করা-ই ছিল প্রাগৈতি-হাসিক যুগের শিল্পীর মুখ্য প্রেরণা—ইহা-ই নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। কিন্তু মৃগয়ার জন্য মায়াজাল বুনিবার উদ্দেশ্য একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিতে পারে নাই—অলংকরণ এবং সৌন্দর্য্য-বোধের প্রেরণাও যে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীর মনে ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত আছে। উত্তর-কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মানুষের হাতের কাজ শিল্প-বস্তুতে, সম্মোহনী ও সৌন্দর্য্য-বোধ, উভয় প্রকারের তাগিদ, পৃথক্ বা মিলিত-ভাবে শিল্প-রচনায় কাজ করিয়া আসিয়াছে। আদিম যুগে যে জাদু বা সম্মোহনীর প্রয়োজন শিল্প-প্রাণের বা শিল্প-রচনার আবাহন করিয়াছিল, পরবর্তী কালে মানবের আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই জাদু বা সম্মোহনী, দেবপ্রতীকের এবং ধর্মানুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় শিল্প-চেষ্টায় উন্নীত হইল। আদিম মানবের জাদুবিদ্যার প্রয়োগে যে বাদ্য, যে মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত, তাহার আধারের উপরে সংগীত—বিশেষ করিয়া ধর্ম-সংগীত এবং স্তোত্রাদি আধ্যাত্মিক সাহিত্য—গঠিত হইল। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষের হৃদয় ও মন—মানুষের ভাব-জগৎ—অপার্থিব অনুভূতির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সংগীত, পাঠ ও অনুষ্ঠানের ন্যায়, শিল্প-ও হইল ধর্মের সেবায় আত্ম-নিয়োজিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সৌন্দর্য্য-বোধ দ্বারা উদ্বোধিত অপার্থিব সত্তার অনুভূতি অথবা অনুভূতির আভাস—সুসভ্য জন-সমাজে এখন ইহা-ই হইতেছে শিল্পের চরম উদ্দেশ্য। শিল্পের এই উদ্দেশ্য প্রাচীন মিসরে, বাবিলনে, এবং বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীসে, ভারতবর্ষে ও বৃহত্তর ভারতে—বৌদ্ধ চীন ও জাপানে, এবং মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতে দেখা যায়। যে-সকল জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং লক্ষণীয় শিল্প রচনা করা যাহাদের দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শিল্পের আদর হইয়াছে ধর্মের বা আধ্যাত্মিক সাধনার পথ হিসাবে। তাহারা মানব-জাতির গৌরব-স্বরূপ বিভিন্ন শিল্প-শৈলী বিশ্বমানবকে উপহার দিয়া গিয়াছে। যে-জাতি বাস্তব সভ্যতায় পিছনে পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যেও শিল্পের আকর্ষণ দেখা যায়—ধর্মানুভূতি তাহাদের মধ্যেও শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে; যেমন আফ্রিকার নিগ্রো-জাতীয় লোকেরা। কিন্তু সভ্যতার পথে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর য়িহুদী ও আরবদের মধ্যে ধর্ম-সাধনায় রূপ-শিল্পের স্থান সংকুচিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই হওয়া সম্ভব যে, য়িহুদীদের ও আরবদের আদি পুরুষ উত্তর-আরবের মরুবাসী শেমীয় জাতির মধ্যে আদিম যুগেই তাহার ধর্ম-বোধে প্রতীকের ভীতি আসিয়া যায়। শেমীয় জাতির মধ্যে প্রাচীনতম কালে সভ্যতার উন্নতি তেমন হয় নাই, তাই শিল্প-কলা তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; শিল্প-সম্বন্ধে অক্ষমতা, এই জাতির মনে প্রতীক বা মূর্তির সম্মোহনী শক্তি বিষয়ে একটা ভয়ও আনিয়া দিয়াছিল; এবং আদিম মনোভাবের পরিচায়ক এই ভয়, পরে কল্পনাস্তর-অসহিষ্ণু দেবকল্পনা-বিশেষের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে, আরও সুদৃঢ় হইয়া, মূর্তি-প্রতীকের বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। অহৈতুক ভয় হইতেই অহৈতুক বিদ্বেষের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, এবং ক্বচিৎ নাসিকা—এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের সহযোগে আমরা চিত্তকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া লইতে পারি। এইজন্যই ধর্মানুষ্ঠানে মূর্তি বা চিত্রের এবং সংগীত বা পাঠের স্থান অল্প-বিস্তর সকল ধর্মেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে, মন্দিরে ও দেবায়তনে ধূপ-ধুনা, সুগন্ধি কুসুম প্রভৃতির ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ধর্ম-সাধনায় যাঁহারা মূর্তি বা রূপ-শিল্প বর্জন করিতে চাহেন, অথচ সংগীত বা পাঠ বজায় রাখেন, ধূপ-ধুনার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রোত্র ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে প্রশ্রয় দিয়া নিতান্ত অযৌক্তিকতার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়কে পরিহার করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিল্প-সম্বন্ধে সুসভ্য হিন্দু, গ্রীক ও চীনা জাতির (এবং এই তিন জাতির শিষ্য-স্থানীয় আরও কতকগুলি জাতির) মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক্—এই তিন প্রাচীন জাতি রূপ-শিল্পকে মানবের এক প্রধান কৃতিত্ব বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। গ্রীক-জাতির শিল্প-প্রাণতার কথা আমরা সকলেই জানি ; বিশ্বমানবকে গ্রীক-জাতির প্রতিভা অপরূপ শিল্পের মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। চীনা ও জাপানী জাতিদ্বয়ের শিল্প-চেতনাও পৃথিবীতে অপূর্ব, এবং আধুনিক জগতে একক। ভারতবর্ষে শিল্প সেদিন পর্য্যন্ত জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া-ই ছিল—দৈনন্দিন জীবন হইতে শিল্পকে পৃথক্ করিয়া দেখা হইত না। তাই, ভারতীয় জনগণের শিল্প-বোধ স্বত-উৎসারিত হইয়া-ই বিদ্যমান থাকিত, তাহার পৃথক্ বিশ্লেষের জন্য পণ্ডিতগণ চেষ্টিত হন নাই। সাহিত্য-বিচারে, দর্শনে ও অন্য কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের চিন্তানেতৃগণ যেমন শক্তি দেখাইয়াছেন, রূপ-শিল্পের চর্চায় তেমন শক্তি দেখান নাই। গুপ্ত-যুগে ভারতীয় শাস্ত্রের ও শিল্পের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ভরত, দণ্ডী, মম্মট প্রভৃতির মতো রূপ-শিল্পের সমালোচক পণ্ডিত দেখা দিলেন না। এইখানে ভারতীয় সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশের একটা দিক্ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

* * *

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্য-বোধ ও শিল্প-চেতনা সম্বন্ধে ভারতীয় বাঙ্ময় একেবারে নীরব নহে। সৌন্দর্য্য-বোধ ভারতের আর্য্যজাতির মধ্যে যথেষ্ট ছিল—এবং সুসভ্য অনার্য্য জাতিগুলির মধ্যেই যে ভারতের রূপ-শিল্প জন্ম গ্রহণ করে, ও প্রথম বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করে, আজকাল একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। জগতে কোনও কিছুকে ভালো বা লক্ষণীয়, প্রধান বা তুলনায় উৎকর্ষযুক্ত হইতে হইলে, তাহার প্রধান উপলব্ধি-যোগ্য গুণ থাকিবে, তাহার সৌন্দর্য্য ; ভারতের আর্য্যজাতির সুপ্ত চেতনায় সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষের পরস্পরের সংযোগ সম্বন্ধে এই প্রকার বোধ বা বিচার ছিল। সেই জন্য 'শ্রী'-শব্দ হইতে সাধিত, 'শ্রী'-র তারতম্য- বা অতিশায়ন-বাচক দুইটি শব্দ 'শ্রেয়স্, (শ্রেয়ান্, শ্রেয়সী, শ্রেয়ঃ)' এবং 'শ্রেষ্ঠ', সংস্কৃত ভাষায় সর্ববিধ উৎকর্ষের, এমন কি চরম বা পরম উৎকর্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। 'শ্রী' শব্দের প্রধান ও প্রাচীনতম অর্থ, নেত্রের সাহায্যে দর্শনীয় দ্যুতিমান্ সৌন্দর্য্য ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে এই 'শ্রী' বা 'সৌন্দর্য্য' আছে, তাহা-ই 'শ্রেয়স্', তাহা-ই 'শ্রেষ্ঠ'—সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ দুই যেন মিশিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, কোনও পদার্থ 'সুন্দর' হইলেই মঙ্গলময় হইবে—এই বোধেই সৌন্দর্য্য-বাচক 'কল্যাণ (কল্য)'-শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'সুন্দর' (যে অর্থ 'কল্য'-শব্দের গ্রীক প্রতিরূপ kalos, kallos-এ পাই), 'মঙ্গল, ক্ষেমংকর' এই অর্থে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যের মনোভাব যেন গ্রীক আর্য্যের মতোই ছিল—গ্রীকদিগের kaloskagathos আদর্শের অনুরূপ—'যাহা সুন্দর, তাহা-ই ভালো'। আবার, যাহা ভালো করিয়া বুঝা যায়, চিৎশক্তির দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা-ই 'চিত্র (চিৎ-র') অর্থাৎ 'সুন্দর'। এইরূপ কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করিয়া জর্মান পণ্ডিত Oldenberg ওল্ডেনব্যার্গ ভারতের আর্য্যজাতির চিত্তে অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর মতো একটি সৌন্দর্য্য-বোধের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সহজ সৌন্দর্য্য-বোধের স্রোতস্বতী আর্য্য ও অনার্য্য নির্বিশেষে ভারতের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনো অবলুপ্ত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান তাহার মূর্তি- বা রূপ-বিরোধী ভাব-সম্পুট ভারতে লইয়া আসিলেও, রূপ-রসিক পারস্যের প্রভাবে ইতিপূর্বেই এই ধর্মের রূপ-বিরোধিতা অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তুর্কী, ঈরানী ও অন্য বিদেশীয় মুসলমানের আগমনে এদেশে রূপ-শিল্পের ধ্বংস ঘটে নাই;—বরঞ্চ, পারস্যের মুসলমান সভ্যতার সহিত ভারতের হিন্দু মনোভাবের আশ্চর্য্য সাহ. .্য ঘটায়, ভারতে মোগল চিত্রকলার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।

* * *

শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যুগের ঋষিদের চিন্তা বা ধারণা যে কত উচ্চ ছিল, তাহা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের এই বচনটি হইতে অনুধাবন করা যাইবে—

॥ আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে ॥ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ পঞ্চিকা, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম মন্ত্র)।

নিশ্চয়-ই, শিল্প-সমূহ আত্ম-সংস্কৃতির কারণ। যজমান বা শিল্পানুষ্ঠাতা নানা প্রকার শিল্পের দ্বারা নিজ আত্মাকে পরিপূর্ণ-রূপে ছন্দোময় করিয়া থাকেন ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মানুষকে উন্নত ও উন্নীত করিতে যে শিল্পেরও সামর্থ্য আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ স্বীকার করিয়াছেন। উপরে প্রদত্ত মন্ত্রাংশের পূর্বে ঋষি বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন—'হস্তী, কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্'—হাতীর দাঁতের কাজ (মূর্তি, ফলক প্রভৃতি), কাংস্য বা তামা, কাঁসা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্য, বিচিত্র বসন, স্বর্ণালংকার ও নানাপ্রকার স্বর্ণ-শিল্প, অশ্বতরী-যুক্ত রথ—এই প্রকারের শিল্প। এই সব শিল্প-রচনায় বা দর্শনে মানুষের মনকে সংস্কৃতিযুক্ত করে, উদার করে, বিশ্বাত্মার সহিত মিলিত-ভাবে ছন্দোময় করে।

জগতে নিসর্গ-জাত বস্তুর পরেই, মানুষের হাতের শিল্প-রচনাকে ভগবানের সত্তার এবং তাহাতে নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্য্যের অংশ-স্বরূপ বলা যায়। গীতায় বলা হইয়াছে—

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ (১০।৪১)

তুমি ইহা জানিও যে, বিভূতি- বা ঐশ্বর্য্য-যুক্ত, শ্রী- বা শোভা-যুক্ত এবং শক্তিমান্ বা প্রভাব-শালী যে-যে পদার্থ আছে, সে-সমস্ত-ই আমার-ই তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন॥

—এ কথা শিল্প-সম্বন্ধেও বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

* * *

ব্যক্তি-গত ও সমাজ-গত জীবনে শিল্পের প্রভাব লইয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে, অনেক কথা বলা যায়। আমি নিজ ব্যক্তি-গত কথা দুই-একটি বলিতে চাহি। সৎ বা উচ্চ কোটির শিল্প আমার কাছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস আনয়ন করে। যাঁহারা সহজ ভক্তি অথবা দার্শনিক বিচারের দ্বারা পরমার্থ বা শাশ্বত সত্তাকে জীবনে উপলব্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন—'বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্'—তাঁহাদের চরণে আমাদের প্রণাম। কিন্তু আমাদের মতো অনেকে আছে, যাহাদের উপলব্ধি বা অনুভূতি হয় নাই এবং যাহারা বিচার এবং তত্ত্বালোচনার পথ উন্মুক্ত রাখিয়া অনুভূতির আবাহন করিতেছে, যাহাদের কাছে তত্ত্ব গুহানিহিত হইয়া-ই আছে, উপলব্ধি বা অনুভূতি তাহাদের কাছে জ্ঞান বা বিচারের সিংহদ্বার দিয়া আসিতে চাহে না, emotion বা ভাবাবেগ অথবা রসাবেশের খিড়কি-দ্বার দিয়া-ই তাহাদের চিত্তে অনুভূতির ছায়া বা আভাস কখনও চকিতের ন্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উঁকি দিয়া চলিয়া যায়। এই emotion বা ভাবাবেগকে দৌর্বল্যের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃতি-জাত এবং দেহেন্দ্রিয়াশ্রয়ী emotion বা ভাবরাজিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায়, প্রায়-ই দেখা যায় যে, প্রতিক্রিয়ার ফলে আধ্যাত্মিক বা মানসিক কুফল ঘটিয়া থাকে। বরং ইহা-ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কী করিয়া চিত্তের ভাবরাজিকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনে শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে, শাশ্বত বস্তুর উপলব্ধির পথে চালিত করিতে পারি। এই ভাবরাজিকে শোধন করিয়া লইতে একমাত্র সুকুমার কলাই সমর্থ হইয়া থাকে।

নয়ন ও শ্রবণের পথ দিয়া সংগীত ও সুন্দর দর্শনীয় বস্তুর সহায়তায় যে চিত্তের ভাবসম্পুট উন্মুক্ত হয়, কবি কালিদাস শকুন্তলা-নাটকে তৎসম্বন্ধে অতি সুন্দর-ভাবে বলিয়াছেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥ (৫ম অঙ্ক)

রম্য বস্তু দর্শনে, কিংবা মধুর শব্দ শ্রবণে, সুখিত ব্যক্তিরও চিত্তে যে উৎকণ্ঠা জন্মে, তাহা বুদ্ধিপূর্বক না হইলেও নিশ্চয়-ই জন্মান্তরীণ স্থির সৌহার্দ্যের ফল॥

একটু অন্যভাবে এই কথাটা বলা যায় যে, শিল্প-কলা ও প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতি দর্শনের দ্বারা, এবং সংগীতাদি মধুর ধ্বনি শ্রবণের বা, মনে যে সুখময় ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে. তাহা আমাদের অজ্ঞাতে লোকাতিগ অবস্থার আভাস আমাদের অনুভূতিতে জাগরিত করিয়া দেয়।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

অথবা—

ধুনি সুনি মোহি রহৌ ন জায।
ঘায়ল-সী ঘুমত রহৌঁ। ঘর মেঁ কৌ মোহি কছু ন সুহায॥

ধ্বনি শুনিয়া আমার আর রহা যায় না
আহতের মতন আমি ঘুরিয়া বেড়াই—ওগো, ঘরে আমার কিছু-ই ভালো লাগে না।

শাশ্বত বস্তুর সঙ্গে মিলনের জন্য এই যে আকুতি, এই যে দিব্যোন্মাদের অবস্থা—ইহার আধার বা উৎপত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রম্য বস্তু বা মধুর ধ্বনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংগীতকে তাবৎ সুকুমার কলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশীশক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল বর্ণনা করিয়াছেন। সংগীত বা বাদ্য শ্রবণে মানুষের চিত্ত বাস্তব হইতে ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বা উদাহরণ আছে, এ বিষয়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। ধ্রুপদ চৌতাল সংগীত শ্রবণে অনেকের ভাবাবেশ হয়, দেবারাধনার এবং দেব-সান্নিধ্যের অনুভূতি আইসে; বৈষ্ণব কীর্তনে বা সূফী গজলে ভক্ত বা মজজুব জনের 'হাল' বা 'দশা'-প্রাপ্তি ঘটে। স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুরে সংস্কৃত বা লাতীন বা আরবী মন্ত্র উচ্চারণে, অথবা ইংরেজী বা অন্য আধুনিক ভাষায় পাঠে, অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য মনের উন্নয়ন ঘটিতে দেখা যায়।

* * *

সংগীতে যাহা হয়, শিল্প-কলা বা রূপ-কলার দ্বারাও তাহা-ই হয়। শ্রেষ্ঠ গ্রীক বা ভারতীয়, চীনা বা জাপানী ভাস্করের কৃতিত্ব কোনও দেব-মূর্তি; চীনা বা জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যপট; বিজান্তীয় মোসাইক কাজ; পারস্য-দেশীয় গালিচার অপূর্ব চিত্র এবং বর্ণসমাবেশ; মধ্যযুগের হিন্দু অথবা খ্রীষ্টানী চিত্র-কলা; এবং পার্থেনন, তাজ-মহল, শার্ত্র্-এর গির্জা, সান্-মার্কোর গির্জা—প্রভৃতি বাস্তু-শিল্পের বিরাট্ কীর্তি;—এ-সমস্ত দর্শনে ও অনুধ্যানে অনেক সময়ে প্রার্থনার দ্বারা ভাবরাজির উদ্বোধনের মতো মনকে আবিষ্ট করে। তখন শিল্প-জগৎকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায়—

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি'।

* * *

শিল্পের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা লইয়া কিছু বলিলাম—এই জন্য যে আমাদের দেশে পণ্ডিতগণের মনে শিল্পের উপযোগিতা-সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা সন্দেহ আছে। শিল্প একটা বাহুল্য, এবং জীবনে একটা অনাবশ্যক অথবা অপ্রধান বস্তু—সাধারণতঃ আমরা এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। শিল্প-চর্চা কেবল অবসরের চিত্ত-বিনোদনের জন্য, ইহাতে গভীর বস্তু কিছু-ই নাই, সংগীতের মতো কেবল মেয়েদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে—এই প্রকার প্রাকৃত-জনোচিত মনোভাবও প্রবল। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, শিল্পের প্রকৃষ্টভাবে আলোচনা মানব-চিত্তের সাধারণ-ভাবে উৎকর্ষ-বর্ধনের এক প্রধান পথ। শিল্পের মধ্যে জাতির উৎকর্ষের, জাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জাগতিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ ভাবধারা কী ভাবে একটি বিশিষ্ট জাতির শিল্পকে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করিল, ইহাকে পুষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিল; যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির জাতীয় শিল্পে লক্ষণীয় ভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্য কী; কী ভাবে শিল্প হইতে জাতির সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করিল, কিংবা জাতির চরিত্র ভ্রষ্ট বা বিক্ষিপ্ত হইল; জাতির মৌলিক প্রকৃতি তাহার শিল্পের মধ্যে কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং এই মৌলিক প্রকৃতি কী উপায়ে বিদেশীয় অথবা ভিন্ন জাতির প্রকৃতি-জাত শিল্প-রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত—প্রবর্ধিত বা ব্যাহত—হইল; বিভিন্ন যুগের সামাজিক, ধর্মীয় এবং বাস্তব সভ্যতা কী ভাবে শিল্পে প্রকটিত হয়;—এই-সমস্ত বিষয় লইয়া বিচার, জাতির রাষ্ট্রনৈতিক বা দার্শনিক, সমাজনৈতিক বা অন্যবিধ ইতিহাস আলোচনা অপেক্ষা কম উপযোগী এবং চিত্তের পরিপোষক বিদ্যা নহে। বিদ্যালয়ে আমরা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করি, কিন্তু জাতির আত্মার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের ক্ষেত্র-স্বরূপ তাহার শিল্প-কলার আলোচনা-সম্বন্ধে আমাদের কোনও উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা নাই। অথচ, জাতির মধ্যে উদ্ভূত দ্রব্য অবলম্বনে আমরা সহজেই সুন্দর-ভাবে তাহাব ইতিহাসের ও চিন্তার, সভ্যতার ও নৈপুণ্যের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয লাভ করিতে পারি। নানা যুগের শিল্প-দ্রব্য দর্শনে এই পরিচয ঘটিতে পারে, সুতরাং ইহা মনের উপরে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায়, ভাসা-ভাসা থাকিতে পারে না।

আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্পেতিহাস এবং শিল্পাস্বাদন উভয়-ই অল্প-বিস্তর পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মানসিক সংস্কৃতির পথে এই বিষয় দুইটি অপরিহার্য্য। বিদেশে নানা স্বাধীন জাতির মধ্যে শিক্ষা-জগতের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের চিত্ত এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—Art Education-কে সকলেই সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিতেছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও তেমন উৎসাহ নাই। দেশের বা বাহিরের শিল্প-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, এরূপ 'শিক্ষিত' ব্যক্তি এ দেশে প্রচুর। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দুই-চারিজন শিল্প-রসিক পণ্ডিত ভারতীয় শিক্ষা-নেতাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াস অরণ্যে রোদন মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয়, প্রথমটায় কেবল ইতিহাস বা মানব-সভ্যতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অঙ্গ-স্বরূপ শিল্পেতিহাসের চর্চা আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে প্রবর্তিত হইতে পারে। তৎপরে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি পড়িতে পারে, এবং সাধারণ উচ্চ শিক্ষার মধ্য দিয়া, কাব্যাস্বাদনের সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পাস্বাদন করাইবারও চেষ্টা হইতে পারে।

* * *

আমাদের দেশের শিল্পের ধারাটি, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্যিক ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে, সংক্ষিপ্ত আকারে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত আবশ্যিক পাঠ্য-বিষয় করিতে পারা যায়। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাট্রিকুলেশনের নূতন-গৃহীত পাঠ্য-বিষয়-সমূহের মধ্যে, 'শিল্প-রীতি পর্য্যালোচন, এবং চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা' এই দুইটি বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবল মেয়েদের জন্য হইয়াছে, পুরুষ পরীক্ষার্থীরা এই দুইটি বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশেষে এইভাবে শিল্প-শিক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে—ইহা-ই যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—যথাকালে শিল্পেতিহাসও দেশের ইতিহাসের অংশ-স্বরূপ বিবেচিত হইয়া যেন সকল ছাত্রের আলোচ্য বিষয়-রূপে গৃহীত হয়।

* * *

ভারতের শিল্পের ঐতিহাসিক যুগের ধারাটি—অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতের শিল্প-কাহিনী—মোটা-মুটি আমরা ধরিতে পারিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আলেক্সান্দর কানিঙ্‌হাম, জেম্‌স্ ফর্গুসন, ঈ. বী. হাভেল্, আনন্দ কুমারস্বামী, গ্রূন্‌ভেড্‌ল্, ফুশে, গোলুবিএভ্, বাখ্‌হোফর্, জন্ মার্শাল, গ্রিফিথ্‌স্, স্পুনর, পার্সি ব্রাউন্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উইলিয়াম্ কোন্ ডিএট্‌স্, গ্যোট্‌স্, গোপীনাথ রাও, স্তেল্লা ক্রামরিশ, ফোগেল্, ড্যোরিঙ্, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, আলীস্ গেটি, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নানালাল চমনলাল মেহ্‌তা, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, ঝ.ভো-দ্ব্যব্রোই, কৃষ্ণশাস্ত্রা, রয়টার, র‍্যনে গ্রুসে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সত্তার খয়্‌রী, নর্‌মান ব্রাউন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায়, ভারতের প্রাচীন- ও মধ্য-যুগের শিল্পের ইতিহাসের গতি আমাদের সমক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু সব কথা জানা যায় নাই। ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তির কথা, এবং ইহার প্রাথমিক অর্থাৎ মৌর্য্য-পূর্ব যুগের ইতিহাস—সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনও স্পষ্ট ধারণা এখনও হয় নাই। অতীতের অন্ধতমিস্রাময় প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্-কোন্ জাতির রক্ত মিশিয়া প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল ;—অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড, মোঙ্গোল, সম্ভবতঃ ফিন্নো-উগ্রীয় বা উরালীয, এবং আর্য্য জাতি,—ভারতের হিন্দু সভ্যতাব গঠনে কে কোন্ উপাদান আনিয়া দিযাছিল, এ-সমস্ত তথ্য এখন অজ্ঞাত, অবলুপ্ত। আদিস্তনল্লুর ও মোহেন্-জো-দড়োর যুগ হইতে মৌর্য্য-যুগ পর্য্যন্ত তিন-চারি হাজার বৎসব ধরিয়া ভারতেব সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাস এখনও নির্ধারিত হয নাই। এই কার্য্যে ভারত এবং ইউরোপের নৃতত্ত্ববিৎ. সমাজতত্ত্ববিৎ, প্রত্নবিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ এবং ঐতিহাসিক-গণেব সমবেত চেষ্টা অপেক্ষিত। কত দিনে ভারতের প্রাচীন শিল্পের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আমাদেব পূর্ণ দিগ্‌দর্শন ঘটিবে, তাহা আমরা জানি না। বস্তুর অভাবে এখানে বিচারের বিশেষ অবকাশ নাই।

* * *

ভারতের অংশীভূত আমাদের বঙ্গদেশের শিল্পেব কথাও আমরা তেমন জানি না। বাঙ্গালী তাহাব সাহিত্যেব ইতিহাস লইয়া তাহার ভাষার ইতিহাস লইযা কাজ করিতেছে—সুফলও তাহাতে যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয বাঙ্ময়ের অতিবিক্ত, বঙ্গদেশেব বাস্তব-সংস্কৃতির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি না। বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ ধরিযা দাঁড়াইবার পূর্বে, আমরা বাঙ্গালী জাতির কল্পনা করিতে পারি না। আমার মনে হয়, খ্রীষ্টীয অষ্টম শতকের মাঝামাঝি যখন বঙ্গ ও মগধে পাল-রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটিল, তখন বাঙ্গালা ভাষাও মাগধী-অপভ্রংশ হইতে আর একটু পরিবর্তিত হইযা, আদিম-বঙ্গভাষার রূপ ধারণ করিল ; তখন হইতেই বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষী জাতির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। এই নব-সৃষ্ট বা সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি প্রথম হইতেই মানসিক ও বাস্তব উভয় প্রকার সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয়। বঙ্গদেশের তুর্কী-পূর্ব যুগের সংস্কৃত-চর্চা ভারতের সংস্কৃত-বিদ্যার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে—বঙ্গদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পণ্ডিতদের "গৌড়ী-রীতি"-র রচনাকে সারা ভারতবর্ষও সম্মান করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতেই বৌদ্ধ আচার্য্যগণ ভোট-দেশ বা তিব্বত, সুবর্ণভূমি বা বর্মা, এবং দ্বীপময় ভারতে গিয়া বৌদ্ধধর্মকে সংস্কৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও শৈব সাধকেরা সারা উত্তর-ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তীর্ণ করেন। শিল্প-জগতেও নিখিল-ভারতের জাতীয় শিল্প—ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলা—এই দুইটিকেই নূতন ভাবধারায় অভিষিক্ত করিয়া, বঙ্গীয় শিল্পিগণ একটি নূতন শিল্প-ধারার প্রবর্তন করেন,—ষোড়শ শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথ সে-কথা আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন, এবং রীতি-প্রবর্তক দুইজন প্রধান শিল্পীর নামও আমাদের বলিয়া গিয়াছেন—বীতপাল ও ধীমান্। পাল-যুগের গৌড়-মগধ শিল্প ভারতীয় ভাস্কর্য্যে এক নবীন বস্তু আনয়ন করিল, ভারতের শিল্প-জগতে ইহা পূর্ব-ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, বিশিষ্ট দান। পাল ও সেন যুগের বিষ্ণু, হরগৌরী, দুর্গা, সূর্য্য, বুদ্ধ, বোধি-সত্ত্ব, তারা, মারীচি প্রভৃতি মূর্তির মতো ধ্যান-স্থির দেবতা-মূর্তির এমন অপরূপ ভাব-শুদ্ধ বিলাস মধ্য-যুগের ভারতের শিল্পে আর কোথায় পাওয়া যায়? এই গৌড-মগধ শিল্পের প্রভাব বাঙ্গালা ও বিহারের বাহিরে, দেশ-দেশান্তরে প্রসৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ধ্যানময় দেব-মূর্তি, নেপালে, এবং ভারতের বাহিরে ভোট-দেশে, ব্রহ্মে, চীনদেশে, যবদ্বীপে, সমস্ত বৌদ্ধ- ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী দেশে, ভক্ত ও সাধকগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতের শিল্পের এই অভিনব ধারা গৌড-মগধ শিল্প, বৃহত্তর ভারতের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

* * *

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির প্রথম যুগের এই বিশিষ্ট এবং মনোহর প্রকাশ লইয়া বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কলা-রসিক সার্থক গবেষণা করিযাছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, বাঙ্গালার এই প্রাচীন মূর্তি-শিল্পের প্রেরণা এবং রচনা-ভঙ্গীর মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্য্য, আভ্যন্তর তত্ত্ব এবং বাহ্য স্বরূপ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে ইংরেজ জে. সী. ফ্রেঞ্চ, অষ্ট্রিয়া-দেশীয়া স্তেল্লা ক্রামরিশ, ফরাসী র‍্যনে গ্রুসে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওলন্দাজ শিল্পবিদ্ বের্নট্-কেম্পর্স-এর অনুশীলন ও গবেষণাও এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য।

কিন্তু প্রথম যুগের শিল্প-কলার আলোচনা এই-সকল রসজ্ঞ শিল্প-তত্ত্ববিদ্-গণের চেষ্টায় সুস্থাপিত হইলেও, পরবর্তী কালের বাঙ্গালীর শিল্পময় প্রকাশ সম্বন্ধে এখনও আমরা অবহিত হইতে পারি নাই। তুর্কীদের আগমনের পূর্বের যুগের বঙ্গদেশীয়—গৌড-মগধ-জাত—শিল্প-রীতির মধ্যে, বাঙ্গালার বাস্তু-শিল্প প্রাচীন মন্দিরাদির তেমন আলোচনা হয় নাই। মুসলমান-পূর্ব যুগের পাথরের বা ইটের তৈয়ারী যে অল্প কয়টি মন্দির বাঙ্গালার বাস্তু-শিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ বিদ্যমান আছে, সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া, প্রথম যুগের বাঙ্গালার গৃহ-শিল্পের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এখনও হয় নাই। মুসলমান রাজাদের আমলে পাথরে দেউল-তোলার পাট বাঙ্গালাদেশের হিন্দুদের মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গেল—পাথরের স্থাপত্যের সঙ্গে-সঙ্গে পাথরের ভাস্কর্য্যও প্রায় শেষ হইয়া গেল। মন্দির ও ইমারতের ইট কাটিয়া, নূতন ধরণের পোড়া-মাটির ভাস্কর্য্য আরম্ভ হইল—হিন্দু মন্দিরের দেব-দেবী নর-নারী পশু-পক্ষী লতা-পাতা প্রভৃতির ছবি, মুসলমান মস্‌জিদে নানা রকমের নকাশী কাজের অলংকার। বাঙ্গালার এই নবীন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের চর্চা, বা ইহা লইয়া গবেষণা, এখনও হয় নাই; যে স্থাপত্য পশ্চিম-বঙ্গের বিষ্ণুপুরের সুন্দর মন্দিরাবলী, উত্তর-বঙ্গের কান্তনগরের মন্দির, এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অন্য নানা মনোহর মন্দিরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আলোচনা—এবং বাঙ্গালী কলাবিদের হাতে তাহার আলোচনা—না হওয়া লজ্জার কথা। বাঙ্গালীর মধ্য-যুগের চিত্র-শিল্প ও মূর্তি-শিল্প রাজসভায় আদৃত মহিমময় শিল্প-স্বরূপ এখন আর বিদ্যমান নাই—ইহা এখন পল্লী-অঞ্চলে অনাদৃত অখ্যাত গ্রাম্য শিল্পের কোঠায় নীত হইয়া, স্বদেশী ও বিদেশী ছাপা ছবি এবং সেলুলয়েড পুতুলের প্রতিযোগিতায় আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার চিত্র-শিল্প লইয়া—পুঁথির পাটার ছবি, পট, চাল-চিত্র ও অন্য ছবি, এবং কালীঘাটের পট প্রভৃতি বাঙ্গালীর বিশিষ্ট শিল্প-প্রকাশের নিদর্শন লইয়া বাঙ্গালী শিল্পবিদ্‌গণের আলোচনা এখনও অপেক্ষিত। বাঙ্গালার গ্রাম-শিল্পের আধারে বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের শেষ-পাদে কলিকাতায় একটি ইউরোপীয়-ভাব-মিশ্র নূতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিল্প-ধারা ধীরে-ধীরে প্রবর্তিত হয়। পাথরে-ছাপা রঙীন দেবদেবী-চিত্রে এবং পৌরাণিক ও ক্বচিৎ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্রে ইহার একটি লক্ষণীয় এবং সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইহারও সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে কাগজের উপরে ছাপা এই-সব রঙীন লিথোগ্রাফের ছবি এখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য—আধুনিক যুগের বাঙালীর একটি বিশেষ শিল্পময় আত্মপ্রকাশের নিদর্শন এইরূপে প্রায় অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। বহু প্রাচীন পবিবারে পুরাতন আমলের ছবি-রূপে ফ্রেমে বদ্ধ হইয়া এই-সব ছবি এখনও দুই চারিটা থাকিতে পারে—এগুলিকে রক্ষা করিয়া, সংগ্রহ করিরা রাখিবার জন্য অবহিত হওয়া উচিত।

* * *

বাঙালীর গ্রাম-শিল্প বা লোক-শিল্পের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের—প্রাচীন বাঙালা পট, পুঁথির পাটা, হাতে-আঁকা ছবি, মাটির মূর্তি ও পুতুল প্রভৃতির সংগ্রহে ইনি নিযুক্ত হন। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত নবীন-ভারতীয় শিল্প-সংঘের মধ্যেও, অজণ্টা এবং রাজপুত ও মোগল চিত্র-প্রণালীর মতো কালীঘাটের পটের চর্চা এবং প্রভাব দুই-ই বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-ও বাঙালার লোক-শিল্পের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হন, এবং তিনি এই লোক-শিল্পের প্রাণ-বস্তু ও ইহার ভঙ্গিমা দুই-ই আয়ত্ত করিয়া এবং নিজ প্রতিভার দ্বারা ইহাদের মণ্ডিত করিয়া কতকগুলি অতিসুন্দর চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় বাঙালার গ্রাম-শিল্পের ভাষাকেই তাঁহার শিল্প-রচনার বাহন করিয়া লইযাছেন—বাঙালার এই লৌকিক-শিল্পের সবল রেখা-বিন্যাসের মধ্যেই তিনি তাঁহার সব-কিছু বলিবার ভাষা পাইয়াছেন।

বাঙালার লোক-শিল্পের—মধ্য-যুগের বাঙালার যাবতীয় শিল্পের—আদর করিবার লোক বিরল নহে। বাঙালার লোক-নৃত্যের মধ্যে অমৃতময় প্রাণের সন্ধান মিনি পাইয়াছেন, এবং এই অপূর্ব জিনিস দিয়া বাঙালীকে জীয়াইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার ব্রতচারীদের মারফৎ যিনি সারা বাঙালা-ময় ইহার প্রচার করিতেছেন, বাঙালা ছাড়িয়া ভারতের অন্য প্রদেশে, এমন কি সুদূর বিলাতেও যিনি বাঙালার লোক-নৃত্যের বাণী পঁহুছাইয়াছেন, সেই ভাবুক ও কর্মী শ্রীযুক্ত গুরুসদয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দত্ত মহাশয়ও বাঙ্গালার লৌকিক শিল্প-কলার একজন অনুরাগী সংরক্ষক ও সমালোচক। তাঁহার মতো রসজ্ঞ সংগ্রাহক ও বিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালার লৌকিক শিল্প লইয়া ধারাবাহিক ও রীতিবদ্ধ-ভাবে পূর্ণ আলোচনা প্রার্থনা করিতে পারি। বিখ্যাত গুণজ্ঞ শিল্প-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ও বাঙ্গালার লোক-শিল্পের আলোচনা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও বাঙ্গালীর শিল্পের—বিশেষ করিয়া মধ্য-যুগের এবং আধুনিক লৌকিক শিল্পের—পরিচয় বহু চিত্র-যোগে তাঁহার "বৃহৎ বঙ্গ" গ্রন্থে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা বা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের মতো, বাঙ্গালার শিল্পের পূর্ণ ইতিহাসের যে অভাব আমাদের আছে, তাহা মোচনের জন্য বাঙ্গালা দেশের তরুণ গবেষকগণ বদ্ধপরিকর হউন। উপস্থিত আবশ্যক—বিভিন্ন যুগের শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান-মিউজিয়মে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহশালায়, রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহে, এবং ঢাকার মিউজিয়মে, ও অন্যত্র কতকগুলি ব্যক্তি-গত সংগ্রহে, পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্য্যের বহু সুন্দর নিদর্শন আছে। পরবর্তী কালের গৌড-বঙ্গের শিল্পের জন্য একটি বিরাট্ ও ব্যাপক কেন্দ্রীয় সংগ্রহ-শালা স্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ মুসলমান ও আধুনিক যুগের বাঙ্গালা-শিল্প বিষয়ে নগণ্য; কিন্তু এই সংগ্রহকে, অথবা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন স্থাপিত আশুতোষ-ভারতীয়-কলাশালার ক্ষুদ্র সংগ্রহকে অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালীর শিল্পের পূর্ণ পরিচয় যেখানে পাওয়া যাইবে এমন একটি সংগ্রহ গাড়য়া তুলিতে চেষ্টা করা উচিত।

* * *

বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ প্রাচীন-কালে চর্য্যাপদের গান এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ, এবং মধ্য-কালে চণ্ডীদাস, মঙ্গলকাব্যকারগণ, বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ ও অন্য কবিদের রচনা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক-রূপে চলিয়া আসিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে, ইউরোপের মনের সহিত সংস্পর্শ বাঙ্গালীর চিত্তে সোনার কাঠির স্পর্শ দিল, তাহার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিল—আধুনিক যুগে বাঙ্গালী তাহার বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইল সাহিত্যে; ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে বাঙ্গালী দান করিল—বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যে বাঙ্গালীর মধ্যে গৌড়-মগধ শিল্প-রীতি সৃষ্ট এবং পুষ্ট হইয়া ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রকে প্রভাবমণ্ডিত করিয়াছে, সেই বাঙ্গালীর শিল্প-প্রতিভা বিগত সাত শত বৎসর ধরিয়া ম্লান হইয়াই ছিল ; মন্দিরের মূর্তি-শিল্প, পট, পাটা—এই-গুলিতে তাহার যে পরিচয় পাই, তাহা পাল ও সেন যুগের মহিম-মণ্ডিত কৃতিত্বের পার্শ্বে নিতান্তই গ্রাম্য ও লৌকিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক জাগরণের শতবর্ষ পরে, কতকগুলি চেষ্টা ও অপচেষ্টা এবং অপূর্ণ কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া, খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর শিল্প-বোধ এবং শিল্প-চেষ্টা নূতন পথ পাইল। বাহিরের স্পর্শ এ ক্ষেত্রেও কার্য্যকর হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা ও ঈ. বী. হাভেল প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা প্রাচীন ভারতেয় শিল্পের চর্চা এবং প্রতিস্পর্বী ইউরোপীয়—রেনেসাঁস ও গ্রীক—শিল্পের পার্শ্বে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা, ভারতের শিল্পীদের আর একবার অন্তর্মুখী হইতে উৎসাহ দিল। নিজ জাতীয় শিল্পের রক্ষা বিষয়ে জাপানের চেষ্টাও ভারতীয় শিল্পীদের উৎসাহ এবং অনুপ্রাণনা আনিয়া দিল। ইহার ফলে, আশার বাণী এবং কৃতকারিতার গৌরব লইয়া দেখা দিলেন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ; আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণে তাঁহার নাম চিরকাল ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবে। গুরুর আবাহনে যে শিল্প-দেবতা জাগরিত হইলেন, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যানুশিষ্যেরা তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন, এবং এইরূপে যথাশক্তি ভারতের সংস্কৃতির শাশ্বত গৌরবকে আরও মহনীয় করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত হইলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের মধ্যে, 'সিদ্ধশিল্পী' 'রূপপতি' নন্দলাল বসু, নিজ গুরুর সহিত মিলিত-ভাবে বিশ্ব-শিল্পসভায় ভারতের আসন আবার উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় ও বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, আমার মনে হয়, ভারতের ও বিশ্বের শিল্পকলায় নন্দলালের সেই স্থান ; আদিম যুগ হইতে পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে বাঙ্গালার নন্দলাল অন্যতম। গুরু-নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নন্দলাল একাধারে প্রাচীন শিল্পের প্রাণ-রস ও তাহার শক্তিটুকু আহরণ করিয়াছেন, এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সত্যতম এবং সুন্দরতম রূপময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিব-উমার যে মহনীয় কল্পনা ভারতীয় ধর্মোপলব্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং যাহা বিশ্বের তাবৎ দেব-কল্পনার মধ্যে উদার, বিরাট্, গভীর, গম্ভীর ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সর্বঙ্কর ভাবে অতুলনীয়, সেই গরিমময় কল্পনাকে রূপ দিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা—ধারাপুরী বা এলিফাণ্টায়, এলোরায়, মহাবলিপুরে, চোল-যুগের ধাতু-মূর্তিতে, কাঙ্গড়ার রাজপুত চিত্রে; নন্দলালের হাতে সেই মহনীয় কল্পনা, নূতন ভাবে আবার প্রকাশিত হইয়াছে, শিব-উমা যেন নন্দলালের সমক্ষে সাক্ষাৎ প্রকটিত হইয়াছেন;—নন্দলালের শিব-উমার পরিকল্পনা, মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে প্রাচীন ভাস্করদের ও চিত্রকরদের সৃষ্টির পার্শ্বে গৌরবের সহিত স্থান পাইবার যোগ্য। নন্দলালের কৃতিত্ব বাঙ্গালীর এবং ভারতবাসীর গৌরব এবং গর্বের বিষয়। নন্দলালের সতীর্থ ও অনুগামী শিল্পীরা ভারতের অন্যত্র বঙ্গদেশের এই নব শিল্পাদর্শ এবং শিল্প-চেষ্টাকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন এমন শিল্পী আছেন, আধুনিক ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইযা থাকে। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিষ্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ গুণবত্তা দেখাইবার পর অকালে পরলোকগমন করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার—ইঁহাদের কতকগুলি মনোহর রচনা, এবং বিশেষভাবে অসিতকুমারের নানামুখী প্রতিভা—ভারতীয় শিল্প-জগতে ইঁহাদের অমর করিয়া রাখিবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্র-শিল্পী-রূপে সর্বাজনাদৃত কতকগুলি রচনায় কৃতিত্ব দেখাইবার পরে, বাস্তু-শিল্পে একটি নূতন এবং অতি মনোহর ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন; এ বিষযে তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনা ও কুশলতা দেশবাসীর নিকটে সুপরিচিত হওয়া উচিত। আধুনিক বঙ্গীয় তথা ভারতীয় গুণীদের মধ্যে ভাবুক শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের আসন একটু বিশিষ্ট স্থানে। ইউরোপীয় এবং পুনরুজ্জীবিত আধুনিক ভারতীয়, উভয় প্রকার শিল্প-রীতি সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া, ইনি এখন বাঙ্গালার গ্রাম-শিল্পের কতকগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গীর আধারে নিজ শিল্পময় প্রকাশের অভিনব ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালা গ্রাম-শিল্পের সবল রেখা এবং পরিস্ফুট বর্ণসমাবেশ যে কত শক্তির পরিচায়ক, তাহা যামিনীরঞ্জনের রচনায় বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন গৌড়-মগধ শিল্পীরা দেব-মূর্তি রচনায় প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্রকে মানিয়া লইয়া, ঐ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া, অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। যামিনীরঞ্জনও তেমনি মধ্য-যুগের বাঙ্গালা চিত্রের রেখা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বর্ণবিন্যাসের ধারার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্ধন করিয়া, এই সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যেই অরূপের আবাহন করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বল্পভাষী রচনায় মহাভারত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যামিনীরঞ্জনের শিল্প-কলা আধুনিক বাঙ্গালা তথা ভারতে এক অপূর্ব বস্তু; ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য, স্বল্পভাষিতার সহিত বাগ্মিতা, দুই-ই ইহাকে এক নূতন বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। নন্দলাল গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব উভয়েই অতুলনীয়, এবং তিনি তাঁহার বহুবিধ রচনায় আমাদের অরূপের রূপ দেখাইয়াছেন ও রূপাতীতের বাণী শুনাইয়াছেন; যামিনীরঞ্জন দৃঢ় রেখা ও পরিস্ফুট বর্ণের অতলে ডুব দিয়া অরূপ-রত্নের অন্বেষণ করিতেছেন—মনে হয়, তাঁহার ছবিতে এই অরূপ-রত্নের জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

* * *

বাঙ্গালা দেশের শিল্পীরা আধুনিক ভারতের শিল্প-চেতনায় এবং শিল্প-সৃষ্টির রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন—ইহা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এক গৌরবের বিষয়। কিন্তু বাঙ্গালী শিল্পীর নবীন চেষ্টার মধ্যে, সব সময়েই শক্তি বা কৃতকারিতা দেখা যায় না। প্রাচীন শিল্পের প্রতি একটা অন্ধ শ্রদ্ধা আসিয়া পড়ায়, বহুশঃ জীবন্ত সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাণহীন অনুকরণ-চেষ্টাই দেখা যায়। দর্শন-শক্তিযুক্ত চক্ষু এবং শিল্পদৃষ্টি-নিয়ন্ত্রিত অকম্পিত হস্ত—এই দুই-ই বিশেষ সাধনার অপেক্ষা রাখে। সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষা শিখিতে গেলে, ব্যাকরণ-চর্চা অপরিহার্য্য; প্রাচীন ভারতের শিল্পের প্রাণটুকু আধুনিক রচনায় ফুটাইয়া তোলা, অসাধারণ শক্তি ও সাধনার দ্বারাই সম্ভব। আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীদের অনেকে প্রাচীনের চিন্তা-ধারার সহিত পরিচয় রাখেন না, আধুনিক জীবনও ভালো করিয়া জানেন না। তাঁহারা কেবল গুরু-নির্দিষ্ট পথ—গুরুর আচরিত পদ্ধতি—অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই কর্তব্য শেষ হইল মনে করেন। সত্য-দর্শনের চোখের অভাব, আবার সঙ্গে-সঙ্গে সবল রেখা-পাতের উপযোগী হস্ত-নিয়ন্ত্রণ শক্তিরও অভাব। সুতরাং ফিকা রঙের কোয়াসায় অক্ষম রেখাপাতকে আবৃত করিয়া, ততোঽধিক অক্ষম কল্পনার প্রকাশ, তথা-কথিত "ভারতীয় পদ্ধতি"র আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীর রচনায় অত্যন্ত সাধারণ। বাঙ্গালা কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে যে গতানুগতিকতা, যে অনুকরণ, যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিদেশী ভাব বা রীতির অনুবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখা যায়, "ভারতীয় শিল্প-রীতি" অনুসারে যে-সকল বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আঁকেন, তাঁদের অনেকের ছবিতে সেই-সেই অবগুণ পাওয়া যায়। চারিদিকের জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের যোগের অভাব, প্রাচীন শিল্পের বাহ্য ভাষাটুকুকে একমাত্র পুঁজী করিয়া লইবার চেষ্টার সহিত মিলিত হইয়া, ইঁহাদের অনেকের শিল্প-রচনাকে নিতান্ত মূক ও প্রাণহীণ করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃত বা ফারসী বা হিন্দী যদি বলিতে না পারি, বাঙ্গালা বলিতে চেষ্টা করা উচিত; যদি খাঁটি বাঙ্গালাও না আসে, ভাষা দুরুস্ত করিয়া লইয়া তবে তাহাতে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত; এমন কি, নিজ বক্তব্য যদি সুবোধ্য করিয়া ইংরেজী-বাঙ্গালা-মিশ্র চল্‌তি ভাষায় বলা যায়, তাহা অবোধ্য ব্যাকরণশুদ্ধ প্রাচীন-ভাষা বা অন্য প্রদেশের ভাষা ব্যবহার অপেক্ষা কার্য্যকর হইবে। আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সম্মিলিত না রাখিয়া, কেবল কাব্য ও শিল্পের উপজীব্য রূপে প্রাচীন দেব-কল্পনাকে—দেব-মূর্তি ও দেব-চরিত্রকে—ব্যবহার করিলে, কল্পনা ক্ষুণ্ণ হয়; আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও দর্শন হইতে উদ্ভূত বিরাট্ রূপ-সৃষ্টি তাহাতে কেবল বিলাসে পরিণত হয়; এবং সে বিলাস প্রীতিকর হইলেও, প্রাণের পরিচায়ক চিরন্তন শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আধার শিল্প-পদবাচ্য হইতে পারে না। গ্রীসের শিল্পের ইতিহাসে আমরা এই ভাবটি-ই দেখিতে পাই। গ্রীক জাতি জেউস্, দেমেতের্, আপোল্লোন্, আর্তেমিস্, দিওনুসস্, আথেনা, হের্মেস্, আফ্রোদীতে, আরেস্ প্রভৃতি দেবতাগণে বিশ্বাস হারাইল—এই দেবতাদের বিরাট্ আধ্যাত্মিক স্বরূপ খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতক হইতে তাহাদের জীবনে আর প্রতিস্পন্দন জাগাইল না; অথচ তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতকে, এবং তাহার পরেও রোমান যুগে, এই-সব দেবতাদের লইয়া মূর্তি-গঠন ও সাহিত্য-রচনা চলিল; পরবর্তী আস্থাহীন শিল্পীদের হাতে, দেব-মূর্তি-রচনায় ব্যাপৃত গ্রীক শিল্প, আপাত-নয়নাভিরাম থাকা সত্ত্বেও, decadent বা ক্ষয়িষ্ণু এবং পতিত হইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশেও এ যুগে যেন ইহার-ই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি।

* * *

আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পী, যে শিব ও উমা, কৃষ্ণ ও রাধার কল্পনায় আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থা পোষণ করেন না, কিংবা এই-সকল কল্পনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গভীরত্ব ও গাম্ভীর্য্য যথাযথ উপলব্ধি করেন না, অথচ রাজপুত বা মোগল অথবা অজণ্টার ছবির ভঙ্গীর হাস্যকর অনুকরণের উপরে জাপানী হালকা রঙের পোঁছ লাগাইয়া সেই শিব-উমা, কৃষ্ণ-রাধার লীলার ছবি আঁকিবার চেষ্টা করেন—মনে করেন, "ভারতীয় শিল্প" হইতেছে। ইহা অপেক্ষা, সোজাসুজি বাস্তবানুকারী ইউরোপীয় ভঙ্গীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়কে, শিল্পে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টার মূল্য অধিক হইবে। এ স্থলে অক্ষম রেখাপাত ও ধোঁয়াটে' বর্ণ-সমাবেশের সুবিধা নাই—রচনায় ব্যাকরণ-দোষ সহজেই ধরা পড়ে।

* * *

আধুনিক ইউরোপীয় technique—বাস্তবানুকারী চিত্রণ-পদ্ধতি—লইয়া যে-সকল বাঙ্গালী শিল্পী কাজ করিতেছেন, বাঙ্গালার শিল্প-জগতে তাঁহাদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এইরূপ শিল্পীদের মধ্যে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু এবং চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অতুল বসু ও দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর কৃত কতকগুলি প্রতিকৃতিময় চিত্র ও মূর্তি বাঙ্গালার শিল্পেতিহাসে সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইবে।

* * *

বাঙ্গালা তথা ভারতের শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে সহজ ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিবর্তে, অত্যধিক দেশাত্মবোধ দ্বারা দুষ্ট Orientalism বা 'প্রাচ্যবাদ'—'আর্য্যামি'-র জ্ঞাতি-হিসাবে যে 'প্রাচ্যবাদ'কে আমরা 'প্রাচ্যামি'ও বলিতে পারি—সেই 'প্রাচ্যামি' আসিয়া গিয়াছে। শিল্প-জগতে যদি অনুচিত দেশাত্মবোধ আসে, তাহা শিল্পের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে না। ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্প-রসিকেরা আমাদের শিল্পকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে—আমরাও করিয়াছি; এতদিনে এই অবহেলার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আমরা Indian Spirituality vs. Western Materialism, 'ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বনাম ইউরোপীয় ইহলোক-সর্বস্বতা'—এই বুলি আওড়াইতেছি, এবং এই বুলিতে বিশ্বাসও করিতেছি। সেইজন্য আমরা এখন এই কথাটি শুনিতে বা বলিতে ভালোবাসি যে, ভারতীয় শিল্প আধ্যাত্মিকতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রসে ভরপুর, ইউরোপের শিল্প (কি গ্রীক, কি বিজান্তীয়, কি গথিক, কি রেনেসাঁস, কি আধুনিক—সব আমরা এক কড়ায় চড়াইয়া দেই) মানবিকতার পূজায় মত্ত। এই প্রকার বিশ্বাস বা বিচারের বশবর্তী হইয়া, আমরা এখন (অন্ততঃ বাহিরে) প্রাচ্যের পূজারী হইয়া পড়িতেছি;—আভ্যন্তর প্রেরণা হইতে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির জোরে আর খাঁটি প্রাচ্য থাকিতেছি না; বাহিরের জগতের চাপে ভিতরে আমরা যত-ই ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, তত-ই আমরা 'প্রাচ্যামি'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বাহ্য-জীবনে ইহার ছিটাফোঁটা লাগাইয়া, আমাদের অবস্থায় যে অস্বস্তি আমরা অনুভব করি সেই অস্বস্তিকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছি। শিল্পে আমাদের এই 'প্রাচ্যামি'ও দেখা দিতেছে; এবং 'কস্‌মেটিক্'-এর বিজ্ঞাপনের ছবিতে, অজন্টার যুগের মেয়েদের অনুকরণে বুকে গামছা বাঁধিয়া, গামছা বা খাটো লুঙ্গী পরিয়া, ইউরোপীয় সুন্দরীরা যে আধুনিক বাঙ্গালী ঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা শিল্প-বিষয়ক এই 'প্রাচ্যামি'র একটা প্রকাশ মাত্র। ইউরোপীয় প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের ফোটোগ্রাফের নকলের অনুরূপ ভঙ্গীতে রাধা-কৃষ্ণের ছবি আঁকা—ইহাও এই 'প্রাচ্যামি'র এক অপকৃষ্ট বিকার মাত্র। শিল্পকলায় এই বাহ্য প্রাচ্যামি একটা ভাণ মাত্র; ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা মনে-প্রাণে না বুঝিয়া, দৈনন্দিন জীবনে ইহাকে কার্য্যকর করিবার কোনও চেষ্টা না রাখিয়া, শিল্প-সৃষ্টিতে ইহার বিলাস প্রদর্শন করা একটা মিথ্যাচার—একটা প্রাণহীন ভঙ্গী-মাত্রতে পর্য্যবসিত হয়। ইহাতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, মাত্র নামে এবং বাহ্য অপ্রধান দুই-একটি বস্তুতে ব্যতীত, আর কিছুতেই বিদ্যমান নাই। এই-সমস্ত জিনিস যেন, 'পরশুরাম'-দৃষ্ট, বঙ্গদেশের আধুনিক শিক্ষিত লোক এবং এমন কি 'জজ মেজিষ্টর মহামহোপাধ্যায়'গণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত 'রেণ্ডেজ্‌ভোঁস্' 'আংগ্লোমোগলাই কেফ্'-এর 'নবতম অবদান'—'কচি ভাইটো-পাঁঠার ইষ্টু', 'মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপো,' অথবা 'ডবল-ডিমের রাধাবল্লভী'; কিংবা অতি-আধুনিক বাঙ্গালী সংগীত-স্রষ্টার 'ধ্রুপদী গজল' অথবা 'ঠুমরীর 9th Symphony.'

* * *

আকাঙ্ক্ষা না হইলে পূর্তি হয় না। দেশের লোকের মধ্যে চাহিদা না থাকিলে, শিল্প অথবা অন্য কোনও বস্তুর-ই প্রসার বা উন্নতির সম্ভব হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে, শিল্পের সমঝদার এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, উভয়েরই অভাব। শিল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সমর্থ, অধিকাংশ স্থলে তাঁহার রুচি বিকৃত, এবং স্বদেশী শিল্পী ও শিল্প-দ্রব্য দুই-ই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে প্রায়-ই বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প-শিক্ষারও অভাব; এবং দেশ নিতান্ত দরিদ্র। উপস্থিত অবস্থায় দেশের রাজশক্তির নিকট শিল্প-কলা বিশেষ কোনও সহায়তা পাইবার আশা করিতে পারে না—শিল্প এখন অবহেলিত। অন্যান্য সভ্য ও স্বাধীন দেশে, নগর ও জাতীয় সৌধাবলীর শোভা বর্ধনের জন্য শিল্পী সর্বত্রই আহূত হন। কিন্তু ভারতবর্ষে এতদিন এই রীতি প্রায় অজ্ঞাত ছিল; সম্প্রতি দিল্লীতে স্বল্প পরিমাণে শিল্পের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহা আরও অজ্ঞাত ছিল। পোস্টার বা প্রাচীর-বিজ্ঞাপন, এবং গল্প ও ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তকের ছবির রেওয়াজ আসিয়া না গেলে, অধিকাংশ শিল্পীকে অনাহারে থাকিতে হইত। অধুনা কলিকাতার দুই-একটি সিনেমা-প্রেক্ষাগৃহে বাঙ্গালী শিল্পীরা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার কথঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছেন। যাহা বাঙ্গালায় গভর্ণমেণ্ট বা তদনুরূপ প্রতিষ্ঠান করিলেন না, সেই শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ভারত-ইতিহাসের যে ভিত্তি-চিত্রমালা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় ব্যাপার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত বহুশঃ অনুকৃত হইলে, বাঙ্গালাদেশের শিল্পীদের মধ্যে নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ দেখা দিবে। সুখের বিষয়, কলিকাতায় দুই-চারিজন গুণগ্রাহী ও শিল্প-রসিক ব্যক্তি এইরূপে বাঙ্গালার শিল্পী ও শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা আরম্ভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে, বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যে নিহিত সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, আদর্শবাদ ও বাস্তবিকতা—এই সমস্তকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ফুটাইয়া তোলার সার্থকতা থাকিবে—অজণ্টা বা মোগল শিল্প, অথবা পুঁথির পাটার ছবির ভঙ্গীতে নহে, ইহার অন্তর্নিহিত সত্য-দর্শনের মধ্যে এবং শক্তিময় প্রকাশের মধ্যে। "যে হউক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে হউক ভাষা—কাব্য রস লয়্যা"—কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-বিষয়ে এই উক্তি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ভঙ্গী যাহা-ই হউক না কেন—সারল্য ও সততা-ই হইতেছে সার্থক শিল্পের প্রাণ। বাঙ্গালীর জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আশঙ্কার মধ্যে যদি কিছু বড়ো জিনিস থাকে—এমন জিনিস যাহা সত্য-সত্যই সমগ্র জাতির দেহ মন ও প্রাণকে নাড়া দেয়, তবে সর্বদর্শী এবং কৃতী শিল্পী থাকিলে তাহার উপযুক্ত শিল্পময় প্রকাশ হইবেই। আর বাঙ্গালীর জীবন যদি ক্ষুদ্র ও নগণ্য থাকে, হাজার অজণ্টার ভারত বা রেনেসাঁস ইটালী, আধুনিক ইউরোপ বা জাপানের অনুপ্রেরণা তাহাকে শিল্পে বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। শিল্প ও সাহিত্য, এ সমস্ত-ই জীবনের অংশ—এ কথা আমাদের অহরহঃ মনে রাখিতে হইবে। বাঙ্গালী শিল্পী বাঙ্গালীর জীবনে মহাকাব্যের অনুরূপ রচনার বস্তু না পাইতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরোয়া জীবন লইয়া, ওলন্দাজ শিল্পীদের মতন অথবা জাপানী Ukiyo-ye 'উকিয়ো-য়ে' শিল্পীদের মতন এক অভিনব গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন-সংপৃক্ত চিত্রণ-রীতি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে হওয়া উচিত নহে। এখানেও সততা ও সত্যদৃষ্টি চাই, চোখ ও হাত চাই।

* * *

বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন অরাজকতা চলিতেছে; ইউরোপীয় সাহিত্যের কতকগুলি নূতন জিনিস বাঙ্গালার সাহিত্যে এবং সমাজে চালাইবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। বাঙ্গালা শিল্প-ক্ষেত্রেও এখন কোনও আদর্শ, কোনও বিশেষ রীতি নাই; জাতীয়তার নামে, Indian Art-এর দোহাই পাড়িয়া, ইউরোপীয় নকল-শিল্পের উপরে এক পোঁছ প্রাচ্যামির রঙ লেপিয়া, এখন সাধারণতঃ বাঙ্গালী শিল্পী আত্মপ্রকাশ বা আত্ম-বঞ্চনায় ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে একমাত্র দিগ্‌দর্শন আসিতে পারে,—প্রথমতঃ, শিল্পীদের মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্ধনে—শিল্পেতিহাসের আলোচনায়, মিসরীয়, গ্রীক, বিজান্তীয়, প্রাচীন ভারতীয়, গথিক, চানা, জাপানী, রেনেসাঁস প্রভৃতি শিল্পের বড়ো-বড়ো সৃষ্টির অনুধ্যানে; দ্বিতীয়তঃ—বহুবর্ষব্যাপী সাধনার দ্বারা সৌন্দর্য্যগ্রাহী দিব্যদৃষ্টি লাভে, এবং দিব্যদৃষ্টির প্রকাশক তুলিকা বা ছেদনী চালনার শক্তি অর্জনে। দেশের শিল্পের ধারাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজ প্রচেষ্টাকে তাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে না দিলে, দেশের মাটি হইতে রস পাইয়া তবে শিল্প প্রাণবন্ত থাকিবে। যুগ-প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ, সিদ্ধ-শিল্পী রূপপতি নন্দলাল, ভাবুক রূপকার যামিনীরঞ্জন—নবীন বাঙ্গালার শিল্প-জগতের এই ত্রয়ী শক্তির অনুপ্রেরণা, তরুণ বাঙ্গালী শিল্পীকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারিবে, মানসিক ও শিল্প-বিষয়ক সংস্কৃতি ও উপলব্ধি, শক্তি ও দৃঢ়তা, সত্য-দর্শন ও সত্য-প্রকাশনের সাধনায় তাহার জন্য যুগোপযোগী পথ নির্দেশ করিতে পারিবে॥

[বঙ্গাব্দ ১৩৪৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"

(বৈদিক উর্বশী, গ্রীক আফ্রোদীতে, সূফী বিশ্বপ্রিয়া)

রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী" কবিতাটি বাঙ্গালা ভাষায় কল্পনার ও উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-রূপে বিদ্যমান, এবং বিশ্বসাহিত্যেও এইরূপ কবিতা সুদুর্লভ। বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও মানব-জীবন উভয়েরই মাধ্যমে কার্য্যকর, জীবনের আধার এবং পটভূমিকা-রূপে শাশ্বত সত্তা ও সত্য, নানা ভাবে আপান-ই মানুষের কাছে দেখা দেয় ও ধরা দেয়—মানুষ-ও নানা ভাবে তাহাকে দেখিতে চায় ও ধরিতে চায়। মানুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, রুচি ও আকাঙ্ক্ষা সংখ্যাতীত; শাশ্বত সত্যও বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সংখ্যাতীত পৃথক্-পৃথক্ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। সূফী দার্শনিক এই ভাবের কথা-ই বলিয়াছেন —"তুরুকু-ল্লাহি ক-াঅদদি অন্‌ফাসি-ল্-মখ্‌লুকাতি" অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু-সমূহের নিঃশ্বাসের সংখ্যার মতো-ই ঈশ্বরের প্রকাশ-লীলা অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের মনে এই শাশ্বত সত্তা যে ভাবে নিজেকে ধরা দিযাছিল, তাঁহার যৌবন-কালের "জীবন-দেবতা" পর্য্যাযের কবিতাগুলিতে (মুখ্যতঃ "সোনার তরী" ও "চিত্রা"-র এবং "উৎসর্গ"-র কতকগুলি কবিতায়, এবং প্রকীর্ণ অন্য কতকগু া কবিতায) তাহা অদ্ভুত মনোহর ভাবে প্রকাশিত হইযাছে। ভাব ও তাহার প্রকাশ উভয়-ই চিরন্তন, এবং একাধারে নবীন ও প্রাচীন। নানা দেশে, নানা যুগে, নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে, শাশ্বত বস্তুর প্রকাশ, বহুধা অর্থাৎ বহু বিভিন্ন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে একটি নূতন ভঙ্গী আনিয়া দিয়াছেন; তাহাতে এই চিরন্তন সত্তা আবার নূতন রূপে আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং আমাদের আকুল করিতেছে। এই বিশ্বজনীন আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিগত উপলব্ধির রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া, যেন বিশেষ-ভাবে রবীন্দ্রনাথের-ই সত্যদর্শন ও অনুভূতির বাণী বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

* * * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিষয়টির আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন ডচ্-ইণ্ডিয়া বা ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ দ্বীপময় ভারতে (যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে) ভ্রমণ করিতে যান, তখন আমাকেও তিনি সঙ্গে লইয়া যান। যবদ্বীপের বাতাবিয়া নগরে দুই তিন-দিন থাকিবার পরে আমরা সুরাবায়াতে যাই, এবং সেখান হইতে আমাদের বলিদ্বীপ-যাত্রা হয়। বিকাল বেলায় আমরা সুরাবায়াতে জাহাজে চড়ি, তাহার পরের দিন ভোরে উত্তর-বলিদ্বীপের বন্দর বুলেলেঙ্-এ পৌঁছিবার কথা। সন্ধ্যার প্রথমেই জাহাজের যাত্রীদের সায়মাশ সম্পন্ন হইল। রবীন্দ্রনাথ উপরের খোলা ডেকে আসিয়া বসিলে, ওলন্দাজ ও ইন্দোনেসীয় অনুরাগী সহযাত্রিগণ চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সদালাপ চলিতে লাগিল। আমি একটি ইন্দোনেসীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করিতে-করিতে ডেকের উপরে পায়চারি করিতেছি। একটু দূরে, খোলা ডেকের উপরেই, একটি ছোট টেবিলের সামনে দুইখানি চেয়ারে একটি দম্পতী উপবিষ্ট—পোশাকে পুরুষটিকে আমেরিকান পাদ্‌রি বলিয়া মনে হইল। আড় চোখে চাহিয়া দেখিলাম, স্বামীটি একটু ভালো-মানুষ গোছের, সরল-প্রাণ ব্যক্তি। স্ত্রীটির ইচ্ছা, স্বামী গিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটু আলাপ জমান, কিন্তু স্বামীটি মিশুক নহেন, ইতস্ততঃ করিতেছেন। শেষটায় দেখিলাম, বেচারা পাদ্‌রি, স্ত্রীর তাড়ায় উঠিয়া, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে আমার কাছেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পরিষ্কার আমেরিকান নাকী টানের ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, Sir, are you travelling with Tagore, the poet? আপনি কি ঠাকুর কবির সঙ্গে যাইতেছেন? আমি বলিলাম, Yes; what can I do for you? হাঁ; আপনার জন্য কী করিতে পারি? পাদরি তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—Can I have a talk with him for two minutes by the clock—ঘড়ী ধরিয়া মাত্র দুই মিনিটের মতন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পারি কি? আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। পাদ্‌রির সঙ্গে আমি যে কথা কহিতেছি, কবি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, ভদ্রলোকটি "ঘড়ী ধরিয়া, দুই মিনিট মাত্র" আপনার সঙ্গে কথা কহিতে চান। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ওটি? পাদ্‌রি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইতেছে। আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, পাদ্‌রি বটে, আমেরিকান পাদ্‌রি। এখন বিশেষ করিয়া 'আমেরিকান পাদ্‌রি' শুনিয়া, রবীন্দ্রনাথ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নোবেল পারিতোষিক পাইবার পরে যখন আন্তর্জাতিক নামযশ তাঁহার হইল, তাহার পরে জাহাজে ভ্রমণ-কালে দুই-দুই বার আমেরিকান পাদ্‌রি তাঁহার উপরে চড়াও হয়—তাঁহাকে যদি খ্রীষ্টান করিতে পারা যায় এই চেষ্টায়। ঘর-পোড়া গোরু সিন্দুরে' মেঘ দেখিয়া ডরায়—রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থা। আমি বলিলাম—যদি বেআদবী করে, তাহা হইলে সরাইয়া লইয়া যাইব। তখন কবি নিরুপায় ভাবে বলিলেন, আচ্ছা, ডেকে নিয়ে এসো। রবীন্দ্রনাথের সামনে আসিয়াই, খাস আমেরিকান কায়দায় হৃদ্যতা দেখাইয়া খুব জোরে তাঁহার হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া, পাদ্‌রিটি বলিলেন, Glad to make your acquaintance, Sir. After all, we follow the same religion—মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখী হইলাম—আমরা তো মোটামুটি ভাবে এক-ই ধর্ম পালন করি। ধর্ম-বিষয়ে বিচারের উদ্দেশ্যে একেবারে সোজা মুখপাত। কবি শুধাইলেন—How's that? সেটা কী রকম? পাদ্‌রি ব্যাখ্যা করিলেন—Aren't our ideas about God the same? ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি এক ধরণের নয়? কবি উত্তর দিলেন, I doubt it very much—সে বিষয়ে আমার খুব-ই সন্দেহ আছে। তখন পাদ্‌রি বলিলেন, "Why, don't we both worship God as Father? কেন, আমরা দু-জনেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পূজা করি না? আমি দেখিলাম—এই বার God as Father বা "পিতা ঈশ্বর" আমন্ত্রিত হইলেন, ইহার পরে নিশ্চয়ই God the Son বা "পুত্র ঈশ্বর" এবং God the Holy Ghost বা "পবিত্র আত্মা ঈশ্বর" আসিবেন—সেইজন্য তাড়াতাড়ি কবি কিছু বলিবার আগেই বলিলাম—Yes, we worship God as Father; we also worship God as Mother, as Son, as Friend; we also worship him as Lover; and we dare worship him even as Sweetheart —আমরা পিতা-রূপে ঈশ্বরের আরাধনা করি, তা-ছাড়া মাতা-রূপেও করি, পুত্র আর মিত্র-রূপেও করি; আমরা ঈশ্বরকে প্রণয়াস্পদ রূপে-ও আরাধনা করি; এমন কি তাঁহাকে প্রণয়িনী রূপে-ও আরাধনা করিবার সাহস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাখি। "সদা-প্রভু পরম পিতা" পরমেশ্বরের সঙ্গে এ কি সৃষ্টি-ছাড়া সম্বন্ধের কল্পনা! পাদ্‌রিটি আমার কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—কিন্তু কবি নির্বাক্, নিশ্চল, স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন, আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না। তখন পাদ্‌রিটি কিছু না বলিয়া হঠাৎ স্থান-ত্যাগ করিয়া, একেবারে গট্‌গট্ করিয়া গিয়া অপেক্ষমাণা স্ত্রীর পাশে চেয়ারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন—বোধ হয় স্ত্রীকে যাহা বলিলেন তাহা এই ধরণের কথা-ই হইবে—গিন্নী! এরা বলে কী! লোকগুলা উন্মাদ!

* * * *

এই যে God the Sweetheart-এর কল্পনা, এটি একটি নূতন বস্তু নয়। মানব যখন হইতেই ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্তার সহিত নিজের ব্যক্তিগত যোগের বা আকর্ষণের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সামাজিক পরিবেশের প্রসার বা উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ঐ সত্তার সহিত সে নানাবিধ সম্পর্কের কল্পনা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক, পতি-পত্নী রূপে বা প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে যখন romantic অর্থাৎ রমন্যাস বা অনুরাগ-রঞ্জিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, দেহাশ্রয়ী সম্পর্ক যখন আতিদৈহিক পর্য্যায়ে sublimated বা উন্নীত হইল, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা, এবং বিশ্বাতিগ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরাৎপরের সঙ্গে এই প্রকারের অনুরাগ-রঞ্জিত নিবিড়তম সংযোগকে তখন মানুষ অন্যতম চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা পরমার্থ বলিয়া চিন্তা করিতে শিখিল। মানব-সমাজে এক দিকে যেমন শাশ্বত সত্যের সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিতেছিল, এবং সেই সচেতনতাকে অবলম্বন করিয়া সত্যের বা পরমার্থের উপলব্ধি বা অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা ধর্ম-সাধনার রূপে প্রকট হইতেছিল, তেমনি অন্য দিকে নর-নারীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও জীবনের অন্যতম প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ বলিয়া পরিগণিত হইয়া, শ্রেয়ের প্রতীক বা সাধন-রূপে কবিদৃষ্টি-যুক্ত মানব-মনের নিকট প্রতিভাত হইল। জ্ঞানের পথে ও কর্মের পথে যেমন শাশ্বত সত্তার উপলব্ধির চেষ্টা আরম্ভ হইল, তেমনি পরে এই অনুরাগের পথও আবিষ্কৃত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধও জাগ্রত হইল। সমাজে সব বিষয়ে নেতা বা পরিচালক ছিল পুরুষ, এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী-ই সব বিষয়ে ছিল প্রবল—এমন কি মেয়েরাও অবস্থাগতিকে পড়িয়া পুরুষের চোখেই সমস্ত বিষয় দেখিতে অভ্যস্ত হয়। নারী-সম্বন্ধে পুরুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধারণা যেমন-যেমন romantic বা অনুরাগের পর্য্যায়ে উঠিতে লাগিল, পুরুষ-ও তেমনি-তেমনি কবিতায়, গানে, কাব্যে, ও শিল্পে তাহার উচ্ছ্বসিত ও পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে লাগিল। নারী তো নর-সমাজে পরিবার ও গৃহের পত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, গৃহধর্মের সহধর্মিণী রূপে প্রথম হইতেই ছিল। তাহার উপরে, নারী-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাঙ্গল্য, শ্রী ও কল্যাণ আসিয়া, ভাবুক পুরুষের কাছে নারীর মর্য্যাদা আরও উঁচুতে তুলিয়া ধরিল। বাস্তব ও কল্পনা, জৈব আকর্ষণ এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে তাহার উন্নয়ন—এই দুইয়ে মিলিয়া পুরুষের কল্পনার কেন্দ্র করিয়া তুলিল নারীকে। অপর, যে শাশ্বত বস্তুর সম্বন্ধে মানুষ এই ভাবে সচেতন হইল—

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি ;
বিশ্ব-বিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছো মোর জীবন মরণ হরণ করি"—

মানবী আকৃতিতে তাহার যেন নানা রূপায়ণ মানব-চিত্তে ঘটিল, নারী-মূর্তি-ও তাহারও মধ্যে পুরুষ-আকৃতির প্রতিস্পর্ধী হইয়া দেখা দিল। নারী একাধারে প্রণয়িনী ও জননী ; নারী আবার একদিকে নর্মসখী ও অন্যদিকে কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী। পুরুষের complementary বা পরিপূরক আবার নারী। সুপ্রাচীন যুগ হইতেই সব দেশের পুরুষ, সে যাহা আন্তরিক ভাবে কামনা করে তাহাকে নারী-প্রতীকেই পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। The World's Desire অর্থাৎ "বিশ্ব-বাসনা" নিজ বিকশিত রূপ লাভ করিয়াছে নারী-মূর্তিতে ; কবির এই উক্তি মানব-সাধারণ—"অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।"

কিন্তু তাই বলিয়া সর্বত্রই যে নারী-প্রতীকে বিশ্বসত্তার বা শাশ্বত সত্যের আবাহন হইয়াছে, তাহা নহে। বিভিন্ন জন-সমাজের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের আধারে এ বিষয়ে সেই সমাজের চেতনাও গড়িয়া উঠিয়াছে। Patriarchal অর্থাৎ পিতৃনিষ্ঠ সমাজে মাতার স্থান পিতার পরে ; আবার তেমনি Matriarchal অর্থাৎ মাতৃনিষ্ঠ সমাজে পিতার স্থান নগণ্য, মাতা-ই সেখানে রাণী, মাতা-ই পরমা দেবী। পৃথিবী বা ধরণী বা ধরিত্রী—সকলকে ধরিয়া আছেন, ক্রোড়ে করিয়া আছেন এই প্রশস্ত ভূমিময় জগৎ—প্রায় সর্বত্র মাতা-রূপে কল্পিত—আমাদের "পৃথিবী মাতা," "ধরতী মা"। এই মনোভাবও আদিম মানবের মনোভাব। পিতৃনিষ্ঠ ও মাতৃনিষ্ঠ উভয় পারিপার্শ্বিকের মিলনের ফলে আর্য্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"দ্যৌষ্ পিতা" ও "পৃথ্বী মাতা" উভয়ের মিলিত কল্পনা গড়িয়া উঠে। এবং প্রাগ-আর্য্য যুগের পশ্চিম-এশিয়া খণ্ডের আর্য্যেতর জাতি-সমূহের মধ্যে শিব-উমা বা শিব-শক্তির দর্শন-মূলক প্রতিষ্ঠা ঘটে। অন্যান্য নানা জাতির মধ্যে-ও এইরূপ নর-নারী বা পিতা-মাতার অথবা পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্ম কল্পনা দেখা যায়। ভারতের আদিবাসী কোল-জাতির মধ্যে "সের্মা" (Serma) বা আকাশ ও "অতে" (Ote) বা পৃথিবী, "আপা-এঙা" (Apa-Enga) বা পিতা-মাতা রূপে কল্পিত। পোলিনেসীয় জাতির মধ্যে "পাপা-রাঙি" বা "পাপা-লাঙি" অর্থাৎ পৃথিবী (Papa) ও স্বর্গ বা আকাশ (Langi, Rangi), চীনাদের মধ্যে Yang "য়াঙ্" বা পুরুষ ও Yin "য়িন্" বা প্রকৃতি, এইরূপে বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত।

এইরূপে দেখা যায় যে, শাশ্বত সত্তার সহিত মানব অন্তরঙ্গ-ভাবে নানা সম্বন্ধের কথা স্থির করিয়াছে—প্রভু, পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, পতি, প্রণয়িনী প্রভৃতি। এইরূপ নানা প্রকারের সম্বন্ধ মানুষ যে করিয়া থাকে, মানুষ করিতে বাধ্য, তাহা প্রাচীন ভারতে অতি সহজ-ভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের "একং সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি," উপনিষদের "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব", এবং "ত্বং স্ত্রী ত্বম্ পুমানসি, ত্বম্ কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" প্রভৃতি বচনে, এবং গীতার "গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং বিধানম্ বীজম্ অব্যয়ম্॥" প্রভৃতি শ্লোকে, এই বিশ্বতোমুখ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে বৈষ্ণব চিন্তায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই কয় পর্য্যায়ে এই ব্যক্তিগত সংযোগ শ্রেণী-নিবদ্ধ হয়। সময় বা অবস্থা অনুসারে এক-ই ব্যক্তি, একাধিক সম্পর্কের ভাবনা করিতে পারে ও করিয়া থাকে।

* * * *

আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, এই রসাত্মক বা অনুরাগময় মধুর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং সর্বোচ্চ কোটির বলিয়া স্বীকৃত। এই সম্পর্কে, মানব অথবা মানবাত্মা হইতেছে 'শাশ্বত নারী' এবং পরম সত্য বা চরম সত্তা হইতেছেন পুরুষ—'পুরুষোত্তম'; গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ, এই দুই প্রতীকে এই সম্পর্ক বৈষ্ণব দর্শনে ও অনুভূতিতে রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই মধুর রসের বা অনুরাগের সম্পর্কের সাধনায়, চিরকাল ধরিয়া. ভারতবর্ষে সর্বত্র সব শ্রেণীর সাধক, যাঁহারা শুষ্ক জ্ঞান ও বিচারের পথের বাহিরে প্রধানতঃ রসানুভূতির পথ গ্রহণ করিয়াছেন, 'মানবাত্মা নারী-প্রকৃতিক ও পরমাত্মা পুরুষোত্তম', এই ভাবের-ই ভাবুক হইয়াছেন। অবশ্য, একাত্মবোধের অবস্থায় নারী বা পুরুষ কাহারো এই বিভেদ-বুদ্ধি থাকে না—বৈষ্ণব সাধক পদকার যেমন বলিয়াছেন, "না সো রমণ, না হম রমণী"—কিন্তু সাধারণ ধারণায় এই ভাবের সিদ্ধান্ত বা আরোপ প্রচলিত। অবশ্য এই সাধারণ ধারণা বা বোধের ব্যত্যয়-ও ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতিহাসে আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন বা সংযোগকে, অথবা জীবাত্মা কর্তৃক নিজের মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি বা অনুভূতিকে, 'প্রিয়া স্ত্রী'র সঙ্গে পুরুষের মিলনের সহিত উপমিত করা হইয়াছে (বৃহদারণ্যক —৪।৩।২১—"তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহত-পাপ্মাভয়ং রূপং—তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্, এবায়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরং—তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।" ঋগ্বেদেও, কবি বা ঋষির কাছে বাগ্‌দেবীর আত্ম-প্রকাশকে-ও অনুরূপ প্রতীকে দেখানো হইয়াছে—

"উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্,
উতঃ ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তনুবং বিসস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥"

এবং উপনিষদে পাইতেছি—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বি বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে মধুর রসের সাধনায় পরমাত্মা বা শাশ্বত সত্তা হইতেছেন পুরুষ, এবং মানব বা মানবাত্মা হইতেছে নারী। ইহার বিপরীত ভাব পাওয়া যায় না—উপরের অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত বৈদিক সাহিত্যের কতকগুলি উদাহরণ ভিন্ন। এমন কি মুসলমান সূফী মতভাবে প্রভাবান্বিত, ও স্পষ্ট করিয়া নিজেদের "সূফী" আখ্যা যাঁহারা দিয়াছেন, এমন মুসলমান ও হিন্দু কবিগণ, এই ভারতীয় কল্পনা-ই রক্ষা করিয়াছেন—ঈশ্বর পুরুষোত্তম, মানব যেন ঈশ্বরের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী। ঈরান ও আরবের সূফী মতে কিন্তু ইহার বিপরীতটি-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হইতেছে। ভারতে স্থফী আধ্যাত্মিক ধারণা ও প্রকাশ-ধারা যাঁহারা পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছেন, এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে ফারসী সাহিত্যের আওতায় যাঁহারা পড়িয়াছেন, এমন কতকগুলি উর্দু-ভাষার কবি অবশ্য এই সনাতন বা বিশিষ্ট ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী গ্রহণ করেন নাই—ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে "মাশূকা" বা "মাশূক", অর্থাৎ প্রেমের পাত্রী অথবা প্রেমের পাত্র, এবং মানব বা জীব হইতেছে "আশিক্" অর্থাৎ প্রেমিক।

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"-বিষয়ক কবিতাগুলিতে কিন্তু ভারতীয় ধারার বিরোধী অন্য ভাবটি-ই পাইতেছি। এই "জীবন-দেবতা" কে? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চিন্তা বা ভাব-ধারার বিচার-বিশ্লেষণ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ এই জীবন-দেবতা যে শাশ্বত সত্তা, পরমাত্মা বা 'ঈশ্বর' নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত (সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, সাকার দেবতা প্রভৃতি) ঈশ্বরীয় সত্তার বিভিন্ন বর্ণনা অথবা দার্শনিক প্রকৃতি নির্ণয়ের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূত ও "জীবন-দেবতা" নামে অভিহিত এবং কবিতায় তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত সত্য-শিব-সুন্দর-স্বরূপ (এবং কবি-দৃষ্টির সামনে বিশেষ করিয়া সুন্দর-স্বরূপ) বিশ্ব-নিহিত ও বিশ্বাতিগ শাশ্বত সত্তার সম্পূর্ণ মিল না পাইয়া, এই "জীবন-দেবতা"-কে ঐশ্বরিক সত্তা হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন; এবং সেই বস্তুটি যে কী, তাহার নির্ণয়ের জন্য শব্দের মালা গাঁথিয়াছেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমার মনে হয়, যে বিশ্ব-শক্তি বা বিশ্বদেবতা ব্রহ্মাণ্ডময় লীলা করিতেছেন, মানব-জীবন সেই দেবতার অধিকারের বাহিরে নহে; "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে"—সেই দেবতা বা সত্তা বা শক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছেন, আবার মানুষের দেহ-পিণ্ডের অভ্যন্তরে তাঁহার-ই লীলা চলিতেছে; Macrocosm ও Microcosm, বৃহৎ বা ভূমা, এবং অণু বা কণা, উভয়-ই তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র, এবং সেই লীলার প্রকাশ বা ভঙ্গী-ও অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি, বিশ্ব-মানবের অনুভূতির রাজ্যে একান্ত-ভাবে তাঁহার নিজের দান—তাঁহার কাব্যময় কৃতির মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে এই বস্তুটি একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া বিদ্যমান; এবং চিরকাল ধরিয়া ইহা রসের অফুরন্ত উৎস হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা লোপ পাইলে বা ইহার আমূল পরিবর্তন ঘটিলে, এই বস্তুর প্রকাশ-সৌন্দর্য্য সাধারণ ভবিষ্যদ্-বংশীয়ের কাছে হয়-তো ঢাকা পড়িয়া যাইবে; কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে-ও তাহার রস-বৈচিত্র্য বা রস-বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হইবে না।

* * * *

অনুরাগ-রঞ্জিত এই দৃষ্টি বা অনুভূতি, বিশ্বের প্রেয়সী, এবং ব্যক্তি-গত ভাবে কবির প্রেয়সী এই যে সৌন্দর্য্যময়ী নারী-মূর্তিতে প্রকটিত শাশ্বত সত্য, কবির কাছে আসিল কী করিয়া? এ সম্বন্ধে কার্য্যকারণাত্মক বা ক্রম-বিচার-মূলক অনুসন্ধান চলিতে পারে; তাহাতে এই অপূর্ব রস-সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বা গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং ইহাকে সম্যক্ রূপে বুঝিবার পক্ষে সহায়তা-লাভ ঘটিতে পারে। Beauty in the Abstract, ভাবময় সৌন্দর্য্য, যাহা শাশ্বত সত্তারই রূপান্তর, তাহার সম্বন্ধে সূক্ত রচনা করিয়াছেন কবি তাঁহার "উর্বশী" কবিতায়। এই নামের দ্বারায়, কবির অনুভূতি- ও অনুভূতি-জাত রস-সৃষ্টির অন্যতম আধার বা প্রেরণাকে আমরা গোচরীভূত করিতে পারি। "উর্বশী"র প্রথম প্রকাশ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে—ঋগ্বেদের কবিতাময় পুরূরবা-উর্বশী সূক্তে, শতপথ-ব্রাহ্মণের গদ্য উপাখ্যানে। পরবর্তী কালে বিষ্ণু-পুরাণেও উর্বশীর কথা পাই। প্রাচীন আর্য্য জগতের আখ্যানটির মৌলিক সরলতা ও মনোহারিতা বিষ্ণু-পুরাণে কথিত গদ্যময় উপাখ্যান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে কালিদাসের নাটকে, তথা অন্য পুরাণে, এই উপাখ্যান বহুশঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া নিতান্ত অন্য ধরণের হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" পর্য্যায়ের কাব্য-সর্জনার মধ্যে, বৈদিক উর্বশীর কল্পনা একটি মূল-সূত্র রূপে বিদ্যমান।

"উর্বশী"-কবিতার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা হইতেছে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে—প্রাচীন গ্রীক প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী Aphrodite আফ্রোদীতে-র কল্পনা হইতে; প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, ও তাহার আদর্শে গঠিত আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি আছে, তাহা-ও ইহার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা। তৃতীয় অনুপ্রাণনা আমার মনে হয় কবি পাইয়াছিলেন, পরোক্ষ ভাবে—সূফী কবিতা হইতে। ঈশ্বরের বিভূতি-স্বরূপ কবির নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিব্য প্রতিভা, অবশ্য এই কবিতা-সর্জনার মূল উৎস। কিন্তু যে রঙ্গীন আলোক এই উৎস-ধারার উপর পড়িয়া তাহাকে এমন বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল করিয়াছে, অন্ততঃ তাহা অংশতঃ এই তিন বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়াছে।

উর্বশীর কল্পনার ও উপাখ্যানের মূল কথা—দেবকন্যার সহিত মানবের প্রেম। এইরূপ উপাখ্যান বা কল্পনা নানা জাতির মধ্যে আছে; কিন্তু মনে হয়, কল্পনাশীল ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি-আর্য্য) জাতির মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। আদি-আর্য্য (বা ইন্দো-ইউরোপীয়) জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে এইরূপ এক বা একাধিক myth বা দেব-কাহিনী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য, প্রাচীন ঈরানীয়, প্রাচীন গ্রীক, ইতালীয়, কেল্‌তিক, জর্‌মানিক ও স্লাব, ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সকল শাখার মধ্যেই এই ধরণের উপাখ্যান বা কথা পাওয়া যায়। অপ্সরা বা দিব্য-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত সুন্দরীকে দেখিয়া মানুষ প্রেমে পড়িল। অমানুষী নিজেকে মানুষের কাছে ধরা দিল; পরে পার্থিব জীবনে বিগত-রুচি হইয়া, দেবকন্যা বা সুর-সুন্দরীর তিরোধান; এবং শেষে ইহ-লোকেই অথবা পর-লোকে মানুষ ও অমানুষী প্রেমিক-যুগলের মিলন, ও মানুষের দেবত্ব-লাভ। এইরূপ উপাখ্যানে আবার কতকগুলি খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি আদি-আর্য্য জাতির মধ্যে উদ্ভূত এই myth বা দেব-কাহিনীর মূল রূপে বিদ্যমান ছিল। যেমন "আতি" বা swan অর্থাৎ রাজহংস রূপে অমানুষী অপ্সরোগণের বিচরণ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, অপ্সরা উর্বশী ও তাঁহার মানুষ প্রেমিক ও পতি রাজা পুরূরবার কথোপকথনাত্মক আঠারো ঋকের একটি সূক্ত আছে (ঋগ্বেদ, ১০।৯৫); শতপথ-ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে বর্ণিত গদ্য উপাখ্যান হইতে এই কথোপকথনের সূত্র ঠিক-মতো ধরা যায়।

অপ্সরা ও গন্ধর্ব বৈদিক দেব-জগতে Romance of the Supernatural অর্থাৎ অতি-প্রাকৃতের রমণীয়তার প্রতীক ও প্রকাশক। ঋগ্বেদের দেবতারা পুরাপুরি মানব-ধর্মী নহেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে নৈসর্গিক জগতের ছাপ বা ছোঁয়াচ বিদ্যমান—যদিও ইন্দ্র, উষা, সূর্য্য, অশ্বিদ্বয়, রুদ্র প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার মধ্যে মানব-ধর্মিতা যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু গন্ধর্ব ও তাহাদের সহিত সংযুক্ত অপ্সরোগণ—ইহাদের সম্বন্ধে যে কল্পনা, তাহা অন্য জিনিস। পৌরাণিক স্বর্গের মহামহিম সম্রাট্, অমাত্য- ও চাটুকার-পরিবেষ্টিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজা ইন্দ্রের সভার নাচুনী রূপে অপ্সরাদের অবনমন তখন-ও হয় নাই। অপ্সরোগণ জল স্থল, অরণ্য ও আকাশমার্গে বিচরণশীল স্বাধীন দেবযোনি, গন্ধর্বগণ অপ্সরাদের সহচর, পতি। স্বেচ্ছাবৃত্ত চিরযৌবনা অপ্সরোগণ, গ্রীক দেবলোকের Naiad, Dryad ও Nereid-দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের কেশি-সূক্তে (১০।১৩৬) দেখিতেছি, দীর্ঘ-কেশ-ধারী মলিন-কাষায়-বস্ত্র-পরিধানকারী শৈব যোগী, যিনি রুদ্রের সঙ্গে এক পাত্রে বিষপান করেন ("কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্ রুদ্রেণাপিবৎ সহ"), তিনি নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন—সিদ্ধি লাভ করেন; তন্মধ্যে একটি কাম্য সিদ্ধি হইতেছে এই যে, তিনি অপ্সরা ও গন্ধর্ব এবং বন্য পশুর বিচরণ-ভূমিতে ইচ্ছামতো চলিয়া-ফিরিয়া বেড়ান ("অপ্সরসাং, গন্ধর্বাণাং, মৃগাণাং চরণে চরন্।")।

এই-রূপ এক অপ্সরা, উর্বশী ছিল যাঁহার নাম, তিনি ইলা-পুত্র রাজা পুরূরবাকে কামনা করিলেন, রাজা পুরূরবাব পত্নীত্ব স্বীকার করিলেন। উর্বশীকে রাজা পত্নী-রূপে পাইলেন, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার পক্ষে পালনীয় কতকগুলি তুচ্ছ প্রতিবন্ধ বা সময় বা শর্ত ছিল। উর্বশীকে আবার তাহাদের মধ্যে ফিরাইয়া পাইতে উৎসুক গন্ধর্বদের চেষ্টায়, সেই প্রতিবন্ধ পুরূরবা অনিচ্ছায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে উর্বশীও অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে রাজপত্নী উর্বশীর সন্তান-সম্ভাবনা। পুরূরবা প্রিয়া-বিরহে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে কতকগুলি অপ্সরা সহচরী সহিত কুরু-ক্ষেত্রের হ্রদে আতি বা রাজহংসের রূপে তাঁহাকে জলক্রীড়া করিতে দেখিলেন। উর্বশী পুরূরবার সহিত আলাপ করিলেন। উভয়ে পূর্বের দাম্পত্য জীবনের কথার অনুস্মরণ করিলেন। এবং ভবিষ্যতে পুরূরবার সহিত উর্বশীর আবার মিলন হইবে স্বর্গ-লোকে বা গন্ধর্ব-লোকে, এই কথার ইঙ্গিত করিয়া উর্বশী তিরোধান করিলেন।

এই তো উপাখ্যান। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্ত-সমূহে কতকগুলি বাক্য আছে, যেগুলিতে উর্বশীকে সামান্য একটি রূপকথার নায়িকার পদ হইতে মানুষের কামনার কেন্দ্রীভূত এক বিশ্বাবেশিনী নারী-রূপিণী সত্তা বা শক্তিতে পরিণত করিতেছে। এই সত্তাকে মানুষ পাইয়া-ও পাইতেছে না—অমানুষী এই শক্তিকে মানুষ সেবা করিয়াছে, লাভ করিয়াছে, ("পুরূরবো অনু তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কেতমায়ং ; রাজা মে, বীর ! তনুঅস্ তদাসীঃ" ; "অমানুষীষু মানুষো নি ষেবে") ; কিন্তু এই শক্তি বা সত্তা এখন প্রথম উষার ন্যায় চিরতরে অন্তর্হিত, বায়ুর ন্যায় দুরাপনীয় ("প্রাক্রমিষম্ উষসাম্ অগ্রিয়েব···দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি")। কিন্তু তবুও আশা মনের কোণে জাগিয়া থাকে ;—উর্বশী একবার দেখা দিয়া আবার চলিয়া যাইতেছেন, পুরূরবার আকুল কামনা—

"অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীম্
উপ শিক্ষামি উর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ ;
নি বর্তস্ব—হৃদয়ং তপ্যতে মে।"—

"অত্যন্ত কামনাযুক্ত হইয়া আমি উর্বশীকে আহ্বান করি—যে উর্বশী অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়া রাখে, ও আকাশ-মার্গকে পরিমাণ করে। আমার সমস্ত সুকৃতের বা পুণ্য-কর্মের ফল তোমাতেই পঁহুছাক্ ; ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় তপ্ত হইতেছে।"

এই পুরূরবা-উর্বশীর ঋক্‌গুলির মধ্যে, বিশেষ করিয়া উপরে উদ্‌ধৃত ঋক্‌টিতে, রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"-র মহীয়সী কল্পনার কতকগুলি বীজ যেন বিদ্যমান। "উর্বশী" নামটির মৌলিক অর্থ সম্ভবতঃ ইহা-ই ছিল—'উরু' অর্থাৎ প্রচুর বা পূর্ণ, 'বশ' অর্থাৎ কামনা যাহার, বা যাহার জন্য (উরু+ √বশ্+ -ঈ)। প্রাচীন গ্রীক-ভাষায় ইহার প্রতিরূপ হইবে *Euru-wekia—*Eurekia। এই হিসাবে, "*উরু-বশী—উর্‌-বশী, উর্বশী" শব্দের অর্থ হইতে পারে the World's Desire,—রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বিশ্ব-বাসনা"।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের উর্বশী-পুরূরবা-সংবাদময় পঁচানব্বইয়ের সূক্তের উদ্‌ধৃত এই সতেরোর সংখ্যক উপাস্ত ঋক্‌টিতে, অমানুষীর সহিত মানুষের প্রেমের কাহিনী বা রূপকথাটি, সাধারণ পার্থিব সত্তা বা জীবনের ঊর্ধ্বে একেবারে অতীন্দ্রিয় লোকে উন্নীত হইতেছে। এখানে, এমন কি মানুষের নৈতিক জীবনের সার্থকতা হইতেছে, জীবনের পিছনে অবস্থিত শাশ্বত সত্তাতে তাহার সমস্ত কর্মচেষ্টা, 'সমস্ত শুভ কার্য্য, সব সুকৃতের সমর্পণের মধ্যে-ই—"উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ"—এরূপ ইঙ্গিতও রহিয়াছে।

* * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার পরিকল্পনার মধ্যে, গ্রীক দেবী Aphroditē আফ্রোদীতে ও আফ্রোদীতেকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে (বিশেষ করিয়া গ্যোটে হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে) বিশ্ব-মধ্যে লীলান্বিত সর্বসুন্দরী দৈবীশক্তির যে আবাহন ও অনুধ্যান চলিয়াছে, তাহার-ও প্রভাব আছে। আফ্রোদীতে প্রেমের ও কামের দেবী; তিনি মানব-সম্পর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অনৈতিক আকর্ষণ-শক্তি; জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের বিগ্রহ-স্বরূপা তিনি। ("আফ্রোদীতে" নামটির সংস্কৃত প্রতিরূপ "*অভ্রদত্তা" হইতে পারে—"অভ্র বা মেঘের দান", এই অর্থে; এবং মূলে হয়-তো ইনি অপ্-সরার মতো জল-মধ্যে বিচরণশীলা দেবী ছিলেন।) Sophokles সোফোক্লেস্, Euripides এউরিপিদেস্ প্রমুখ প্রাচীন গ্রীসের প্রধান কবিগণ, দেবী আফ্রোদীতে, এই নামের মধ্যে অবস্থিত Cosmic অর্থাৎ বিশ্বস্তব ও বিশ্বন্ধর ভাব বা কল্পনার পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রীক কবিদের দুই একটি উক্তি ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়—

My children, of a surety Cypris is
Not Cypris only, but bears many a name;
Death is her name, and Might imperishable,
And maniac Frenzy, and unallayed Desire,
And Lamentation loud. All is in her,
Impulse, and Quietude, and Energy,
For in the bosoms of all souls that breathe
This Goddess is instilled. Who is not prey
For her? She penetrates the watery tribe
Of fishes; she is in the four-legged breed
Of the dry land; in birds her wing bears sway,
In brutes, in mortals, in the Gods on high.....
.....without spear,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Without a sword, Cypris cuts short all counsels,
Both human and divine.

(সোফোক্লেস্ হইতে, Sir George Young-এর অনুবাদ ;
Cypris = Kupris, Aphrodite আফ্রোদীতের অন্য নাম।)

"বৎসগণ, নিশ্চয়-ই কুপ্রিস্-দেবী (আফ্রোদীতে) কেবল কুপ্রিস্-ই নহেন, কিন্তু তিনি বহুনাম-যুক্তা। তাঁহার নাম 'মৃত্যু', এবং অবিনশ্বর 'শক্তি', এবং 'উন্মাদনা', এবং অতৃপ্ত 'কামনা', এবং নিনাদিনী 'ক্রন্দসী' ; সব-কিছু তাঁহাতেই বিদ্যমান , 'আকাঙ্ক্ষা' এবং 'শান্তি', এবং 'কর্মস্তোতনা'। শ্বাস-যুক্ত প্রত্যেক জীবের বক্ষো-মধ্যে দেবী আসীনা আছেন। এমন কে আছে যে তাঁহার শিকার নহে? জলচর মৎস্য-কুলের মধ্যে তিনি চরণশীলা ; শুষ্ক পৃথিবীর উপরে চতুষ্পদ-কুলের মধ্যেও তিনি বিরাজমানা ; পক্ষিকুলের মধ্যে তাঁহার-ই পক্ষ কার্য্যকর। পশু, মানব, স্বর্গবাসী দেবতা, সকলেই তিনি। বর্ষা বা তরবারীর সাহায্য না লইয়া, কুপ্রিস্-দেবী মানব ও দৈব সর্বপ্রকার বিচার খণ্ডন করিয়া দেন।"

She ranges with the stars of eve and morn,
She wanders in the heaving of the sea,
And all life lives from her.—Aye, this is she
That sows Love's seed and brings Love's fruit to birth ;
And great Love's brethren are all we on earth !

(এউরিপিদেস্ হইতে, Dr. Gilbert Murray-র অনুবাদ।)

"সন্ধ্যা ও উষার তারকার মধ্যে দেবী বিচরণ করেন, সাগরের হিল্লোলে তিনি দোলায়িতা হন ; সমস্ত জীবন তাঁহা হইতে প্রাণ পায়। হাঁ, ইনি-ই তিনি, যিনি প্রেমের বীজ বপন করেন ও প্রেমের ফল উৎপাদন করেন। মহৎ প্রেমের-ই ভ্রাতৃরূপী আমরা সকলে—এই ভূমির উপরে।"

নারী-সম্বন্ধে মানুষের প্রেম ও কাম বিষয়ক সমস্ত বাসনা ও আগ্রহের নিয়ন্ত্রী রূপে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে আফ্রোদীতের এইরূপ বহু উল্লেখ আছে। গ্রীক স্ত্রী-কবি Psappha স্যাপ্‌ফা বা Sappho সাপ্‌ফো-র কতকগুলি গীতি-কবিতার ভগ্নাংশের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নূতন করিয়া এ যুগে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও ভাব-ধারার পুনরাবিষ্কারের পরে ও ইহার পুনরালোচনার ফলে, এই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী সৌন্দর্য্যময়ীর কল্পনা আধুনিক ইউরোপকে আবার নূতন দৃষ্টি, নূতন প্রেরণা দিয়াছে।

গ্যোটের জীবনব্যাপী জ্ঞান ও সাহিত্য-কলার সাধনার ফল Faust "ফাউস্ট্" নামক মহাকাব্য-রূপী নাটকের শেষ কথা—

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan—

"শাশ্বত নারী-রূপিণী আমাদিগকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিতেছে।"

ইংরেজ কবি A. C. Swinburne সুইন্‌ব্যর্‌ন্ গ্রীক ভাবের (বিশেষ করিয়া ইউরোপে খ্রীষ্টান-ধর্ম প্রসার লাভ করিবার পূর্বে যে প্রাচীন গ্রীক ধর্ম গ্রীসদেশে প্রচলিত ছিল তাহার চিন্তা-ধারার) পুনরানয়নের চেষ্টায়, আধুনিক ইংরেজী-সাহিত্যে গ্রীক দিব্যদৃষ্টি আনিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায়, যে-সব কবিতা ও যে-দুইখানি অপূর্ব নাটক রচনা করেন, সেগুলির মধ্যেও এই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী রমণীয়তার প্রশস্তি উদার ছন্দে ও উদাত্ত ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার Hertha কবিতা, The Last Oracle প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা; এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার গ্রীক রীতিতে রচিত নাটক Atalanta in Calydon-এ, আফ্রোদীতে-বন্দনাময় Chorus অর্থাৎ সমবেত-পাঠ—আধুনিক ইউরোপীয় ও বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি অপূর্ব বস্তু; সুইন্‌ব্যর্‌নের এই অনবদ্য সৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"তে আসিয়াছে বলিয়া কেহ-কেহ মনে করেন; এইরূপ মনে করা অযৌক্তিকও নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় প্রকাশে এবং বিশেষ করিয়া "জীবন-দেবতা"র কল্পনায়, ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বা প্রভাব কতটা ছিল, তাহার বিচার হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট্ প্রতিভা ও মনীষা ছিল সর্বগ্রাহী; সব-কিছু হইতেই তিনি ভাব ও প্রকাশ আত্মসাৎ করিবার শক্তি রাখিতেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব যে, তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উপর তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জ্যোতি পড়িয়া, তাহাকে একেবারে তাঁহার নিজের জিনিস করিয়া দিয়াছে: In literature, a thing becomes his who says it best.

* * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"র কল্পনায় ও অনুভূতিতে আর একটি দিক্ হইতে কতকটা প্রভাব আসিয়া গিয়াছিল মনে করি—ইহা হইতেছে সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাত্মাকে মানবের বা মানবাত্মার প্রেমাস্পদ রূপে কল্পনা। সূফী সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ইতিহাস ও সিদ্ধান্তের কথার সম্যক্ আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, আদিম বা প্রাথমিক ইস্‌লামেব মধ্যে, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক এই-ভাবে কল্পিত হয়,—ঈশ্বর প্রভু, মানুষ তাঁহার দাস। ইহা-ই হইতেছে ইস্‌লামের প্রধান বাহ্য রূপ। আভ্যন্তর অনুভূতিতে, লোকোত্তর চরিত্রের মানুষ ঈশ্বরেব সহিত সখিত্ব বা মিত্রতার কোঠাতেও পহুঁছিতে পাবে, ইহা-ও প্রাথমিক ইস্‌লামের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথম যুগের ইস্‌লামী (আরব) সাধকেবা একান্তে এই দাস্য-ভাবের সাধনা করিতেন ; এবং তাঁহাদের এই বিবিক্ত সাধনার মধ্যে সূফী মতবাদেব বীজ নিহিত ছিল। আদ্য ইস্লামের "মীরাবাঈ", আরব সিদ্ধা বাবিযা (তিবোধানের সময়, খ্রীষ্টাব্দ ৮০১) দাস্য-ভাবের পবিবর্তে ঈশ্বব-প্রেম আনিযা, সূফী মতবাদের ও উপলব্ধির মোড ফিরাইয়া দিলেন—এই প্রেম ঠিক বৈষ্ণব মধুর রস বা অনুরাগ নহে, কিন্তু তাহার আভাস-স্বরূপ। বাবিযা-র একটি প্রার্থনার অনুবাদ—

> O, my Lord; the stars are shining, and the eyes of men are closed, and kings have shut their doors, and every lover is alone with his beloved, and here am I, alone with Thee.
>
> "প্রভু আমাব, উপরে তারকা-সমূহ জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে ; মানব-চক্ষু নিমীলিত ; রাজারাও প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ করিযা দিযাছেন ; প্রত্যেক প্রেমিক তাহার প্রেমিকার সঙ্গে একান্তে অবস্থান করিতেছে ; আর আমিও এখানে একা, কেবল তোমার সঙ্গে।"

উত্তরকালে এই ধর্ম-সাধনার ধারায় আসিয়া মিলিত হইল গ্রীক নব্য-প্লাতোনীয় দর্শনের gnosis বা মারিফাৎ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, এবং ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের "শিবোঽহম্" বা "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি"। কিন্তু অনুরাগাত্মক সাধনা এবং অনুভূতিও চলিল। পরবর্তী যুগের ঋষি মন্‌সুর অল্-হল্লাজ (মৃত্যু-কাল ৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিক রূপে সূফী সাধকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাইতেছি, যাঁহাদের চেতনায় ও কাব্যময় প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"র-ই (আংশিক-ভাবে অন্ততঃ) পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া নাম করা যায় এই কয়জনের—হকীম আবুল মজ্‌দ্ মজদূদ্ সনাঈ—পারসীক (একাদশ শতক); ফরীদুদ্দীন †অত্তার—পারসীক (খ্রীষ্টাব্দ ১১২০—১২৩০); †ওমর ইব্‌নু-ল্-ফরীদ—মিসরীয় আরব (১১৮১—১২৩৫); মুহ্‌য়ীদীন ইব্‌নু-ল্-†অরবী—হিস্পান-দেশীয় আরব (১১৬৫—১২৪০); এবং জলালুদ্দীন রূমী—পারসীক (১২০৭—১২৭৩); শেখ সা†দী—পারসীক (১১৮৪—১২৯১); সা†দুদ্দীন মহমূদ শবিস্তরী—পারসীক (১২৫০—১৩২০?); মুহম্মদ শম্‌সুদ্দীন হাফেজ—পারসীক (মৃত্যু ১৩৯০); ও নূরুদ্দীন †আব্দুর্-রহ্‌মান জামী (১৪১৪—১৪৯২)। ইঁহাদের সকলের অনুভূতির কাব্যময় প্রকাশে, ইঁহাদের "জীবন-দেবতা" হইতেছেন প্রেমাস্পদ —প্রেমের পাত্রী বা পাত্র, প্রেমিক পুরুষ নহেন;—এই প্রেমাস্পদ বা প্রেমের পাত্র, ক্বচিৎ সুন্দরী তরুণী নারী-রূপিণী, ক্বচিৎ (পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডের অধিবাসীদের সামাজিক জীবনের রীতি অনুসারে) সুন্দর কিশোর-রূপী। নারী-রূপে কল্পিত "জীবন-দেবতা" বা শাশ্বত সত্তাকে আরবী ভাষায় "মা†শূক্বা" mā'shūqah (মা†শূক্বৎহুন্ mā'shūqathun) আখ্যা দেওয়া হয়, ও কিশোর-রূপী হইলে "মা†শূক্" mā'shūq' (মা†শূক্বুন্ mā'shūqun); এবং প্রেমিক জীবাত্মা বা মানব হইতেছে "†আশিক্" 'ashiq (†আশিক্বুন্ 'ashiqun)। এই শব্দগুলি আরবী "†শ্‌ক্" 'shq ধাতু হইতে গঠিত; এই ধাতুর অর্থ 'প্রেম করা, ভালোবাসা'।

সূফীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষের মধ্য-যুগে খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতক হইতে আসিতে আরম্ভ করে। কবীর প্রভৃতি সন্তগণের অনুভূতিতে ও শিক্ষায়, ও নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরে—আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধরিয়াও—এই প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ভারতের অনুভূতিতে শাশ্বত-সত্তা বা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত পুরুষোত্তমের কল্পনার পরিবর্তে, শাশ্বতী অনুরাগ-পাত্রী নারীসত্তমা বা নারী-শ্রেষ্ঠার কল্পনা গৃহীত হয় নাই;—পরবর্তী কালের ফারসী কবিতার অন্ধ অনুকারক উর্দু কবিগণ ভিন্ন, ভারতীয় সূফীগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, পুরুষোত্তমেরই আবাহন করিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিম্নে সুফী কবিদের দুই-চারিটি কবিতাংশ বাঙ্গালা অনুবাদে দেওয়া যাইতেছে—

"ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া, এই জগতের হাটে, আসিয়াছ তুমি কে ?
তোমার টানেই সমগ্র মানব-জাতি তোমার সঙ্গে চলিয়াছে !
তোমার সুন্দর তনুর একটি রশ্মি আমাদের
বিশ্ব-মানবকে উদ্ভাসিত করিয়াছে ;
তোমার বোনা ফসল প্রত্যেক গাছকে ফলবান্ করিয়াছে।"

—ফরীদুদ্দীন †অত্তার।

"তাহার কেশগুচ্ছের রাত্রির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে ;
কালো নর্‌গিস্ ফুল লাল গোলাপকে শিশির-সিক্ত করিয়াছে।"

—ইব্‌নু-ল্-†অরবী।

"সে (মা†শূকা) যদি মনের মধ্যে ঠাঁই পায়, কল্পনা-ও তাহাকে পীড়িত করে ; তাহাকে কি চোখে দেখা যায় ?"

—ইব্‌নু-ল্-†অরবী।

"সে প্রীতির দিব্যমূর্তি, তাহার কথা ভাবিলেই সে মূর্তি গলিয়া যায়—
দৃষ্টিপথের পক্ষে সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।"

—ইব্‌নু-ল্-†অরবী।

"জ্যোতির আকাশ তাহার পায়ের তলায় ;
দ্যুলোক স্বর্লোকের উর্ধ্বে তাহার মুকুট।"

—ইব্‌নু-ল্-†অরবী।

"আমার রজনী তাহার মুখের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত,
আমার দিন তাহার কেশ-জালের আঁধারে ভরা।"

—ইব্‌নু-ল্-†অরবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"প্রাণের মধ্যে কোন্ এক নব-বধূর আগমন হইয়াছে!
তাহার মুখের প্রতিচ্ছবিতে, সমগ্র জগৎ,
নব-বিবাহিত বর-বধূর হস্তের মতো হিল্লোলময় ও রাগ-রঞ্জিত হউক।"

—জলালুদ্দীন রূমী।

"আমি তোমার বীণা, আমার প্রত্যেক তারে তুমি আঘাত করিতেছ,
আমি তাহাতে রণরণিয়া উঠিতেছি!"

—জলালুদ্দীন রূমী।

সূফী কবিদের রচনা হইতে এইরূপ বহু-বহু ছত্র উদ্ধার করিয়া দেওয়া যায়, যেগুলি শ্রবণ মাত্রেই রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" কবিতার কথা মনে পড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ-ভাবে এই-সব লেখার সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সংবাদ আমরা জানি না। তবে তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সূফী কবি হাফেজের ভক্ত ছিলেন, হাফেজের পদ ও পদাংশ তিনি আবৃত্তি করিতে ভালো-বাসিতেন। হাফেজ প্রভৃতি সূফী কবির এই মাশূকা-কল্পনার সহিত তাঁহার পিতার প্রসাদে রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে হয়-তো প্রথম পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই-ভাবে তাঁহার নিজের অনুভূতির অভিব্যক্তিতে সূফী ভাব-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, এই World's Sweetheart-এর অনুধ্যান, কিছুটা কার্য্যকর হইয়া থাকিতে পারে। যেমন পরোক্ষ-ভাবে আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে, জলালুদ্দীন রূমী প্রমুখ পারস্যের সূফী সাধকদের ভাব-ধারা, কিছুটা অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে সংগত বা যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ধারা এবং কাব্যময় প্রকাশ, উভয় ব্যাপারের কর্ণধার-স্বরূপ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন দুইজনেই যে ফারসী-ভাষাতেও পণ্ডিত ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহারা গৌড়ের স্বাধীন সুলতানের দরবারে কাজ করিতেন—একজন ছিলেন সুলতানের "দবীর খাস" বা খাস-মুন্শী, অর্থাৎ Private Secretary বা অন্তরঙ্গ সহকারী, আর অন্যজন ছিলেন "সাগির মালিক" অর্থাৎ ছোট-রাজা বা প্রতিরাজ, অর্থাৎ রাজপ্রতিভূ-পদাধিষ্ঠিত উচ্চ অমাত্য। রাজভাষা ফারসী এবং তৎসঙ্গে ফারসী সাহিত্য ইঁহাদের ভালো করিয়াই জানা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এক-একটি পূর্ণ বস্তুকে বিশ্লেষ করিলে, তন্মধ্যে নানা উপাদান পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় প্রকাশ সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু পারি-পার্শ্বিকের প্রভাবে, নানা স্থান হইতে লব্ধ বিভিন্ন উপাদানকে লইয়া, রবীন্দ্রনাথ যে পরিপূর্ণ নব-কলেবর দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা একটি অভিনব ও বিস্ময়কর সর্বজন-মনোহর রস-সৃষ্টি ; এবং বিশ্বমানব সহৃদয়তার সহিত চিরকাল ধরিয়া এই রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে—অতীন্দ্রিয় শাশ্বত সত্তাকে আমাদের জীবনে ধরিবার মনোগত আকূতিকে জাগরিত ও উন্নীত করিবার পথে, এই রস-সৃষ্টি আমাদের চির-কাল ধরিয়া শক্তি ও আনন্দ দান করিবে ॥

বঙ্গাব্দ ১৩৫৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ পাঠ
৫৭	১২	"শান্তভাবের কবিতা ও Razm 'রজ্‌ম্‌' "
৫৭	২৩	"তিরু-বল্‌ল্‌লুবর্‌-এর ভগিনী,"
৫৭	২৮	"ঈতল্‌ অম্‌ ; তীরিনৈ ইট্‌ট্‌ট্‌-ঈট্‌টল্‌ পোরুল্‌"
৫৮	৫	"পরনৈ নিনৈন্তু—"
৮৭	২	"তোমার তবে আমার মন দহে,…"
১১৯	৯	"সক্‌কা-নী—…ক-ফিলি-দ্‌-দ্বয়্‌ফি বি-দ্‌-দ্বয়্‌ফি"
১১৯	১০	"ফ-লম্‌মা……বি-ন্‌-নত্তু+ই…"
১৩৮	১৬	'…prd অর্থাৎ brd = "বৃদ্ধি"…'
২২১	১২	"—৪।৩।২১)— .."
২২১	১৮	"উত ত্বঃ শৃণ্বন্‌ ন শৃণোতি এনাম।"
২৩১	৬	"মুহ্‌য়িউ-দ্‌-দীন ইব্‌ন্‌-ল্‌+অরবী— ."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাংস্কৃতিকী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রথম সংস্করণ : কার্ত্তিক ১৩৭২

প্রকাশক
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীমন্মথনাথ পান
কে. এম্. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীকানাই পাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাংস্কৃতিকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ওঁ ॥ শ্রীঃ ॥

১৯০১ সালে

পুণ্যশ্লোক মতিলাল শীলের

অবৈতনিক বিদ্যালয়ে

ছাত্রাবস্থা হইতে,

সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে

৬৪ বৎসরের

অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস

করকমলে।

শ্রীসুনীতি ॥

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী

২৮ শ্রাবণ ১৮৮৭ শকাব্দ

৭ ভাদ্রপদ ২০২২ সংবৎ

১৯ আগস্ট ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সূচী-পত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	অভিভাষণ	১-১৬
২।	বৃহত্তর বঙ্গ	১৭-৩৮
৩।	পশ্চিম-আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ধর্ম	৩৯-৫০
৪।	শ্রীজয়দেব কবি	৫৮-৮১
৫।	'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা	৮২-১০৩
৬।	এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব	১০৪-১৩০
৭।	ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ	১৩১-১৪০
৮।	অহম-রাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ	১৪৮-১৭১
৯।	ঋগ্‌বেদ	১৭১-২০৪
১০।	শঠকোপ-কৃত "সহস্র-গীতি"	২০৫-২২২
১১।	ভারতে রোমক লিপি	২২৩-২৪৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অভিভাষণ*

আপনারা আমায় আপনাদের বার্ষিক সভায় আহ্বান ক'রে আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন। আমি নিজেকে এ আহ্বানের এ সম্মানের নিতান্ত অযোগ্য ব'লে মনে করি। ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে অবস্থান আর অধ্যয়ন কর্‌বার সুযোগ আমার হয়-নি, সুতরাং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ব'লে যে গৌরব আপনারা অনুভব করেন, তা থেকে আমি বঞ্চিত। কিন্তু গত আট-দশ বছর আগে যখন আমি প্রথম শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখ্‌তে আসি, তখন থেকেই আশ্রমের সঙ্গে মনে-মনে আমি একটি যোগ অনুভব ক'রে আস্‌ছি। তাতে আমিও যে শান্তিনিকেতনেরই একজন, এই রকম একটা ধারণার অধিকারী হ'তে পেরেছি। আর তা ছাড়া, আপাতত আমাকে শান্তিনিকেতনের একজন ছাত্র ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। শান্তিনিকেতনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আর আদরের সঙ্গে দেখি ব'লে, আর এখানকার অধ্যাপক আর ছাত্র অনেকের স্নেহ আর প্রীতি লাভ ক'র্‌তে পেরেছি ব'লে, আপনাদের এই আহ্বান আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছি।

যে পুরুষশ্রেষ্ঠের চরণতলে ব'স্‌তে পাওয়ার ফলে আপনাদের ছাত্রজীবন মহনীয় হ'য়ে উঠেছিল,—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হ'লেও, কৈশোরের অবসানের সময় থেকেই পরোক্ষভাবে তিনি আমার আর আমার মতন অনেকেরই গুরুদেব। আপনারা তাঁকে বরাবরই অতি নিকটে পেয়েছিলেন, পেয়ে আছেন, শ্রেষ্ঠ এক গৌরবের অধিকারী আপনারা। এই মহৎ সান্নিধ্যে আপনাদের জীবন উজ্জ্বল হ'য়েছে নিশ্চয়ই—জীবনে কতগুলি উচ্চ প্রেরণা আপনারা লাভ ক'রেছেন নিশ্চয়ই। যাঁরা আপনাদের মতন তাঁকে কৈশোরে বা যৌবনে ব্যক্তিগতভাবে আচার্য্য রূপে দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেন-নি, তাদেরও অনেকের কাছে তাঁর গান আর কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেই প্রেরণা অন্তত কিছু পরিমাণে এসে পঁউচেছে। কারণ খালি বাঙালী বা বাঙলা-পাঠীর কাছে নয়, পৃথিবীর সব দেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে তিনি একজন বরেণ্য আচার্য্য, অন্যতম যুগন্ধর গুরু।

* শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সভাপতি কর্তৃক পঠিত (৮ই পৌষ, ১৩৩১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যে বাণী নোতুন ক'রে আমাদের গুরুদেব এই শান্তিনিকেতনের মধ্যে থেকে প্রচার ক'রে বিশ্বকে আহ্বান ক'রছেন, যে বাণী এই ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বময় জগতে লোকের মনে প্রীতি-মৈত্রী-শান্তির ভাব আনতে সাহায্য ক'রবে আর ক'রছে, সেই বাণী হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষেরই বাণী। সুদূর অতীতে ভারতে আর্য্যের সঙ্গে কোল-দ্রাবিড়-মোঙ্গোলের মিলন আর সংমিশ্রণের পর থেকে, যখন ভারতের সভ্যতা বিশিষ্টতা লাভ ক'রে দাঁড়াল', তখন-থেকেই ভারতবর্ষ এই বাণী প্রচার ক'রে আসছে। যুগ-যুগ ধ'রে ঋষি যতি ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পরিব্রাজক, সাধু সন্ত বৈরাগী, এমন কি ভারতের মুসলমান পীর ফকীর দরবেশ, সেই এক-ই বাণী বহন ক'রে আসছেন। সেই বাণী হ'চ্ছে অহিংসার আর ত্যাগের, মৈত্রীর আর করুণার, জিজ্ঞাসার আর পরিপৃচ্ছার, আর শ্রেয়ের অনুসন্ধানের। উপনিষদ্, মহাভারত, বৌদ্ধশাস্ত্র, মধ্যযুগের সাধুসন্তদের কবিতা গান, দক্ষিণের ভক্তদের গান প্রভৃতি যে-সমস্ত রচনায় এই বাণী রক্ষিত হ'য়ে আছে, সেই-সব রচনা, যে-সমস্ত ব্যক্তিগত আর সমাজগত আচার-অনুষ্ঠানে এই বাণীর পরিপোষকতা ক'রতে সাহায্য ক'রেছে, সেই-সমস্ত আচার অনুষ্ঠান, যে-সমস্ত সুকুমার কলায় শিল্পে গানে কাব্যে সাহিত্যে এই বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতীয় চিত্তের মনোহর প্রকাশ হ'য়েছে, সেই-সমস্ত সুকুমার শিল্প আর সাহিত্য; যে-সমস্ত গভীর দর্শনে আর অন্য আলোচনায় এই বাণীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হ'য়েছে, সেই-সব দর্শন আর চিন্তা; এক কথায়, গত আড়াই বা তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতের যা কিছু সু-কৃতি ভারতের যা কিছু সৃষ্টি, যা মানুষকে উচ্চ-লোকে নিয়ে যেতে চায়, সে-সবই হ'চ্ছে আমাদের অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয়দের পিতৃ-পুরুষদের কাছ-থেকে পাওয়া রিক্থ। এই রিক্থ হ'চ্ছে মানব জ্ঞান-ভাণ্ডারে, মানবের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে একটি শ্রেষ্ঠ জিনিস। এই রিক্থ এখন আর কৃপণের ধনের মতো কেবল ভারতবর্ষেরই সম্প্রদায়-বিশেষের পেটক-বদ্ধ রত্ন ক'রে রেখে দেবার বস্তু নয়। বাইরের লোকে এখন এই রত্নের খবর পেয়েছে—আর আমাদের কাছ থেকে এর উদ্ধার ক'রে তাকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। সমস্ত বিশ্ব এখন এই রিক্থের অধিকার চায়। আর আমাদের প্রসন্ন মনে যতদূর আমাদের দ্বারা সাধ্য হবে তাদের সেই অধিকারের দাবী মেনে নিতে হবে। আমাদের কাছ থেকে বিশ্বের যা আবশ্যক তা বিশ্ব নেবেই। আমাদেরও কর্তব্য আছে—পরিবর্তে বিশ্বের কাছ থেকেও কিছু নেওয়া। বিশ্বের মানব কোথায় কখন্ সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ ক'রেছে, কোথায় সৎ-এর কোন্ দিক দেখ্‌তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পেয়েছে তা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত রিক্থকে আরও শোভা সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণতা উপযোগিতায় সমৃদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হবে। তা না হ'লে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে আমাদের যে ঋণ আছে তা শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না। যখনই বাইরের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ ঘ'টেছে, আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ জিনিস, যা আমাদের ছিল না বা থাক্‌লেও যাতে আমরা প্রাবীণ্য লাভ ক'র্‌তে পারি-নি, তা কিছু-না-কিছু তাদের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে শিখে নিয়েছি। আর এই নেবার ফলে আমাদের জাতীয় সভ্যতা জাতীয় আত্মা বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ ক'র্‌তে পেরেছে। এইতেই না কতকটা গ্রীকের শিক্ষায় ভাস্কর্য্য-শিল্পে আর জ্যোতিষে প্রাচীন ভারতের উন্নতি, এইতেই না আমাদের জ্ঞাতি ঈরানী মুসলমানের সংস্পর্শে এসে ভারতের মধ্য যুগের কবীর নানক প্রমুখ সন্ত গুরুদের চিন্তার আর অনুভূতির অপরূপ বৈচিত্র্য আর তার অমৃতময় প্রকাশ; এইতেই না আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, বিদেশের সাহিত্যের সোনার কাঠি ছোঁয়ানোর ফলে, নোতুন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব শক্তি আহরণ ক'রে বিশ্বসমক্ষে দাঁড়াবার অধিকারী হ'য়েছে।—কিন্তু আমাদের দেবারও যে কিছু আছে, কাজেই এখানে নেবার কোনও লজ্জা নেই, এ হ'চ্ছে প্রদানের পরিবর্তে আদান,—এ বিনিময়, ভিক্ষা নয়। বিশ্বের অংশ আমরা, আমরা বিশ্বের সঙ্গে সাহচর্য্য ক'রে চ'ল্‌বো। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহন থেকে আমাদের পূজনীয় গুরুদেব, সমস্ত দূরদর্শী মহাপুরুষ আমাদের এই সাহচর্য্য ক'র্‌তেই উপদেশ দিচ্ছেন, আর তাঁরা নিজেরাও সেই সাহচর্য্য ক'রে আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের বিশ্বভারতী বিশ্বের সামনে ভারতের আদর্শকে ধ'রে তুল্‌তে চান। মানবের সুখশান্তি পরমার্থ লাভের পথে পৃথিবীতে এ আদর্শের সার্থকতা আছে, বিশেষত পাশ্চাত্য জগতে যে আছে, এ কথা বহু পাশ্চাত্য মনীষী স্বীকার ক'রেছেন। The world must be Indianised, ভারতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে' দিতে হবে; ভারতের সভ্যতার বাহ্য বর্ণ-চিহ্ন বা তকমা সব জাতকে পরাবার চেষ্টা ক'রে নয়, কারণ এই বর্ণ-চিহ্নটি ভেদ আর বিরোধের সৃষ্টি করে; কিন্তু ভারতের সূক্ষ্ম গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমত-সহিষ্ণুতা আছে, ভারতের জীবনের সব দিকের মূলে যে তিতিক্ষা যে মৈত্রী যে শান্তি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান, তাদের জীইয়ে' রেখে, জাগিয়ে' রেখে, সবল রেখে, আর বিশ্বমানবের মনে যেখানে এর অনুকূল ভাব প্রকট বা সুপ্ত, অস্ফুট বা পীড়িত হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে ভারতের এই জীবনীবাহী শিক্ষার যোগ সাধন ক'রে। আর কেবলমাত্র সেইটি কর্‌বার চেষ্টা ক'রে নয়; নিজেদের আত্মিক উন্নতির জন্য বিশ্বকেও আমরা ভারতের ভিতরে আন্‌বো। কাউকে আমরা অস্বীকার ক'র্‌বো না; কারণ সকলেই বিরাট্ বিশ্বপুরুষের অংশ। সকলের উৎকর্ষ আমরা গ্রহণ ক'র্‌বো, সকলের সুকৃতির ফল আমরা নেবো। খ্রীষ্টান সাধুর এই উক্তি আমাদের মন্ত্র ক'রে নিতে হবে—

Finally, brethren, whatsoever things are true,
Whatsoever things are just.
Whatsoever things are pure,
Whatsoever things are lovely.
Whatsoever things are of good report:
If there be any virtue, and if there be any praise,
Think on these things.

পৃথিবীর মধ্যে সৎ চিন্তার পোষক যা কিছু, মানুষের দেহের মনের আর আত্মার স্বাধীন বিকাশের অনুকূল যা কিছু আছে, তার সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় প্রাণের সম্পূর্ণ অনুমোদন আর সহযোগ আছে। আমরা যে অতি সহজেই সকলকে মেনে নিয়েছি—আমাদের ঋষি আচার্য্য সাধক সকলেই বিশ্বমৈত্রীর উপদেশ আমাদের যুগ যুগ ধ'রে দিয়ে আস্‌ছেন:

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মান'—ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

'যিনি সমস্ত প্রাণীকে আপনাতে দেখেন, আর আপনাকে সমস্ত প্রাণীতে দেখেন, তিনি কারও কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে' নেন না, কাকেও ঘৃণা করেন না।'

'আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়া' কুর্বন্তি সাধবঃ', 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এ-সব তো আমাদের দেশের অতি সাধারণ কথা; লাতীন লেখকের homo sum, humani nihil a me alienum puto—'মানুষ আমি, মানুষ-সংক্রান্ত এমন কিছু নেই যাকে আমি নিজের থেকে দূরের জিনিস ব'লে মনে করি'—এইরূপ ভাব আন্‌বার মতন মানসিক অবস্থায় আস্‌তে আমাদের বেশী পরিশ্রম ক'র্‌তে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা মানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আস্থাবান্। যদিও এখন আমরা চারিদিকে নানা অত্যাচার অশান্তি অধঃপতন অন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবু মোটের উপর মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, এটা আমরা মনে করি। অন্যায় অত্যাচার দুঃখ ক্লেশ নেই এমন সত্যযুগ কোনও কালে ছিল না; এ কথা ইতিহাস আমাদের ব'ল্‌ছে, যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার ক'র্‌লে এ কথা মান্‌তেই হবে। কল্পনায় এক সত্যযুগকে খাড়া ক'রে তার উপর অন্ধ ভক্তি এনে বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা ক'র্‌লে জাতীয় জীবনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছু হবে না। আগেকার যুগে মানুষের অনুভূতির প্রসার ছিল অল্প, অল্প জায়গার মধ্যে নিজের গণ্ডীর অন্তর্গত ভাবরাজী নিয়েই সাধারণতঃ তার কারবার ছিল, সে জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী হ'লে তার সেই অল্পকেই তাকে অত্যন্ত গভীরভাবে জান্‌তে হ'ত, তার পক্ষে আর অন্য উপায় ছিল না। সাধারণ লোকে সেই অল্পটুকুর ভিতরে কি খুব গভীরভাবে নাম্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ত, বা নাম্‌ত? হয়-তো কোথাও তা ক'র্‌ত, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা বলা যায় না। কিন্তু এখন আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। এতে গভীরতার বদলে বিস্তারের দিকেই আমাদের ঝোঁক হ'য়েছে। বিস্তার জিনিসটা মন্দ নয়, যদি তা কেবল উপর-উপর, কেবল ভাসা-ভাসা না হয়। কিন্তু যথার্থ পণ্ডিতের পক্ষে বিস্তার আর গভীরতা দুই-ই সাধন করা এখনই সম্ভবপর হ'য়েছে। আগে সে সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সাধারণ লোক যাঁরা, তাদের পক্ষে দুটো সাধন করা সব সময়ে সম্ভব হবে না। একটি বিষয় আমরা ভালো ক'রে জানি, আর বাকী সবের যেন রসাস্বাদ কর্‌বার অধিকার রাখ্‌তে পারি। একটি বিষয়ে গভীর না হ'লে আমাদের তাল ঠিক থাক্‌বে না, বহু বিস্তারের ফলে আমরা পথভ্রষ্ট হ'য়ে মনো-রাজ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাক্‌বো, জ্ঞানের লক্ষ্য আমাদের ঠিক থাক্‌বে না। আবার কোনও বিশেষ ভাবরাজীকে ভাল ক'রে জান্‌তে হ'লে কেবলমাত্র তাতেই আবদ্ধ থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। ব্যাপকভাবে দেখ্‌লে তবে প্রত্যেক জিনিসের যথার্থ পরিচয় হয়। পরিধি না থাকলে কেন্দ্র কোথায়? মানসিক রাজ্যে কেন্দ্রের যেমন আবশ্যকতা, পরিধিরও তেমনি আবশ্যকতা আছে। আমাদের মনের গতি এই যুগে হ'চ্ছে পরিধিমুখী; আগে ছিল কেন্দ্রমুখী। শ্রেষ্ঠ মানসিক উৎকর্ষ হয় দুইয়ের সামঞ্জস্যে। নানা রাজনৈতিক কারণে, আত্মরক্ষার চেষ্টায়, বাইরের পরিধির প্রতি আমাদের দেশের লোকের একটা অশ্রদ্ধা একটা অবজ্ঞার ভাব এখন জেগে উঠেছে। যাতে বাহির এসে আমাকে ডুবিয়ে' দিতে না পারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায়, সেই-জন্যে বাহিরকে অস্বীকার ক'রে বর্জন ক'রতে পারলেই, আমার কেন্দ্রকে আঁকড়ে' ধ'রে থাকতে পারলেই আত্মরক্ষা হবে। এইরূপ মনোভাবের কারণ বুঝতে পারা যায়, আর এর স্বপক্ষে হয়-তো যুক্তিও থাকতে পারে। কিন্তু পরিধির দিকে চাইলেই কেন্দ্রচ্যুত হয় তারা, যারা জানে না কেন্দ্রের স্বরূপটি চিনে নিয়ে ঠিকমতো কোথায় তার সঙ্গে বজ্র-বাঁধনে অচ্ছেদ্য-যোগে বদ্ধ থাকতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনের জাতীয় উৎকর্ষের কেন্দ্র কোথায় তা যদি আমরা সত্যরূপে জানতে পারি, আর তা জেনে, আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনে তার আবশ্যকতা প্রণিধান ক'রে, আমাদের কাছে তা কতখানি সত্য তা যদি বুঝতে পারি, তা-হ'লে বাইরে যত দূরেই আমাদের চিন্তার ব্যাসার্ধ প্রসারিত হোক না কেন, আমরা ঠিক্ থাকবো। আগে নিজেকে জানা দরকার, ভালো ক'রে জানা দরকার, আবার সেই জানা পূর্ণ ক'রতে গেলে বাহিরকেও জানা দরকার। এই দুইয়ে জড়িয়ে' পুরা এক চক্র। আত্মজ্ঞানের জন্যে বাহিরের উপযোগিতাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হয়।

আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকে আমরা অবস্থান ক'রছি। এক আমাদের নিজেদেরই ভারতীয় জগৎ র'য়েছে—তার ভাবরাজ্য কত বড়ো! আমাদের প্রাচীন কথা বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বৌদ্ধ কাল, মৌর্য্য-যবন-শক-গুপ্ত-কালের কত বিচিত্র উৎকর্ষকে অবলম্বন ক'রে, উত্তর-ভারতীয় আর দক্ষিণ-ভারতীয় আর্য্য-দ্রাবিড় জাতের কত কীর্তি কত সৌন্দর্য্য- আর সাহিত্য-সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের মুসলমান-পূর্ব যুগের কথা; তারপর নানা নূতন কৃতিসম্ভার নিয়ে আমাদের মুসলমান যুগ আছে। এক ভারতেই কত না বৈচিত্র্যের সমাবেশ, কত না বিভিন্ন প্রকারের ভাবসম্পদ্। তেমনি অন্য-অন্য কত দেশে মানুষ কত না ভিন্ন রূপে সভ্য হ'য়ে, কত নোতুন জিনিস আমাদেরই জন্য উদ্ভাবন ক'রে ইতিহাসের পথ বেয়ে চ'লে এসেছে, আসছে,—আর কত ভিন্ন ভিন্ন যুগ ধ'রে। সে-সবের ছিটে-ফোঁটা তো বাঙলা-দেশেই ব'সে-ব'সে আমি আস্বাদ ক'রতে পারছি। Culture বা মানসিক উৎকর্ষ এখন জাতিবিশেষের কৃতিকে অবলম্বন ক'রে নেই, Culture এখন বিশ্বমানবের সাধারণ সৃষ্টি আর সাধারণ সম্পদ্, সমগ্র জগতে এখন এক, এতে আজ কোনও জাত বাদ প'ড়তে পারে না। এই সাত-আট হাজার বছর ধ'রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সভ্য হবার পর মানুষ যা ক'রেছে, সে সমস্তের হক্-ওয়ারিসান মালেক হ'চ্ছি আমরা—অর্থাৎ সব দেশের শিক্ষিত লোকেরা। এত বড়ো একটা অধিকার—এ কে কি ছেড়ে দিয়ে, কারো উপর রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে' নিজের কোণে ব'সে থাক্‌বো? এর দ্বারা আমার তো নৈতিক বা মানসিক অবনতি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—জগতের আর সকলের কাছে আমি হীন আমি দরিদ্র আমি ভিখিরি, এই ভাবে চিন্তা ক'রে পরের ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হ'চ্ছি না, কারণ আমার যা আছে তা আমি জানি। আমি বাঙালী হিন্দু; মিসরের গ্রীসের চীনের আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য কলা চিন্তা আধ্যাত্মিকতা, সব-ই আমার যুগের কল্যাণে আমার মানবত্বের দাবীতে আমি পেতে পারছি। এ-সব ছেড়ে দিয়ে কোনও অজ্ঞাত বৈদিক যুগে আমি ফিরে যেতে চাই না—পরবর্তী কালের সঙ্গে তুলনায় যে-যুগ সত্যি-সত্যিই অর্ব্বর্বর, কিন্তু উপনিষদের আলো-কে কল্পনার রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে তার উপর ফেলে আমরা তাকে লোকোত্তর মহত্বে শোভায় শ্রীতে মণ্ডিত ক'রে নিয়েছি। আর Back to the Vedas কথার চরম বিচার ধ'রলে, একেবারে আদিকালের মানুষ হ'য়ে পাথরের অস্ত্র হাতে ক'রে পশু-হননের চেষ্টায় জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে' বেড়াতে কেউ রাজী হবে না। আরও নাই-আকড়ে' হ'লে পরে, আরও এগিয়ে' গিয়ে বানরের অবস্থায় বা protoplasm অবস্থায় পঁউছে যেতে পারলেই বোধ হয় অনেকে ভালো মনে ক'রবেন—কিন্তু সেই অজ্ঞাতের মোহান্ধকারে আমি ফিরে যেতে চাই না। আনাতোল ফ্রাঁসের কথায়—J'ai passé l'âge heureux où on admire les choses qu'on ne comprend pas. J'aime la lumière: অর্থাৎ 'যে সদানন্দ বয়সে লোকে যে জিনিস বোঝে না সেই জিনিসের আদর করে, সে বয়স আমি পেরিয়েছি। আমি আলো ভালোবাসি।' পাশ্চিব সভ্যতার নানা সুবিধার, নানা দৈহিক আরামের কথা ধ'রছি না, সে-জিনিসটা খুব একটা বড়ো জিনিস নয়, কিন্তু সভ্য মানুষের, আধুনিক মানুষের স্বাধীন মন আমি পেয়েছি আমাদের এই যুগধর্ম্মের ফলে। আর ভারতীয় ব'লে, ভারতের প্রাচীন চিন্তার আব-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছি ব'লে, আমার পক্ষে সেই মন লাভ করা অতি সহজই ঘ'টেছে, সে সহজলভ্যতার সৌভাগ্য থেকে বহু সভ্য দেশ এখনও বঞ্চিত আছে। এই যে মনোজগতের স্বাধীনতার কথা ব'লছি, একমাত্র এই স্বাধীনতাই বাহ্য পরাধীনতার যত কিছু আঘাতকে কোমল হাত বুলিয়ে' আরাম ক'রে দেবার চেষ্টা করে। এই মানসিক স্বতন্ত্রতা আছে ব'লেই সভ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মানুষ পরতন্ত্র থাকলেও স্বাধীন মানুষ হিসাবে প্রাণধারণ ক'রতে সমর্থ হয়,—অন্যথায় কেবলমাত্র দাস হ'য়ে পশুবৎ হ'য়ে যেত।

বাইরের পরাধীনতা যতই কেন নিষ্ঠুর যতই কেন কঠোর হোক্ না, মন যদি স্বাধীন থাকে তা হ'লে সে পরাধীনতা কিছুতেই স্থায়ী হ'য়ে থাকতে পারে না। সব-চেয়ে সর্বনাশকর হবে মনের স্বাধীনতার হানি। এই স্বাধীনতা-নাশের চেয়ে বাহ্য পরাধীনতা সহস্র গুণে শ্রেয়। আমি চিন্তা-শক্তিকে পরিচালনা করবার যোগ্যতা লাভ ক'রে, কী হ'চ্ছে তা জেনে কাজ ক'রতে চাই, আমি জানতে চাই, আমি বুঝতে চাই। যদিও সেই জানার পর, প্রতীকার ক'রতে পারার শক্তি না থাকার দরুন, মনে আমি দারুণ অশান্তি বা অস্বস্তি মাত্র লাভ করি—কারণ জেনে শক্তির অভাবে প্রতীকার ক'রতে না পারার মতো কষ্টকর, তার মতো বুক-ভাঙা আর কিছু নেই—কিন্তু তবুও আমি জানবো; আমি pathetic, placid contentment-এ থাকতে চাই না। হয়-তো কখনও উপলব্ধি বা অনুভূতির বন্যা এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, হ'তে পারে, জানার নির্মল আনন্দে মত্ত হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে, বা তার যে divine discontent তা'তে ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ানোর চেয়ে, অনুভূতি বা উপলব্ধির রসের সাগরে ডুবে যাওয়াটাই মানুষের মন বা আত্মার পক্ষে চরম লাভ, তার পক্ষে পরমার্থ, পুরুষার্থ। কিন্তু যতক্ষণ আমার ঈশ্বর-দত্ত বা প্রকৃতি-থেকে-লব্ধ বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ তাকে মেরে আমি আত্মঘাতী হ'তে চাই না।

অসূর্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাঽঽত্মহনো জনাঃ॥

'অন্ধ তমোদ্বারা আবৃত অসুরদের উপযোগী অসূর্য্য নামে যে-সকল জগৎ, আত্মঘাতী হয় যে-সব মানুষ তারা পরলোকে গিয়ে সেই-সকল জগতে পঁউছয়।'

আমরা চাই, অন্ধকারের বাইরে গিয়ে আমরা যেন জ্যোতি দেখতে পাই; আমাদের প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', এবং More Light; আমাদের প্রার্থনায় আছে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ', তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করুন, 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু', তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, বাইরের জগতের সৌন্দর্য্য আর মোহ যেন আমাদের অভিভূত ক'রে সার সত্যের সন্ধানের পথে বাধা না দেয়—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্ পূষন্ন্ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত ; হে পূষাদেবতা, সত্যধর্ম দর্শনের জন্য তুমি তা সরিয়ে' দাঁও।'

আমাদের প্রার্থনা, যেন 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ,' হে দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা কান দিয়ে যেন শুনি ; 'ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্ যজত্রাঃ', হে পূজিত দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা চোখ দিয়ে যেন দেখি।

নানা দিক দিয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে আমাদের ভারতীয় মানবের মনের স্বাধীনতাটুকু লোপ পেতে ব'সেছে, বহু স্থলে লোপ পেয়েছে,—লোপ পেয়েছে ব'ল্‌বো না—মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছে, কারণ ভারতের সভ্যতার মূলে যে মন্ত্র আছে, সে-মন্ত্রটি অমর , সে মন্ত্র হ'চ্ছে মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মন্ত্র। ভারতের জীবনের বাইরের আবর্জনার মধ্যে, বাইরের রঙচঙ জগ্‌জগা, বাইরের প্রতিমার নশ্বর অলংকারের মধ্যে সেই মন্ত্র হ'চ্ছে অক্ষয় মণি। যতদিন উপনিষদ্ আর গীতার মধ্যে, বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে, সন্তবাণীর মধ্যে আর অন্যান্য ভারতীয় আচার্য্যদের বাণীর মঞ্জুষার মধ্যে সেই অক্ষয় নীতি বিদ্যমান থাক্‌বে, আর যতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুশীলনের আর জীবনে প্রতিফলিত করণের স্বল্পমাত্রও চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন আমরা সকল দারিদ্র্যের সকল দৈন্যের সকল অভাবের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব হবো না—আর বাহ্য পরাধীনতার রাহু আমাদের সভ্যতাকে একেবারে পূর্ণগ্রাস ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ভারতের নিজস্ব প্রাচীন কৃতির বিশেষত্ব কোথায়, সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে, আর তা থাকবেও। কেউ কেউ ভারতের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের বর্ণাশ্রম ভেদেই ভারতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে মনে ক'রে সেইটিকেই রক্ষা কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর। কেউ বা ভারতের সমাজবিশেষের সাধন বা সাধনের অঙ্গকে পরম পদার্থ ব'লে মনে করেন, যেন ভারতের সভ্যতার বা সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা সেখানেই। আজকালকার মতো প্রাচীন যুগে এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌বার আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভারতের বাইরের জগতের প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে ভারতের সমাজের সংঘর্ষ হ'লেও, ভারতের ভাবরাজ্যের উপর বাইরে থেকে আজকালকার মতন এতো বড়ো সংঘাত কখনও ঘটে-নি—আজকাল যেমন ক'রে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান ইউরোপ আর আমেরিকা, আর আরব-মনের সৃষ্টি ইস্‌লাম, আর ওদিকে কিছু পরিমাণে চীন-জাপান, ভারতের মানসিক প্রগতির আর তার প্রাচীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সভ্যতানুমোদিত জীবনযাত্রার উপরে এসে প'ড়েছে, আর আমাদের বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। এই-সব নানা দিক্ থেকে আমাদের উপর সংঘাত এসে পঁউছানোতে, মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কিসে ভারতের ভারতীয়ত্ব, আর সেই ভারতীয়ত্ব রক্ষা করা আমাদের পক্ষে তথা বিশ্ব-মানবের পক্ষে কল্যাণকর হবে কি না, সে বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে আর ভারতবাসীকে আশ্বস্ত কর্‌বার জন্য অভিমত দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। ভারতের জীবনে যা সত্য যা শিব আর সুন্দর, তা এঁরা আংশিক-ভাবে বা পূর্ণ-ভাবে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধর্‌বার প্রয়াস ক'রেছেন। ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক, শিক্ষা আর রুচি অনুসারে এঁদের মতের ইতরবিশেষ হ'লেও, একটি বিষয়ে এঁরা সকলে একমত ; সকলেই সত্যকে শ্রেয় ব'লে মনে নিয়েছেন, আর বিশেষ পরীক্ষা ক'রে নিয়ে তবে সত্যকে স্বীকার ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। সত্য নির্ণয় বড়োই কঠিন ব্যাপার ; সত্য তো কখনও পূর্ণরূপে মানুষকে ধরা দেয় না। মানুষের বুদ্ধির সাহায্যে সত্যনির্ণয় ক'র্‌তে হ'লে কিন্তু যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পথ ধ'রে চলা চাই। এই পথে চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে, আমাদের অপ্রিয় কিছুতে যদি আমাদের নিয়ে যায়, তা-হ'লে দুঃখিত বা বিচলিত হ'লে চ'ল্‌বে না। যাতে আমাদের বিচলিত না ক'র্‌তে পারে, তদনুরূপ সত্যদিদৃক্ষুর উপযোগী দৃঢ়চিত্ততা আমাদের থাকা উচিত। এইরূপ দৃঢ়চিত্ততা, সত্যদ্রষ্টার অটল নির্ভীকতা প্রাচীন ভারতে ছিল। আধুনিক ইউরোপেও বহু ক্ষুদ্রস্বার্থ-প্রণোদিত মিথ্যার মধ্যে এই অটল সত্যানুসন্ধিৎসা যথার্থ জিজ্ঞাসুদের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে নির্ভীকভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই জিনিসটি নোতুন ক'রে ইউরোপ আমাদের দান ক'রেছে ; রেলগাড়ি, বিজ্ঞান, কলকারখানার চেয়ে এই দান-ই শ্রেষ্ঠ দান। হ'তে পারে, দু-পাঁচজন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বা লেখক আধুনিক ভারতবর্ষকে পরাধীন, হীন, ভেদ-দ্বেষে পরিপূর্ণ দেখে, তার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ ক'রে, প্রাচীন ভারতেরও প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখিয়েছে, প্রাচীন ভারতের লাঘব কোনও জায়গায় ক'র্‌তে পেলে হর্ষের আতিশয্য দেখিয়েছে, সেদিকে আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছে। কিন্তু যে কৌতূহল যে অনুসন্ধিৎসা আমাদের কাছে বুদ্ধকে অশোককে গুপ্তরাজগণকে তাঁদের যথার্থ স্বরূপে এনে দিয়েছে, আমাদের গৌরবময় অতীতকে বিস্মৃতির অতল থেকে আবার উদ্ধার ক'রেছে,' Serindia বা মধ্য-এশিয়া, Indo-china ইন্দোচীন, Insul-india বা ভারত দ্বীপপুঞ্জে যে এক বিরাট্ 'বহির্ভারত' ছিল, তাতে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পিতৃপুরুষ তত্তৎদেশের অর্ধসভ্য বা অসভ্য অধিবাসীদের সাহচর্যে যে বিরাট্ সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন তার খবর আমাদের এনে দিচ্ছে, আমাদের পুরাতন সুহৃৎ সতীর্থ বৌদ্ধ চীনের মনোরাজ্যের সঙ্গে আমাদের পুনঃপরিচয় করিয়ে' দিয়েছে,—এক কথায়, 'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জানো, এই অনুজ্ঞা পালনের জন্য আমাদের পুর্ণ সহায়তা ক'রেছে, ক'রছে,—সে জিনিস নিতান্ত তুচ্ছ নয়, সে বিদ্যা আর সে বিদ্যালব্ধ ফলকে 'ওদের' ব'লে উপেক্ষা ক'রলে আমাদেরই হানি—মানসিক, ঐহিক, উভয়বিধ হানি।

রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা আমাদের সত্যদ্রষ্টার উচিত নিরপেক্ষভাব নিতে বলেছেন। এরা বিশ্বকে ভয় করেন-নি, বিশ্বকে বর্জন করেন-নি; জ্ঞাতি, ব'লে, বন্ধু ব'লে সাদরে মনোরাজ্যে বরণ ক'রে নিয়েছেন। ভারত যেখানে বিশ্বের বা বাইরের ভয়ে পালিয়ে' বেড়াচ্ছে না, কিন্তু নিজের গৌরবে দশের মধ্যে এক হ'য়ে বিরাজ ক'রছে, আমাদের দেশের সেইরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের এই শান্তিনিকেতন আর তার এই নবীন মূর্তি বিশ্বভারতী হ'চ্ছে অন্যতম। এখানে ভারত তার নিজ কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে চাইছে, নিজের স্বরূপকে ভুলতে চাইছে না, কেবলমাত্র বাহ্য-অনুষ্ঠান-গত স্বরূপকে নয়, তার অন্তরতম মানসিক আর আত্মিক স্বরূপকে; মনের স্বাধীনতাকে পুর্ণ স্ফূর্তি দিয়ে, সত্যের সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে শিব আর সুন্দরকেও বরণ ক'রে নিয়ে, জ্ঞান আর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার থেকে রত্নরাজী আহরণ ক'রে এনে, তার দ্বারা দেশের চিত্ত আর প্রাণের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করবার চেষ্টা ক'রে।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমাদের যাদের যোগস্থাপনের সুযোগ হ'য়েছে, তাদের পক্ষে এই আদর্শের মূল্য বোঝা কঠিন হবে না। এখন আমাদের সকলের যত্ন করা উচিত, যাতে আমরা শান্তিনিকেতনের বা বিশ্বভারতীর যোগ্য কর্মী হ'তে পারি। আমাদের দায়িত্ব খুব-ই গুরুভার। বিশেষ এই ঘোরতর দুর্দিনে, যখন আমাদের এই যে শ্রেষ্ঠ রিক্থ—স্বাধীনচিত্ততা—তার উপর নানা দিক দিয়ে আক্রমণ আর আঘাত প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে এসে প'ড়ছে। বাহ্য স্বাধীনতার চেয়েও প্রার্থিত, এমন কি আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই যে মানসিক স্বাধীনতা, এর আলো-কে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে জ্বালিয়ে' রাখতে হবে—অধ্যয়ন, আলাপ, আর চিন্তার দ্বারা। কিন্তু সমষ্টিগত-ভাবে আমাদের বড়ো কাজ আছে। যারা আমাদেরই মতন এক-ই পিতৃপুরুষ থেকে জাত, আমাদেরই মতন ভারতের প্রাচীন ধনের অধিকারী, তাদেরও মনে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুনরুজ্জীবিত অভিনব ভারতীয় Culture-এর সৌধ কেবল চোরাবালির উপর গড়া হবে মাত্র—তার কোনও সার্থকতা থাকবে না, দুদিনে তা আকাশ-কুসুমের মতো বিলীন হ'য়ে যাবে। গ্রামকে অবলম্বন ক'রে ভারতীয় সভ্যতার অনেক কিছু শ্রেষ্ঠ অঙ্গের বিকাশ হ'য়েছে। গ্রামের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান ক'মে আস্‌ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রপদ-বাচ্য ব্যক্তি আমরা, আমরা ভারতীয় Culture-এর উন্নতি সাধন ক'র্‌ছি বটে, কিন্তু আমরা নিজেরা শহুরে' হ'য়ে প'ড়েছি। ছবিতে গল্পে কবিতায় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করি বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার ভয়ে আর বিজলীর বাতি নেই ব'লে গ্রামে যেতে ভয় পাই—গ্রামের বাস্তু ভিটা ত্যাগ ক'রেছি, গ্রামের জনকে বর্জন ক'রেছি। প্রত্যেক মানুষের প্রশস্ততম কার্য্যক্ষেত্র সাধারণত হ'চ্ছে, যতদূর সম্ভব, নিজের সমাজের মধ্যে। Charity begins at home। প্রতিভাশালী ব্যক্তির কথা অবশ্য আলাদা, তাঁরা কেবল জানপদ বা পৌর মাত্র নন, তাঁদের ক্ষেত্র আরও বিরাট্, সমস্ত দেশ বা কখনও-কখনও সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে হ'য়ে পড়ে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিজের দেশের আর নিজের-নিজের সমাজের কথা ভুলে গেলে চ'ল্‌বে না।

শান্তিনিকেতনের Culture বা উৎকর্ষ যাতে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তা যেন শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ছাত্রের চিন্তার বিষয় হয়। দেশ আমাদের দারিদ্র্যের নিপীড়নে ছারে-খারে যাচ্ছে। তার উপর নানাপ্রকার সামাজিক আবর্জনা আর বিভীষিকা আছে। তার জঙ্গুলে' আওতায়, তার যত আগাছার জটের মধ্যে প'ড়ে আমাদের দেশে সমস্ত প্রাণ শুখিয়ে' যাচ্ছে, ম'রে যাচ্ছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, উপনিষদের শিক্ষা যেন আমাদের শান্তিনিকেতনের মধ্যে দিয়ে এই শুষ্ক ক্লিষ্ট মৃতকল্প দেশে অমৃতের প্রভাব আন্‌তে সাহায্য করে। যেন তার আলোর সাম্‌নে, তার তীক্ষ্ণ দর্শন আর উৎসাহশীল প্রয়াসের সাম্‌নে সমস্ত অন্ধকার সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত হ'য়ে যায়; এখানকার কলাভবনের ছাত্রদের দ্বারা দেশের জনসাধারণের মাঝে আগেকার কালের মতো সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ আবার ফিরে আসে। আমাদের এখানে যে পটুয়ারা তাঁদের গুরুকে আশ্রয় ক'রে শিক্ষালাভ ক'র্‌ছেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জনে বড়ো চিত্রকর হ'য়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল ক'র্‌বেন, এ আশা আমরা সহজেই ক'র্‌তে পারি। কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ ফিরিয়ে' আন্‌বার জন্য বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই—যে সৌন্দর্য্য-বোধকে আমাদের দেশে এখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সুদূর পল্লীগ্রামে সুন্দর-সুন্দর তৈজসে নানাপ্রকার মনোহর গৃহশিল্পে ফুটে উঠ্‌তে দেখা যায়। এ বিষয়ে যাঁর দ্বারা সেখানে যেটুকু সম্ভব হবে সেটুকু ক'র্‌তে পার্‌লে, ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেকটা কাজ ক'র্‌তে, দেশবাসীর সেবা ক'র্‌তে পারা যাবে। সেইরূপ ইতিহাস দর্শন সাহিত্যের ছাত্র, সংগ্রহ-রক্ষণ আর শিক্ষার ব্রত দিয়ে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে কাজ ক'র্‌তে পার্‌বেন। গ্রাম-সংগঠন বিষয়ে আমাদের শ্রীনিকেতন থেকে কিছু পরিমাণে কাজ আরম্ভ হ'য়েছে, সেটা দেশের উপচিকীর্ষু, শান্তিনিকেতনের চিন্তাশীল ছাত্রের প্রণিধানের বিষয়। সমস্ত জা'তকে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। নইলে আমাদের Culture নিয়ে আমরা ভারতবর্ষের জনকতক ভদ্রশ্রেণীর লোক নিজের দেশেই পুরো পরবাসী হ'য়ে প'ড়্‌বো, আমাদের ভারত, ভারতীয় Culture হিসেবে, অতীতের বস্তু হ'য়ে প'ড়্‌বে,—অন্তরের শক্তির অভাবে আর ক্ষয়ে আর বাহ্য আক্রমণে। এই ক্ষয় রহিত করা-ই হ'চ্ছে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—আমাদের Culture অবলম্বন ক'রে যাতে আমাদের জা'ত বেঁচে থাক্‌তে পারে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া চাই। যে শিক্ষা তাঁরা এখানে পাচ্ছেন বা পেয়েছেন, কর্মজীবনে যেন তার পূর্ণতা হয়, যেন তার প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রাচীন ভাগবতধর্মের এই তিনটি জিনিস দু' হাজার বছর আগে এক অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত গ্রীকের মনকে আকৃষ্ট ক'রেছিল; গ্রীক হেলিওদোর, বৈষ্ণব ভাগবতধর্ম গ্রহণ ক'রে তার উৎকীর্ণ বিদিশা-অনুশাসনে লিখে' গিয়েছেন—

'ত্রিণি অমুত পদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগং—দম, চাগ, অপ্রমাদ।

'তিনটি অমৃতপদ ভালো ক'রে পালন ক'র্‌লে স্বর্গে নিয়ে যায়—দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ, অর্থাৎ আত্মদমন, নিস্পৃহতা, আর শুভ বুদ্ধিকে পরিহার না করা।' এই তিনটি অমৃতপদ প্রত্যেক মানুষের আত্মিক উন্নতির সহায়ক। এর পালনের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন ক'র্‌তে হবে—সমাজের সেবার জন্য, নিজের শ্রেয়স্ লাভের জন্য।

তারপর আমাদের কাজ ক'র্‌তে হবে 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—শ্রদ্ধার সঙ্গে আচার্য্যদের শিক্ষাকে শ্রবণ ক'রে, সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে; আর মৈত্রীপরবশ হ'য়ে সেবা ক'রে—যেখানে যে অসহায় দুর্বল আতুর আত্মবিশ্বাসহীন, তার সেবা ক'রে, তার সহায় হ'য়ে, তাকে বল দিয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাকে জ্ঞান দিয়ে, তার মনে আত্মবিশ্বাস এনে। এইভাবে কাজ ক'র্‌লেই আমরা ব্যক্তিগত পরমার্থ লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো, আর আমাদের পিতৃপুরুষ, আমাদের জ্ঞাতি-বন্ধু-ভ্রাতা, তথা বিশ্ব-মানবের প্রতি এইরূপেই আমাদের কর্তব্য ক'র্‌তে পার্‌বো, যথাশক্তি সমাজের সম্বন্ধে আমরা কিছুটা আনৃণ্য লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো॥

শান্তিনিকেতন
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৩১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বৃহত্তর বঙ্গ

"বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটি আজকাল আমরা খুব-ই ব্যবহার করিতেছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের "প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মেলন"-এর যে সকল অধিবেশন হইতেছে, সেগুলিতে "সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান" শাখা ভিন্ন, উপরন্তু একটি "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখাও স্থান পাইতেছে। এতদ্ভিন্ন, পত্র-পত্রিকাতেও "বৃহত্তর বঙ্গ"কে হালের বাঙ্গালীর অন্যতম গৌরব বলিয়া আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা, উচ্ছ্বাস-আলোচনা করিতেছি।

কথাটা কিন্তু বেশী দিনের নহে। আমার মনে হয়, ১৯২৬ সালে ভারতের বাহিরের দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্যে যখন কলিকাতায় "বৃহত্তর ভারত পরিষৎ" স্থাপিত হয়, তাহার পরে "বৃহত্তর ভারত"—এই সংযুক্ত পদটির দেখাদেখি "বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটিও ব্যবহৃত হইতে থাকে। আগে আমরা "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" জানিতাম, "প্রবাসী বাঙ্গালী" জানিতাম। ১৯০০ সালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে "বৃহত্তর বঙ্গ" শব্দদ্বয় ও তাহাদের অন্তর্নিহিত ভাব দুর্বোধ্য হইত; ১৮৫০ সালের বাঙ্গালীর পক্ষে কথাটি ও তাহার অর্থ উভয়-ই অবোধ্য লাগিত। অথচ এই কয়েক বৎসরে এই কথাটি হালের বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গৌরববোধ, আত্মপ্রসাদ ও শক্তিসংগ্রহের (এবং সঙ্গে-সঙ্গে আত্মবঞ্চনার) একটা মস্ত বড়ো সহায়ক হইয়া পড়িতেছে।

জিনিসটা আমাদের তলাইয়া বুঝা দরকার।

"বৃহত্তর বঙ্গ"—এই কথাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এই—ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে, অর্থাৎ অ-বাঙ্গালী যাহারা বাঙ্গালা ভাষা বলে না, এমন লোকদের মধ্যে, ব্যক্তি-গত বা সমাজ-গত ভাবে আজীবিকা-সংগ্রহের চেষ্টায় বা অন্য উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীরা গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বসবাস-কালে যে সকল কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বর্ধন করিয়াছে, মুখ্যতঃ সেই কৃতিত্বের বিচার, এবং সেই কৃতিত্ব-জনিত আত্মবিশ্বাস ও নৈতিক শক্তির আবাহন। সঙ্গে-সঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার ও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতির আলোচনা, ও যথাযথ ইহাদের বিবর্ধন বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া, প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা করা, তথা আধুনিক ভারতের জাতিবৃন্দের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্থানকে গৌরবের ও সম্মানের স্থান করিয়া রাখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সন ১৩০৮ সালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন প্রয়াগ হইতে "প্রবাসী" পত্রিকা বাহির করেন, তখন হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী বা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত জনগণ একটু বেশী করিয়া সচেতন হইতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে "প্রবাসী" পত্রিকার মারফৎ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" শীর্ষক জীবন-চরিতাত্মক প্রবন্ধাবলীতে, যে-সব কৃতী বঙ্গ-সন্তান বিগত দুই পুরুষ ধরিয়া (এবং ক্বচিৎ তাহার পূর্বেও) বাঙ্গালার বাহিরে পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে গিয়া স্বীয় বিদ্যা- ও চরিত্র-গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হন, ধারাবাহিক-ভাবে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের নিকটে তাঁহাদের সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সুপরিচিত "বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকের দুইটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে—এই বইয়ের দ্বারা বৃহত্তর বঙ্গের বোধ বাঙ্গালী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা খুব-ই বাড়িয়া যাওয়ায়, পশ্চিমের ও দক্ষিণের দূরতম প্রদেশ মাত্র দুই-এক রাত্রির, ক্বচিৎ তিন-চারি রাত্রির রেল-ভ্রমণের পথে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে প্রবাসী বাঙ্গালী আর সত্য-সত্য প্রবাসী থাকিতেছেন না, দেশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতর যোগ রাখা সম্ভবপর হইতেছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা—প্রাচীন ভারতের বণিক্, নাবিক, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, শিল্পী ও সাধারণ ব্যক্তি—ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া, ধর্ম ও সভ্যতায় সেই-সব দেশে এক অভিনব বৃহত্তর ভারতের পত্তন করিয়াছিলেন। "বৃহত্তর ভারত", ভারতের এক গৌরবময় অবদান। ইহার-ই অনুকরণে "বৃহত্তর-বঙ্গ", এই ভাবময় সমস্ত-পদের সৃষ্টি। "বৃহত্তর ভারত"—মুসলমান-পূর্ব ভারতের কৃতিত্বের পরিচায়ক; ব্যাপক-ভাবে, আধুনিক ভারতের প্রসারের কথাও ইহার মধ্যে নিহিত। "বৃহত্তর বঙ্গ"—মুখ্যতঃ উনবিংশ শতকে ভারতের অন্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের কথা।

এখন, এই কয় বৎসর ধরিয়া "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া আমরা একটু বেশী সাত্মাভিমান হইয়া পড়িয়াছি। ইহার দুইটি কারণ আছে। এই কারণ দুইটি প্রবাসী বাঙ্গালী ও ঘরবাসী বাঙ্গালী উভয়েরই মধ্যে পরিদৃশ্যমান।

প্রথমতঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী যেমন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অবস্থা তেমন-ই (কোথাও কম কোথাও বা বেশী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে বঙ্গের বাহিরে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীর যে সম্মান, যে প্রতিষ্ঠা ছিল, এখন তাহার কিছু-ই নাই। অনেকে ক্ষেত্রে আবার বাঙ্গালীর সম্মানপূর্ণ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। বাঙ্গালী আর ইংরেজ সরকারের প্রিয়পাত্র নহে; ইংরেজের আশ্রয়ে উন্নতি-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর প্রতি, বাঙ্গালার বাহিরের বহু স্থানের লোকেদের মনে যে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যা ছিল, তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফলে, রাম এবং রাবণ, উভয়েরই হাতে তাহার লাঞ্ছনা। এ ক্ষেত্রে উচ্চ পদের প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গে-সঙ্গে অর্থের প্রতিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত প্রবাসী বাঙ্গালীকে নৈতিক প্রতিষ্ঠায় অটল থাকিতে হইবে। কাজটি খুব-ই কঠিন। প্রবাসী বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অন্ন-সংস্থানের জন্য, অর্থোপার্জনের জন্য, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদের কারণ যে, যে-যে স্থানে চিরতরে সে বাসা পাতিয়াছে, সেই-সেই স্থানে শিক্ষা ও মানসিক সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য সে অনেক কিছু করিয়াছে। ইহা তাহার জাতির পক্ষে গৌরবেরই কথা। এই ইতিবৃত্তের আলোচনা ও অনুশীলন তাহাকে যথেষ্ট শক্তি দিতে পারে। এই জন্য বৃহত্তর বঙ্গের চর্চা।

দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আমাদের ভিতরে একটা পরাজয় ও পরাভবের হাওয়া বহিতেছে। সকলেরই মনে এই ভাবটি অল্প-বিস্তর জাগরিত হইতেছে যে—আমাদের অবস্থা বনের হরিণের মতো—"হরিণ জগতবৈরী আপনার মাংসে"। বাঙ্গালাকে সকলে মিলিয়া লুঠিতেছে, আমরা দেখিয়াও তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছি না। অন্য বিষয়েও আমরা হঠিয়া যাইতেছি। আমাদের এখন অর্থনৈতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সব রকমের আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে। "বৃহত্তর বঙ্গ" আমাদের একটি বড়ো আধ্যাত্মিক আশ্রয়। দৈব-দুর্বিপাকে পড়িয়া যাওয়ায়, এখন আমাদের কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। হাতী পাঁকে পড়িলে, বেঙ্গেও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। আমরা অতীতে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছি; যখন হইতে ভারতে ভারতীয় এবং প্রাদেশিক জাতি-চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তখন হইতে বাঙ্গালী ভারতের অন্য জাতিদের পশ্চাতে কখনও থাকে নাই। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর"—বঙ্গমাতাকে আমরা আত্মবিশ্বাসপূর্ণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে একথা বলিতে পারি। "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালীর অধুনাতন কৃতিত্বের একটি লক্ষণীয় নিদর্শন, ইহার চর্চায় আত্মবিশ্বাস আসিবে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুঝিবার শক্তি আমরা পাইব,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতি হিসাবে এই শক্তি পাইব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাহিরে ও ভিতরে, অন্য প্রদেশে ও বঙ্গদেশে, "বৃহত্তর বঙ্গ"-বাদ আমাদের কতটা শক্তি দিতে পারে, আমাদের বাঙ্গালী-জীবনে কি ভাবে ইহাকে সার্থক করিতে পারা যায়—তাহার আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু এই আলোচনা ঐতিহাসিক বিচার দিয়া আরম্ভ না করিলে বিশেষ কিছু ফল হইবে না।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনা করিতে গেলে, তিনটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সে তিনটি কথা এই—

[১] বাঙ্গালা-দেশ ভারতেরই অংশ।

[২] বাঙ্গালী জাতি ভারতীয় জাতি-মণ্ডলীরই অন্তর্ভুক্ত, ভারত-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সত্তা তাহার নাই।

[৩] বাঙ্গালার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অংশ—ভারত-বিরোধী পৃথক্ বাঙ্গালী-সংস্কৃতি নাই।

এইরূপে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্রে সংযুক্ত হইলেও, বাঙ্গালা-দেশের সংস্কৃতিতে দুই-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া, সংস্কৃতি-বিষয়ে, "বাঙ্গালা-বনাম-ভারত" এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

সংস্কৃতি-বিষয়ে এক হইলেও, অর্থনৈতিক ও অন্য বিষয়ে পার্থক্য বা বিরোধ আসিতে পারে। যেমন ইংলণ্ডের ইংরেজ ও আমেরিকায় উপনিবিষ্ট ইংরেজদের মধ্যে ঘটিয়াছিল। সেরূপ বিরোধ আসিলে, সংস্কৃতির ঐক্য কিছু-ই করিতে পারে না। তখন আত্মরক্ষা করিবার জন্য বা নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, প্রত্যেক সম্প্রদায় বা সমাজকে সচেষ্ট হইতে হয়। নিজ অস্তিত্ব বা নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বাধা প্রদান করা তখন কর্তব্য হইয়াই দাঁড়

বাঙ্গালী জাতির পূর্ব কথায়, "বৃহত্তর বঙ্গ" এই আদর্শ কত প্রাচীন? বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি অজ্ঞাত। তবে এটা ঠিক যে, মগধ হইতে আর্য্যভাষা ও উত্তর-ভারতের আর্য্যানার্য্য-মিশ্র গাঙ্গ সভ্যতা, ভারত-বিজয়ী সভ্যতা-রূপে বাঙ্গালা-দেশে আসিবার পূর্বে, এদেশে অস্ট্রিক(কোল ও মোন-খ্‌মের)-জাতীয়, মোঙ্গোল- বা ভোট-চীন-জাতীয় এবং দ্রাবিড়-জাতীয় অনার্য্য জাতি বাস করিত। মোঙ্গোল-জাতির বাস ছিল মুখ্যতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে। ইহাদের নিজস্ব পৃথক্-পৃথক্ সংস্কৃতি ছিল, এবং ইহা অসম্ভব নহে যে, কোথাও-কোথাও ইহাদের মধ্যে সংস্কৃতি-গত এবং শোণিত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গত মিশ্রণও হইয়াছিল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির লোকেরা কিন্তু নিজ জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইতে পারে নাই। তাহা হইলে, আজ পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষা-সংস্কৃতি জীবিত থাকিত—অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালা দেশ পুরাপুরি আর্য্যভাষী হইয়া পড়িত না। মোঙ্গোল-জাতীয় লোকেরা একটু দূরে থাকিত, ইহাদের সঙ্গেও অন্য জাতের তাদৃশ মিশ্রণ, বহুকাল ধরিয়া অন্ততঃ হয় নাই। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড জাতিব অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপজাতির লোক—ইহাদের মধ্যে কোনও সংহতি-শক্তির উদ্ভব হয় নাই; দুইটি পৃথক্ জগৎ—অস্ট্রিক ও দ্রাবিড—দুইয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় কখনও হইতে পারে নাই। ঐক্যবিধায়ক এমন কিছু বাঙ্গালা দেশে গড়িয়া উঠে নাই, যদ্দ্বারা উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষা ও উত্তর-ভারতেব ধর্ম ও সভ্যতা প্রতিহত হইতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র দিকে মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। অনুমান হয়, ২৫০ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে কোনও সময়ে বঙ্গদেশ মৌর্য্যরাজগণের আমলে বিজিত হয়। মৌর্য্য যুগে পূর্ববঙ্গে "সংবঙ্গ" নামে সঙ্ঘ-বদ্ধ বঙ্গীয় গণ-সঙ্ঘের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গবাসিগণের প্রাদেশিক গৌরব বা স্বাতন্ত্র্য-বোধের কোনও পরিচয় আমবা পাই না।

মৌর্য্য যুগের পরে শুঙ্গ ও কুষাণ যুগ আসিল, গুপ্ত ও পাল যুগ আসিল। পাল যুগের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে সেন রাজাদের শাসনকাল আসিল। তার পরে ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতেই বিজাতীয় ও বিধর্মী তুর্কীদের দ্বারা বঙ্গদেশ বিজিত হইল। তুর্কী-বিজয়ের বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা আর্য্য-ভাষী হইয়া গিয়াছে, এবং উত্তর-ভারতের সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিয়া, আর্য্যাবর্তের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। প্রায় সহস্র বৎসব ধরিয়া বঙ্গদেশের আর্য্যীকরণ চলিতেছিল, জাতির সেই যুগান্তরের সময়ে বঙ্গবাসিগণের পক্ষে সাত্মাভিমান হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের আজকালকার প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার মূল হইতেছে সমভাষিত্ব, খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে এই সমভাসিত্ব বঙ্গদেশে ছিল বলিয়া মনে হয় না, তখন দেশের লোকে অস্ট্রিক-, মোঙ্গোল- ও দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর নানা ভাষা বলিত, এবং অনার্য্য ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্য্য ভাষার বাঁধন মানিয়া লইয়া তখন এদেশের লোকেরা সবে-মাত্র একতার পথে পদার্পণ করিয়াছে। গুপ্ত এবং প্রথম পাল যুগে, বাঙ্গালার সহিত বিহার ও কাশী অঞ্চলের ভাষাগত সাম্য ছিল বলিয়া মনে হয়; তখন এক-ই প্রাকৃত বা অপভ্রংশ (খুব খুঁটিনাটি প্রাদেশিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভেদ হয়-তো ছিল, কিন্তু তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে) সারা পূর্ব-ভারতে আর্য্যভাষা-রূপে সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল পাল-বংশীয় রাজাদের রাজত্বের শেষ-ভাগে—খ্রীষ্টীয় দশম শতকের দিকে। তখন বঙ্গদেশেবাসীর—গৌড়-বঙ্গ জনের —"বাঙ্গালী প্রাদেশিকতা" জন্মলাভ করে নাই; বাঙ্গালারই মতো, ভারতের অন্যত্র কোথাও এরূপ ভাষাশ্রয়ী প্রাদেশিকতা তখনও উদ্ভূত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালী তাহার ঘরোয়া ভাষাকে "প্রাকৃত" বলিত, ঘরোয়া ভাষায় সে অল্প-স্বল্প গান ছড়া প্রভৃতি লিখিত; এবং তাহা ছাড়া পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষাতেই সে বেশী লিখিত; এই ভাষা যেন ছিল সে কালের হিন্দী; এবং এতদ্ভিন্ন, উচ্চকোটির সাহিত্যরচনার জন্য নিখিল ভারতের সর্ব-প্রধান ভাষা সংস্কৃত তো ছিলই।

তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকদের অবস্থা যেমন ছিল, তেমন-ই, একটি প্রান্ত-নিবদ্ধ, বিশেষভাবে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় গৌরব অনুভব না করিয়া, বঙ্গদেশের রাজা, পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক, কবি, শিল্পী, সকলেই এক নিখিল-ভারতীয় সভ্যতার পুষ্টিসাধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতটুকু উপায়ন ভারতমাতার চরণতলে সেদিনের গৌড়বঙ্গ-বাসী আনয়ন করিয়াছে, তাহা সে প্রাদেশিক আত্মসত্তা, অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবাসীর সত্তা বা চেতনা উপলব্ধি না করিয়াই করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে, গৌড-বঙ্গ-মগধ-পতি মহারাজ ধর্মপালের আমলে, একবার বঙ্গবাসী উত্তর-ভারতের কনোজের রাজা চক্রায়ুধকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; এতদ্ভিন্ন, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারত পর্য্যন্ত, গৌড-বঙ্গ-বাসী জয়যাত্রা করিয়াছিল। রাজনৈতিক প্রভাব ও দিগ্‌বিজয় আদি ব্যাপারে বঙ্গবাসিগণের কৃতিত্ব বিশেষ কিছু ছিল না; মাটি আঁচড়াইলেই যে দেশে ধান মিলিত, সে দেশের লোকেদের বাহিরে যাইবার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু সংস্কৃতির বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে লক্ষণীয় দান যোগাইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ যুগের ইতিহাসে বাঙ্গালার স্থান অতি উচ্চে। বৃহত্তর ভারতের পত্তনে বাঙ্গালার সহায়তাও যথেষ্ট ছিল। বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশ ও সুবর্ণ-দ্বীপ বা সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের সঙ্গে বঙ্গদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাঙ্গালার তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর, ভারতের সভ্যতার বাহিরে প্রসারের জন্য এক প্রধান পথ ছিল। ভারতে প্রাচীন শিল্পের ইতিহাসে গৌড-মগধ রীতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাস্কর্য্য একটি প্রধান বস্তু—এই রীতির বিকাশে বাঙ্গালার বরেন্দ্র-ভূমির ধীমান্ ও বীতপাল নামক ভাস্করদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসেও বঙ্গদেশের দান অল্প নহে। "গৌড়ী রীতি" নামক সংস্কৃত কাব্য-রচনার রীতি বাঙ্গালা দেশেই উদ্ভূত হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ভারতীয় সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ব্যাকরণ, শব্দকোষ, টীকা-টিপ্পনী গ্রন্থেও গৌড-বঙ্গের পণ্ডিতগণ পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

মোটের উপর, বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাবে অংশ-গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অংশ-গ্রহণ-কার্য্য যখন ঘটিয়াছিল, তখন তাহাদের বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া বিশেষ গৌরব-বোধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না—তখন বাঙ্গালা ভাষা সূতিকাগারে, এবং বাঙ্গালী জাতির বা অন্য কোনও প্রাদেশিক জাতির মধ্যে এই প্রকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনা আসে নাই। চন্দ্রগোমী, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ভট্ট ভবদেব, জয়দেব, বন্দিঘাটীয় সর্বানন্দ প্রভৃতি—ইঁহারা প্রাচীন ভারতের, ইঁহাদের লইয়া সমস্ত ভারত গৌরব করেন—বাঙ্গালী বলিয়া বিশিষ্ট বোধ বা চেতনা ইঁহাদের সময়ে কাহারও মনে ছিল না।

তুর্কী পাঠান ও মোগল যুগে বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী তখনও পূর্ণভাবে সাত্মাভিমান হয় নাই। তুর্কী-বিজয় বাঙ্গালীর জীবনের অঞ্চল-দেশ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল; ইহা তাহার জীবনকে পুরাপুরি পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যে একটা উন্মুখ আন্তর্ভারতিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল—হিন্দু আমলে স্বাধীন-ভাবে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া তাহা বাঙ্গালীর প্রাদেশিক জীবনকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। কিন্তু মুসলমান রাজশক্তি আসিয়া, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য তাহা ব্যাহত করিয়া দিল। আসন্ন আপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্গালী কূর্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিল, বাধ্য হইয়া সে তাহার গ্রাম্য জীবনের মধ্যেই অঙ্গ-সংহরণ করিয়া লইল। খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের পর হইতে, ১৮৫০ সালের দিকে ইংরেজের সঙ্গে মিলিয়া ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, সাড়ে-সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর যে জীবন ছিল, তাহা মোটের উপর গ্রাম্য জীবন ছিল। যখন রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ, উড়িয়া, তেলুগু, কানাড়ী, পাঞ্জাব ও উত্তর-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, এই সব জাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মারামারি কাটাকাটি করিয়া বা মিলন করিয়া ভারতের মধ্যযুগের বা মুসলমান-যুগের ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে নিযুক্ত, তখন, কবির ভাষায়—

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'॥

মুসলমান যুগে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে নিজ সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার প্রয়াসের ফলে, বাঙ্গালী সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিল। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে একটা 'গাঁউয়া' গেঁয়ো ভাব কায়েমী হইয়া গেল। হিন্দু যুগে, বাহিরকে লইয়া তাহার যেটুকু কারবার ছিল—ভারতের অন্য প্রদেশকে লইয়া, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের দেশকে লইয়া ছিল—সেটুকু আর বজায় রহিল না। বাঙ্গালী নিজ সংকীর্ণ গ্রাম্য সমাজ ছাড়িয়া ক্বচিৎ বাহিরে যাইত—সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য মিথিলা ও কাশী, এবং তীর্থ-যাত্রার জন্য পুরী, গয়া, কাশী, পরে বৃন্দাবন, ক্বচিৎ কাঞ্চী, রামেশ্বর, দ্বারকা—ইহা-ই তাহার দৌড় ছিল। এতদ্ভিন্ন, কখন-সখন (বিশেষতঃ মোগল-বিজয়ের পরে) কোনও-কোনও বাঙ্গালী জমিদার, দিল্লী-আগ্রা পর্য্যন্ত যাইতেন, বাদশাহের দরবারে সেলাম দিবার জন্যে, জমিদারির সনদ আনিবার জন্য। বাঙ্গালী মুসলমান এবং সম্ভবতঃ দুই চারিজন বাঙ্গালী হিন্দুও বহির্বাণিজ্যের জন্য ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে করিয়া এদিকে বর্মা, মালয়দেশ ও দ্বীপময় ভারত, ওদিকে দক্ষিণ-ভারত ও সিংহল, গোয়া, গুজরাট, এবং আরব-দেশ পর্য্যন্ত যাইত। কিন্তু এই সাগর-যাত্রাটুকুও ফিরেঙ্গী "হর্মাদ" বা পোর্তুগীস বোম্বেটিয়াদের উৎপাতে বন্ধ হইয়া গেল, বাঙ্গালী পুরাপুরি ঘরবাসী বনিয়া গেল, তাহার জীবনে সাগরের ছাপ আর পড়িল না। "কালাপানি" পার হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এবং তখন পণ্ডিতেরা এই কলিযুগে সাগর-যাত্রা নিষিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীর একটা গৌরবের পথ এই ভাবে অবস্থা-গতিকে রুদ্ধ হইয়া গেল; মুসলমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজশক্তি-ও এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিল, কোনও সাহায্য করিতে পারিল না। মোগল-পূর্ব যুগে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতীর মতো এক-আধজন বাঙ্গালী, বৌদ্ধ হইয়া সিংহলে গিয়া বাঙ্গালার সঙ্গে বাহিরের যোগের পুনরানয়নের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তখন গেঁয়ো ঘরমুখা বাঙ্গালীর কাছে তাহার কুঁড়েঘরের প্রদীপটি-ই প্রিয় হইয়া গিয়াছিল, সে বাহিরের আলো-কে আলেয়া ভাবিয়া তাহার পিছনে ঘুরিতে ভয় পাইল।

"বৃহত্তর বঙ্গ" বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, তদনুরূপ বাঙ্গালীর প্রসার মোগল-পূর্ব যুগে একমাত্র চৈতন্যদেবের প্রভাবে নূতন করিয়া ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখানেও আমাদের সময়ের মতো সজ্ঞান "গৌড়িয়াপনা" বা বাঙ্গালীয়ানা একেবারেই ছিল না। চৈতন্যদেব আসিয়া বাঙ্গালীকে আর "ঘ'রো" ও "কুণো" থাকিতে দিলেন না; তিনি যে নাম-প্রচারের আহ্বান শুনাইলেন, তাহাতে সে আর নিজ কুটীর বা গ্রামে নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না, তাহাকে বাহিরে আসিতে হইল; রাজনৈতিক বিষয়ে না হউক, আধ্যাত্মিক জীবনে তাহাকে আর একবার বড়ো হইতে হইল, ভারতীয় হইতে হইল। চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর মধ্যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল বাঙ্গালা দেশের নহেন—তিনি বাঙ্গালীত্বের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া কেবল বাঙ্গালীয়ানার বড়াই করা অশোভন ও অনুচিত হইবে, এবং সেরূপ করিলে তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রের অমর্য্যাদা করা হইবে। পুরীতে জনৈক উড়িয়া পণ্ডিতের কাছে শুনিয়াছিলাম—চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গভীর ভক্তির সহিত তিনি বলিতেছিলেন—"মহাপ্রভু লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ জাতির নন, তাঁহার বাল্য-জীবন ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে; দক্ষিণীদের মধ্যে ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে তিনি মধ্য-জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করেন, এবং তাঁহার শেষ জীবন তিনি যাপন করেন উড়িয়াদের মধ্যে।" চৈতন্যদেবের শিক্ষায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল, বাঙ্গালী পুরীতে গেল, সুদূর বৃন্দাবনের তীর্থগুলির উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দু যুগের পরে, আবার বঙ্গের বাহিরে, গৌড-বঙ্গের পণ্ডিতের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে, বাঙ্গালী ভাবের—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের—প্রচার বাহিরের প্রদেশে কিছু-কিছু হইল বটে, কিন্তু তখনও এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সজ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও সাত্মাভিমান বাঙ্গালীয়ানা দেখা দিল না। তাহার মুখ্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ হইল সর্বভারতীয় সংস্কৃত ভাষায়।

মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালা-দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মানসিংহ আসিয়া পূর্ব-বাঙ্গালার দেবমূর্তিকে আম্বেরে লইয়া গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত গেল। বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব তদ্রূপ জয়পুরে হিন্দু রাজার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজপুতানার বা রাজস্থানের কতকগুলি রাজ্যে, মথুরা বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালী গোস্বামীদের অধিষ্ঠান হইল। বাঙ্গালী জ্যোতিষী, পণ্ডিত বিদ্যাধর, জয়পুর-নগর স্থাপনের সময়ে, সরাঈ রাজা জয়সিংহের সহায়ক হইলেন। ষোড়শ শতক হইতে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামিগণের অবস্থানেব ফলে, বৃন্দাবন বাঙ্গালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। এই সব কৃতিত্বের জন্য বাঙ্গালী মর্য্যাদার বড়াই কেহ করেন নাই—ভারতের আর পাঁচটি জাতির মধ্যে অন্যতম জাতি হিসাবে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ এই-সব কার্য্য করিয়াছিলেন।

মোগল-যুগে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালার যোগসূত্র আরও সুদৃঢ় হইল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ফারসীর চর্চা বাড়িল। উত্তর-ভারতের রাজ-দরবারে বাঙ্গালার মলমলের চাহিদা বেশী করিয়া হইতে লাগিল। বাঙ্গালার বাঁশের কুঁড়ের চাল-রচনার ধাঁচা, রাজপুত-মোগল বাস্তশিল্পে pavilion বা বিমান-গৃহ নির্মাণে গৃহীত হইল, ইহার ফলে রাজপুত-মোগল বাস্তশিল্পে "রেওটী" নামক বাঁকা-ছাত বিমানের উদ্ভব হইল। বাঙ্গালাদেশের কুটীরের মতো হাল্‌কা-ধরনে তৈয়ারী ছোটো বাসবাটীর নাম উত্তর-ভারতে হইয়া গেল "বাঙ্‌লা" (বা বাঙ্‌লা) বাড়ি।

মুসলমান-যুগের চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ছাড়া বাঙ্গালাদেশ হইতে আর কোনও লক্ষণীয় আন্তর্ভারতীয় আন্দোলন উদ্ভূত হয় নাই। ধর্ম-সম্বন্ধীয় আন্দোলন বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীয়ানার কোনও স্থান ছিল না। সজ্ঞান "বৃহত্তর বঙ্গ" তখন হয় নাই, যদিও প্রশংসনীয় ভাবে বঙ্গভাষীর প্রভাব বঙ্গের বাহিরে কোনও-কোনও দেশে গিয়া পহুঁছিতেছিল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাদুর্ভাব ঘটিতে থাকে। পারস্য-রাজ্যের আর্‌মানী-জাতীয় প্রজারা ষোড়শ শতক হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত, বাঙ্গালা দেশেও তাহাদের গতায়াত ছিল। ১৩৫০ সালের পূর্বেই আর্‌মানীরা কলিকাতায় একটি ব্যবসায়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা তৈয়ারী এই ক্ষেত্রে, ১৬৯১ সালে ইংরেজ Job Charnock যোব চার্নক ইংরেজদের একটা আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিলেন। ধীরে-ধীরে দেশ-মধ্যে ইংরেজদের প্রভাব ও প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, দুর্বল নবাব সিরাজুদ্দৌলার রাজ্য কালে, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। অজ্ঞান, স্বার্থান্ধ, কুচক্রী, মনুষ্যত্ব-বিহীন কয়েকজন বাঙ্গালী ও বঙ্গ-প্রবাসী জমিদার, সমাজ-নেতা, সেনানী ও ধনী ব্যক্তি মিলিয়া, স্বদেশকে ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিল।

অষ্টাদশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে বাঙ্গালীর যে অধোগতি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরেজ বাঙ্গালাদেশে রাজা হইয়া বসিল, এবং বাঙ্গালাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষময় ইংরেজের রাজ্যের প্রসার ঘটাইল। বাঙ্গালারই পয়সায়, এবং কেবল পয়সার জন্য যাহারা কাঁচা মাথা দিতে প্রস্তুত, এরূপ তেলেঙ্গা ও ভোজপুরিয়া সিপাহীর সাহায্যে, ইংরেজ ধীরে-ধীরে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া ফেলিল। ইংরেজ-শাসনের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, ইংরেজের তল্পিদার-হিসাবে বাঙ্গালীরও বিস্তার ঘটিল। যেখানে-সেখানে ইংরেজের ছাউনি, ইংরেজের তহশীল, ইংরেজের পুলিস, ইংরেজের দপ্তর, ইংরেজের আদালত, ইংরেজের ইস্কুল, ইংরেজের ডাকঘর ও ইংরেজের দোকান বসিল, যেখানে-সেখানে ইংরেজি-জানা কেরানি, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, উকিলের দরকার হইল, এবং বাঙ্গালী অল্প দু'পাতা বা কিছু বেশী করিয়া ইংরেজি পড়িয়া, সেখানকার ইংরেজি-নবীস লোকের অভাব দূর করিল। হাসপাতাল হইল, ইংরেজ ডাক্তারের নীচে বাঙ্গালী ডাক্তার গিয়া হাজির হইল। কেবল বাঙ্গালী মজুরের যাইবার দরকার হইল না—দৈহিক শ্রমের দ্বারা যাহারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে এমন অশিক্ষিত লোকের অভাব উত্তর-ভারতে ছিল না। আর বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কেহ গেল না, কারণ ইংরেজের সাহচর্য্যে আসিয়া ব্যবসায়-কার্য্যে বাঙ্গালীর উৎসাহ ও প্রবৃত্তি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। ওদিকে উত্তর-ভারত হইতে দলে-দলে বণিক্, চাকর, দরোয়ান, মজুর আসিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে কায়েম হইয়া বসিল, পরে বাঙ্গালাদেশ-ময় ছড়াইয়া পড়িল। বিহারী আসিল, হিন্দুস্থানী আসিল, উড়িয়া আসিল; পরে মারওয়াড়ী ও পাঞ্জাবী আসিল—এখন ভাটিয়া ও গুজরাটী আসিতেছে, নেপালী আসিতেছে, তেলুগু আসিতেছে, তমিল মালয়ালীও আসিতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এইরূপে বাঙ্গালার বাহিরে ইংরেজের আমলে ও ইংরেজের আশ্রয়ে নবীন যুগের এক "বৃহত্তর বঙ্গ" যেমন প্রতিষ্ঠিত হইল, তেমন-ই—সে দিকে আমরা কোনও দৃষ্টি দেই নাই—সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এক-একটি "বৃহত্তর বিহার", "বৃহত্তর হিন্দুস্থান", "বৃহত্তর মারওয়াড", "বৃহত্তর উড়িষ্যা" এবং হালে "বৃহত্তর পাঞ্জাব", "বৃহত্তর গুজরাট", "বৃহত্তর অন্ধ্র", "বৃহত্তর তামিল-নাড", "বৃহত্তর কেরল"-ও স্থাপিত হইতে লাগিল। "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার বুকের ভিতরে এই সকল "বৃহত্তর অন্য প্রদেশ" বেশ বাড-বাড়ন্ত অবস্থায়, বেশ জাঁকাইয়া বিদ্যমান; আমরা স্বেচ্ছায় ইহাদের নিগড পরিয়া রহিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিলেও নিজেদের মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

ইংরেজ-আমলে এই যে "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা খুব সচেতন, খুব সাত্মাভিমান বটে—কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালীর গর্ব করিবার বড়ো কিছু-ই নাই; একদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, নবীন যুগের এই "বৃহত্তর বঙ্গ" বাঙ্গালী জাতির পক্ষে চরম অগৌরবের। ভারতবর্ষের রাজধানী হইতে সুদূর কোণে অবস্থিত একটি প্রদেশের অধিবাসী, একটি গেঁয়ো জাতি,—মধ্য-যুগের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাহার কোনও স্থান ছিল না, রাজপুত, মারহাট্টা, কানাড়ী, তেলুগুর মতো, উত্তর-ভারতের হিন্দু আর মুসলমানের মতো, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস গড়িতে কোনও লক্ষণীয় সহায়তা যে করে নাই, যাহার একমাত্র গর্বের বস্তু হইতেছে কিছু পরিমাণে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা এবং মধ্য-যুগের আন্তর্ভারতিক ভাব-জগতে চৈতন্যের ব্যক্তিত্বকে দান করা,—সেই অনাদৃত গেঁয়ো জাতি, তাহার নেতাদের অশ্রুত-পূর্ব নীচতা ও মূর্খতার বশে, মুষ্টিমেয় বিদেশীর হাতে স্বদেশকে বিকাইয়া দিল; এবং পরে যখন তাহার দেশে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সেই অর্থ দিয়া বাহির হইতে সিপাহীদের কিনিয়া, এই বিদেশীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ জয় করিতে লাগিল, বাঙ্গালীরা, অম্লান-বদনে নহে, মহোল্লাসে—সেই বিদেশীর পিছনে-পিছনে চলিল। গরীবের হঠাৎ বড়ো-মানুষি ঘটিল, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল। সাহেবদের সঙ্গে-সঙ্গে, বড়ো-সাহেবের নীচে বাঙ্গালী ছোটো-সাহেব হইয়া উঠিল। উড়িষ্যা-প্রদেশের জনৈক বিখ্যাত জন-নেতার ভাষায—ruling race-এর সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী একটি intermediate ruling race হইয়া দাঁড়াইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই ময়ূর-পুচ্ছে দেহ আবৃত করিয়া বাঙ্গালীর মন অহমিকায়—"হাম্-বড়া"-ভাবে পূর্ণ হইল ; ইংরেজ-কর্তৃক নূতন বিজিত প্রদেশে তাহার সর্দারি করিতে যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি দৈন্য ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। স্থানীয় লোকেরাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না ; তবে ইহাতে তাহাদের মনের অন্তস্থলে অজ্ঞাত- বা প্রচ্ছন্ন-ভাবে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যে একটুখানি জুগুপ্সা, বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব না আসিয়া গেল, তাহা নহে। ইংরেজের সাহচর্য্যের বলে, নূতন-লব্ধ ইংরেজি শিক্ষার দম্ভ ও মোহে, সে ভারতের সুপ্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলিকে বহু স্থলে হেয় ভাবিতে লাগিল। সূর্য্যের তাপ লোকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু বালির তাপ কেহ সহিতে চাহে না। বঙ্গের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীদের যে স্থানীয় লোকে আর তিষ্ঠিতে দিতেছে না, তাহার অন্তর্নিহিত অন্যতম কারণ বোধ হয় এই-ই ,—বিশেষতঃ এখন, যখন সকলেই বুঝিতেছে যে সরকার-বাহাদুর আর বাঙ্গালীর প্রতি মোটেই প্রীত নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি, হাতী পাঁকে পড়িলে বেঙ্গেও আসিয়া লাথি মারিয়া যায়—এ প্রবাদ অতি সত্য অভিজ্ঞতার ফল।

গভীর-ভাবে তলাইয়া দেখিলে, এই "বৃহত্তর বঙ্গ" লইয়া হৈ-চৈ করা খুব শোভন ব্যাপার হইবে না। বাঙ্গালীদের "বৃহত্তর-বঙ্গ"-র দেখাদেখি মহারাষ্ট্রীয়েরা "বৃহন্মহারাষ্ট্র" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—"বৃহন্মহারাষ্ট্র" লইয়া সভা-সমিতিও হইয়া গিয়াছে। সকলেই বৃহৎ, সকলেই মহান্। কিন্তু "বৃহন্মহারাষ্ট্র" যে-ভাবে প্রসারিত হইয়াছিল, সে-ভাবে "বৃহত্তর- বঙ্গ" প্রসার লাভ করে নাই। আবার প্রাচীন কালে (অর্থাৎ মুসলমান- ও হিন্দু-যুগে) যদি আমরা "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা কল্পনা করি, তাহা হইলে তাহার প্রতিষ্ঠাও যে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্-ভাবে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেও দেরী লাগে না। আধুনিক কালের "বৃহত্তর বিহার", "বৃহত্তর উড়িষ্যা" যে-ভাবে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা আবার বঙ্গদেশের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর-মারওয়াড়", "বৃহত্তর গুজরাট" ও "বৃহত্তর পাঞ্জাব" হইতে পৃথক্। ইংরেজের "বৃহত্তর ইংলাণ্ড" লইয়া ইংরেজ জাতি গর্ব করিয়া থাকে, তাহাদের গর্ব করিবার অধিকারও আছে। আরবের "বৃহত্তর আরব", যাহা আরব দেশ ছাপাইয়া ইরাক বা মেসোপোতামিয়া, শাম বা সিরিয়া, মিসর, সুদান, ত্রিপোলি, তুনিসিয়া, আল্-জযাইর বা আল্‌জিয়র্স, মঘ্‌রব বা মরোক্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, স্পেন, কসিকা, সিসিলি, মাল্‌টা, পারস্য, মধ্য-এশিয়া এক সময়ে যে "বৃহত্তর আরবদেশ"-এর পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল, সেই "বৃহত্তর আরব" লইয়া খালি আরব কেন, আরব-জাতির মাওয়ালী বা শিষ্য, অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাব-জগতের প্রজা, অন্য মুসলমান জাতিও গর্ব করিয়া থাকে। প্রাচীন-কালে ভারতের ভাব-রাজ্যের, ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসারের ফলে, এশিয়ার প্রায় সর্বত্র যে "বৃহত্তর ভারত" সংস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার প্রত্যক্ষ ফল আমরা সেরিন্দিয়া বা প্রাচীন মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীন বা ব্রহ্ম-শ্যাম-কম্বোজ-চম্পায়, ইন্দোনেসিয়া বা মালয়দেশ ও দ্বীপময়-ভারতে, তথা ভোট বা তিব্বত, চীন, আনাম, কোরিয়া ও জাপানে দেখিতেছি, তাহা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের অবদান—আমরা অধঃপতিত ভারতীয়েরা এই কথা স্মরণ করিয়াও এখন ধন্য হইতে পারি। কিন্তু এখনকার "বৃহত্তর ভারত"? যে ভাবে আড়কাঠির সাহায্যে কুলি চালান দিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, ফিজি, গায়েনা, জ্যামেকা প্রভৃতি দেশে এই নূতন বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কি আমাদের বুক উৎসাহে দশ হাত হইতে পারে? এই বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে—অথবা নিগ্রো ক্রীতদাসদের আগমনের ফলে আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রে যে "বৃহত্তর আফ্রিকা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে—কেহও কি "বৃহত্তর ইংলাণ্ড"-এর তুলনা করা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিবে?—"রামচন্দ্র" ও "রামছাগল", উভয়ের মধ্যে "রাম" শব্দটি সাধারণ—অতএব এই দুই শব্দ সামান্য-ধর্মী—ইহা এই ধরনের হাস্যজনক কথা হইবে।

আধুনিক "বৃহত্তর বঙ্গ" আমরা জানি। ইহার যে কোনও সার্থকতা ছিল না, ইহার দ্বারা যে ভারতের কোনও কাজ হয় নাই, তাহা কেহ বলিবে না। কিন্তু সমর্থ রামদাস দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবাজী কর্তৃক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বৃহন্মহারাষ্ট্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও যে ভাবে তাহা অষ্টাদশ শতকে পেশোয়াদের দ্বারা ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া পশ্চিমে ও দক্ষিণে একটু ঘুরিয়া আসিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়; এবং তদ্দর্শনে মহারাষ্ট্র-লক্ষ্মী ও মহারাষ্ট্র-সরস্বতীর নিকটে, মহারাষ্ট্র-শক্তি ও মহারাষ্ট্র-বুদ্ধির সমক্ষে, মস্তক অবনত না করিয়া পারা যায় না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতে হিন্দু-সংস্কৃতির সংরক্ষণ এই বৃহন্মহারাষ্ট্র দ্বারাই হইয়াছিল। এ কথা সত্য বটে, সর্বত্রই যে বৃহন্মহারাষ্ট্র, সন্ন্যাসী রামদাস ও ছত্রপতি শিবাজীর এবং ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী ও পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের মহান্ আদর্শ—"গো-ব্রাহ্মণ" রক্ষার আদর্শ (অর্থাৎ হিন্দুর সংসার ও সমাজ এবং হিন্দুর জ্ঞান ও সাধনা রক্ষার আদর্শ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা নহে; বাঙ্গালাদেশে নাগপুর হইতে কতকগুলা মারহাট্টা লুঠেরা ("বার্গীর্") আসিয়া, পশ্চিম-বাঙ্গালার প্রজাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি "বর্গী" নামের সঙ্গে এখনও জড়িত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ অপচার দুই দশ স্থলে হইয়াছিল বলিয়া, আদর্শের মহত্ত্ব এবং অন্যত্র তাহার কার্য্যকরতা খর্ব হয় না। উত্তর-ভারতের হিন্দী কবি ভূষণ যে বলিয়াছিলেন, শিবাজী আসিয়া হিন্দুর "চোটী বেটি রোটী" অর্থাৎ হিন্দুর মাথায় শিখা বা ধর্ম, হিন্দুর মেয়ের সম্মান, এবং হিন্দুর রুটী অর্থাৎ অন্ন বা অর্থনৈতিক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য উক্তি। বিজেতা ধর্মান্ধ মুসলমান —কি বিদেশী মুসলমান, কি হিন্দু-সন্তান মুসলমান, যেখানে যাহা ভাঙ্গিয়াছিল, ধ্বংস করিয়াছিল, লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুশক্তি তাহার উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে জীয়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে পুনরায় শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে উত্তর-ভারতে, কাশীতে এবং অন্যত্র, সংস্কৃত-বিদ্যা রক্ষা পাইয়াছিল—অনেকটা পেশোয়াদের পৃষ্ঠ-পোষিত মহারাষ্ট্র-পণ্ডিতদের চেষ্টায়। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দির, কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দির, মহারাষ্ট্রীয় রানী অহল্যাবাঈয়ের কীর্তি। উজ্জয়িনীতে গিয়া দেখিলাম, মহারাষ্ট্র রাজশক্তির প্রভাবেই অন্ত বড়ো হিন্দুতীর্থ টি পুনরায় প্রাণ পাইয়া টিঁকিয়া আছে। সুদূর দক্ষিণে তমিলদেশ তাঞ্জোরেও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর পূর্ণ প্রভাব। এ একেবারে অন্য জিনিস ; এ জিনিস উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে ও তৃতীয়-পাদে বাঙ্গালী কিছু-কিছু বুঝিতে পারিত—কিন্তু 'হিন্দু' নামের মর্য্যাদা যাহারা ভুলিতে বসিয়াছে এমন অতি-আধুনিক বাঙ্গালী এ জিনিস বুঝিবে না।

ইংরেজদের middlemen হইয়া, অর্থাৎ তাহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া আমাদের হালের বৃহত্তর-বঙ্গের প্রসার। ইহা নায়েবি গোমস্তাগিরি দারোগাগিরির মতোই ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে সত্যকার আত্ম-প্রসাদের যে কিছু-ই নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী তাহার এই তল্পিদারির, এই ফড়িয়াগিরির অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। ইংরেজি শিখিয়া বাঙ্গালী যে জিনিসটি ভারতবর্ষের অন্য সব জাতির তুলনায় অনেক আগেই পাইয়াছিল—তাহার মনের আধুনিকতা, মনের সংস্কার-মুক্ত ভাব— তাহা তাহাকে এমন একটি স্থানে উন্নীত করিয়াছিল, যেখানে উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধেও সাধারণ ভারতবাসীর (বিশেষতঃ অ-বাঙ্গালী ভারতবাসীর) পক্ষে পঁহুছানো, একেবারে অসম্ভব না হইলেও, বিশেষ কঠিন ব্যাপার ছিল। দুইটি জিনিস বাঙ্গালী ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া পাইয়াছিল,—জ্ঞানলিপ্সা অর্থাৎ নূতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খবর, বাহিরের জগতের খবর জানিবার আকাঙ্ক্ষা ;—এবং স্বাধীন চিন্তা। তাহার স্বাধীনতার স্পৃহা এবং জাতীয়তার উন্মেষও এই স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই উদ্ভূত হয়।

বঙ্গের বাহিরে গিয়া বাঙ্গালী চাকুরিজীবী এই দুইটি বস্তু ভারত-মাতার সেবায় উপস্থাপিত করিল। প্রবাসী বাঙ্গালী উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র যেখানে-যেখানে গিয়াছে, প্রায় সর্বত্রই ইংরেজি ইস্কুল খুলিয়াছে, অথবা ইংরেজি ইস্কুল খুলিতে সাহায্য করিয়াছে ; ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। টাকা-কড়ি দিয়াছে, জমি দিয়াছে, বিনা বেতনে পরিশ্রম করিয়াছে। এই শিক্ষা-প্রচারের দ্বারা, বিচার করিয়া দেখিলে, এক হিসাবে সে নিজের পায়েই কুড়ুল মারিয়াছে ; স্থানীয় লোকেরা ইংরেজি-শিক্ষিত হইলে, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যে ও-সব দেশে আর থাকিবে না, সে কথা প্রবাসী বাঙ্গালীরা চিন্তা করেন নাই ,—এই সকল ইংরেজি ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রাদেশিক স্বার্থবোধ তাঁহাদের একেবারেই ছিল না, সমগ্র ভারতের হিতৈষণা ইহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বাঙ্গালী উকিল ও অন্য স্বাধীন ব্যবসায়ীর হাতে ইংরেজি সংবাদপত্রের দ্বারা রাজনৈতিক শিক্ষাও প্রসূত হয়। বাঙ্গালী-ই "ভারত-মাতা"-র কল্পনা ও বোধ ভারতময় প্রচার করে, "স্বদেশী" মন্ত্র বাঙ্গালীর দ্বারাই প্রচারিত হয়। ইংরেজ রাজসরকারে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা আগে যাহা ছিল, তাহার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া, শিক্ষা ও দেশাত্মবোধের মন্ত্র বাঙ্গালী যখন প্রচার করিল, ভারতের লোকেরা তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না,—বাঙ্গালার বাহিরের লোকেদের চরিত্রে এ বিষয়ে গ্রহণশক্তিও যথেষ্ট ছিল।

আধুনিক বৃহত্তর বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে চাকুরিগত-প্রাণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের দ্বারা। এইরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতে সব প্রদেশে নাই, বা ছিল না। চাকুরি-জীবী ছাড়া, বাঙ্গালী কারিগর ও ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরে ও কাশীতে কিছু-কিছু আছে, এবং বহু তীর্থবাসী কাশী ও বৃন্দাবনে প্রবাসী হইয়া আছেন। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকীর্ণতা ও উদারতা, উভয়-ই বৃহত্তর বঙ্গে বিদ্যমান। নিজের সম্প্রদায়ের বা সামাজিক গণ্ডীর বাহিরে কিছু দেখিলে, সে জিনিসকে সহজে বুঝিতে না পারা, বা বুঝিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা না করা—ইহা এক সাধারণ সংকীর্ণতা ; বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত নহে। সংকীর্ণতার আনুষঙ্গিক আর একটি অবগুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বিদ্যমান—অনুচিত দম্ভ বা অহমিকা। অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত কতকগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাধারণ গালি এই সংকীর্ণতা ও দম্ভ হইতে উদ্ভূত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই সংকীর্ণতার সঙ্গে-সঙ্গে আবার আত্মভোলা উদারতাও দেখা যায়। নিজের অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া স্থানীয় লোকের মধ্যে শিক্ষা ও অন্য বিষয়ে উন্নতি বিধানের চেষ্টার দৃষ্টান্ত, বহু প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা গিয়াছে।

বাঙ্গালী যেখানে-যেখানে বাস করিয়াছে, তাহার শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সে সাধ্য-মতো সেখানকার লোকেদের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু—

The evil that men do lives after them ;
The good is oft interred with their bones.

—প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। ইংরেজি শিক্ষার ফলে, উত্তর-ভারতের নানা স্থানে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে এই শ্রেণীর অভাব বা অল্পতা ছিল, ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ায়, এবং ইংরেজি-শিক্ষিত কেরানি ও কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ইত্যাদির আবশ্যকতা হওয়ায়, এই ইংরেজি-জানা স্থানীয় ব্যক্তি বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র দেখা দিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী ইংরেজি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং শিক্ষাদানে ও অন্য রূপে, ইংরেজের সহায়তা করিয়া, বাঙ্গালার বাহিরে এই শ্রেণীর উদ্ভবে অংশ-গ্রহণ করিয়াছে। যেমন-যেমন এক-এক পুরুষের লোক অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, তেমন-তেমন এখন তাহাদের কৃত জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা বাঙ্গালার বাহিরের লোকেরা ভুলিয়া যাইতেছে, বাঙ্গালীর উদারতার কথা ভুলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু বাঙ্গালী যে সরকারের পিয়ারা ছিল এবং বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ-কেহ যে তুচ্ছতার সহিত বাহিরের লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করিত, সে কথা তাহারা মনে করিয়া রাখিতেছে। এখন সরকার ও জনসাধারণ এক হইয়াছেন—অবস্থা-গতিকে প্রবাসী বাঙ্গালীর উচ্ছেদসাধন ঘটিতেছে। ইহার উপর বিধাতার মার আছে ; বিহারের ভূমিকম্পে কয়েক মিনিটের মধ্যে, বিগত তিন-চারি পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাঙ্গালী যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অনেকখানি ভূমিসাৎ হইয়া গেল ; বিহারে প্রতিষ্ঠিত "বৃহত্তর বঙ্গ" এখন হতশ্রী, মৃতপ্রায়।

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর আবশ্যকতা তেমন হয় নাই, কাজেই বাঙ্গালী চাকুরিয়াকে সেখানে যাইতে হয় নাই। ওদিকে বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনের প্রসাদে তেলুগু, তমিল ও মালয়ালী কেরানি আসিয়া এখন বাঙ্গালীর ঘরের ভিতর চড়াও হইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই অবস্থার প্রতিকার কী? "বৃহত্তর বঙ্গ"-র দুরবস্থা, বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালী জাতির নিজের দুরবস্থারই অংশ মাত্র। বাঙ্গালা দেশের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—জীবন-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ এ-দিকে তেমন কেহ চিন্তা করিতেছেন না। "ওরিএণ্টাল" নৃত্য, তরুণী-নৃত্য, বিভিন্ন সিনেমা-ওয়ালাদের নব-নব "অবদান", যৌনতত্ত্ব লইয়া রচিত উপন্যাস, সহশিক্ষা, ফুটবল, এবং অবসর মতো একটু-আধটু নিজ পঙ্গু সমাজের নিন্দা-কটূক্তি ও সঙ্গে-সঙ্গে "রাশ্যা" অর্থাৎ রুষদেশের প্রগতির প্রশংসাময় আলোচনা—এই পথে আমাদের যুবকদের মন চালিত হইতেছে। নিজ পারিপার্শ্বিকের, অর্থাৎ যে সমাজের মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার কোনও কাজ করিবার কথা উঠিলে, সমগ্র ভারতীয় অথবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রসঙ্গ তুলিয়া এ সমস্ত ছোটো কথা চাপা দিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। হিন্দু হিন্দু-সমাজের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে, এই চেষ্টাকে আমরা communalism বলিয়া গালি দেই। দেশের ভিতরে তো আমাদের এই অবস্থা। বাহিরের অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিবারই সময় পাই না—প্রতিকারের চিন্তা তো দূরের কথা।

বিহার এবং সংযুক্ত-প্রদেশের (উত্তর-প্রদেশের) পূর্ব-অঞ্চলের কতকগুলি চিন্তাশীল প্রবাসী বাঙ্গালী, যাহারা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে চিন্তিত এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সম্বন্ধে ভীত, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি—চাকুরির দিকে তাকাইয়া থাকিলে "বৃহত্তর বঙ্গ" আর টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাঙ্গালীকে ঝুঁকিতে হইবে। এ-দিকে প্রতিযোগিতা খুব-ই আছে, তবে ঈর্ষ্যাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আত্মলঘুতাবোধপূর্ণ প্রতিযোগিতা বোধ হয় এখনও ততটা দেখা দেয় নাই,—যে প্রকারের প্রতিযোগিতা চাকুরির ক্ষেত্রে ও "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়ে বিদ্যমান দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে সকল বাণিজ্য ও ব্যাপার, সেগুলির একটা বড়ো অংশ প্রবাসী বাঙ্গালীদের হাতেই থাকা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বেনারসী কাপড়ের কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্র-গৃহস্থের বিবাহে বেনারসী জোড় ও সাড়ী (অভাবে বিষ্ণুপুরের চেলীর জোড় ও সাড়ী) না হইলে চলে না। বেনারসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন জরীর কাজযুক্ত চেলী বা রেশমের বস্ত্র বিষ্ণুপুরে এখনও তৈয়ারী হয় নাই, তবে হওয়া উচিত; এতদ্ভিন্ন, বেনারসী জরীর-কাজের কাপড়ের একটি আভিজাত্য আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বেনারসী কাপড়ের এত আদর থাকায়, এ ভীষণ দুর্দিনেও বেনারসী বস্ত্র-শিল্প কতকটা রক্ষা পাইয়াছে—এ-কথা বেনারসী কাপড়ের ব্যবসায়ীর মুখে শুনিয়াছি। এই কাজ কাশী-প্রবাসী বাঙ্গালী কিছু-কিছু হাতে লইয়াছেন। আরও বেশী লোকের এই প্রকারের কাজে নামা উচিত। বাহির হইতে যে ঘিয়ের, মাছ ও অন্য খাদ্যদ্রব্যের চালান আসে, সেদিকেও আমাদের অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালাদেশের মাল যাহা বাঙ্গালার বাহিরে অন্য প্রদেশে যায়, তাহা যথা-সম্ভব প্রবাসী বাঙ্গালীর হাত দিয়া যাহাতে যাইতে পারে, তদ্বিষয়েও চেষ্টা করা উচিত। ব্যাপারটি সোজা বা সহজ-সাধ্য নহে। এক তো আমাদের বাণিজ্যের উপযুক্ত বুদ্ধি বা তদ্বিষয়ে রুচি নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রতিকূলতা-ও অনেক। পয়সা উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনও sentiment বা সুকুমার ভাব নাই। ব্যবসায় বাণিজ্যে যাহারা টাকা করিতে নামে, তাহারা (অন্য বহু ব্যবসায়েরই মতো) অনেক সময়ে নির্মম হৃদয়হীনতার ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙ্গালার সহিত গুজরাটের কলওয়ালা ও বণিক্‌দিগের ব্যবহার আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত।

বৃহত্তর বঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য চেষ্টা—আমার মনে হয়, এ বিষয় এখন কিছুকালের জন্য ধামা-চাপা থাক্। এখন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সাহিত্যিক ব্যসনের সময় এখন নাই। প্রবাসী বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েরা ঘরে বাপ-মায়ের সঙ্গে বাঙ্গালা বলিবে, এবং অন্ততঃ বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটুকু হইলেই যথেষ্ট। যাতায়াতের সুবিধার প্রসাদে, বঙ্গের সঙ্গে "বৃহত্তর বঙ্গ"র যোগসূত্র আর সহজে নষ্ট হইবার নহে, কিন্তু বৈবাহিক আদান-প্রদান যতদিন স্বশ্রেণীর বা স্বজাতির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে, ততদিন প্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা, আম্বেরের 'শিলামতা' যশোহরেশ্বরীর পুরোহিতদের মতো অথবা করৌলীর গোস্বামীদের মতো দাঁড়াইবে—স্বশ্রেণীর পাত্রপাত্রী পাওয়া কঠিন; ভাষায়, জীবনযাত্রায় তাঁহারা রাজস্থানীদের মতো হইয়া গিয়াছেন বলিয়া, সুদূর বাঙ্গালা দেশ হইতে জামাই-বউ পাওয়া ইঁহাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার পড়িয়াছে;—তবে কাশীতে প্রয়াগে আগ্রায় বৃন্দাবনে ও অন্যত্র উপনিবিষ্ট স্বশ্রেণীর প্রবাসী বাঙ্গালী ঘরের সঙ্গে উহাদের বেশির ভাগ করণ-কারণ করিতে হয়। স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ বন্ধ হইলে, অর্থাৎ বিবাহ-বিষয়ে আধুনিক হিঁদুয়ানি যে ভাবে চলিতেছে তাহা অচল হইলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবার বেশি দেরি আর থাকিবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"বৃহত্তর বঙ্গ" যাঁহাদের লইয়া, তাঁহারা আর একটি জিনিস সহজে করিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা বঙ্গদেশের তথা ভারতের সেবা করিতে পারেন। বাঙ্গালীর সহিত অন্য প্রদেশের লোকেদের, এবং অন্য প্রদেশের লোকেদের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় তাঁহাদেরই দ্বারা ভালো করিয়া হইতে পারে। এই কাজের জন্য তাঁহাদের মাতৃভাষা ভালো করিয়া শেখা উচিত, এবং স্থানীয় ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতো করিয়া লওয়া উচিত। হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া সাহিত্যে কতকগুলি বাঙ্গালী সম্মানের স্থান করিয়া লইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে কম আনন্দের ও গৌরবের কথা নহে। রাধানাথ রায়, অমৃতলাল চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র রায়, বাবা যমুনাদাস, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—ইহারাই যথার্থ বৃহত্তর-বঙ্গের সেবক। হিন্দী, উর্দু, রাজস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, মারহাট্টী প্রভৃতি ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করা—এ দিক্ দিয়াই তাঁহাদের বঙ্গবাণীর সেবা সার্থক হইতে পারে। অবশ্য যাঁহার শক্তি আছে, যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সেই অবস্থাতেই তিনি অনুবাদ-সাহিত্য অথবা সত্যকার রস-সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ" ধরিব না—সেখানে "বৃহত্তর ভারত" বিদ্যমান;—সেখানে দু-পাঁচজন বাঙ্গালী থাকিলে একত্র মিলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা গান, বাঙ্গালার বিশিষ্ট সংস্কৃতি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশীর সমক্ষে বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালার তিলক কপালে পরিয়া বেড়াইলে, সমগ্র ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য একত্বের বিরুদ্ধেই কতকটা কার্য্য করা হইবে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতের বাহিরে কোথাও "বৃহত্তর বঙ্গ" গড়িয়া উঠে নাই। বর্মা—সে তো এতাবৎ ভারতের অংশ হইয়াই ছিল। বর্মায় প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী মুসলমান (কৃষক ও নাবিক শ্রেণীর লোক) যায়, কিছু-কিছু হিন্দু কেরানি যায়; অন্য প্রদেশ হইতে তেলুগু ও তমিল কুলি, শিখ পাহারাওয়ালা, হিন্দুস্থানী দরোয়ান, উড়িয়া মালী ও মিস্ত্রি, এবং গুজরাটী খোজা ও ভাটিয়া, তমিল হিন্দু চেট্টি এবং মুসলমান চুলিয়া ও লাব্বে যায়। তাহারা এতাবৎ বর্মীদের সংস্কৃতিতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। সকলের এক উদ্দেশ্য—কোনও রকমে বর্মার লোকেদের কাছ হইতে পয়সা উপার্জন করা, অথবা চাকুরি-জীবী হইলে, কোনও রকমে চাকরিটুকু বজায় রাখা। বর্মায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভাব নাই; এবং বর্মী জানেন, বেশ ভালো রকম বর্মী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জানেন, এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীও অপ্রচুর নহে। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী হিন্দু বর্মার বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব-গত আত্মীয়তা বাড়াইয়া তুলিতে পারিয়াছেন? ভারতবর্ষীয়েরা বর্মীদের কাছে "কালা থোয়ে" অর্থাৎ "সাগর পারের কুকুর" মাত্র রহিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে ক্রমে একটি তীব্র ভারতীয়-বিদ্বেষ দেখা যাইতেছে—তাহার বহু নিষ্ঠুর পরিচয় আমরা খবরের কাগজে পড়িতেছি। ভারতীয় সংস্কৃতি বর্মীদের দ্বারে পহুঁছাইয়া দিতে-ই বা কয় জনে চেষ্টা করিয়াছেন? বর্মীদের সম্বন্ধেও আমরা কতকটা অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছি—তাহাদের ব্যাবহারিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কোনও খবর আমাদের কাছে পহুঁছায় নাই।

বর্মার বাহিরে অন্যত্র বাঙ্গালীর সংখ্যা নগণ্য। শ্যামদেশে দুই এক জন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও কেরানি, মালয়েও তাই, অধিকন্তু দুই-চারি জন ব্যারিস্টার, এবং পূব আফ্রিকায়, কেনিয়ায় ও তাঙাঞ্জিকায় দুই-চারি জন বাঙ্গালী আছেন শুনিয়াছি। ইংলাণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্মানিতে কিছু কিছু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী গুরুকুল-বাস করিতে যান মাত্র, স্থায়ী ভারতীয় অধিবাসী খুব-ই কম। সুতরাং ভারতের বাহিরে "বৃহত্তর বঙ্গ"-র কথা উপস্থিত ক্ষেত্রে কাজের কথা নহে।

উপসংহারে খালি এই কথা বলিতে চাই—বাঙ্গালী ঘরে বড়ো হইলেই তবে বাহিরেও বড়ো হইবে। "বৃহত্তর বঙ্গ"-কে একটি জীবন্ত আদর্শ হিসাবে সার্থক করিতে গেলে, প্রবাসী বাঙ্গালীর দায়িত্ব খুব-ই আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ দায়িত্ব, ঘরবাসী বা বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালী চারিত্র্য-যুক্ত হইলে, ঘরে-বাহিরে, পথে-প্রবাসে সবত্র তাহার জয় হইবেই।

"বৃহত্তর বঙ্গ", "বৃহত্তর বঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজের middleman হইয়া, ইহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া যে বৃহত্তর-বঙ্গের প্রতিষ্ঠা, তাহার কোনও স্থায়ী ফল দেখা যাইতেছে না। উৎকট বাঙ্গালীয়ানা লইয়া বাঙ্গালী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য যে অস্ত্র, আত্মপ্রসারের জন্য সে অস্ত্র অনেক সময়ে মোটেই উপযোগী হয় না। সমগ্র ভারতের একাত্মতা-বোধ ভিন্ন আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নহে। এক প্রদেশ কর্তৃক অন্য প্রদেশের উপরে, আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া, অন্য বিষয়ে প্রভাব চলিতে পারে না; অর্থনৈতিক প্রভাব ও চাপ কেহ সহ্য করিবে না। আমাদের প্রাণপণে গুজরাট, মারওয়াড়, পাঞ্জাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রভৃতি প্রদেশের অর্থনৈতিক exploitation বা শোষণের প্রতিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ সব প্রদেশ হইতে যদি কোনও মানসিক বা আধ্যাত্মিক বস্তু আমরা পাই, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। সমগ্র ভারত এক, ভারতের অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য একত্ব—এই বোধ আমাদের ভারতীয় সাংস্কৃতিতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। ব্রিটিশ আমলে নূতন যুগে এই কথা-ই বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে প্রথম নূতন করিয়া শুনাইয়াছে—ইহাতেই তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ ভূদেব রবীন্দ্রনাথের বাণী, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ভারতের একতাবোধকে দৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাই ১৯০৪ ইইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মানসিক ও আদর্শগত নেতৃত্ব সমগ্র ভারত এক রকম মানিয়া-ই লইয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গালীর কল্পনা ও চিন্তাশক্তি এবং শিক্ষা-বিষয়ে যোগ্যতা ইহার মূলে ছিল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেমন অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, এদিকে তেমনি ঘরে বাঙ্গালা দেশে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া আমরা শক্তিহীন হইতেছি। ঘর সামলাইয়া লইলেই বাহির আপনা হইতেই নিজেকে সামলাইবে। জ্ঞানে, চারিত্র্যে, কর্মশীলতায় বাঙ্গালী আবার যখন বড়ো হইবে, এবং উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত যথার্থ মানুষের সংখ্যা বাঙ্গালীদের মধ্যে যখন বেশি করিয়া দেখা দিবে, তখন-ই বাঙ্গালী যেখানে যাইবে সেখানেই নূতন ভাবে এক গৌরবময় "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে॥

উদয়ন
ভাদ্র ১৩৪১

কলিকাতা, তালতলা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখার সভাপতির অভিভাষণ (অংশতঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পশ্চিম-আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ধর্ম

১৯১৯ সালে ছাত্র-রূপে গুরুকুল-বাস করিবার জন্য লণ্ডনে উপস্থিত হই। বাসা ঠিক করিয়া লইয়া বসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রথমেই লণ্ডনের সুবিখ্যাত সংগ্রহ-শালা ব্রিটিশ-মিউজিয়ম দেখিতে যাই। এই অপূর্ব সংগ্রহের মধ্যে, অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটি অনপেক্ষিত বস্তু-সম্ভারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে—সেটি হইতেছে, পশ্চিম-আফ্রিকায় নিগ্রোদের শিল্প। আর পাঁচজনের মতো আমিও ভাবিতাম, আফ্রিকার নিগ্রোরা জঙ্গলী বর্বর জাতির মানুষ, তাহাদের মধ্যে সভ্য জাতির মতো উচ্চ অঙ্গের চিন্তা ও ধর্ম এবং সভ্যতা ও শিল্প কিছু-ই নাই। কিন্তু পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাইগিরিয়া-দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের Benin বেনিন্-জনপদের নিগ্রোদের কৃতি, চারি-পাঁচ শত বৎসরের পূর্বেকার তৈয়ারী ধাতুশিল্প —ব্রঞ্জের মুণ্ড, মূর্তি ও মূর্তি-সমূহ, ব্রঞ্জের পাটায় ঢালা ও খোদিত মানব ও পশু-পক্ষীর চিত্র, এবং হাতীর-দাঁতের মূর্তি, কাঠের কাজ ও অন্য কারুশিল্প—এ-সব দেখিয়া চোখ খুলিয়া গেল, একটা নূতন রাজ্যে যেন আমি প্রবেশ করিলাম। আফ্রিকার সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-আফ্রিকার সম্বন্ধে, কৌতূহল জাগরিত হইল, হাতের কাছে—ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আর অন্যত্র—এ বিষয়ে যাহা পাইলাম পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে আফ্রিকার নানা আদিম জাতি ও তাহাদের ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম। দেখিলাম, রসগ্রাহী ইউরোপীয় শিল্পী এবং কলাবিৎ পণ্ডিতের চোখে আফ্রিকার আদিম-প্রকৃতিক শিল্প-চেষ্টার সার্থকতা এবং সৌন্দর্য্য ধরা দিয়াছে। আফ্রিকার বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে তাহাদের জীবনকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম, সভ্যতা ও শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দরের যে লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বিশ্ব-মানবের নিকট গ্রহণযোগ্য। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেরা যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, অন্য পাঁচটি জাতির সভ্যতায় যেমন, তেমনি ইহাতেও লজ্জা ও ঘৃণার জিনিস কিছু-কিছু থাকিলেও, গৌরব ও আদরের বস্তু যথেষ্ট আছে। সব-চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, আফ্রিকার আদিম জাতির লোকেদেরও এ বিষয়ে চোখ ফুটিতেছে; তাহারা এখন সব বিষয়ে নিজেদের পশ্চাৎপদ, অসহায়, ও ইউরোপের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছে না; অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইউরোপের হৃদয়বান্ উদার-প্রকৃতিক সত্য-কাম মনের প্রভাবেই তাহাদের চোখের পটী খুলিয়া যাইতেছে—ইউরোপের মিশনারিদের দ্বারা আনীত খ্রীষ্টানি সভ্যতা আর ইউরোপের যন্ত্র-শক্তির প্রভুত্বের মোহ কাটাইয়া এখন দরদের সহিত, অন্তর্মুখী দৃষ্টি দিয়া, নিজেদের সংস্কৃতির বিচার করিয়া দেখিতে শিখিতেছে—তাহাদের সব বিষয়ে (এমন কি, নিজেদের দেশোপযোগী জীবন-যাত্রা সম্বন্ধেও) যে দীনতাবোধ যে হীনতা-ভাব ছিল, তাহা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহা কেবল আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের পক্ষে নহে, উপরন্তু সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে একটি আনন্দের সংবাদ।

১৯১৯ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ইংলাণ্ডে অবস্থান করি, তখন আফ্রিকার শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হই। ঐ দুই বৎসরের মধ্যে পশ্চিম-আফ্রিকার নাইগিরিয়া-দেশের Lagos লেগস্-শহরের কতকগুলি ইংলাণ্ড-প্রবাসী নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাহাতে একটু অন্তরঙ্গ ভাবে এই অঞ্চলের নিগ্রোদের আচার-ব্যবহার ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে কতকটা ওয়াকিফ-হাল হইতে পারি—এই পরিচয়ের ফলে ইহাদের সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হয়।

সমগ্র আফ্রিকায় মোটের উপরে সাতটি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট জাতির লোক বাস করে। ইহারা হইতেছে [১] Semitic শেমীয়, [২] Hamitic হামীয়, [৩] Bushman বুশ্‌মান, [৪] Hottentot হটেণ্টট, [৫] Bantu-বাণ্টু নিগ্রো, [৬] Sudanic সুদানী বা বিশুদ্ধ-নিগ্রো ও [৭] Pygmy বামন-নিগ্রো। এই কয় জাতির মধ্যে [১] শেমীয় ও [২] হামীয় জাতিদ্বয় ভাষায় ও সম্ভবতঃ রক্তে পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত। হামীয় জাতি আফ্রিকার সমস্ত উত্তরখণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। মিসরের সুসভ্য প্রাচীন অধিবাসীরা হামীয় ছিল। আলজিয়র্স, ত্যুনিস ও মোরোক্কোর Berber বের্বের জাতির লোকেরা, সাহারা-মরুর Tuareg তুআরেগ জাতি, পূর্ব-আফ্রিকার Somali ও Galla সোমালি ও গাল্লা জাতি—ইহারাও হামীয়। হামীয়েরা শ্বেতকায় মানবের শ্রেণীতে পড়ে। এদিকে, আরব-দেশ, পালেস্তীন ও সিরিয়া, এবং বাবিলন ও ও আসিরিয়া শেমীয়দের দেশ। পালেস্তীন ও সিরিয়া এবং পরে আরব হইতে শেমীয় জাতির লোকেরা উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় গিয়া নিজেদের জ্ঞাতি হামীয়দের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়, এবং হামীয়দিগকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে। বিশেষতঃ মুসলমান আরবেরা তো মুসলমান ধর্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়া, মিসর হইতে মোরোক্কো পর্য্যন্ত সমগ্র হামীয় দেশকে এক নূতন আরব-দেশ বানাইয়া তুলিয়াছে। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের সঙ্গে, জাতি ভাষা ও সংস্কৃতিতে, শ্বেতকায় সুসভ্য শেমীয়-হামীয়দের কোনও সম্পর্ক নাই। মুসলমান আরব ও বেবের প্রভৃতি সভ্য সুসংহত সাত্মাভিমান জাতির লোক, ইহারা নিজেদের রক্ষা করিতে জানে, কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোর মতো ইহারা কখনও অসহায় ছিল না। আমি এই শেমীয় ও হামীয়দের কথা বলিব না। হামীয়দের সঙ্গে দক্ষিণ সাহারায়—পশ্চিম-সুদানে—বিশুদ্ধ নিগ্রোদের মিশ্রণের ফলে, Hausa হাউসা, Fulani, Fulbe বা Peul ফুলানি, ফুল্‌বে বা পাল্ প্রভৃতি কতকগুলি সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাদের কথাও বলিব না। [৩] বুশ্‌মান ও [৪] হটেণ্টট জাতির লোকেরা হামীয় ও শেমীয়দের মতো পরস্পরের জ্ঞাতি; ইহারা দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাস করে, ইহাদের সভ্যতা অতি নিম্ন স্তরের; ইহাদের কথাও উপস্থিত প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। মৌলিক জাতি হিসাবে ইহারা কৃষ্ণকায় নিগ্রো হইতে একেবারে পৃথক্। [৭] Pygmy বা বামন-জাতীয় লোকেরা এক প্রকার খর্বকায় নিগ্রো, ইহাদের সভ্যতা বলিতে কিছু-ই নাই, জাতিতে ও সংস্কৃতিতে ইহারা বোধ-হয় পৃথিবীর সর্ব-মানবের মধ্যে সব-চেয়ে নীচু অবস্থায় বিদ্যমান; Congo কঙ্গো-দেশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ইহাদের কিছু-কিছু পাওয়া যায়। ইহারা অন্য নিগ্রোদের থেকে পৃথক জাতি। খাস নিগ্রো বা কাফরী জাতি দুইটি বড়ো শ্রেণীতে পড়ে—মধ্য- ও দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিবাসী বান্টু-নিগ্রো, এবং পশ্চিম-আফ্রিকা ও উত্তর-মধ্য-আফ্রিকার অধিবাসী সুদানী বা শুদ্ধ-নিগ্রো। আকৃতিতে, প্রকৃতিতে এবং সংস্কৃতিতে ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও, ভাষায় এবং সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়।

পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রোরাই আফ্রিকার নিগ্রো-জগতের সব-চেয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধি। এই শুদ্ধ-নিগ্রোরা আবার ভাষা হিসাবে অনেকগুলি উপ-জাতিতে পড়ে। পশ্চিম-আফ্রিকার শুদ্ধ-নিগ্রো উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই কয়টি প্রধান—নাইজিরিয়ার Nupe নূপে, Ibo ইবো ও Yoruba য়োরুবা; Gold Coast বা 'স্বর্ণোপকূল' অঞ্চলের এখনকার Ghana গানা রাষ্ট্রের Chi বা Twi চী বা ত্বী জাতি—এই জাতির অন্তর্গত Ashanti আশান্টি বা Fanti ফান্টি, Ewhe এহ্বে প্রভৃতি কতকগুলি উপশাখা; এবং ফরাসীদের অধিকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পশ্চিম-আফ্রিকার Baule বাউলে, Mandingo মান্দিঙ্গো, Mossi মোস্সি, Songoi সোঙ্গোই, Senufo সেনুফো, Wolof উওলোফ প্রভৃতি কতকগুলি উপজাতি। Yoruba য়োরুবা এবং Ashanti আশান্টি জাতির লোকেরা দৈহিক শক্তিতে, বুদ্ধিতে ও কর্ম-চেষ্টায় সমগ্র পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের অগ্রণী; ইহারা, এবং পূর্ব-আফ্রিকার Uganda উগাণ্ডা অঞ্চলের বান্টু-নিগ্রো-জাতীয় Baganda বাগাণ্ডারা, আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো-জাতির মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত,—বিদ্যা, বুদ্ধি ও সংহতি-শক্তিতে ইউরোপীয়দের সঙ্গেও পাল্লা দিতে ইহারাই সমর্থ হইয়াছে।

আমার সঙ্গে যে নিগ্রো ভদ্রলোকদের আলাপ হয়, তাঁহারা সকলেই য়োরুবা জাতির। (এখানে একটা কথা জানাইয়া রাখি, ইংরেজি-শিক্ষিত নিগ্রোরা নিজেদের Black Man 'কালো মানুষ' বলিয়া উল্লেখ করিতে লজ্জা পান না, কিন্তু 'নিগ্রো' Negro শব্দের বিকৃত রূপ Nigger 'নিগার' ইংরেজিতে গালিব্যঞ্জক হওয়ায়, ইহারা নিজেদের সম্বন্ধে Negro 'নিগ্রো' শব্দ আর ব্যবহার করিতে চাহেন না,—যদিও এই শব্দগুলির মূল হইতেছে লাতীন ভাষার Niger 'নিগের' শব্দ, যাহার অর্থ 'কালো' অথবা 'কালো মানুষ'—African 'আফ্রিকান' শব্দ-ই ইহারা এখন পছন্দ করেন, এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ইউরোপীয়গণ-ও এখন African শব্দ-ই ব্যবহার করেন।) ইহাদের কাছে শুনিলাম যে, নাইগিরিয়া দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ য়োরুবাদের দ্বারা অধ্যুষিত। য়োরুবারা সংখ্যায় ৩০ লাখের উপর। ইহাদের মধ্যে ১০ লাখ খ্রীষ্টান, ১০ লাখ মুসলমান, ও ১০ লাখ Pagan অর্থাৎ যাহারা তাহাদের পুরাতন স্বভাবজ ধর্ম পালন করিয়া থাকে। এখন (১৯৬৫-সালে) য়োরুবাদের সংখ্যা ৫০ লাখেরও অধিক হইবে। ধর্মের জন্য ইহাদের মধ্যে আত্মকলহ নাই। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মদ্বয় দ্বারা আক্রান্ত হইলেও, য়োরুবা ধর্ম এখনও বেশ জোরের সঙ্গে চলিতেছে। এই ধর্মের দেবতারা সাধারণ মন্দিরে ও তীর্থে এবং গৃহস্থের গৃহে যথারীতি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। য়োরুবারা চাষ-বাস করে, যে অঞ্চলে ইহারা বাস করে সে অঞ্চলটা খুব ঘন-বসতি। নিজের জমিতে নারিকেল, তাল-জাতীয় এক রকম গাছের বীজের তেল, চীন-বাদাম, কোকো, তুলা, মেহগনি কাঠ, এই সব উৎপন্ন করিয়া ও রপ্তানি করিয়া এখানকার চাষী আর ছোটো জমিদারেরা বেশ সমৃদ্ধ। য়োরুবা-দেশে অনেকগুলি বেশ বড়ো-বড়ো শহর আছে, যেমন Lagos লেগস্ (দেড়-লাখের উপর অধিবাসী), Ibadan ইবাদান (প্রায় আড়াই-লাখ অধিবাসী), Ogbomosho

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওয়োমোশো (নব্বই হাজার), Ilorin ইলোরি (পঁচাশী হাজার), Abeokuta আবেওকুটা ও Iwo ইবো (প্রত্যেকটি পঞ্চান্ন হাজার করিয়া) ; এ ছাড়া, পঞ্চাশ বা তিরিশ হাজার লোকের বাস অন্য শহরও কতকগুলি আছে। এই সব শহরে ইহাদের রাজা আছে, প্রাচীন পদ্ধতিতে নিজেরাই শহরের সব কাজ চালায়—আধুনিক, ইউরোপীয় রীতি কার্যকর মনে করিলে গ্রহণেও বাধা নাই। Ife ইফে-শহর ইহাদের ধর্মের কেন্দ্র। য়োরুবা দেশের পশ্চিমে Dahomey দাহোমে, আর Togo তোগো, আর তাহারও পশ্চিমে Gold Coast 'স্বর্ণোপকূল', (এখনকার স্বাধীন রাষ্ট্র Ghana গানা), যেখানে বিখ্যাত Ashanti আশান্টি নিগ্রো জাতির বাস ; এই-সব দেশেরও বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা।

শ্রীযুক্ত Nathaniel Akinremi Fadipe (বা Fadikpe) নাথানিয়েল্ আকিন্রাম্মি ফাডিপে (বা ফাডিক্‌পে)—এই নামের একটি য়োরুবা ছাত্রের সঙ্গে তখন (১৯২০ সালে) লণ্ডনে আলাপ হইয়াছিল। পরে ১৯৩৮ সালে আবার ইংলাণ্ডে ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ফাডিপে-কে তাহার নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করি—তাহার পুরা নাম তখন জানা হয় নাই। সে বলে যে Fadikpe নামটি Ifa-di-kpe এই তিনটি শব্দের সমবায়ে গঠিত, ইহার অর্থ, 'Ifa 'ইফা'-দেবতার দান, 'ইফা-দত্ত'। আমি তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করি। ফাডিপে নিজে ছিল খ্রীষ্টান, কিন্তু দেখিলাম, তাহাদের প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও জুগুপ্সার বা ঘৃণার ভাব নাই। Ifa ইফা দেবতার সম্বন্ধে বলিল যে, এই দেবতার পুরোহিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, Ife ইফে-শহর ইঁহার পূজার কেন্দ্র, ষোলটি সুপারি-জাতীয় ফল (ইহাকে Kola-nut 'কোলা-কল' বলে) লইয়া পুরোহিতেরা ষোল বার গোল বা চৌকা আকারের একখানি কাঠের বারকোষে ফেলেন, কয়টি ফল হাতে রহিল কয়টি পড়িল, তাহা ধরিয়া বারকোষের উপর ষোল বার দাগ কাটিয়া হিসাব করিয়া তাঁহারা দেবতার আদেশ বা অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। ফাডিপের কথা শুনিয়া মনে হইল, খ্রীষ্টান হইলেও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যে তাহার আস্থা আছে। তবে সে আমাকে খোলসা করিয়া বলিল, খ্রীষ্টান ঘরের ছেলে, প্রাচীন Pagan বা স্বভাবজ ধর্মের খবর সে ঠিক-মতো সব জানে না, তবে তাহার জাতির এক-তৃতীয়াংশ এখনও এই ধর্মকে জীবন্ত রাখিয়াছে। পরে একজন মুসলমান য়োরুবা রাজার সঙ্গে দেখা হয়, ইনি লণ্ডনে তাঁহার রাজ্য বা জমিদারি সংক্রান্ত মোকদ্দমার জন্য আসিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজি জানিতেন না, তবে ইঁহার সেক্রেটারি Herbert Macaulay

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হর্বর্ট্ মেকওলে নামে একটি য়োরুবা ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত মেকওলের নামটি ব্রিটিশ হইলেও, ইনি খাঁটি আফ্রিকান, এবং জাতীয়তাবাদী; ইনি য়োরুবাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য বিশেষ গৌরব বোধ করেন। শ্রীযুক্ত মেকওলে বিলাতে পাস-করা ইঞ্জিনীয়ার বা পূর্তকার ছিলেন, এবং স্বদেশের একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ইঁহার কাছে য়োরুবা ধর্ম ও সমাজের রীতি-নীতির খবর কিছু-কিছু পাই। জনৈক য়োরুবা পাদ্রি য়োরুবা ভাষায় (য়োরুবাদের ভাষায় নিজস্ব লিপি ছিল না, ইউরোপীয় সংস্পর্শ ও প্রভাবের ফলে রোমান লিপি এখন য়োরুবাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে) য়োরুবা ধর্ম সম্বন্ধে একখানি বই লিখেন, ইহার ইংরেজি অনুবাদ হইয়াছে, এই ইংরেজি বই ইঁহার কাছে ছিল, ইনি আমায় উহা পড়িতে দেন। বইখানি পড়িয়া খুশী হই, কারণ ইহাতে মিশনারি-সুলভ গোড়ামি ছিল না, গ্রন্থকার কতকটা দরদের সঙ্গে তাঁহার জাতির ধর্ম, পিতৃপুরুষের ধর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ সহানুভূতিশীলতা বেশ ভালো লাগিল। য়োরুবা খ্রীষ্টান পাদ্রি, পূর্ব-পুরুষ যে খ্রীষ্টান বা য়িহুদী ছিল না, তজ্জন্য লজ্জিত নহেন, গোড়াতেই তিনি বলিয়াছেন যে, সুসভ্য ইউরোপের লোকেরাও এক সময়ে Pagan ছিল, য়োরুবাদের ধর্মের মতো ধর্ম-ই তাহারা পালন করিত। য়োরুবা-দেশে অনেক সামন্ত রাজা আছেন, অন্য শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন, ইঁহাদের কেহ-কেহ আবার বিলাতে শিক্ষিত, কিন্তু ইঁহারা স্বধর্মের জন্য লজ্জিত নহেন, বরং কেহ-কেহ সেই ধর্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত। এই গৌরব-বোধ এবং রক্ষণশীলতা এই বিশিষ্ট আফ্রিকার জনগণের মানসিক শক্তিরই পরিচায়ক।

য়োরুবাদের জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জনগণের মধ্যেও এই ভাব এখন দেখা যাইতেছে—বিশেষ করিয়া স্বর্ণোপকূলের (বা গানার) Ashanti আশান্টি জাতির মধ্যে। Kumasi কুমাসি ও Accra আক্রা নগরদ্বয় আশান্টি জাতির রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আক্রাতে সম্পৃক্ত Gan গাঁ জাতির লোকও বাস করে। মুসলমান এবং প্রাচীনধর্মী য়োরুবারা এবং বহু খ্রীষ্টান য়োরুবা ইউরোপীয় পোষাক পরে না, নিজেদের উষ্ণদেশোপযোগী ঢিলা জামা ও ইজার এবং গায়ের চাদর ব্যবহার করে; আশান্টিরাও তেমনি রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া জন-সাধারণ পর্য্যন্ত সকলে পায়ে সাবেক চালের নিগ্রো চপ্পল বা চাপ্‌লি-জুতা পরে, ও গায়ে নিজেদের জাতীয় পোষাক, রঙ্গীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছাপা কাপড়ের চাদর, জড়াইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার কোনও শহরে—খুব সম্ভব চিকাগো-তে—একটি বিশ্বধর্ম-মহাসভা হয়; ১৮৯৩ সালের সভা, যেখানে পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজন-সমক্ষে হিন্দু আদর্শের অন্যতম প্রধান কথা, ধর্ম-বিষয়ে উদারতার বাণীর প্রচার করেন, তাহার মতো অত বিরাট্ ব্যাপার না হইলেও, এই সভায় নানা জাতির ও নানা ধর্মের প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হন। এই প্রতিনিধিদের নামের তালিকা কোথায় দেখিয়াছিলাম—দুঃখের বিষয় তাহা হইতে আবশ্যক তথ্যটুকু টুকিয়া লওয়া হয় নাই—এই তালিকায় একজন আশান্টি ভদ্রলোকের নাম দেখিয়াছিলাম, ইনি কুমাসি নগর হইতে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক-ধর্ম-সম্মেলনে অন্য পাঁচটা ধর্মের নেতাদের সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহার আশান্টি-জাতির মধ্যে উদ্ভূত Paganism বা স্বভাবজ ধর্মকে তিনি আধুনিক যুগের সভ্য মানুষের উপযোগী বলিয়া মনে করেন;—এই বোধের বশবর্তী হইয়া তিনি নিজ ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। এই সংবাদের পিছনে যে অখ্যাত অবজ্ঞাত অত্যাচারিত আফ্রিকান জাতির পুনরুজ্জীবনের সুসমাচারের মতো কতখানি গুরুত্ব বিদ্যমান, সহৃদয় মানব-প্রেমী মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। আশান্টি ধর্ম, তাহার প্রতিষ্ঠা কোন্ দার্শনিক বিচার এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উপরে, তাহা আমরা জানি না।* জগৎ-সমক্ষে এতাবৎ কেবল ইহা-ই ঘোষিত হইয়াছে যে, এই ধর্মের পরিপোষক নিগ্রোরা নরবলি দিত, এবং নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীরই জীব ছিল। নরবলির কথা অস্বীকৃত হয় নাই এবং হইবারও নহে; ধর্মের নামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নরবলি বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখনও পরোক্ষভাবে আছে। যেমন, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে Inquisition বা বিধর্মীদের দমনের নামে জীবন্ত মানুষকে পোড়াইয়া মারা অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; যেমন, ধর্মের নামে বিধর্মীদের বধ বা সর্বনাশ এখনও চলিতেছে। কিন্তু ইহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে এবং জাগ্রৎ বা সুপ্ত মানসিক শক্তি সম্বন্ধে, ইউরোপীয় মিশনারি ও অন্য ব্যক্তির উক্তি বহুশঃ একদেশ-দর্শী, স্বার্থান্ধ এবং মিথ্যা।

* পরে এসম্বন্ধে নূতন তথ্য যাহা পাইয়াছি আমার ইংরেজি বই Africanism—the African Personality (১৯৬০, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা)-তে নিবদ্ধ একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

য়োরুবাদের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটি কথা বলিব—ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে অসহায় ও পশ্চাৎপদ জাতির মানুষের সম্বন্ধে কত অনুচিত ধারণা প্রচারিত হয়। হর্বর্ট্ মেকওলে নামে যে য়োরুবা ভদ্রলোকটির উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমায় বলিয়াছিলেন :—

"দেখুন মিস্টার চাটর্জি, আমাদের কালো মানুষ, জঙ্গলী, অসভ্য, বর্বর ব'লে ইউরোপীয় লোকেরা গা'ল দেয়, তারা আমাদের 'সভ্য' কর্‌বার জন্য, 'উন্নত' কর্‌বার জন্য পাদ্রি পাঠায়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, ওরা এসে আমাদের সাবেক চালের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবন আর নৈতিক জীবন সব বরবাদ ক'রে দেয়। সেকেলে' আফ্রিকান্‌রা বাপ-পিতামহের কালের যে জীবন পালন ক'রে আস্‌ছিল, সেটা সভ্যতায় উন্নত না হ'তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে চুরির আর মিথ্যা-কথা বলার আর সামাজিক অন্যায়ের স্থান ছিল না। এখনও সাবেক সত্যবাদিতা আর নীতিনিষ্ঠতা থেকে আমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলের লোকে ভ্রষ্ট হয়নি। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামকে ইংরিজিতে bush বলে। দু-ধারে bush অর্থাৎ জঙ্গল, ক্ষেত, গ্রাম—তার মাঝখান দিয়ে বড়ো সড়ক গিয়েছে। রাস্তায় জলের কষ্ট, কুয়োর রেওয়াজ কম, water-hole অর্থাৎ ডোবা বা পুখুরও কম। দোকান-হাট, হোটেল, সরাইয়ের পাট বড়ো নেই। ভোরের বেলা গায়ের স্ত্রীলোক মাথায় এক কলসি জল আর পিঠে এক কাঁদি না'রকল আর এক কাঁদি কলা নিয়ে নিজের গ্রাম থেকে দু-পাঁচ মাইল হেঁটে বড়ো সড়কের ধারে একটা বড়ো গাছের তলায় সব রেখে দিলে। জলের কলসির মাথায় একটি না'রকল মালা, তাতে তিনটে ঢিল; কলার কাঁদির উপরে দুটো ঢিল, আর না'রকলের কাঁদির গায়ে পাঁচটা কি সাতটা ঢিল—এই সব সাজিয়ে' রেখে দিলে। দিয়ে বাড়ি চ'লে গেল। ঢিল রাখার মানে, যদি রাহী লোকের তেষ্টা পায়, তবে গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডায় জলের কলসি দেখে তা থেকে জল কিনে খেতে পার্‌বে—এক মালা জলের দাম তিন কড়া—আমাদের দেশে এখনও কড়ি চলে; খাবারের দরকার হ'লে, দু কড়া দিয়ে একটা কলা, পাঁচ বা সাত কড়া দিয়ে একটা না'রকল নিতে পার্‌বে। সন্ধ্যের দিকে জল আর ফলের মালিক স্ত্রীলোকটি গ্রাম থেকে আস্‌বে, হিসেব ক'রে দেখ্‌বে, জল এতটা নেই, তার বদলে জলের কলসির পাশে এতগুলি কড়ি; তেমনি না'রকল আর কলা পথ-চল্‌তি লোকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যা নিয়েছে, তার বদলে হিসেব ক'রে কড়ি দিয়ে গিয়েছে। জল আর ফলের বদলে ঠিক হিসাব-মতো কড়ি বুঝে পেয়ে, স্ত্রীলোকটি তার বাকী জিনিস নিয়ে খুশী মনে ঘরে ফিরে যাবে। লোকচক্ষুর অগোচরে এই রকম বিকি-কিনিতে কেউ জুয়াচুরি করে না—এখনও আমাদের এতটা নৈতিক অবনতি হয়নি। কিন্তু 'সভ্যতা'-র ছোঁয়াচ লেগে, নৈতিক অবনতির আরম্ভ হ'য়েছে।" শ্রীযুক্ত মেকওলে আরও বলিলেন—"দেখুন, আমাদের সমাজের বাঁধন ছিল, জন্-মত ছিল; অন্যায় অনুচিত যা-খুশী তা লোকে ক'র্‌তে পার্‌ত না। এখন তা পারে, কারণ ইংরেজের আইনে বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু আগে good form বা সুরীতি অনেক ছিল, তাতে ক'রে আমাদের ভালোই হ'ত। এই ধরুন না, বিয়ের ব্যাপারে। কোনও উৎসবে, অথবা হাটের দিন হাটে, বিয়ের-বয়সের ছোক্‌রা একটি মেয়েকে দেখ্‌লে। তাকে বিয়ে কর্‌বার তার ইচ্ছে হ'ল। সে কোনও বন্ধুকে জানালে। বন্ধু গিয়ে ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরমা সম্পর্কের কোনও আত্মীয়কে ব'ল্‌লে। তখন, মেয়ের ঘর যদি ভালো হয়, তা-হ'লে বাপ মা সম্বন্ধের জন্য কথা পাড়্‌লে ঘটক দিয়ে। তার পরে পাত্র-পক্ষ আর পাত্রী-পক্ষ, উভয় পক্ষ থেকে গোপনে অনুসন্ধান চ'ল্‌ল—অপর পক্ষের বাড়ির লোকেরা কেমন, তাদের অবস্থা কেমন, আর পাত্র বা পাত্রীর ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষে এই তিনটি রোগ কারো কখনো হ'য়েছিল কিনা—উপদংশ, কুষ্ঠ আর উন্মাদ রোগ। এই অনুসন্ধানে দু-পক্ষ উত্‌রে গেলে, তবে ভদ্র আফ্রিকান ঘরে বিয়ের কথা পাকা হ'ত।

যাহাদের ব্যক্তি-গত আর সমাজগত নৈতিক ধর্ম এই রকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বড়ো-বড়ো ইমারত খাড়া করিতে বা সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে দর্শনে উন্নত হইতে না পারিলেও, তাহাদের যে একটা উঁচু দরের সংস্কৃতি ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কোনও জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্ম, সেই জাতির মৌলিক প্রকৃতি, তাহার আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিক, তাহার আজীবিকা ও জীবন-যাত্রার উপায়, প্রচুর অবসরের ফল-স্বরূপ তাহার চিন্তা, তাহার শিক্ষা, এবং অন্য চিন্তাশীল বা সুসভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ ও সংস্পর্শের জন্য বাহির হইতে আগত প্রভাব—এই-সবের উপরে নির্ভর করে। পশ্চিম-আফ্রিকার দক্ষিণে সাগরোপকূল অঞ্চলের নিগ্রোদের সঙ্গে এখন হইতে সাড়ে-চারি শত কি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে অন্য কোনও সুসভ্য জাতির সংস্পর্শ ঘটে নাই—ঐ সময়ে পোর্তুগীসদের সহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাণিজ্য-সূত্রে ইহাদের প্রথম সংযোগ ঘটে। শিল্পের ক্ষেত্রে পোর্তুগীস প্রভাব সামান্য কিছুটা হয়-তো পড়ে, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কতটুকু পড়িয়াছিল তাহা বিবেচ্য ; অনুমান হয়, বেশি পড়ে নাই। আরব ও বের্বের, তুআরেগ প্রমুখ হামীয় মুসলমানদের আগমন ইহাদের মধ্যে ঘটে আরও পূর্বে, কিন্তু সে প্রভাব প্রথমটায় উত্তর অঞ্চলের নিগ্রোদের মধ্যে Niger নাইগার নদীর দুই ধারে নিবদ্ধ ছিল। ইহার পূর্বেই নিগ্রোদের ধর্মের লক্ষণীয় সমীক্ষা ও অনুষ্ঠান, দেবতাবাদ ও পূজারীতি নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের ধর্ম বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলের আফ্রিকার ধর্মকে আফ্রিকান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আফ্রিকান জাতির প্রৌঢ় চিন্তা ও চেষ্টার ফল বলিয়াই ধরিতে হয়। ইবো, নূপে য়োরুবা, এহ্বে, আশান্টি, বাউলে, মান্দিঙ্গো প্রভৃতি পশ্চিম-আফ্রিকার জাতিগুলির মধ্যে যে-সব ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান দেখা যায়, ভাষা ও উপজাতি হিসাবে সেগুলির মধ্যে কিছু-কিছু অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলে, এক-ই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্জাত বলিয়া, ইহাদের ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সহজেই নির্ধারিত করা যায়।

তুলনামূলক আলোচনা করিব না, এ বিষয়ের অধিকারী আমি নই,—কেবল য়োরুবা জাতির ধর্মের স্থূল বা প্রধান কথাগুলি বলিবার চেষ্টা করিব। য়োরুবাদের ধর্ম লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আলোচনা হইয়াছে, পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য কোনও জাতির বা জনগণের ধর্ম লইয়া অত আলোচনা হয় নাই। য়োরুবারাও নিজেদের ভাষায় এ সম্বন্ধে বই লিখেছে। Colonel A. B. Ellis, R. E. Dennett, Leo Forbenius, Stephen S. Farrow —ইহাদের বই হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছি। আফ্রিকার শিল্প বিষয়ে লিখিত বই হইতেও কিছু-কিছু পারিপার্শ্বিকের খবর মিলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, Geoffrey Parrinder, J. Olumide Lucas, E. Bolaji Idowu, W. R. Bascom—ইহাদের বই ও প্রবন্ধ আছে। য়োরুবা ধর্মকে পশ্চিম-আফ্রিকার জনগণের ধর্মের প্রতিভূ-স্থানীয় বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়।

য়োরুবাদের মধ্যে ধর্মের প্রধান একটি অঙ্গ, দেবতাবাদ ও দেবকাহিনী, খুব লক্ষণীয়-রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। মনোজ্ঞ দেবকাহিনী না হইলে, সাধারণ্যে ধর্মের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু দেব-কাহিনী-রচনার উপযোগী কল্পনা ও রসবোধ সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মিসরীয়, মেসোপোতামীয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতীয়, গ্রীক, জর্মানিক, কেল্‌টিক—এই কয়টি জাতি এদিকে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা সর্বত্র মেলে না। সমস্ত আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে—হামীয়-শ্রেণীর মিসরীয়দের পরেই—য়োরুবা জাতির মানুষেরা এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখের যোগ্য। ইহাদের দেবজগৎ কতকগুলি ব্যক্তিত্বশালী দেব ও দেবীর দ্বারা অধ্যুষিত, জগতের বা বিশ্বমানবের কল্পিত দেবলোকে, Pantheon অর্থাৎ 'সুধর্মা'-সভায়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া য়োরুবা দেবতারাও স্থান পাইবার যোগ্য।

এই-সব দেব-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া য়োরুবাদের ও তাহাদের সংপৃক্ত অন্য জাতির মধ্যে একটি বিশিষ্ট শিল্পকলার সৃষ্টি হইয়াছে—কাষ্ঠ, ধাতু ও মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি ও পাত্রাদিতে এই শিল্পকলা দৃষ্ট হয়। আফ্রিকান শিল্প-জগতে ইহার স্থান প্রথম শ্রেণীতে, এবং বিশ্বমানবের শিল্পের মধ্যেও সৌন্দর্য্য-গুণে ও সার্থকতায় ইহার স্বকীয় বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত হইয়াছে।

য়িহুদী ধর্ম ও তৎসংপৃক্ত খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম যাহারা মানেন, তাঁহাদের কেহ-কেহ এই তিন ধর্মের বাহিরের লোকেদের সম্বন্ধে নানা তুচ্ছতাজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার করেন—যেন ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ তাঁহাদেরই জ্ঞাত, আর কেহ জানে না, জানিতে পারে না। এইরূপ মনোভাবের পরিচায়ক একটি ইউরোপীয় শব্দ হইতেছে Pagan, Paganism: যাহারা বাইবেল ও কোরানের আপ্ত বাক্য মানে না, তাহারা বর্বর, জঙ্গলী, ধর্ম বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে' ভূত, pagan-শব্দের মৌলিক অর্থ—'গ্রাম্য'। অন্য ভাবে বলা যায় যে, অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত কোনও ধর্মগুরুর উক্তি যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা নহে, যে ধর্ম অনাদিকাল হইতে কোনও দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ও সেই দেশের অধিবাসীদের হৃদয়, চিত্ত ও সংস্কৃতির প্রকাশ-স্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ স্বভাবজকে ধর্মকে Paganism বলা যায়. এই অর্থে এই শব্দ প্রয়োগে আমাদের আপত্তি নাই। কিছুকাল হইল, বঙ্গদেশে ও উত্তর-ভারতে সুপরিচিতা গ্রীক মহিলা শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী, মুখোপাধ্যায়-জায়া, আমাদের ভারতীয় Paganism—আমাদের স্বভাবজ ধর্ম হিন্দুধর্মক স্বীকার করিয়া, হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে চিন্তাশীল ও অতি উপাদেয় পুস্তক A Warning to the Hindus লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত Pagan, Paganism শব্দের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। য়োরুবা ধর্ম এইরূপ এক স্বভাবজ ধর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আফ্রিকার জনগণের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ স্বভাবজাত ধর্মের প্রকৃতি বা স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, ইহার বাহ্য অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ বা দিক্ ধরিয়া, ইউরোপীয়গণ প্রথমটায় ইহার নাম দিয়াছিলেম Fetishism : fetish অর্থাৎ কোনও সৃষ্ট বস্তুতে দৈবী শক্তির আরোপ করিয়া সেই fetish-কে সম্মান করা, বিপদ্‌বারণ মাদুলি বা তাবিজের মতো ধারণ করা। আফ্রিকার সাধারণ লোকে হয়-তো একটি প্রস্তর-খণ্ড, কিংবা কোনও ফলের বীজ, কিংবা বস্ত্র-খণ্ড, কিংবা জন্তুবিশেষের অস্থি-খণ্ড, পক্ষিবিশেষের পালখ, বা ধাতুর কোনও দ্রব্য, কাষ্ঠের কোনও মূর্তি, এইরূপ কোনও একটি বস্তুর সম্বন্ধে বিশ্বাস করিল যে, স্বাভাবিক-ভাবে অথবা কোনও প্রক্রিয়ার ফলে ঐ বস্তুতে ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে ; এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে সেই বস্তুকে তাহারা পূজা করে, বা পবিত্র বলিয়া ধারণ করে। এইরূপ বিশ্বাস বা আচরণ কিন্তু আফ্রিকার বন্য জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে ; সুসভ্য ইউরোপীয় লোকেদের mascot বা সৌভাগ্য-আনয়ন-কারী দ্রব্য ধারণ বা গৃহে রক্ষণ করার রীতিকে Fetishism-ই বলিতে হয়। সুতরাং, কেবল এই জিনিসের দিকেই নজর রাখিয়া, ইহার একটি বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আফ্রিকার জনগণের মধ্যে উদ্ভূত এই স্বভাবজাত ধর্মকে Fetishism বলা চলে না। তেমনি, ইহা কেবল Animism অর্থাৎ 'দ্রব্যাত্মবোধ'-ও নহে—প্রত্যেক বস্তু বা দ্রব্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক প্রাণ-শক্তি বিদ্যমান, কেবল এই বিশ্বাসও নহে।

নানা যুগে, নানা দেশে ও নানা জাতির মধ্যে উদ্ভূত এইরূপ বিভিন্ন স্বভাবজ ধর্মের আপসের মধ্যে ঝগড়া নাই—সকলেই পরস্পরকে পারমার্থিক সত্যের পথের পথিক বলিয়া শ্রদ্ধা করে। নিজেকে একমাত্র সত্যধর্ম বলিয়া ভাবিয়া অন্য ধর্মকে হেয় জ্ঞান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি, কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে য়িহুদী ধর্মে বিশেষ করিয়া দেখা দেয়, পরে এই ভাব খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মেও সংক্রামিত হয়। অন্য ধর্মের বিলোপ সাধন করিয়া নিজের ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মূলে হইতেছে এইরূপ ধারণা। স্বভাবজ ধর্মগুলি এই পাপ হইতে মুক্ত। আর একটি জিনিস বিচার করিবার—ইহাদের মধ্যে বাহ্য নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, স্বভাবজ ধর্মগুলির আলোচনায় ইহা দেখা যায় যে, বিভিন্ন পরিবেশ সত্ত্বেও মানব বিভিন্ন দেশে ও কালে স্বাধীন-ভাবে কতকগুলি সাধারণ উপলব্ধিতে আসিয়া পহুঁছিয়াছে ; যেমন, বিশ্বাত্মবাদ বা বিশ্বাত্মানুভূতি—সর্বভূতে ঐশী শক্তি বা শাশ্বত সত্তার অবস্থান ; যেমন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কল্পনাতীত নির্গুণ পরব্রহ্ম ও তাহার সগুণ দেবতাময় প্রকাশ; যেমন, জন্মান্তরবাদ। এখানে যদি আমরা সর্বত্র ভারতের প্রভাব খুঁজি, তাহা হইলে আমাদিগকে জাতীয়তাদোষ-দুষ্ট বলিতে হয়; ধর্মের ক্ষেত্রে, "আমার জাতি-ই সব-চেয়ে বড়ো, আমার জাতির মধ্যেই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাবর্ষণ হইয়াছে", এই চিন্তা, ঐশী শক্তির অপমান করে। চীনের 'তাও'-বাদ, ভারতীয় নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মের বা বিশ্বনিয়ন্তৃ ঋতের কল্পনার ছায়া নহে—উহা স্বতন্ত্রভাবে চীনা ঋষির উপলব্ধিতে আসিয়াছে,—এই ভাবে দেখিলেই আলোচ্য উপলব্ধির সহজ মানব-সাধারণত্ব সূচিত হয়।

য়োরুবারা আমাদের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো এক ঐশী শক্তিতে আস্থাবান্; এই শক্তির নাম Olorun 'ওলোরুঁ'। পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জাতির লোকেরাও এইরূপ আস্থা পোষণ করে, তবে তাহাদের নিজ-নিজ ভাষায় তাহারা বিভিন্ন নামে তাঁহাকে অভিহিত করে। য়োরুবাদের মধ্যে খ্রীষ্টানেরা তাহাদের যিহোবাকে ও মুসলমানেরা তাহাদের আল্লাহ্‌কে ওলোরুঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে. খ্রীষ্টান য়োরুবারা এই নামেই পরমেশ্বরকে ডাকে। 'ওলোরুঁ' শব্দের অর্থ 'স্বর্গের স্বামী'। তাঁহার অন্য নামে তাঁহার মহিমা ব্যক্ত হয়—Eleda 'এলেদা' অর্থে 'স্রষ্টা', Alaye 'আলায়ে' অর্থে 'জীবনের স্বামী', Olodumare 'ওলোদুমারে' অর্থে 'সর্বশক্তিমান্', Olodumaye 'ওলোদুমায়ে' অর্থে 'স্বয়ম্ভূ', Elemi 'এলেমি' অর্থে 'পরমাত্মন্', Oga-Ogo 'ওগা-ওগো' অর্থে 'মহামহিম', Oluwa 'ওলুরা' অর্থে 'প্রভু'। হিন্দুদের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো গভীর দার্শনিক তথ্যে বা তত্ত্বে য়োরুবাদের পঁহুছানো সম্ভবপর হয় নাই; তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', কারুণিক, ন্যায়কারী, পাপপুণ্যের বিচারক ঈশ্বরের ধারণা ইহারা ওলোরুঁর কল্পনায় করিতে পারিয়াছে।

এই সর্বশক্তিমান্, এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে কিন্তু সাধারণভাবে উপচার দিয়া পূজা করা হয় না। বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির ও মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের জীবনের পরিচালক হিসাবে, ইহারা কতকগুলি Orisha 'ওরিশা' বা দেবতার কল্পনা করে। এই ওরিশাদের সংখ্যা কোনও মতে ২০১, কোনও মতে ৪০১, কোনও মতে ৬০০। অনেক য়োরুবার ধারণা, ওরিশারা প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে নিজ শক্তি বা গুণের দ্বারা দেবতার পদে উন্নীত হন। কিন্তু য়োরুবা দেব-কাহিনী বা পুরাণ-কথা মতে, ওরিশাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস অন্য দেশের দেবতাদেরই মতো। ওলোরুঁ পৃথিবী-পালনের জন্য একজন পুরুষ দেবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সৃষ্টি করিলেন—Obatala 'ওবাতালা', অর্থ 'সাদা-ঠাকুর', 'শ্বেতিমরাজ', বা 'জ্যোতিরীশ্বর'; এবং ওবাতালার পত্নী হইলেন Odudua 'ওদুদুআ' অর্থাৎ 'কৃষ্ণবর্ণা' বা 'কালী'—এই দেবী 'ওদুদুআ', ওলোরুঁর সৃষ্টা নহেন, তিনি প্রকৃতি, অনন্তকাল ধরিয়া পৃথক্ অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। ওবাতালা-ওদুদুআ কতকটা আমাদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মতো। ওবাতালাকে য়োরুবারা শুচিতার ও কল্যাণের দেবতা বলিয়া পূজা করে, তিনি-ই শিব বা মঙ্গলময়, মানবের স্রষ্টা ও ত্রাতা, কিন্তু ওদুদুআর চরিত্র ইহাদের হাতে ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ওবাতালা হইতেছেন দ্যৌস্পিতা, ওদুদুআ পৃথিবী-মাতা,—তাই পৃথিবীর পাপ ও পঙ্কিলতা ওদুদুআর চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে—ওদুদুআ পতি ওবাতালাকে ত্যাগ করিয়া মৃগয়াপ্রিয় জনৈক অন্য দেবতাকে আশ্রয় করেন। ওবাতালা ও ওদুদুআর এক পুত্র Aganju 'আগাঁজু' ও এক কন্যা Yemaja 'য়েমাজা'। ইহারা পরস্পরের সহিত বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হয়। ইহাদের দুই সন্তান, Obalofun 'ওবালোফুঁ' অর্থাৎ 'বাক্‌পতি' এবং Iya 'ইয়া' অর্থাৎ 'মাতা', ইহারা হইতেছে আদি মানব-মানবী। ইহাদের আর এক পুত্র Orungan 'ওরুঙ্গান'-এর দুর্বৃত্ততার ফলে য়েমাজার মৃত্যু হয়। য়েমাজার মৃত্যুর পরে তাহার দেহ স্ফীত হয়। দেহের রক্ত মাংস মেদ হইতে পনের জন প্রধান দেবতার উদ্ভব হয়। এই দেবতারা এখন য়োরুবা জাতির পূজিত। ইঁহাদের অনুরূপ দেবতা পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য জাতিগুলির মধ্যেও আছেন।

এই পনের জন দেবতার মধ্যে প্রধান হইতেছেন এই কয়জন :—

[১] Shango 'শাঙ্গো'—ইনি বজ্রের দেবতা, য়োরুবারা ইঁহার খুব-ই পূজা করে। আকাশে মেঘের মধ্যে এক পিত্তলময় প্রাসাদে শাঙ্গো নিজ গণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করেন। তাঁহার অসংখ্য ঘোড়া আছে। শাঙ্গোর রূপ কাঠের মূর্তিতে প্রদর্শিত হয়—শ্মশ্রুমান্ দেবতা, ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন। শাঙ্গোর তিন স্ত্রী—তিন জনেই য়েমাজার দেহ হইতে সম্ভূত, তিনজনেই তিনটি নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; ইঁহাদের মধ্যে প্রধানা হইতেছেন Oya 'ওইয়া', ইনি বিশাল Niger নাইগার নদীর দেবী। শাঙ্গো পাপের শাস্তি দেন। শাঙ্গোর অন্যতম অনুচর হইতেছে Oshumare 'ওশুমারে' বা 'রামধনু' —ইহার কার্য্য হইতেছে, পৃথিবী হইতে শাঙ্গোর পিত্তলময় প্রাসাদে মেঘমালার মধ্যে জল শোষণ করিয়া লওয়া। Double-axe বা ঘোড়ামুখ কুড়ালি শাঙ্গোর বিশেষ আয়ুধ বা বর্ণ-চিহ্ন। শাঙ্গোর সম্বন্ধে এই স্তোত্রটি খুব-ই জনপ্রিয়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিশ্বমাতা ওদুদুআ

(য়োরুবা জাতির দেবতা—কাঠের মূর্তি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

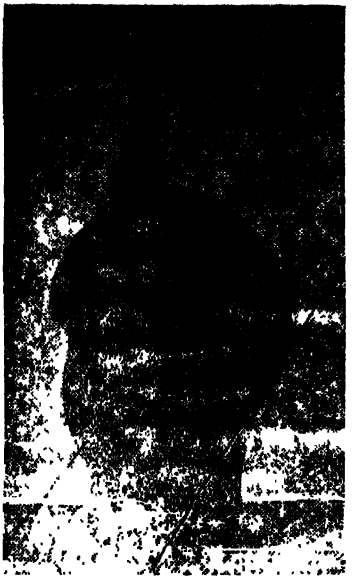

ব্রঞ্জে ঢালা সাগব-পতি 'ওলোকুঁ'-র মূর্তি

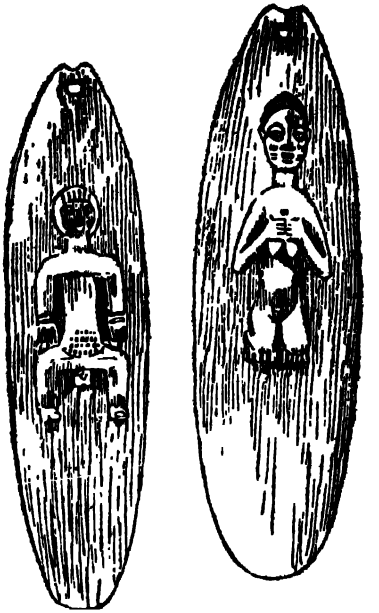

কাঠের 'ভেমবা'

বজ্রের দেবতা শাঙ্গো ও তাঁহাব দুই পত্নী (কাঠের মূর্তি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হে শাঙ্গো, তুমি-ই প্রভু।
তুমি অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড-সমূহ হাতে করিয়া লও,
পাপীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য।
তোমার ক্রোধ প্রশমন করিবার জন্য।
ঐ প্রস্তর যাহাকেই লাগে, তাহার বিনাশ ঘটে :
অগ্নি বনানীকে খাইয়া ফেলে,
বৃক্ষরাজি ভগ্ন হয়,
সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয়॥

[২] Ogun 'ওগুঁ'—লৌহ, যুদ্ধকার্য্য এবং শিকারের দেবতা। যে কোনও লৌহখণ্ডে ইঁহার অধিষ্ঠান। বৃত্তিতে যাহারা লোহার বা কামার এবং সিপাহী ও শিকারী, তাহাদের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত।

[৩] Orishako 'ওরিশাকো', Orisha Oko অথবা Oko 'ওকো'—কৃষির দেবতা, পুরুষ। অন্য নিগ্রো জনগণের মতো য়োরুবাদের মধ্যে কৃষিকার্য্য মেয়েরাই করিত, সেইজন্য 'ওকো'-র পূজকেরা বেশির ভাগ-ই স্ত্রীলোক।

[৪] Shopono 'শোপোনো' বা 'শ-প-ন'—বসন্ত-মারীর দেবতা।

[৫] Olokun 'ওলোকুঁ' বা 'সাগর-পতি'—সমুদ্রের দেবতা, বা বরুণ।

[৬] Ifa 'ইফা'—ভবিষ্যদ্বাণীর দেবতা।

[৭] Aroni 'আরোনি'—বনদেবতা, ইঁহার সম্বন্ধে য়োরুবাদের কল্পনা বিশেষ কবিত্বময়। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেকগুলি দেবতারও পূজা আছে।

উপর্যুক্ত Orisha ওরিশা বা দেবতাদের পরেই হইতেছে প্রেত ও পিতৃ-পুরুষদের সম্মান। ইহাদের মধ্যে নানা প্রকারের প্রেতের কল্পনা আছে। পিতৃলোক হইতে প্রেতগণ পৃথিবীতে আগমন করে। এক শ্রেণীর লোক প্রেতের অভিনয় করিয়া, ইহাদের শ্রাদ্ধের অনুরূপ ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করে। যাহারা প্রেত সাজিয়া আসে, তাহাদের Oro 'ওরো' বলে। ইহারা রাত্রে সারা-গা-ঢাকা উলুখড়ের বা অনুরূপ বস্তুর পোষাক পরিয়া বাহির হয়, এবং ছিদ্র-যুক্ত ডিমের আকারের চেপ্টা ছোটো কাঠের ফিরকি বা ফলায় দড়ি বাঁধিয়া, সেই দড়ি দিয়া কাঠের ফলাটি বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া তদ্দ্বারা এক অদ্ভুত আওয়াজ করিতে-করিতে আসে। এইরূপ ঘুরনি-ফলার গায়ে কখনও-কখনও পুরুষ বা স্ত্রী-মূর্তি খোঁদা থাকে। এই ফলাগুলি ৬ ইঞ্চি হইতে ২॥ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং ঘুরাইবার কালে আকার অনুসারে ইহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইতে সূক্ষ্ম বা গম্ভীর ধ্বনি নির্গত হয়। এইরূপ ঘুরনি-ফলাকে ইংরেজিতে Bull-roarer বলে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং অন্য বহু আদিম জাতির মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানে ইহার রেওয়াজ আছে। আমাদের হিন্দু অনুষ্ঠানে এ জিনিস অজ্ঞাত। কিন্তু ত্রিপুরায় আদিবাসীদের মধ্যে এই বস্তু দেখা যায়—স্থানীয় বাঙ্গালায় ইহাকে 'ভেম্‌রা' বলে। ইহাদের পূজার রীতিতে এমন অনেক উপকরণ ও ক্রিয়া প্রচলিত, যাহা কেবল ইহাদের মধ্যেই মিলে—সে-সকল ইহাদের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ফল।

দেবতা ও প্রেত ভিন্ন, য়োরুবারা পাপ-পুরুষ বা শয়তান Eshu 'এশুর' অর্থাৎ 'অন্ধকারের রাজা'র পূজা করে।

য়োরুবাদের শিশুকালেই পুরোহিতেরা ঠিক করিয়া দেন, কোন্ দেবতা তাহার ইষ্টদেবতা হইবে—সারা জীবন ধরিয়া সেই দেবতাকেই বিশেষ ভাবে পূজা করিতে হইবে। প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যেক আস্তিক য়োরুবা নিজ ইষ্টদেবের নাম লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করে। জলে নামিয়া স্নান করিবার সময়ে অনেকে দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র বলিতে থাকে—মন্ত্র অবশ্য য়োরুবা ভাষায়। ইহাদের দেবতাদের মন্দির খড়ের-চালে ঢাকা সাধারণ কুটীর মাত্র, যে রকম কুটীরে বা গৃহে ইহারা নিজেরা অবস্থান করে। সাধারণের জন্য বিভিন্ন দেবতার মন্দির থাকে, আবার সম্পন্ন বা দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ির আঙ্গিনায় বা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের মূর্তি থাকে। আবার বৃক্ষরাজিময় কোনও পবিত্র স্থান মন্দিরের মতো ব্যবহৃত হয়। কোনও গাছকে আশ্রয় করিয়াও পূজা হয়। সাধারণ খাদ্যসম্ভার, ফল প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া, মদ ঢালিয়া, ডিম ভাঙ্গিয়া এবং নানা প্রকার পশু ও পক্ষী জবাই করিয়া পূজা হয়। আমরা যেমন দেবতাকে ফুল দিয়া পূজা করি, সেরূপ পুষ্পদানের রীতি ইহাদের পূজায় অজ্ঞাত। বিশেষ দেবতার পুরোহিতেরা বিশেষ প্রকারের বর্ণচিহ্ন ধারণ করে। যেমন, ওবাতালার পুরোহিতেরা কেবল সাদা রঙ্গের কাপড় পরে, গলায় শ্বেতবর্ণের মালা ধারণ করে। ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করার বিধি আছে। পশুবধ করিয়া, হয় সমস্ত অগ্নিসাৎ করা হয়, না হয় তাহার রক্ত লইয়া দেবতার দ্বারে মাখানো হয়। ফল ও খাদ্যের নৈবেদ্য ও বলির পশুর মাংস প্রসাদ-রূপে উপাসকদের দ্বারা ভক্ষিত হয়। সাধারণ-অনুষ্ঠান-মূলক পূজা ভিন্ন, ব্যক্তিগত প্রার্থনারও রীতি সুপরিচিত —ওলোরুঁ, শাঙ্গো, ইফা প্রভৃতি বিশেষ দেবতার নিকট রুচি-মতো লোকে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইহাদের মধ্যে আত্মার অবিনাশিত্বের পুরা বোধ আছে।

য়োরুবাদের মতে, মানুষ নিজ পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে। সঙ্গে-সঙ্গে পুনর্জন্মবাদও ইহারা মানে। তবে পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহাদের বিচার খুব গভীর নহে। মানবাত্মার শেষ বিশ্রাম-স্থান, Olorun ওলোরুঁ বা পরমেশ্বর।

দেখা যাইতেছে যে, সুদূর পশ্চিম-আফ্রিকার তথা-কথিত ধন্য বর্বর নিগ্রো মানুষ, আমাদেরই মতো, এক-ই ভাবে আশা আশঙ্কা জুগুপ্সা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত, এবং সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে ধর্ম-মত তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম-মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুসভ্য, শিক্ষিত ও পরমত-সহিষ্ণু হিন্দুর সংস্পর্শে আসিলে, ইহাদের আধ্যাত্মিক জীবন কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা বলা কঠিন, তবে এটুকু মনে হয়, আমাদের সংস্কৃতির মজ্জায়-মজ্জায় যে চিন্তাধারা বিদ্যমান, যে "যত মত, তত পথ", তাহার কল্যাণে য়োরুবারা ও অনুরূপ অন্য আফ্রিকান জাতির লোকেরা, নিজের ধর্মের মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক মুক্তির সন্ধান পাইত, এবং অন্য ধর্মের অন্ধ অসহিষ্ণুতার ফল-স্বরূপ আত্ম-দৈন্য-স্বীকারের অপমান হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইত॥

ভারতবর্ষ
কার্তিক, ১৩৪৯
(স্বল্প পরিবর্তিত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শ্রীজয়দেব কবি

'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি শ্রীজয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা শ্রুতি-মধুর গীতি-কবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাঁহার নাম আসিয়া পড়ে—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহ্লণ, জয়দেব। বাস্তবিক, নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাঁহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি কালিদাসের ভারত-ব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত হইতে পারে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি কবির পরবর্তী কালের ভাবতীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। জয়দেবের জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় ১২ ও ১৩-র শতকের পরেও সংস্কৃত কাব্য ও শ্লোক রচনার ধারা অব্যাহত ছিল বটে, কিন্তু উত্তর-ভারত তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে এবং ভাষা-সাহিত্যেব উদ্ভবের ফলে পরবর্তী শতক-সমূহে সংস্কৃতে কাব্যাদি রচনা রাজসভাব পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইল, এবং আর পূর্বের মতো জনপ্রিয় থাকিতে পারিল না, এই জন্য এই ধারা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া উত্তর-ভারতে। মুসলমান-যুগে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি বড়ো বড়ো কবি নিজ প্রতিভার প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের আবির্ভাব ইহা-ই প্রমাণিত করিয়াছিল যে, মুসলমান-যুগে অনেকটা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও হিন্দুব কাব্য-প্রতিভা তাহার অর্ধ-সহস্র বা সহস্র বর্ষ পূর্বেকার কৃতিত্বের প্রতিস্পর্ধী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিত, শ্রীনীলকণ্ঠ দীক্ষিত প্রভৃতি কবিগণ মুসলমান-যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাব্য নাটকাদি ও অন্য পুস্তক, প্রাচীন হিন্দু-যুগের কবিদেব রচনার মতোই সাদরে আলোচিত হইবার যোগ্য; ভারতের সংস্কৃতি-পূত চিত্তের বিগত কয়েক শতক ধরিয়া যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহা ইহাঁদের রচনাতেই বহুল পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ও বিদ্যাগর্ভ সাহিত্যের নদী অবিলুপ্ত গতিতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেও, খ্রীষ্টীয় ১৩-র শতকের আরম্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইতে, জয়দেব কবির পর যে সংস্কৃতের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল এবং নূতন ভাষা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইল, সে কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়দেব হইতেছেন যুগ-সন্ধির কবি, তাঁহার রচনায় প্রাচীনের বিজয়া ও নবীনের আগমনী উভয়-ই যেন যুগপৎ ঝংকৃত হইয়াছে। তিনি ছিলেন, ইংরেজি কথায়, the first of the moderns and the last of the ancients.

শ্রীকৃষ্ণলীলা—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকথা—অবলম্বন করিয়া অতি মনোহর ও শ্রুতি-মধুর কবিতা ও গানের রচয়িতা বলিয়া-ই, অতি সহজে শ্রীজয়দেব—অন্ততঃ সম্প্রদায়-বিশেষের জনগণের সমক্ষে—দিব্য অনুপ্রাণনার দ্বারা প্রণোদিত রসিক ও কবি-রূপে এবং ভক্ত-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। রাধা ও কৃষ্ণের স্বর্গীয় ও শাশ্বত প্রেমকে মানব আকারে রূপ-দান করিয়া নবীন হিন্দু সমাজের সমীপে রসের অনন্ত ভাণ্ডার-রূপে উপনীত করা হয়, তুর্কী-বিজয়ের পরে, যখন মুখ্যতঃ সূফী-মতাবলম্বী ফকীর ও প্রচারকদের চেষ্টায় ভারতে জনগণের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম অল্পে-অল্পে প্রসার লাভ করিতে থাকে, এবং ভারতের ধর্মজীবন ও সংস্কৃতি যখন এইভাবে বিদেশী ধর্মের অভ্যুত্থানে ও প্রসারে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দেশের হৃদয়ে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য, পুনরুদিত ভক্তিবাদকে আবাহন করা হইল; ভারতের সাধক ও ভক্তগণ দেশের মধ্যে ভক্তির ধারার প্রবাহ ফিরাইয়া আনিতে বা তাহাতে নবীনতা দান করিতে চেষ্টা করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামচন্দ্রলীলা এই ভক্তিমার্গের প্রধান পরিপোষক-রূপে দেখা দিল। ধীরে ধীরে জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি ধর্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা পাইল, এবং স্বয়ং জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগৃহীত বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাপুরুষের সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। আধুনিক ভারতের বৈষ্ণব ভক্তকথার মধ্যে জয়দেব অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হইলেন, বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকদের মধ্যে তাঁহার সম্মাননীয় আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে এইভাবে ভক্ত-রূপেই তাঁহার নাম সুপরিচিত; যে-সকল ভক্তিপূত ইতিবৃত্ত পাঠে মানুষের মন ভগবদভিমুখী হইয়া উন্নীত হয়, জয়দেবের নামের সহিত বিজড়িত কাহিনী-গুলি সেই ইতিবৃত্ত-সমূহের অন্যতম হইয়া এখন বিদ্যমান। এইরূপে মানুষের ধর্মজীবনে অনুপ্রাণনা আনিবার সৌভাগ্য ভারতের অতি অল্পসংখ্যক কবির পক্ষে ঘটিয়াছিল; ব্যাস ও বাল্মীকি এবং কতকটা কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কবি এইভাবে সাহিত্যেতিহাসের দৃঢ় পার্থিব ভূমি হইতে পুরাণ-সুলভ কাহিনী ও মধ্য-যুগের ধর্মসাধনার গগনপথে উন্নীত হইতে পারেন নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শ্রীজয়দেব কবির জীবৎকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই—তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, এবং গৌড়-বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভার অন্যতম কবি ছিলেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ১৯০৬ সালের Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার ১৬৩-১৬৯ পৃষ্ঠায় Sanskrit Literature in Bengal during the Sena Rule নামে তাঁহার মূল্যবান্ প্রবন্ধ-মধ্যে জয়দেবের কথা পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্য পাঠে আমরা জয়দেবের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিতে পারি। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম রামা দেবী (বা বামা দেবী, অথবা রাধা দেবী), তাঁহার পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী, এবং পরাশর নামে তাহার এক প্রিয়বন্ধু ছিলেন যিনি 'গীতগোবিন্দ'র গান গাহিতেন। জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক অন্য কবিদের উল্লেখ করিয়াছেন—উমাপতিধর, শরণ, আচার্য গোবর্ধন ও ধোয়ী কবিরাজ। অন্যত্র ইঁহাদের কথা শুনা যায়; ইঁহাদের রচনাও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্বের নাম তিনি গীতগোবিন্দে করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেব নামে একাধিক কবি উদ্ভূত হন, কিন্তু গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ভিন্ন আর কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। জয়দেব নামে এক ছন্দঃ-সূত্র-রচয়িতা ছিলেন, ইনি আলংকারিক অভিনবগুপ্ত (খ্রীষ্টাব্দ ১০০০) কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছিলেন, এবং হর্ষট (খ্রীষ্টাব্দ ৯০০) ইঁহার ছন্দঃ-সূত্রের একটি টীকা প্রণয়ন করেন, সুতরাং ইনি আমাদের জয়দেবের কয়েক শতক পূর্বেকার লোক। রামায়ণ-কথা অবলম্বন করিয়া রচিত 'প্রসন্ন-রাঘব' নাটকের রচয়িতা আর-এক জয়দেব ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নাম সুমিত্রা, ইনি কৌণ্ডিন্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহার গুরুর নাম ছিল হরিমিশ্র, ইনি গীতগোবিন্দ-কার জয়দেবের কাছাকাছি সময়ের হইবেন, কারণ ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত কাশ্মীরীয় কবি জহ্লণ-কৃত 'সূক্তিমুক্তাবলী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে 'প্রসন্ন-রাঘব' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এই জয়দেবের আর কোনও পরিচয় নাই, তবে কেহ-কেহ অনুমান করেন, ইনি বিদর্ভের অর্থাৎ উত্তর-মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। 'চন্দ্রলোক' নামে অলংকার-গ্রন্থও ইঁহার রচিত। বাঙ্গালা দেশে ইঁহার খ্যাতি তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই। 'জয়দেব' বলিলে আমরা 'গীতগোবিন্দ'কার জয়দেবকেই বুঝিয়া থাকি। আমাদের জয়দেব বাঙ্গালার কবি ছিলেন, তাঁহার কেন্দুবিল্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখন কেঁদুলি নামে তাঁহার পীঠস্থান-রূপে পরিচিত। বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে এই গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তির বার্ষিক মেলায় এখনও তাঁহার স্মৃতি উদ্‌যাপিত হয়। ষোড়শ শতকে নাভাজীদাসের ব্রজ-ভাষা বা প্রাচীন হিন্দীতে রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ও সপ্তদশ শতকে প্রিয়াজীদাসের রচিত ঐ গ্রন্থের টীকাতে, তখনকার দিনে বিশেষ প্রচারিত, জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী সম্বন্ধে কাহিনীটি—এটি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়। পদ্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল যে, নিজের কন্যাকে দেববাসীরূপে তিনি জগন্নাথ-মন্দিরে সমর্পণ করিয়া আসেন, কিন্তু নারায়ণ-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরে জয়দেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' সংক্রান্ত ভক্তি-মূলক আখ্যায়িকাটি বাঙ্গালা দেশে সুপ্রসিদ্ধ। 'সেকশুভোদয়া'-তে জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্পর্কে এই কথা সংরক্ষিত আছে যে—বুচনমিশ্র নামে বাঙ্গালা দেশের বাহির হইতে আগত জনৈক সংগীতজ্ঞ জয়দেবকে সংগীত-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন, বিদেশাগত দাম্ভিক কালোয়াতকে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী পরাজিত করিয়াছিলেন। 'সেকশুভোদয়া'র এই উপাখ্যানের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য থাকা খুব-ই সম্ভবপর। পদ্মাবতী সংগীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন, ইহা এই কথা হইতে প্রমাণিত হয়, এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে যে দেবদাসী-রূপে মন্দিরে গান গাহিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এই কাহিনীও যেন কতকটা সমর্থিত হয়; অপর, জয়দেব আপনাকে যে 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' বলিয়া গর্বের সঙ্গে উল্লিখিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যেন ইহাও সূচিত হইতেছে যে, পদ্মাবতী নৃত্যকুশলা ছিলেন। এই-সকল কাহিনী অনুসারে, এবং 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে একাধিক স্থানে নিজ পত্নীর নাম কবি-কর্তৃক উল্লিখিত হওয়ায়, ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, জয়দেব-পদ্মাবতীর দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখের ছিল।

জয়দেব মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, তাহার বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জয়দেবের সমকালীন পণ্ডিত ও কবি এবং সামন্ত ভূম্যধিকারী বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে একখানি সংস্কৃত শ্লোক-সংগ্রহ সংকলিত করেন, ঐ পুস্তক বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় এবং মুসলমান-পূর্ব যুগের গৌড়-বঙ্গের কবি-মনের সমীক্ষায় অমূল্য। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ১৯৩৩ সালে লাহোর হইতে স্বর্গত পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পণ্ডিত হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [সম্প্রতি ইহার আর একটি সংস্করণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।] এই সংগ্রহ-গ্রন্থে পাঁচটি প্রবাহে বিভিন্ন ছন্দে রচিত প্রায় ২৪০০ সংস্কৃত শ্লোক আছে। এগুলির মধ্যে ৫০০টি শ্লোকের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত বা লুপ্ত, কিন্তু অবশিষ্ট শ্লোকগুলির রচয়িতা বলিয়া প্রায় ৫০০ জন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে বোধ হয় ৩০০র অধিক গৌড়-বঙ্গের কবি হইবেন। যে পাঁচটি 'প্রবাহ' অর্থাৎ অধ্যায়ে এই নাতিক্ষুদ্র সংগ্রহ-গ্রন্থ বিভক্ত, সেগুলি যথাক্রমে হইতেছে—[১] অমর- বা দেব-প্রবাহ, [২] শৃঙ্গার-প্রবাহ, [৩] চাটু-প্রবাহ, [৪] অপদেশ-প্রবাহ, ও [৫] উচ্চাবচ-প্রবাহ। প্রত্যেক প্রবাহের অন্তর্গত কতকগুলি করিয়া 'বীচি' বা তরঙ্গ অর্থাৎ শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচি পাঁচটি করিয়া শ্লোকে সম্পূর্ণ। অমর-প্রবাহে আছে এইরূপ ৯৫ বীচি, শৃঙ্গার-প্রবাহে ১৭৯, চাটু-প্রবাহে ৫৪, অপদেশ-প্রবাহে ৭২ ও উচ্চাবচ-প্রবাহে ৭৬। এই-সমস্ত সংস্কৃত কবিতার অনেকগুলিতেই, খ্রীষ্টীয় ১২০০-র অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশ তুর্কী কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্বেকার যুগের বাঙ্গালী কবিচিত্ত প্রতিফলিত হইয়া আছে; ভবিষ্যযুগের বাঙ্গালা কবিতার ভাবধারা ও তাহার ঝংকার বহুল পরিমাণে এই-সকল শ্লোকেই আমরা ধরিতে পারি। সংস্কৃতে নিবদ্ধ এই-সকল শ্লোকের কতকগুলিতে মধ্য-যুগের, এমন কি আধুনিক কালের বাঙ্গালা কবিতার পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যেতিহাসের আলোচনায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত'কে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম সংস্কৃতময়ী প্রতিষ্ঠাভূমি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।

এখন, সদুক্তিকর্ণামৃতে 'জয়দেবস্য' বলিয়া ৩১টি শ্লোক বিভিন্ন প্রবাহে ধৃত হইয়াছে; এগুলির মধ্যে ৫টি শ্লোক গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়। ছন্দঃ-সূত্রকার জয়দেবের কবি-প্রসিদ্ধি নাই, এবং 'প্রসন্নরাঘব'-কার জয়দেব হর-তো আমাদের জয়দেবেরই সমকালীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম-যশ বাঙ্গালা দেশে তখন পঁহুছায় নাই। 'গীতগোবিন্দ'কার জয়দেব হইতে পৃথক্ আর কোনও জয়দেবের কথা জানিয়া থাকিলে, শ্রীধরদাস অবশ্যই তাঁহার উল্লেখ করিতেন; তাঁহার সমকালীন জীবিত কবি, রাজসভায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁহার 'গীতগোবিন্দ' হইতে শ্লোক তিনি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সহিত অপর কোনও জয়দেবকে শ্রীধরদাস নিশ্চয়ই বিজড়িত করিয়া ফেলিতেন না। সুতরাং, 'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত পাঁচটি শ্লোকের বলে, এবং জয়দেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শ্রীধরদাসের পরিচিত কবি ছিলেন এই কথাও ধরিয়া (শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস লক্ষ্মণসেন দেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এ কথা সদুক্তিকর্ণামৃতের ভূমিকায় তিনি আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন), এই ৩১টি শ্লোকের সব কয়টিরই রচয়িতা গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। সদুক্তিকর্ণামৃতে জয়দেবের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে, উমাপতিধরের রচিত ৯১টি শ্লোক আছে, লক্ষ্মণসেন-পুত্র যুবরাজ কেশবসেন দেবের ১০টি, আচার্য গোবর্ধনের ৬টি, ধোয়ী কবির ২০টি (তন্মধ্যে ২টি 'পবন-দূত' হইতে), শরণের ২০টি, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের ১১টি, হলায়ুধের ৫টি। এতদ্ভিন্ন আরও বহু কবি, যাঁহারা জয়দেবের আশপাশের সময়ের ছিলেন, তাঁহাদেরও রচনা আছে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শ্রীরূপগোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে যে একখানি বৈষ্ণব-শ্লোক-সংগ্রহ পুস্তক সংকলন করেন, তাহাতেও এই-সমস্ত কবির লেখা কতকগুলি শ্লোক মিলিতেছে।

জয়দেব-রচিত এই শ্লোকগুলির মধ্যে, শৃঙ্গাররস ভিন্ন বীররসের শ্লোকও পাইতেছি, এবং আমাদের চক্ষে বৈষ্ণব-সাধক-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত জয়দেবের রচিত শিবের স্তুতিময় শ্লোকও পাইতেছি। এই শ্লোক-সমূহ হইতে দেখা যায়, জয়দেবের বাণী কেবল বাঁশীর ঝংকারেই মাতেন নাই, অসির ঝঞ্ঝনাও তাঁহাকে মাতাইয়াছিল, রণক্ষেত্র তূর্য্যধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই-সব দেখিয়া মনে হয়, জয়দেব পঞ্চদেবতার উপাসক সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ছিলেন। পরবর্তী কালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-কর্তৃক তিনি যে একজন বিশিষ্ট সাধক বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, আদৌ সম্ভবতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। খ্রীষ্টীয় ১১০০-১২০০-এর দিকে, চৈতন্যোত্তর যুগের আদর্শে গঠিত বৈষ্ণব সমাজ বা ধর্ম বিদ্যমান ছিল বলিয়া মানিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'র ভূমিকায় দেখাইয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতি, 'বৈষ্ণব মহাজন' বলিলে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা আদৌ ছিলেন না, সহজিয়া সাধকও ছিলেন না, তিনি ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ এবং শিবের, উমার ও গঙ্গার উপাসক। 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিলেও, জয়দেব সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে।

জয়দেবের কবিতার ব্যাখ্যাতেও পরবর্তী সাম্প্রদায়িক মতবাদ আরোপিত হইয়া স্থলে-স্থলে নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জয়দেবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকের "নন্দ-নিদেশতঃ" সমস্তপদটির ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং, বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্,
নক্তং, ভীরুরয়ং—তদেব ত্বমিমং, রাধে! গৃহং প্রাপয়।"
—ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োজয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ॥

এই সুপরিচিত শ্লোকের সরল অর্থ ইহা-ই দাঁড়ায় যে, নন্দ-গোপের নিদেশেই, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞানতঃ, মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার রাত্রে পথস্থ কুঞ্জমধ্যে রাধা ও মাধবের মিলন ঘটিয়াছিল। কিন্তু রাণা কুম্ভের সভায় আলংকারিক পণ্ডিতগণ, কুম্ভ-রাণার নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' নামে 'গীতগোবিন্দ'র টীকা প্রণয়নে যাঁহাদের হাত ছিল, তাঁহারা, "নন্দ-নিদেশতঃ" এই সমস্তপদের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এই ব্যাখ্যা ("নন্দ" অর্থাৎ মিলন-আনন্দের উদ্দেশ্যে, নন্দ-গোপের আদেশে নহে, শ্লোকটির প্রথম দুই ছত্রের উক্তি, এই বিচার অনুসারে, নন্দ-গোপের নহে, ইহা সখীর উক্তি রাধার প্রতি) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত 'গীতগোবিন্দ'র ভূমিকা, এবং ১৩৪৯ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র দোল-সংখ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ)। কিন্তু 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে দুইটি শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, 'গীতগোবিন্দ'-র প্রথম শ্লোকের মতোই শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত—একটি রাজকুমার কেশবসেন দেবের রচিত, অন্যটি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের,—সে দুইটি হইতে বুঝা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের "নন্দ" শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দ-গোপকেই ধরিতে হইবে, এবং এই তিনটি শ্লোক—জয়দেবের, কেশবসেন দেবের ও লক্ষ্মণসেন দেবের—এক সঙ্গেই বিচার করিতে হইবে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'র এই দুইটি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তেও আছে, কিন্তু 'পদ্যাবলী'-তে দুইটি-ই মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের রচিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। শ্লোক দুইটি এই—

(কেশবসেন-রচিত)—

"আহূতাদ্য ময়োৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা,
ক্ষীবঃ প্রেয়ঃজনঃ, কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি?
বৎস, ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্"—ইতি শ্রুত্বা যশোদা-গিরো,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখানে দেখা যাইতেছে যে, এই শ্লোকটি যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রতিধ্বনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' এখানে যশোদাও না জানিয়া রাধা ও কৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করিতেছেন; ইহাতে যেন "নন্দ-নিদেশতঃ" পদের প্রত্যুত্তর বা পালটা জবাব "যশোদা-গিরঃ" পাওয়া যাইতেছে। "যশোদা-গিরঃ" পদটির, "নন্দ-নিদেশতঃ"-র মতো, অন্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস আশা করি কেহ করিবেন না।

(লক্ষ্মণসেন-রচিত)—

"কৃষ্ণ, ত্বদ্‌বনমালয়া সহ কৃতং", কেনাঽপি, "কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম—তদিদং প্রাপ্তং ময়া ; গৃহ্যতাম্।"
—ইত্থং দুগ্ধমুখেন [দগ্ধমুখেন] গোপশিশুনাঽথ্যাতে, ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ।

এই শ্লোকে যেন মহারাজ লক্ষ্মণসেন, অন্যতম সভাকবি জয়দেব- ও রাজকুমার-রচিত যুগ্মশ্লোকের সমাধান করিয়া দিতেছেন, কি করিয়া রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনটি শ্লোকেরই চতুর্থ ছন্দের "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই অংশ লক্ষণীয়। তিনটি শ্লোক-ই যেন সমস্যাপূর্তির জন্য রচিত হইয়াছিল, যেন সভায় রসিক ও বিদ্বান্ রাজা সমস্যা-স্বরূপ শ্লোকাংশ দিলেন—"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি", ও পরে সভাস্থ কবিদের আহ্বান করিলেন, এই শ্লোকাংশকে চতুর্থ ছত্রের প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়া শ্লোক রচনা করিতে হইবে। কিংবা হয়-তো জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া অথবা শুনিয়া প্রীত হইয়া, রাজা ও রাজকুমার উভয়েই এই ভাবের কবিতা রচনা করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়া থাকিবেন। মোটের উপর, আমরা শ্রীধরদাসের নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি এই শ্লোক দুইটি তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধার করিয়া না দিলে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন ও যুবরাজ কেশবসেনের সহিত জয়দেবের এই সাহিত্যিক সংযোগের কথা জানিতে পারিতাম না; এবং এই দুই শ্লোকের দ্বারা "নন্দ-নিদেশতঃ" সমস্তপদটির সহজ সরল অর্থ-ই সমর্থিত হইতেছে, পরবর্তী সাম্প্রদায়িক অর্থ-কল্পনা নহে।

জয়দেবের রচিত শ্লোকগুলি 'সদুক্তিকর্ণামৃত' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এগুলিতে জয়দেবের কবি-প্রতিভার কতকগুলি অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত দিক্ প্রকাশিত হইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[১] ১।৪।৪। মহাদেব ॥

ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্-
ললাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্।
বিস্তীর্ণাঘোরবক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্
বিশ্বং শশ্বদ্ বিতন্বন্ বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ ॥

[২] ১।৫০।৩। কল্কী ॥

কল্কী কল্কং হরতু জগতঃ স্ফূর্জদূর্জস্বিতেজা
বেদোচ্ছেদস্ফুরিতদুরিতধ্বংসনে ধূমকেতুঃ।
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধূমবৎ কল্মষেচ্ছান্
ম্লেচ্ছান্ হত্বা দলিতকলিনাকারি সত্যাবতারঃ ॥

[৩] ১।৫৯।৪। কৃষ্ণভুজ: ॥

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ [=গীতগোবিন্দ ১১।৩৪] ॥

[৪] ১।৬০।৫ গোবর্ধনোদ্ধারঃ ॥

"মুগ্ধে !" "নাথ, কিমাত্থ ?" "তন্বি, শিখরিপ্রাগ্‌ভারভুগ্নো ভুজঃ" ;
"সাহায্যং, প্রিয় ! কিং ভজামি ?" "সুভগে, দোর্বল্লিমায়াসয়।"
—ইত্যুল্লাসিতবাহুমূলবিচলচ্‌চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

[এই শ্লোকের সহিত উমাপতিধর-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয় —এটি সদুক্তিকর্ণামৃতের ১।৫৫।৩ সংখ্যক শ্লোক, বিষয়, "হরিক্রীড়া" ; 'পদ্যাবলী'-তেও এটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সংখ্যা ২৫৯ :—

ভ্রূবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

—উভয় শ্লোকের শেষ ছত্র দুইটি তুলনীয় ; "পতিতাঃ—চলিতাঃ"—এই দুইটি পদের যে কোনও একটি ধরিতে পারা যায় ; সমস্যাপূর্তির শ্লোক হিসাবে শেষ ছত্রের আধারে এই দুই সভাকবি নিজ নিজ শ্লোক রচিয়া থাকিবেন।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[৫] ১।৮৫।৫। বহুরূপকশ্চন্দ্রঃ ॥

ক্রীড়াকর্পূরদীপস্ত্রিদশমৃগদৃশাং কামসাম্রাজ্যলক্ষ্মী-
প্রোৎক্ষিপ্তৈকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্।
কস্তূরীপঙ্কমুদ্রাঙ্কিতমদনবধূমুগ্ধগণ্ডোপধানং
দ্বীপং ব্যোমাম্বুরাশেঃ স্ফুরতি সুরপুরীকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ ॥

[৬] ২।৩৭।৪। বাসকসজ্জা ॥

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ [=গীতগোবিন্দ ৫।১১] ॥

[৭] ২।৭২।৪। অধরঃ ॥

বিভাতি বিম্বাধরবল্লিরস্যাঃ স্মরস্য বন্ধুকধনুর্লতেব।
বিনাপি রাগেণ গুণেন যেয়ং যূনাং মনাংসি প্রসভং ভিনত্তি ॥

[৮] রোমাবলী ॥

হরতি রতিপতের্নিতম্ববিম্বস্তনতটচংক্রমসংক্রমস্য লক্ষ্মীম্।
ত্রিবলিভবতরঙ্গনিম্ননাভীহ্রদপদবীমধিরোমরাজিরস্যাঃ ॥

[৯] ২।১৩২।৪। রতারম্ভঃ ॥*

উন্মীলৎপুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমিষেণ চ [=গীতগোবিন্দ ১২।১০] ॥

[১০] ২।১৩৪।৪। বিপরীতরতম্ ॥

মারাঙ্কে রতিকেলি ইত্যাদি [=গীতগোবিন্দ ১২।১২] ॥

[১১] ২।১৩৭।৫। উষসি প্রিয়াদর্শনম্ ॥

অস্যাঃ [তস্যাঃ] পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো [=গীতগোবিন্দ ১২।১৪] ॥

[১২] ২।১৭০।৫ শরৎখঞ্জনঃ ॥

মধুরমধুরং কূজন্নগ্রে পতন্ মুহুরুৎপতন্
অবিরতচলৎপুচ্ছঃ স্বেচ্ছং বিচুম্ব্য চিরং প্রিয়াম্।
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধূয় মিলন্ মুদা
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্জুস্থলীমধি খঞ্জনঃ ॥

* এই শ্লোকটি যে 'গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত, তাহা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[১৩] ৩।৫।৪। ধর্মঃ ॥

যূপৈরুৎকটকণ্টকৈরিব মখপ্রোদ্ভূতধূমোদ্গমৈর্
অপ্যন্ধংকরণৌষধৈরিব পদে নেত্রে চ জাতব্যথৈঃ।
যস্মিন্ ধর্মপরে প্রশাসতি তপঃসংভেদিনীং মেদিনীম্
আস্তামাক্রমিতুং বিলোকিতুমপি ব্যক্তং ন শক্তঃ কলিঃ ॥

[১৪] ৩।৯।৪। করঃ ॥

তেষামল্পতরঃ স কল্পবিটপী তেষাং ন চিন্তামণিশ্
চিন্তামপ্যুপয়াতি কামসুরভিস্তেষাং ন কামাস্পদম্।
দীনোদ্ধারধুরীণপুণ্যচরিতো যেষাং প্রসন্নো মনাক্
পাণিস্তে ধরণীন্দ্র সুন্দরযশঃ-সংরক্ষিণো দক্ষিণঃ ॥

[১৫] ৩।৯।৫। করঃ ॥

দেব ত্বৎকরপল্লবো বিজয়তামশ্রান্তবিশ্রাণন-
ক্রীড়াস্পন্দিতকল্পবৃক্ষবিভবঃ কীর্তিপ্রসূনোজ্জ্বলঃ।
যস্যোৎসর্গজলচ্ছলেন গলিতাঃ স্যন্দানদানোদক-
স্রোতোভির্বিদুষাং ললাটলিখিতা দৈন্যাক্ষরশ্রেণয়ঃ ॥

[১৬] ৩।১০।৪। চরণঃ ॥

লক্ষ্মীবিভ্রমপদ্মসুভগং কে নাম নোর্বীভুজো
দেব ত্বচ্চরণং ব্রজন্তি শরণং শ্রীরক্ষণাকাঙ্ক্ষিণঃ।
ছায়ায়ামনুগম্য সম্যগভয়াস্তদ্বীর্য্যসূর্য্যাতপ-
ব্যাপ্তামপ্যবনীমটন্তি রিপবস্ত্যক্তাতপত্রাঃ সুখম্ ॥

[১৭] ৩।১১।৫। প্রিয়াবাখ্যানম্ ॥ (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি) ॥

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ ! জঙ্গমহরে ! সংকল্পকল্পদ্রুম !
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ ! সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় ! বঙ্গপ্রিয় !
গৌড়েন্দ্র ! প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কর্ণার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল ! পালক সতাং ! দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম্ ॥

[১৮] ৩।১৫।৫। দেশাশ্রয়ঃ ॥ (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি) ॥

"ত্বং চোলোল্লোললীলাং কলয়সি, কুরুষে কর্ষণং কুন্তলানাং ;
ত্বং কাঞ্চিন্যঞ্চনায় প্রভবসি ! রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—ইত্থং রাজেন্দ্র! বন্দিস্তুতিভিরুপহিতোৎকম্পমেবাদ্য দীর্ঘং
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায় ॥

[১৯] ৩।১৯।৫। বিক্রমঃ ॥

শিক্ষন্তে চাটুবাদান্ বিদধতি যবসাননে কাননেষু
ভ্রাম্যন্তি জ্যাকিণাঙ্কং বিদধতি শিবিরং কুর্বতে পর্বতেষু।
অভ্যস্যন্তি প্রণামং ত্বয়ি চলতি চমূচক্রবিক্রান্তিভাজি
প্রাণত্রাণায় দেব! ত্বদরিনৃপতয়শ্চক্রিরে কার্মণানি ॥

[২০] ৩।২০।৫। পৌরুষম্ ॥

ভীষ্মঃ ক্লীবকতাং দধার, সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুর্,
মিথ্যা ধর্মসুতেন জল্পিতমভূদ, দুর্যোধনো দুর্মদঃ।
ছিদ্রেষ্বেব ধনঞ্জয়স্য বিজয়ঃ, কর্ণঃ প্রমাদী ততঃ;
শ্রীমন্নস্তি ন ভারতেঽপি ভবতো যঃ পৌরুষৈরধর্ষতে ॥

[২১] ৩।২৩।৫। তেজঃ ॥

একং ধাম শমীষু লীনমপরং সূর্য্যোৎপলজ্যোতিষাং
ব্যাজাদদ্রিষু গূঢ়মন্যদুদধৌ সংগুপ্তমৌর্বায়তে।
ত্বত্তেজস্তপনাংশুমাংসলসমুত্তাপেন দুর্গং ভয়াদ্
বার্ক্ষং পার্বতমৌদকং যদি যযুস্তেজাংসি কিং পার্থিবাঃ ॥

[২২] ৩।২৯।৫। আশ্চর্য্যখড়্গাঃ ॥

শ্রীখণ্ডমূর্তিঃ সরলাঙ্গযষ্টির্মাকন্দমামূলমহো বহন্তী।
শ্রীমন্! ভবৎখড়্গতমালবল্লী চিত্রং রণে শ্রীফলমাতনোতি ॥

[২৩] ৩।৩৪।৩। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥

গুঞ্জৎ ক্রৌঞ্চনিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরাঃ
প্রাক্প্রত্যগ্ধরণীন্দ্রকন্দরজরৎপারীন্দ্রনিদ্রাদ্রুহঃ।
লঙ্কাঙ্কত্রিককুৎপ্রতিধ্বনিঘনাঃ পর্য্যন্তযাত্রাজয়ে
যস্য ভেমুরমন্দমন্দররবৈরাশারুধো ঘোষণাঃ ॥

[২৪] ৩।৩৪।৪। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥ (অনুপ্রাস লক্ষণীয়) ॥

যস্যাবির্ভূতভীতিপ্রতিভটপৃতনাগর্ভিণীভ্রূণভার-
ভ্রংশভ্রেশাভিভূত্যৈ প্লবনমিব ভজন্নম্ভসাম্ভোনিধীনাম্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংভারং সংভ্রমস্য ত্রিভুবনমভিতো ভূভৃতাং বিভ্রদুচ্চৈঃ
সংরম্ভোজ্জৃম্ভণায় প্রতিরণমভবদ্ ভূবিভেরীনিনাদঃ ॥

[২৫] ৩।৩৪।৫। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥

বিঘট্টয়ন্নেষ হঠাদকুণ্ঠবৈকুণ্ঠকণ্ঠীরবকণ্ঠগর্জাম্ ।
ভয়ংকরো দিক্করিণাং রণাগ্রে ভেরীরবো ভৈরবদুঃশ্রবস্তে ॥

[২৬] ৩।৩৮।৩ যুদ্ধম ॥

শত্রূণাং কালরাত্রৌ সমিতি সমুদিতে বাণবর্ষান্ধকারে
প্রাগ্ভারে খড়্গধারাং সবিতমিব সমুত্তীর্য্য মগ্নাবিবংশাম্ ।
অন্যোন্যাঘাতমত্তদ্বিরদঘনঘটাদন্তবিদ্যুচ্ছটাভিঃ
পশ্যন্তীয়ং সমন্তাদভিসরতি মুদা সাংযুগীনং জয়শ্রীঃ ॥

[২৭] ৩।৩৯।৪। যুদ্ধস্থলী ॥

নির্যন্নারাচধারাচয়খচিতপতন্মত্তমাতঙ্গজাতং
জাতং যস্যারিসেনাকধিবজলনিধাবন্তরীপভ্রমায় ।
সুপ্তা যস্মিন্ রতান্তে সহ চ সহচরৈর্নালবন্নাগনাসা-
রন্ধ্রদ্বন্দ্বৈকপাত্রে রুধিরমধুরসং প্রেতকান্তাঃ পিবন্তি ॥

[২৮] ৩।৪০।৫। দিগ্বিজয়ঃ ॥

একঃ সংগ্রামরঙ্গত্তুরগখুরবজোরাজিভিনষ্টদৃষ্টির্
দিগ্যাত্রাক্লৈত্রমত্তদ্বিরদভরণমদ্ভূমিভগ্নস্তথান্যঃ ।
বীরাঃ কে নাম তস্মাৎ ত্রিজগতি ন বয়ং ক্ষীণতাং কাণকুব্জ-
ন্যায়াদ্ এতেন মুক্তাবভয়মভজতাং বাসবো বাসুকিশ্চ ॥

[২৯] ৩।৫২।৫। প্রশস্তকীর্তিঃ ॥

মলিনয়তি বৈরিবদনং সুজনং বঞ্চয়তি ধবলয়তি ধাত্রীম্ ।
অপি কুসুমবিশদমূর্তির্যৎকীর্তিশ্চিত্রমাচরতি ॥

[৩০] ৫।১৬।৪। দিশঃ ॥

অস্তু স্বস্ত্যয়নায় দিগ্ধনপতেঃ কৈলাসশৈলাশ্রয়-
শ্রীকণ্ঠাভরণেন্দুবিভ্রমদিবানক্তং ভ্রমৎকৌমুদী ।
যত্রালং নলকূবরাভিসরণারম্ভায় রম্ভাস্ফুটৎ-
পাণ্ডিম্নেব তনোত্তনোতি বিবহব্যগ্রাপি বেশগ্রহম্ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[৩১] ৫।১৮।২। বীরঃ ॥

ধাত্রীমেকাতপত্রাং সমিতি কৃতবতা চণ্ডদোর্দণ্ডদর্পাদ্
আস্থানে পাদনম্রপ্রতিভটমুকুটাদর্শবিম্বোদরেষু।
উৎক্ষিপ্তচ্ছত্রচিহ্নং প্রতিফলিতমপি স্বং বপুর্বীক্ষ্য কিঞ্চিৎ
সাসূয়ং যেন দৃষ্টাঃ ক্ষিতিতলবিলসন্ মৌলয়ো ভূমিপালাঃ ॥

জয়দেব যে কেবল শৃঙ্গার-রসের কবি ছিলেন না, অন্য রসও তাঁহার কাব্য-সরস্বতীর দ্বারা পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা উপরের শ্লোক কয়টি হইতে সুপরিস্ফুট হয়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-ধৃত ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি 'গীতগোবিন্দ' কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিষয়-বস্তুর বিচার করিলে এইরূপ অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, জয়দেব অন্যান দুইখানি অন্য কাব্য লিখিয়া থাকিতেও পারেন—একখানি 'গীতগোবিন্দ'র-ই মতো শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক (উপরের ২, ৭, ৮ ও ১২ সংখ্যার শ্লোকগুলির বিষয়-বস্তু বিচার্য), এবং অপরখানি সম্ভবতঃ মহারাজ শ্রীলক্ষ্মণসেন-দেবের প্রশস্তি-বিষয়ক (উপরের ১৩—৩১ সংখ্যক শ্লোকগুলি এই দ্বিতীয় কাব্য হইয়া থাকিতে পারে)। লক্ষ্মণসেনের বীরত্বের খ্যাতি ছিল, যুদ্ধের জন্য তিনি দক্ষিণ-দেশেও গিয়াছিলেন, ধোয়ী-কবির 'পবন-দূত' কাব্যে এই দক্ষিণ-অভিযানের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, ধোয়ীর ন্যায়, কিন্তু একটু অন্য ভাবে, সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া, সভাকবিদের মধ্যে অন্যতম জয়দেব-ও, পৃষ্ঠপোষক রাজার গুণগান করিয়া থাকিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, অন্য কবিতাগুলি (১, ৪, ৫, এবং সম্ভবতঃ ১২ ও ১৩) জয়দেবের প্রকীর্ণ শ্লোক-রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীধরদাসের জীবৎকালে জয়দেবের বিশেষ প্রতিষ্ঠা না হইয়া থাকিলে, তাঁহার লেখা এতগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া দিতেন না। ধোয়ীর 'পবন-দূত' হইতেও তিনি দুইটি শ্লোক দিয়াছেন।

শ্রীজয়দেবের কবি খ্যাতি অতি শীঘ্রই সমগ্র ভারত-খণ্ডে বিস্তৃত হয়। অনুমান হয়, তাঁহার 'গীতগোবিন্দ', ঐ যুগের সংস্কৃত-ভাষার কবি, এবং উদীয়মান আধুনিক-ভাষাগুলির কবি, উভয় দলেরই প্রিয় হইয়াছিল, কারণ ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত রচনাশৈলীর সঙ্গে অপভ্রংশ এবং নবোদ্ভূত ভাষা রচনাশৈলী, এই উভয়ের গঙ্গা-যমুনা-সংগম ঘটিয়াছিল। একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে দেবকাহিনী ও প্রেমগাথা ভক্তিমার্গের সাধন-রূপে হিন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাংস্কৃতিক জাগরণের সেবায় মিলিত হয়। 'গীতগোবিন্দ'-রচনার শতবর্ষ-মধ্যে সুদূর গুজরাটে পাটন বা অণহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত সংবৎ ১৩৪৮ (অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১২৯২) তারিখের এক সংস্কৃত লেখের মঙ্গলাচরণ শ্লোক-রূপে ইহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল (মনোমোহন চক্রবর্তী-লিখিত পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় যেমন, তেমনি গুজরাট ও রাজপুতানায়, এবং উত্তর-পঞ্জাবের গিরিদেশে ও উত্তর-ভারতের বিশাল সমতল ভূভাগে, সর্বত্র 'গীতগোবিন্দ' জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে। 'গীতগোবিন্দ' হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাংশ ও বাক্যাংশ এবং উহার ভাব ও আশয় প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা উড়িয়া হিন্দী ও গুজরাটী কাব্যে ও কবিতায় প্রযুক্ত হইতে থাকে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান কবি, এবং তুর্কী-বিজয়ের পরে সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশের প্রথম বড়ো কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (? আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গীতগোবিন্দের দুইটি সংগীতের অনুবাদ দিয়াছেন, এবং বহু স্থানে তাঁহার রচনাতে গীত-গোবিন্দের ছায়া পড়িয়াছে। সুপরিচিত প্রাচীন গুজরাটী কাব্য 'বসন্ত-বিলাস' (এক মতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, অন্য মতে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে) পাঠে দেখা যায়, ইহাতেও বহু স্থলে গীতগোবিন্দের ভাব পরিস্ফুট, এবং ভাষাও অনুকৃত বা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের প্রায় ৩৭খানি বিভিন্ন টীকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রচিত হইয়াছিল, মেবাড়-পতি মহারাণা কুম্ভের নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' টীকাখানি এগুলির মধ্যে একখানি প্রাচীন টীকা (মহারাণার রাজ্যকাল, ১৪৩৩-১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দ); গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষার অন্যতম বহুলটীকাময় গ্রন্থ। অন্ততঃ খান বারো বিভিন্ন সংস্কৃত-কাব্য গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হয়; ইহা ভিন্ন গীতগোবিন্দের ধরনে লিখিত ভাষা-কাব্যও কতকগুলি আছে। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে খ্রীষ্টীয় ১৪৯৯ অব্দে উৎকীর্ণ একটি উড়িয়া লেখ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞানুসারে ঐ সময় হইতে 'গীতগোবিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনও রচনা হইতে শ্লোক ও গান পুরীর মন্দিরে দেবদাসী ও অন্য গায়কগণ কর্তৃক গীত হওয়া নিষিদ্ধ হয়। (দ্রষ্টব্য, মনোমোহন চক্রবর্তী-লিখিত প্রবন্ধ, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893, পৃঃ ৯৬-৯৭)। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের চিত্র-শিল্পে, বিষয়-বস্তু হিসাবে গীতগোবিন্দের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের "অপভ্রংশ" (অথবা তথাকথিত "প্রাচীন গুজরাটী")

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং "প্রাচীন-হিন্দী" (অথবা "প্রাচীন-রাজপুত") শিল্পে, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড, বসোহলী, কাঙ্গড়া প্রভৃতি স্থানের "অর্বাচীন-হিন্দী" চিত্ররীতিতে, ও উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা দেশ, নেপাল ও অন্ধ্রদেশের চিত্র-রীতিতে, গীতগোবিন্দের অনুসারী রাধাকৃষ্ণ-লীলার ছবি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পরবর্তী যুগের অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্য এই উভয়ের ধারা মিলিত হইয়াছে। এই কাব্যের ১২টি সর্গে ২৪টি 'পদ' বা গান গ্রথিত হইয়াছে। কাব্যের বর্ণনামূলক অংশ, প্রাচীন ধারার সংস্কৃত কবিতায় লেখা; ভাবে, ভাষায়, শব্দাবলীতে এই অংশগুলি অতীতের রীতি বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু পদ বা গানগুলিতে যে বাতাবরণ পাই, তাহা হইতেছে অপভ্রংশ ও ভাষা সাহিত্যের। পদগুলির ছন্দ, সংস্কৃতের অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ নহে—অপভ্রংশ ও ভাষার মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ; এবং অপভ্রংশ ও ভাষা কবিতার মতো, ছত্রের অন্ত্য ও আভ্যন্তর অক্ষরের মিল ইহার প্রাণ। একাধিক পণ্ডিত এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতগোবিন্দের পদগুলি মূলতঃ সংস্কৃতে রচিত হয় নাই, এগুলি রচিত হইয়াছিল হয় অপভ্রংশে না হয় প্রাচীন যুগের নব্য-আর্য্য ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় (Lassen লাসেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের এই মত)। ইহা অসম্ভব নয় যে, জয়দেব এই গানগুলি প্রথম অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচনা করেন, পরে এগুলি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়, ইহাতে জয়দেব স্বয়ং এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দেন, এবং এইভাবে এগুলিকে নিখিল ভারতের আস্বাদনের উপযোগী করিয়া ও চিরন্তন করিয়া দেন। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, এইরূপ মতবাদ কেবল অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত মাত্র, ইহা প্রমাণিত সত্য নহে। অনুমানের স্বপক্ষে এই চারিটি বস্তু বিচার্য্য :—

(১) পদগুলির ধরণ—এগুলির রচনাশৈলী অপভ্রংশ ও ভাষাপদের অনুরূপ, সংস্কৃত কবিতার অনুরূপ নহে। অপভ্রংশানুকারিতা সর্বজন-স্বীকৃত।

(২) জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদের অনুরূপ সমসাময়িক বহু অপভ্রংশ ও প্রাচীন নব্য-আর্য্য ভাষার গীত বা পদের অস্তিত্ব (যেমন 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' ও 'মানসোল্লাস' অথবা 'অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে)।

(৩) গীতগোবিন্দের কতকগুলি পদের দুই চারিটি করিয়া ছত্র যদি সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশে রূপান্তরিত করিয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে সেগুলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছন্দের গতি আরও সাবলীল হয়। অপভ্রংশ বা পুরাতন বাঙ্গালা রূপে ভাঙ্গিয়া লইয়া এগুলিকে পাঠ করিলে, প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত ছন্দ বিষয়ে চমৎকার মিল দেখা যায়। (যেমন ৫ সংখ্যক পদে—"স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্", এই ছত্রটিকে অপভ্রংশ করিয়া "সুমরই। মণ মর্। কিঅ-পরিহাসং" রূপে পড়িলেই, নিখুঁত পয়ারের মতো অক্ষরের সমাবেশ যুক্ত ছত্র পাওয়া যায়, যথা : ⏑ ⏑ ⏑ ⏑। ⏑ ⏑ ⏑ ⏑॥ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑। — —॥; "শ্রীজয়দেব-কবেরিদং। কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি"—২-এর পদের এই ছত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে একটি করিয়া মাত্রা বেশী আছে, যদি "ইদং" ও "মুদং"-কে অপভ্রংশ-মতে "ইদঁ" ও "মুদঁ" পড়া যায়, তাহা হইলে ছন্দো-দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। এই-সমস্ত ছন্দের বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া ও ভোজপুরী-মগহী-মৈথিল প্রতিরূপ আছে, কিন্তু এগুলির প্রতিরূপ বা অনুরূপ ছন্দ প্রাচীন সংস্কৃতে নাই।

(৪) শেষ বিচার্য, 'গীতগোবিন্দ' বইখানি কাব্য হইলেও, ইহার মধ্যে নাটকীয় অংশ বিদ্যমান। পদগুলি রাধার সখীদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের গীত, যেন এগুলি নাটকে তাঁদেরই উক্তি-প্রত্যুক্তি। আমাদের যাত্রা-গানের উদ্ভবে 'গীতগোবিন্দ'-জাতীয় রচনার একটা বড়ো স্থান ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই; এই যাত্রা-গানেরই পূর্ব রূপ হইতেছে মধ্য-বাঙ্গালার পালা-গান; ইহাতে একাধারে বর্ণনাত্মক অংশ ও পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন থাকে (পালা-গানে মূল গায়েন ও তাঁহার দোহারেরা নাটকীয় আলাপ অংশ চালাইতেন)। অপর পক্ষে, 'গীতগোবিন্দ' মিথিলাতে প্রচলিত এক ধরনের নাটকের ধারার সঙ্গেও বিজড়িত বলিয়া মনে হয়—এইরূপ নাটকে সংস্কৃত বা প্রাকৃত গদ্যে পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে, সংস্কৃত নাটকে যেখানে বিভিন্ন ছন্দে সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়, সেখানে দেশভাষা মৈথিলে পদ বা গান থাকে। স্যর্ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়র্সন্ সাহেব এইরূপ কতকগুলি নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 'পারিজাত-হরণ' নামে উমাপতি উপাধ্যায় কর্তৃক ১৪শ শতকে রচিত একখানি নাটক তিনি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত-ও করিয়াছেন। এইরূপ নাটক-রচনার ধারা মিথিলা (এবং বঙ্গদেশ) হইতে নেপালে প্রসারিত হয়, এবং সতেরর শতক হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি এইরূপ নাটক নেপালে পাওয়া গিয়াছে—এই-সব নাটকে গদ্য অংশ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাঙ্গালা বা মৈথিলে (সংস্কৃতের পরিবর্তে), এবং পদ্যশ্লোকের স্থানে মৈথিল বা কোসলীতে (অথবা পুবী-হিন্দীতে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পদ বা গান আছে, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্য্য-কলাপ (প্রবেশ, নির্গমন, উপবেশন ইত্যাদি)' পূর্ব-নেপালের প্রাচীন ভাষা, ভোট-ব্রহ্ম শাখার অনার্য্য মোঙ্গোলীয় ভাষা নেরারী বা নেওয়ারীতে লিপি-বদ্ধ আছে। এই-সব নাটক দেখিয়া অনুমান হয়, হয়-তো 'গীতগোবিন্দ' ভাষায় বা অপভ্রংশে (সংস্কৃতেতর লঘু ভাষাতে) নিবদ্ধ কথোপকথনাত্মক পদ বা গান এবং সংস্কৃতে নিবদ্ধ বর্ণনাত্মক অংশ লইয়া গঠিত গীতি-নাট্যের একটি ধারার অন্তর্গত ছিল, যে ধারা পূর্ব-ভারতে বিশেষ করিয়া প্রচলিত ছিল। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বর্ণনাত্মক অংশ আছে, কথোপকথন-ও আছে। এই কথোপকথনে দুই বা তিন পাত্রপাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি বা কথা-কাটাকাটি পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে এইরূপ নব্য-আর্য্য ভাষার বা অপভ্রংশের পদকে সংস্কৃত ভাষায় আনিয়া ইহার আকৃতি একটু বদলাইয়া দেওয়া হয় মাত্র; কিন্তু এই পরিবর্তিত আকারে ইহার প্রসার ও প্রভাব আরও ব্যাপক হইয়া পড়ে। রামানন্দ রায় কর্তৃক এই সংস্কৃতময় গীতগোবিন্দের অনুকরণে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামে সংগীত-নাটক রচিত হইয়াছিল। ভাষা (বা অপভ্রংশে) পদময় "সংগীত-নাটক" বা কাব্য-নাট্যের ধারা বিচার করিলে, 'গীতগোবিন্দ'কে ঐ পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

জয়দেব-রচিত বীররসাত্মক অন্য সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে অনুমানের অনুকূলে প্রমাণ যে আছে, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-ধৃত শ্লোকাবলী হইতে তাহা দেখা যায়। সেরূপ কোনও কাব্য থাকিলে, তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জয়দেব ক্রমে-ক্রমে বৈষ্ণব সাধক ও ভক্তগণের পর্য্যায়ে নীত হইলেন, তাঁহার গীতগোবিন্দের কল্যাণে। 'গীতগোবিন্দ' কার ভক্ত জয়দেব ভাষাতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন, এই ধারণা উত্তর-ভারতের সন্ত বা ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবে জয়দেব উত্তর-ভারতের প্রধান ভক্ত ও সাধুদের মধ্যে পরিগণিত হন। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু শ্রীগুরু অর্জুনদেব মধ্য-যুগের উত্তর-ভারতের ভক্তগণের পদ-সংগ্রহের ঋগ্বেদ-স্বরূপ 'শ্রীগুরু-গ্রন্থ' বা 'শ্রী-আদি-গ্রন্থ' বা 'শ্রীগ্রন্থ-সাহেব' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে যখন সংকলিত করেন, তখন তিনি সাধকদের পদ (তাঁহার পূর্বগামী চারিজন শিখ গুরু ও তাঁহার নিজের রচিত ভিন্ন) যাহা হাতের কাছে পান, তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। সন্ত কবীরের বহু পদ এই ভাবে গুরু-গ্রন্থে গৃহীত হয়; রবিদাস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবা ফরীদ, রামানন্দ, মহারাষ্ট্রের ভক্ত নামদেব, এবং বাঙ্গালার জয়দেব,—অন্য কয়জন ভক্তের পদের সঙ্গে-সঙ্গে ইঁহাদেরও পদ গুরু-গ্রন্থে স্থান পায়। জয়দেবের রচিত বলিয়া দুইটি পদ গুরু-গ্রন্থে আছে। এই দুইটির ভণিতায় জয়দেবের নাম আছে। পদ দুইটি যে 'গীতগোবিন্দ'-কার জয়দেবের রচিত, তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ নাই; তবে সেগুলি যে জয়দেবের নহে, সে পক্ষেও প্রমাণ নাই। শিখ গুরু-পরম্পরা অনুসারে গুরু-গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই দুই পদের রচয়িতা রূপে 'ভক্তমাল'-গ্রন্থ-বর্ণিত গীতগোবিন্দ-কার ভক্ত কবি জয়দেবকেই স্বীকার করা হয়। গ্রন্থ-সাহেবের জয়দেব ও গীতগোবিন্দের জয়দেব এক হইলে,—এবং এক বলিয়া মানিয়া লইতে কোনও অন্তরায় নাই—তাঁহাকে ভাষা-সাহিত্যের একজন আদি কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় (গীতগোবিন্দের পদ-কয়টির মূল ভাষার প্রশ্ন না ধরিলেও)।

গুরুগ্রন্থ-ধৃত পদ দুইটি "রাগ গুজরী" ও "রাগ মারু"-র অন্তর্গত। M. A. Macauliffe-রচিত শিখ-ধর্ম-বিষয়ক সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৫-১৭ পৃষ্ঠায় এই দুইটি পদের ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে এই পদ দুইটির বিচার করা যাইতেছে।

[১] শ্রীজৈদেব-জীউ-কা পদা (রাগ গুজরী)॥
পবমাদি পুরুখ মনোপিমং সতি আদি ভাব-রতং।
পরমদ্ভুতং পরক্রিতিপরং জদি চিন্তি সরব-গতং ॥১॥
রহাউ—
কেবল রামনাম মনোরমং বদি অম্রিত-তত-মঈঅং।
ন দনোতি জনমরণেন জনম-জরাধি-মরণ-ভইঅং॥
ইছসি জমাদি-পরাভয়ং জস্তু স্বসতি সুক্রিতি-ক্রিতং।
ভব-ভূত-ভাব সমব্যিঅং পরমং পরসন্নমিদং ॥২॥
লোভাদি-দ্রিসটি পরগ্রিহং জদি বিধি আচরণং।
তজি সকল দুহক্রিত দুরমতী ভজু চক্রধর-সরণং ॥৩॥
হরি-ভগত নিজ নিহকেবলা রিদ করমণা বচসা।
জোগেন কিং জগেন কিং দানেন কিং তপসা ॥৪॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপি নর সকল-সিধি-পদং।
জৈদেব আইউ তস সফুটং ভব ভূত-সরব-গতং ॥৫॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই পদটি E. Trumpp কর্তৃক ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে Munich ম্যুনিক নগরের বাভারীয় রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দর্শন-সাহিত্যেতিহাস শাখার কার্য্যবিবরণীতে জর্মান ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহার ভাষা বিকৃত সংস্কৃত, কেবল মাঝে-মাঝে (বিশেষতঃ শেষ শ্লোকে) ভাষা বা অপভ্রংশের শব্দ দুই চারিটি আছে। পদটি মূলে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া থাকিতে পারে, পরে ইহার সংস্কৃতীকরণের চেষ্টা হয়; এই সংস্কৃত রূপান্তরে যে বাঙ্গালাদেশের (অথবা পূর্ব-ভারতের) উচ্চারণ অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়। অসম্পূর্ণ গুরুমুখী বর্ণমালায় নীত হওয়ার কালে আরও বিকৃতি ঘটে। এই পদের সংস্কৃত ছায়া এইরূপ হইবে—

পরমাদিপুরুষম্ অনুপমং সদ্-আদি-ভাবরতম্।
পরমাদ্ভুতম্ প্রকৃতিপরং যদ্ (= যম্) অচিন্ত্যং সর্বগতম্ ॥ ১ ॥
রহাউ (= ধুয়া)—
কেবলং রামনাম মনোরমং বদ অমৃত-তত্ত্বময়ম্।
ন দুনোতি যৎস্মরণেন জন্ম-জরাধিমরণভয়ম্ ॥
ইচ্ছসি যমাদিপরাভবং, যশঃ, স্বস্তি, সুকৃত-কৃতং (= সুকৃতং কুরু ?)।
ভবভূত ভাব-সমব্যয়ম্ পরমম্ প্রসন্নম্ ইদম্ (অথবা
মিদ, মিদু = মুদু == মৃদু ? Trumpp-এর ব্যাখ্যা)।
লোভাদি-দৃষ্টি-পরগৃহং যদ্ অবিধি-আচরণম্।
ত্যজ সকল-দুষ্কৃতং দুর্মতিম্, ভজ চক্রধর-শরণম্ ॥
হরিভক্তিঃ নিজা নিষ্কেবলা—হৃদা কর্মণা বচসা।
যোগেন কিং, যজ্ঞেন কিং, দানেন কিং, [কিং] তপসা ॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপ, নর, সকল-সিদ্ধি-পদম্।
জয়দেবঃ আয়াতঃ তস্য স্ফুটম্—ভব-ভূত-সর্ব-গতম্ ॥

পদটির সাধারণ অর্থ গ্রহণে কোনও কঠিনতা নাই, যদিও ভাব ও ভাষা উভয়ের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য স্থলে-স্থলে বিদ্যমান। এই ভাব-সমূহের অসামঞ্জস্য এবং ভাষার আড়ষ্টতা দেখিয়া এই পদের মূল রূপকে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। ভাষা এখানে ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী নয়।

[২] বাণী জৈদেরজীউ-কী (রাগ মারূ) ॥

চন্দ সত ভেদিয়া নাদ সত পুরিয়া সূর সত খোডসা দত্তু কীয়া।
অচল বল তোড়িয়া অচল চল থপ্পিয়া অঘড ঘড়িয়া, তহা আপিউ পীয়া ॥১॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মন আদি গুণ আদি বখাণিয়া।
তেরী দুবিধা দ্রিস্‌টি সমানিয়া ॥ রহাউ ॥
অর্ধ-কৌ অরধিয়া সধি-কৌ সরধিয়া, সলল-কৌ সলিল সমানি আয়া।
বদতি জৈদেব জৈদেব-কৌ রমিয়া, ব্রহ্ম-নির্বাণ লিব লীণ পায়া ॥ ২ ॥

এই পদটির ভাষা ঠিক অপভ্রংশ নহে, ইহাকে মিশ্র-অপভ্রংশ ভাষা বলা যাইতে পারে; হয়-তো ইহা মূলে প্রাচীন বাঙ্গালা ছিল। এখানেও সংস্কৃত (অর্ধ-তৎসম) শব্দগুলির বানান, প্রাচ্য-ভারতের সংস্কৃত উচ্চারণের অনুসারী। E. Trumpp এই পদটির অনুবাদ করেন নাই—তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ-সাহেবের অনুবাদেও ইহা নাই। Macauliffe-এর অনুবাদ ও ভাঈ বিসন সিংহ গ্যানী রচিত পাঞ্জাবী ভাষা টীকা "ভগত-বানী" অনুসরণ করিয়া এই পদের বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

চন্দ্রকে (অর্থাৎ ঈড়া বা বাম নাসারন্ধ্রকে) সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা ভেদ করিয়াছি [অর্থাৎ আমি প্রাণায়ামের পূরক করিয়াছি], সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা নাদ (অর্থাৎ সুষুম্না, অর্থাৎ নাসিকার ভিতর দুই নাসারন্ধ্রের উপরিভাগের মধ্যস্থ স্থান) পূরিয়াছি। অর্থাৎ কুম্ভক-যোগ করিয়াছি]; সত্ত্ব বা প্রাণবায়ুকে সূর (অর্থাৎ সূর্য্য, বা পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র) দ্বারা আমি বাহির করিয়া দিয়াছি ("দত্তু কীয়া"=দত্ত করিয়াছি) [অর্থাৎ আমি রেচক দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ণ করিয়াছি]—ষোল বার ("খোডসা", অর্থাৎ প্রত্যেক পূরক, কুম্ভক ও রেচক কালে ষোড়শ বার প্রণব বা ওঁ-কার উচ্চারণ করিয়া এইভাবে প্রাণায়াম করিয়াছি)।

অবল বা বলহীন (যে এই ভঙ্গুর দেহপিণ্ড), ইহার বল ভগ্ন করা হইয়াছে ("তোডিয়া"=তোড়া হইয়াছে), চল অর্থাৎ চঞ্চল (যে মন, তাহাকে) অচলে (অর্থাৎ অব্যয় ব্রহ্মে) স্থাপিত করা হইয়াছে; অঘটিত (মন)-কে ঘটিত বা সুগঠিত করা হইয়াছে; তদনন্তর অমৃত (আপিউ=অপ্পিউ=অব্বিউ=অম্বিউ=অম্ব্রিঅ=অম্ব্রিত=অম্রিত=অমৃত) পীত হইয়াছে ॥ ১ ॥

(যে ব্রহ্ম) মনেরও আদিতে, এবং (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন) গুণেরও আদিতে, অহার ব্যাখান করিয়াছি। তোমার দ্বিবিধা দৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ দর্শন) অবলুপ্ত হইয়াছে (সমানিয়া=সামাইয়া গিয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে) ॥ ধুয়া ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরাধ্যকে আরাধিত করা হইয়াছে ; শ্রদ্ধীকে (বা শ্রদ্ধার পাত্রকে) শ্রদ্ধা করা হইয়াছে, সলিলকে সলিলে প্রবেশ করানো হইয়াছে (সামানো হইয়াছে)। জয়দেব বলে—জয়যুক্ত দেবে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) রমণ করা হইয়াছে ; ব্রহ্মনির্বাণ লইয়া ("লিব"), আমি লীন পাইয়াছি (=লীন হইয়া গিয়াছি) ॥ ২ ॥

জয়দেবের এই "বাণী" বা ভাষা-পদটি হইতেছে যোগমার্গের পদ—খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর ওদিকে এবং এদিকে সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, এই যোগ-সাধনের কথায় ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক কথার সাহিত্য, ভরপুর। ধর্ম-সাধনার পথে, ভক্তি-মার্গ ও যোগ-মার্গ এই দুই পথ অপক্ষপাতের সহিত প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল, খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পুব হইতেই যোগ-সাধনের কথা—ঈডা পিঙ্গলা সুষুম্না, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মলীন হওয়ার কথা, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ধর্মমতের কথা। যোগ-মার্গেব কথা ওদিকে যেমন মহাযান বৌদ্ধমতেব সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যেব মধ্যে পরিব্যাপ্ত (প্রাচীন বাঙ্গালা 'চর্যাপদ' হইতে ইহা দেখা যায়), তেমনি এদিকে নাথ-পন্থ প্রভৃতি শৈব-সম্প্রদায়ে, কবীব-প্রমুখ সন্ত বা নবীন মতের সাধুদের সম্প্রদায়ে, শিখ সম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবাদি ভক্তিবাদী অন্য সম্প্রদায়েও অল্প-বিস্তব প্রবল-ভাবে বিদ্যমান। জয়দেব, পববর্তী কালের রামাওতী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধবনেব বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি সম্ভবতঃ পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ-ই ছিলেন। তাহাব বচিত পদে পূবক-কুম্ভক-রেচক সাধন ও ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করার কথা থাকা কিছু বিচিত্র নহে।

উত্তব-ভাবতের ভাষা-সাহিত্যের উপব জয়দেব সাধাবণ ভাবে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিশেষ ভাবে তাহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা এবং প্রাণ-দাতা বলিতে পারা যায়। জয়দেব বাঙ্গালার আদি কবি চর্যাপদ-রচয়িতা বৌদ্ধ কবিদের সমসাময়িক ছিলেন। গীতগোবিন্দেব গানগুলিকে উক্ত গ্রন্থে "গীত" বলা হইয়াছে, অন্যত্র এগুলি "পদ" নামে প্রচলিত। শিখদের আদি-গ্রন্থেও জয়দেবের একটি গানকে "পদা" অর্থাৎ "পদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে. জয়দেব নিজেও এগুলিকে "পদ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—"মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্", 'গীতগোবিন্দ', ১।৩। উপস্থিত সংস্কৃত-ভাষা-গ্রথিত রূপে এই গীত বা পদগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মিলিলেও, বৌদ্ধ চর্য্যাপদের মতো গীতগোবিন্দের এই পদগুলিকেও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আদিতে স্থান দিতে হয়। জয়দেবোত্তর মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি মুখ্য ধারা দেখিতে পাওয়া যায়; একটি, কথাত্মক কাব্যের ধারা, ইহাতে কোনও দেবতা বা অবতার অথবা ঐতিহাসিক বা অন্যবিধ মহাপুরুষের কাহিনী বা জীবনী বিবৃত থাকে; এই প্রকার কথাত্মক কাব্যকে "মঙ্গল-কাব্য" বা "মঙ্গল" বলা হইত। মঙ্গল-কাব্যে নিখিল-ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা বা অবতারকে লইয়া কথা রচিত হইত—যেমন শিব, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র; অথবা কেবল গৌড়-বঙ্গে প্রসিদ্ধ দেবতা বা পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইত—যেমন ধর্মঠাকুর ও লাউসেন, মনসা ও চাঁদ সদাগর এবং লখিন্দর-বেহুলা, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর, কালকেতু ব্যাধ ও ফুল্লরা; অথবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও ক্বচিৎ অন্য সম্প্রদায়ের পূত-চরিত্র সাধক বা ভক্তের জীবনী লইয়া রচিত হইত। দ্বিতীয় ধারাটি গীতাত্মক; এই ধারায় পাওয়া যায় কেবল ধর্ম-সম্বন্ধীয় অথবা ধর্মাশ্রয়ী বা লীলাশ্রয়ী শৃঙ্গার রসের, কিংবা পার্থিব প্রেমের গান; এই গানের ধারাকে "পদ" বলা হইত। বৌদ্ধ চর্য্যাপদ, বৈষ্ণব মহাজন-পদ, সহজিয়া পদ, দেহতত্ত্বের গান, রামপ্রসাদ-প্রমুখ শাক্ত সাধকদের পদ, শ্যামাসংগীত, বাউলের গান, মুসলমান মারফতী গান, প্রভৃতি বাঙ্গালা-সাহিত্যের গীতির বিভিন্ন ধারা, এই পদ-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ-স্থ পদাবলী মধ্য-যুগের বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সূত্রপাত-স্বরূপ—চর্য্যাপদের চেয়েও জয়দেবের পদগুলি বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী বৈষ্ণব পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিধু-বাবু প্রভৃতি প্রাচীন ধারার কবিদের প্রেমের গান,—জয়দেবের পদেই এই গীত-গঙ্গার গঙ্গোত্তরী মিলিতেছে। অপর, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কথা-কাব্যও বটে; সেই হিসাবে ইহা একটি "মঙ্গল-কাব্য"; একাধারে "পদ" ও "মঙ্গল", উভয় ধারা গীতগোবিন্দে বিদ্যমান। সংস্কৃত-শ্লোক-নিবদ্ধ হইলেও, ইহার স্থান একদিকে বাঙ্গালা মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে; তেমনি ইহার গানগুলি হইতেছে "পদাবলী" বা পদ-সংগ্রহ। জয়দেব স্বয়ং "মঙ্গল" অর্থাৎ "মঙ্গল-কাব্য" বলিয়া ইহার বর্ণনাও করিয়াছেন—"শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম্ উজ্জ্বল-গীতি", অর্থাৎ "শ্রীজয়দেব কবির রচিত উজ্জ্বল-রসের অর্থাৎ প্রেমের গীতিময় এই মঙ্গল-কাব্য আনন্দ দান করে।" সুতরাং স্বদেশে, এবং স্বদেশ-ভাষার সাহিত্যের দুইটি মুখ্য ধারার অগ্রণী বলিয়া, জয়দেব কবির প্রতিষ্ঠার কারণ সহজেই প্রণিধান করা যাইতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যদিও গীতগোবিন্দের পদাবলীর সম্ভাব্য অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ মিলিতেছে না, এবং যদিও 'আদি-গ্রন্থ'-ধৃত দুইটি মিশ্র-ভাষা সংস্কৃত ও ভাষাময় পদের সহিত আমাদের জয়দেবের সংযোগ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাঁহাকে আমরা নবীনের আবাহন-কর্তা, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে, বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া মর্য্যাদার আসন দিতে পারি ; যেমন তিনি ছিলেন প্রাচীন ধারার, মুসলমান-পূর্ব যুগের সংস্কৃতের অন্তিম মহাকবি। সংস্কৃত ও ভাষা, উভয় প্রকার সাহিত্যে জয়দেবের বিরাট্ প্রভাবের কথা মনে করিয়া, এবং মধ্য-যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি যে একজন 'মহাজন' অর্থাৎ ভক্ত কবি বলিয়া বিরাজমান সে কথাও স্মরণ করিয়া, নাভাজীদাস ষোড়শ শতকে তাঁহার 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবদ্ধ পদে জয়দেবের যে প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও সার্থক—

জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীত-গোবিন্দ উজাগর।
কোক-কাব্য-নবরস-সরস-শৃঙ্গার-কৌ আগর ॥
অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
রাধা-রমন প্রসন্ন সুনত হাঁ নিশ্চৈ আবৈ ॥
সন্ত-সরোরুহ-খণ্ড-কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি।
জয়দেবকবি নৃপ-চক্কৈব, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর (=ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের প্রভু) মাত্র। তিন লোকে 'গীতগোবিন্দ' প্রচুর ভাবে উজ্জ্বল (উজ্জাগর) হইয়াছে। (ইহা) কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র), কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার-স্বরূপ। যে (গীতগোবিন্দের) অষ্টপদী (=গীত) অভ্যাস করে, তাহার বুদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সন্ত(ভক্ত)-রূপ কমল-দলের পক্ষে (তিনি) পদ্মাবতী-সুখ-জনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর মাত্র ॥

ভারতবর্ষ
শ্রাবণ ১৩৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'সদুক্তিকর্ণামৃত'
ও
বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এক হাজার বছর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রচনা যাহা এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতেছে নেপালে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথিতে নিবদ্ধ ও ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত ৪৭টি বৌদ্ধ চর্য্যাপদ। এগুলির রচনা-কাল আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পূর্বে, "বাঙ্গালা ভাষা" বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোনও নিদর্শন মিলিতেছে না। বাঙ্গালা দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা তাহার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। বাঙ্গালা ভাষা যখন সজ্যমান, মগধ হইতে আগত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যখন ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ৮০০-১২০০-র মধ্যে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিতেছে, তখন ও তাহার পূর্বেও অবশ্য বাঙ্গালা দেশের লোকেরা কবিতা রচনা করিত, পদ্য-বন্ধ করিত, অর্থাৎ গান বাঁধিত। সে সব গান কী ভাষায় রচিত হইত? নিশ্চয়ই তখনকার দিনে প্রচলিত সাহিত্যের ভাষায়, এবং কতকটা লোকমুখে প্রচলিত মৌখিক ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার রূপ লইয়া দানা বাঁধিবার পূর্বেকার তরল অবস্থার গৌড়-বঙ্গ অপভ্রংশে। গৌড়-বঙ্গে প্রচলিত এই অপভ্রংশ যখন মৌখিক বা কথ্য ভাষা মাত্র ছিল, তখন ইহাতে কেহ কবিতা বা পদ রচনা করিলে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ছিল না; এবং এই কথ্য ভাষায় রচিত কোনও গান বা পদ বা শ্লোক এখনও পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালা-ভাষার প্রতিষ্ঠার পূর্বে, সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাঙ্গালা-দেশে প্রচলিত ছিল এই কয়টি ভাষা—(১) সংস্কৃত, (২) বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত, এবং (৩) পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ। সংস্কৃত ভাষা তখনকার দিনের শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে (এবং ভারতের বাহিরে বৃহত্তর-ভারতের নানা দেশেও) আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইহার প্রচলন ছিল, বর্ণজ্ঞানযুক্ত লোক তখন সকলেই অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জানিত; আর্য্যভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতে সংস্কৃত ও বিভিন্ন লোক-ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা তখনকার দিনে খুব বেশি বলিয়া লোকে মনে করিত না; লোকের মনে সাধারণতঃ এই ধারণা ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যে, প্রাকৃত ও লোক-ভাষার শুদ্ধ ও 'সংস্কৃত' রূপ-ই হইতেছে সংস্কৃত-ভাষা ; এই ধারণায় কিছু ভুল ছিল না। চলিত বা কথ্য ভাষার শুদ্ধ, ব্যাকরণ সংগত 'পাঠ' বা রূপ বলিয়া সংস্কৃতের আদর ও প্রচলন সর্বত্র ছিল ; এবং শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা ছিল, শুদ্ধ সংস্কৃতে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করা—কি বিজ্ঞানে কি শিল্পে, কি দর্শনে কি বিচারে, কি জ্ঞান-বিস্তারে কি কাব্য-সাহিত্যে। লেখকের পক্ষে প্রকাশ-পথ সংস্কৃতে ছিল সহজ ; দেড় হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বহু কবি ও অন্য লেখক সংস্কৃতে ভাব-প্রকাশের জন্য যে রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, অল্প একটু ব্যাকরণ-জ্ঞান হইলেই লোকে অবলীলা-ক্রমে সেই পথে নিজ রচনা-রথ পরিচালিত করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে কিছু রচিত হইলে, নিখিল-ভারত ও বৃহত্তর-ভারতের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সহজ-সাধ্য হইত। এই হেতু, সংস্কৃত-রচনার এতটা জনপ্রিয়তা ছিল, এতটা প্রতিষ্ঠা ছিল। এক জৈনদের বাহিরে প্রাকৃত-সাহিত্য-রচনার ধারা তেমন প্রচলিত ছিল না ; পশ্চিম-ভারতের জৈনেরা সংস্কৃতে একটি বিরাট্ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—আবার বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতে এবং প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ অপভ্রংশে-ও বহু পুস্তক, গদ্যগ্রন্থ কাব্যাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে জৈনদের প্রভাব তত বেশি ছিল না, এখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী আর বৌদ্ধদেরই আধিক্য ছিল, সেইজন্য প্রাকৃতে সাহিত্য-রচনার ধারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই ; নাটকে অল্প-বিস্তর প্রাকৃতে কথোপকথন যাহা থাকিত, তাহার বাহিরে প্রাকৃত-ভাষার পঠন-পাঠন ও রচনা এদেশে বড়ো একটা হইত না বলিয়াই মনে হয়। হীনযানের থেরবাদী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা পালি-ভাষা (ইহা একপ্রকার প্রাচীন প্রাকৃত) ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেই পালির চর্চা ও পালিতে রচনার রীতি বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এই থেরবাদী সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না। ইহাদের কেন্দ্র ছিল (অন্ততঃ খ্রীষ্ট-জন্মের পরের শতক-সমূহ হইতে) সিংহলে, পরে সিংহল হইতে ব্রহ্মে ও ব্রহ্ম হইতে চট্টলে এই হীনযান থেরবাদী বৌদ্ধ-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা দেশের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ বৌদ্ধগণ ছিলেন মহাযান মতের ; ইহাদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল, হয় শুদ্ধ সংস্কৃত, না হয় প্রাকৃত-ঘেঁষা মিশ্র-সংস্কৃত, যাহা "বৌদ্ধ-সংস্কৃত" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা-দেশে তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে দেখা যায়,—সংস্কৃতের এই সর্বজন-স্বীকৃত ও সর্বজনানুমোদিত প্রতিষ্ঠা, আর পালি-প্রাকৃতের চর্চা বা প্রতিষ্ঠার অভাব ; তার পরে দেখা যায়, পশ্চিমা- বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শৌরসেনী-অপভ্রংশের প্রচার। মথুরা-অঞ্চল ছিল শৌরসেনী-প্রাকৃতের কেন্দ্র; এই প্রাকৃত, খ্রীষ্টীয় ৪০০-৫০০-র মধ্যে, বর্তমান উত্তর-প্রদেশের সমগ্র পশ্চিম ভাগে, পূর্ব-পাঞ্জাবে, মালবে ও রাজপুতানায় প্রসৃত হয়; কোসলে এবং গুজরাটেও ইহার প্রভাব পড়ে। এই প্রাকৃত ছিল মধ্যদেশের—আর্য্যাবর্তের—হৃদয়-দেশের ভাষা; এইজন্য ইহার একটা স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে, উচ্চ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রী যাহারা সংস্কৃত বলেন না, তাঁহারা এই শৌরসেনী- প্রাকৃতেই কথা কন। শৌরসেনী-প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ শৌরসেনী-অপভ্রংশ; ইহা খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত (ও তাহার পরেও) উত্তর-ভারতের রাজপুত রাজাদের সভায় সাহিত্যের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত; সমগ্র পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায়, গুজরাটে ও উত্তর-প্রদেশে, তুর্কী-আক্রমণের পূর্ববর্তী কালে, ইহা তখনকার দিনের হিন্দীর মতো প্রচলিত ছিল, কোসলে, কাশীতে, মগধে, মিথিলায় ও গৌড-বঙ্গেও ইহার প্রসার ঘটে, ওদিকে মহারাষ্ট্রে ও সিন্ধু-প্রদেশেও ইহা বিস্তৃত হয়, মহারাষ্ট্র হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সারা উত্তর-খণ্ডে, তখনকার দিনের হিন্দীর মতো, এই শৌরসেনী-অপভ্রংশ এক অখণ্ড উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা বা লোক-ভাষার স্থান গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় কথ্য-ভাষার দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত হইলেও, শৌরসেনী-অপভ্রংশ মোটামুটি একটি অখণ্ড ভারত-ব্যাপী সাহিত্যের উপজীব্য কথ্য ভাষা রূপে ৬০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বিরাজ করিতে থাকে। বাঙ্গালা-দেশের কবিরাও এই ভাষায় পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। কান্হ, সরহ প্রভৃতির পদ এই ভাষায় পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে বাঙ্গালা-দেশের কথ্য-ভাষা সুজ্যমান প্রাচীন বাঙ্গালার ছাপ একটু-আধটু পাওয়া গেলেও, কান্হ সরহ প্রভৃতির অপভ্রংশকে শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ-ই বলিতে হয়। এই অপভ্রংশে সাহিত্য-রচনার জের পরবর্তী তুর্কী বা মুসলমান যুগের কয়েক শতক পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁহার 'কীর্তিলতা' কাব্য এই শৌরসেনী-অপভ্রংশেই রচনা করিয়া গিয়াছেন—যদিও তাঁহার ব্যবহৃত শৌরসেনী-অপভ্রংশে বহু স্থলে তাঁহার মাতৃভাষা মৈথিলের সহিত মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ৮০০-৯০০-র দিকে বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা-দেশে সাহিত্যের জন্য দুইটি প্রধান ভাষার প্রচলন ছিল—সংস্কৃত, এবং শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ। গৌড়-বঙ্গের লোক-ভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিকার, ধীরে-ধীরে প্রাচীন বাঙ্গালায় তখন ইহা রূপান্তরিত হইতেছে। সমগ্র-উত্তর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারত-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা হেতু, শৌরসেন-অপভ্রংশ এই পরিবর্তনশীল মাগধী-অপভ্রংশের সাহিত্যিক প্রতীক রূপে, আংশিক ভাবে অন্ততঃ, দাঁড়াইয়া যায়—কারণ বাঙ্গালা-দেশের কথ্য-ভাষাব সঙ্গে ইহার মিলও খুব ছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কবিগণ, সকলেই শৌরসেনী-অপভ্রংশ অল্প-স্বল্প ব্যবহার করিতেন; কিন্তু সকলেই বেশি করিয়া ব্যবহার করিতেন সংস্কৃত। বাঙ্গালা-ভাষা তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে, তাহাতে বৌদ্ধ সিদ্ধগণ পদ-রচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল, বর্ণজ্ঞান-হীন জন-সাধারণের নিকট তত্ত্ব-কথা বা দেবতা-কথা পহুঁছাইয়া দেওয়া; এইজন্য তৈয়ারী শৌরসেনী-অপভ্রংশ-ই ইহারা লইলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে উদীয়মান, নিজ বিশিষ্ট সত্তায় পৃথগ্‌ভূত প্রাচীন বাঙ্গালাকেও বর্জন কবিলেন না।

কিন্তু শৌরসেনী-অপভ্রংশ ও প্রাচীন-বাঙ্গালাকে লইয়া বাঙ্গালা-দেশে তখন অর্থাৎ তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে দুই তিন শতক ধরিয়া অল্প-স্বল্প experiment অর্থাৎ পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র, দেশেব সমগ্র শিক্ষিত (অর্থাৎ সংস্কৃতে-শিক্ষিত) পণ্ডিত ও কবিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র গণতান্ত্রিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অথবা প্রগতিশীল পণ্ডিত ও কবি এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন না, ইঁহাদের অনেকের কাছেই কবিতা অপেক্ষা ধর্মপ্রচার-ই বেশি গরজের জিনিস ছিল। সুতরাং বলিতে পারা যায়, তুর্কী-বিজয়ের পূবের যুগের বাঙ্গালা-দেশের কবি-মনের পূর্ণ পরিচয়—কল্পনোজ্জ্বল শিক্ষিত মনের পরিচয়—এই শৌরসেনী-অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালার পদের ছিটাফোঁটা যাহা আমরা নিতান্ত সৌভাগ্য-ক্রমে পাইয়া গিয়াছি, তাহার মধ্যে পাইব না, পাইব অন্যত্র—তখনকার দিনের গৌড-বঙ্গের কবিদের সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ রচনায়।

এইরূপ সংস্কৃত-রচনা, ইহার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পরবর্তী কালের, মুসলমান-যুগের, বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র বা ঐতিহাসিক পটভূমিকা হিসাবে, তাহার তেমন আলোচনা হয় নাই। কেবল শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার অতি মূল্যবান্, তথ্য-পূর্ণ ও উপাদেয় গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর প্রথম পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ সার্থক ভাবে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম সাহিত্য-দৃষ্টি সাধুবাদের যোগ্য। মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া ইতিপূর্বে মূল্যবান্ আলোচনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচার করিয়া গিয়াছেন পরলোকগত মনোমোহন চক্রবর্তী ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর নিবন্ধ-ও এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য, এবং সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজিতে লিখিত বাঙ্গালা-দেশের ইতিহাসের হিন্দু-যুগ-সম্পর্কীয় প্রথম খণ্ডের ৭৩-পৃষ্ঠাব্যাপী ১১-শ অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় তুর্কী-বিজয়ের পূর্বের যুগের গৌড-বঙ্গে রচিত সংস্কৃত-সাহিত্যের অতি সুন্দর ও ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন। গৌড-বঙ্গের প্রাচীন অনুশাসনগুলিতে যে-সমস্ত সুন্দর মঙ্গলাচরণ ও অন্য শ্লোক পাওয়া যায়, সাহিত্যের দিক্ হইতে প্রিয়বর সুকুমার-বাবু তাঁহার পুস্তকে সেগুলির-ও বিচার করিয়াছেন, মুসলমান-পূর্ব যুগে গৌড-বঙ্গে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'গীতগোবিন্দ' লইয়া আলোচনা-ও করিয়াছেন, এবং বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে সংস্কৃত-কবিতা-সংগ্রহের কথাও বলিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তির যুগে, মুখ্যতঃ সংস্কৃত-ভাষা এবং অংশতঃ পশ্চিমা-অপভ্রংশ কেন বাঙ্গালা-দেশের কবিদের ও অন্য লেখকদের উপজীব্য হইয়াছিল, সুকুমার-বাবু তাহারও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। সুকুমার-বাবুর লেখা পড়িয়া-ই 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হয়, এবং এই অতি মূল্যবান্ সংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিয়া, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পত্তনের যুগের ইতিহাসে ইহার যে একটি বড়ো স্থান আছে, তাহা আমার মনে বিশেষ করিয়া প্রতিভাত হয়।

পণ্ডিতেরা ধর্ম, দর্শন, ব্যবহার, নৈতিক প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লইয়া যে-সব বই লিখিতেন, তাঁহারা পণ্ডিতদের জন্যই মুখ্যতঃ লিখিতেন। সেখানে সংস্কৃত ছাড়া কথ্য-ভাষায় (অথবা কথ্য-ভাষার সাহিত্যিক রূপ অপভ্রংশে) লিখিবার কথা তাঁহাদের মনে হইত না। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের রসিক, নিছক পণ্ডিতদের বাহিরেও পাওয়া যাইত, তখনকার দিনে এইরূপ অপণ্ডিত সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে, সংস্কৃত জানা অনেকটা ভালো রকমে মাতৃভাষা জানার-ই শামিল ছিল। একটি সংস্কৃত শ্লোক অথবা একটি-একটি করিয়া বহু শ্লোকে গ্রথিত পুরা একখানি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়া বুঝিয়া শ্লোকটির অথবা সমগ্র কাব্যটির রস আস্বাদন করা, তখনকার যুগের সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে কষ্টকর ছিল না। তাঁহাদের জন্যও সংস্কৃত শ্লোক বা কাব্য রচিত হইত, কেবল বড়ো-বড়ো পণ্ডিতের জন্য নহে। বাঙ্গালা-দেশে সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল, নতুবা "গৌড়ী-রীতি"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নামে সংস্কৃত-রচনা-শৈলী সংস্কৃত-সাহিত্যে দাঁড়াইয়া যাইত না। গৌড়-বঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি কালিদাসের কাব্য ও নাটক পড়িয়া সেগুলির রস-গ্রহণ করিতে পারিতেন, ভবভূতি ভারবি রাজশেখর বাণভট্ট প্রভৃতিও বুঝিতেন; তাঁহাদের জন্যই বাঙ্গলা-দেশের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' কাব্য রচনা করেন, গৌড় অভিনন্দ ইঁহাদের সুবিধার জন্য পদ্যে 'কাদম্বরী-কথা-সার' লেখেন, শান্তিদেব ইঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'বোধিচর্য্যাবতার' প্রণয়ন করেন, এবং দ্বাদশ শতকে ইঁহাদের আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন, ধোয়ী কবি 'পবন-দূত' লেখেন, গোবর্ধনাচার্য্য তাঁহার 'আর্য্যাসপ্তশতী'-র শ্লোক প্রণয়ন ও সংকলন করেন, এবং সমসাময়িক অন্য কবিগণ নিজ-নিজ কাব্য ও প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। সংস্কৃত কবিতার অনুরাগী পাঠকদের জন্য সংগ্রহ-পুস্তক প্রণয়ন করার রীতি বোধ হয় সর্ব-প্রথম বাঙ্গালা-দেশেই দেখা দেয়। এইরূপ কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকা সুপরিচিত—তন্মধ্যে বোধ হয় সর্ব-প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতেছে 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'; এখানি খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকে বাঙ্গালা-দেশে কোনোও সময়ে গ্রথিত হইয়াছিল; দ্বাদশ শতকের অক্ষরে লেখা ইহার একমাত্র পুঁথি হইতে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এফ্ ডব্লিউ টমাস্ মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার অতি সুন্দর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রহ-কারের নাম জানা যায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। প্রাপ্ত পুস্তকখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, ইহাতে মাত্র ৫২৫টি শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, ও ১১১ জন বিভিন্ন কবির নাম ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ১১১ জন কবির মধ্যে কালিদাস, অমরু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি আছেন, আবার এমন অনেক কবি আছেন নাম হইতে যাঁহাদের সেই যুগের গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় বলিয়া মনে হয়—যেমন, অচলসিংহ, অপরাজিতরক্ষিত, গৌড় অভিনন্দ, কুমুদাকর মতি, ডিম্বোক বা হিম্বোক, ধর্মকর, বৈদ্য ধন্য, বিম্বোক, বুদ্ধাকরগুপ্ত, ভ্রমরদেব, মধুশীল, বাগোক, লক্ষ্মীর, ললিতোক, বন্দ্য তথাগত, বিতোক, বিদ্যাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়দেব, বীর্য্যমিত্র, বৈদ্দোক, শুভংকর, শ্রীধরনন্দী, সিদ্ধোক, সোনোক বা সোন্নোক, হিঙ্গোক। অবশ্য, সংস্কৃত-সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ এইরূপ কবিতা বা সূক্তি সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া; ঋগ্বেদ-প্রমুখ চার বেদ, সংগ্রহ-গ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কাব্য-রসিকদের জন্য যতগুলি সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম দুইখানি গৌড়-বঙ্গে গ্রথিত হইয়াছিল ('কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'-এর লিপি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ দিকের অথবা দ্বাদশ শতকের প্রাচীন নেপালী হইলেও, বইখানি বাঙ্গালা-দেশে সংকলিত হইয়া নেপালে নীত হইবার পক্ষে অনুমানের কারণ আছে)। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী জমিদার কর্তৃক সংকলিত হয়। 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'র পরে এই সংগ্রহগুলির নাম করিতে হয়—কাশ্মীরীয় কবি জহ্লণ কর্তৃক সংকলিত 'সুভাষিত-মুক্তাবলী' বা 'সূক্তি-মালিকা' অথবা 'সূক্তি-মুক্তাবলী' (১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' (খ্রীষ্টীয় ১৩৬৩ সালের মধ্যভাগে রাজপুতানার কবি বৈদ্য শার্ঙ্গধর কর্তৃক গ্রথিত), 'সুভাষিতাবলী' (বল্লভদেব কর্তৃক পঞ্চদশ শতকে সংকলিত), ও শ্রীধর-কৃত 'সুভাষিতাবলী' (পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ); এতদ্ভিন্ন আরও পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে 'পদ্যতরঙ্গিণী' (ব্রজনাথ-কৃত), 'পদ্যবেণী' (বেণীদত্ত-কৃত), 'পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী' (হরিভাস্কর-কৃত), 'সভ্যালংকরণ' বা 'সারসংগ্রহসুধার্ণব' (ভট্ট গোবিন্দজিৎ), 'সুভাষিত-প্রবন্ধ', 'সুভাষিত-শ্লোক', 'সুভাষিত-রত্নকোশ' (ভট্ট শ্রীকৃষ্ণ), 'সুভাষিত-হারাবলী' (হরি কবি), প্রভৃতি নানা সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হয়। কিন্তু এইরূপ সংগ্রহের সূত্রপাত সম্ভবতঃ গৌড়-বঙ্গেই হইয়াছিল; এবং পরবর্তী কালেও বাঙ্গালা-দেশে এই সংগ্রহের ধারা লুপ্ত হয় নাই; ষোড়শ শতকের মধ্য-ভাগে শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে একখানি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের সংগ্রহ সংকলিত করেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে এখানি একখানি সুপরিচিত পুস্তক। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এইরূপ ২০০-র অধিক শ্লোক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্লোক-মঞ্জরী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। বাঙ্গালা-দেশে ভাষা-কবিতার এইরূপ সংগ্রহ গোড়া হইতেই আরব্ধ হয়; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্য্যাপদের সংগ্রহ বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদি পুস্তক, এবং চৈতন্যদেবের পরে বহু বৈষ্ণব পদ বাঙ্গালা-ভাষায় ও ব্রজবুলীতে রচিত হইয়া যখন আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল, তখন, সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেকগুলি পদ-সংগ্রহ বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখা দিল—'ক্ষণাদাগীত-চিন্তামণি', 'পদামৃত-সমুদ্র' (রাধামোহন ঠাকুর-কৃত), 'পদকল্পতরু' (গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস-কৃত), 'কীর্তনানন্দ' (গৌরসুন্দর দাস-কৃত), প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন উপরে উল্লিখিত তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার সংস্কৃত শিলালেখ ও তাম্রলেখ-সমূহের যে মঙ্গলাচরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শ্লোকগুলির সাহিত্যিক মূল্যের বিচার করিয়াছেন, সেই শ্লোকগুলিও একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মতো।

নানা দিক্ হইতে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' একখানি লক্ষণীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং বাঙ্গালা-দেশের কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বইখানি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়; তখন পশ্চিম বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন, তুর্কী সেনানী বখ্‌ত্যার খল্‌জীর আক্রমণে নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া পূর্ববঙ্গে গিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছেন। গ্রন্থ-সংকলয়িতা শ্রীধরদাস, গ্রন্থারম্ভ-শ্লোকে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্বক, পঞ্চ-শ্লোকময় 'প্রস্তাব' অর্থাৎ ভূমিকায় নিজের পরিচয় দিয়াছেন। শৌর্য্য, তপ, জ্ঞান, দান, ইন্দ্রিয়জয়, শত্রুজয়, যোগ, ক্ষমা প্রভৃতি নানা গুণের আকর জীবন্মুক্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের 'প্রতিবাজ' অর্থাৎ লেখক, অথবা বিশ্বস্ত খাস-মুন্‌শী (সম্ভবতঃ ইঁহাকে রাজার প্রতিনিধি হইতে হইত বলিয়া এই উপাধি) এবং তৎকর্তৃক মহাসামন্তপদে বৃত ও তাঁহার অনুপম প্রেমের একমাত্র পাত্র-স্বরূপ, সখার পদবীতে উন্নীত, শ্রীবটুদাস ছিলেন অক্ষয় ও সুনুতপূর্ণ চন্দ্র-স্বরূপ, তাঁহার পুত্র ছিলেন শ্রীধরদাস; ইনি লক্ষ্মীমন্ত ও বিদ্বান্ ছিলেন, এবং শ্রীপতিপদে ইঁহার ভক্তি ছিল। কবিদেব অকারণ-মিত্র-স্বরূপ শ্রীধরদাস পঞ্চ প্রবাহে 'সুক্তিকর্ণামৃত' বা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে এই সংগ্রহ-গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গ্রন্থ-সমাপ্তিতে তিনি গ্রন্থে সংগৃহীত শ্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন, এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সমাপ্তির তারিখ দিয়াছেন,—শকাব্দ 'সপ্তবিংশত্যধিক-শতোপেতদশশত' অর্থাৎ ১১২৭ শকাব্দ, ২০এ ফাল্গুন, —খ্রীষ্টাব্দ ১২০৬, ১১ই ফেব্রুয়ারি। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ১৯১২ সালে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মার সম্পাদনায় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের চারখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং বইখানি কতকটা লোক-প্রিয় হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ১৯৩৩ সালে ইংরেজি ভূমিকাদি সমেত এই বই লাহোরের মোতীলাল বনারসীদাসের সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও পণ্ডিত হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। [সম্প্রতি, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায়, নাগরী লিপিতে, সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির একখানি নূতন সংস্করণ, কলিকাতার ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।] এই গ্রন্থখানি লইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজেন্দ্রলাল মিত্র আলোচনা করেন, এবং ১৮৮০ সালের পরে জর্মান পণ্ডিত Aufrecht আউফ্‌রেখ্‌ট্‌ 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র দুইখানি পুঁথি লইয়া এই বইয়ের বিচার করেন, ও জর্মান ভাষায় রচিত দুইটি প্রবন্ধে পণ্ডিত-মহলে ইহাকে পরিচিত করিয়া দেন। আউফ্‌রেখ্‌ট্‌-এর কাগজ-পত্রের মধ্যে 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ ছিল, অধ্যাপক টমাস স্বীয় 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'-এর সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময়ে এই কাগজ-পত্র হইতে অনেক তথ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া যাইবার পরে, আমাদের দেশে এখন উহার আলোচনা সুগম হইয়াছে।

'সদুক্তিকর্ণামৃত' পাঁচটি 'প্রবাহ' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া 'বীচি' অর্থাৎ তরঙ্গ বা শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক। শ্লোকের শেষে রচয়িতার নাম দেওয়া আছে, নাম যেখানে সংকলয়িতার জানা ছিল না সেখানে "কস্যচিৎ" অর্থাৎ 'কাহারো' বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রবাহের নাম 'অমর(বা দেব)-প্রবাহ'—ইহার বিভিন্ন 'বীচি'তে নানা দেবতার ও তাঁহাদের লীলা বিষয়ক পাঁচটি করিয়া শ্লোক আছে; সর্ব-সমেত ৯৫ বীচি এই প্রবাহে মিলিতেছে। দ্বিতীয় প্রবাহ হইতেছে 'শৃঙ্গার-প্রবাহ', ইহাতে ১৭৯টি 'বীচি'; এই প্রবাহে প্রেম ও নায়ক-নায়িকা বিষয়ক এবং প্রেমিক-প্রেমিকার নানা ভাব ও অবস্থা, ও তদ্ভিন্ন ষড়্‌ঋতুর ও প্রকৃতির নানা অবস্থার বর্ণনাত্মক পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক বিদ্যমান। তৃতীয় প্রবাহের নাম 'চাটু-প্রবাহ', ইহাতে ৫৪ 'বীচি', বিষয়-বস্তু রাজা বা বীরের দেহ ও শক্তি, চতুরঙ্গ সেনা, অস্ত্র, বীরত্ব, তূর্য্যধ্বনি, যুদ্ধ, শত্রু, কীর্তি ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা। চতুর্থ 'অপদেশ-প্রবাহ' হইতেছে ৭২ 'বীচি'ময়, ইহাতে নানা দেবতার দোষগুণ ও বহুবিধ পার্থিব প্রাকৃতিক বস্তু, বৃক্ষলতা-পুষ্পাদি, পশু-পক্ষী প্রভৃতির বর্ণনাময় শ্লোক আছে। শেষ 'উচ্চাবচ-প্রবাহ', ইহার ৭৬ 'বীচি'তে নানাবিধ বিষয়ের শ্লোক আছে—মনুষ্য, অশ্ব, গো, নানা পক্ষী, দেশ, কবি প্রভৃতি বহু প্রকীর্ণ বস্তু, স্থান, গুণ ও অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা। সংকলয়িতা গ্রন্থে-শেষে 'বীচি'-সমূহের সংখ্যা দিয়াছেন ৪৭৬, ও শ্লোকের সংখ্যা ২৩৮০; কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোকের অভাব-হেতু ৪৭৪ বীচি ও ২৩৭২ শ্লোক মিলিতেছে।

এই-সমস্ত শ্লোক বা কবিতার রচয়িতা হিসাবে প্রায় ৫০০ জন বিভিন্ন কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকগুলি শ্লোকের রচয়িতার নাম শ্রীধরদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জানিতেন না বা পান নাই। এই কবিদের মধ্যে অমরু, কালিদাস, দণ্ডী, পাণিনি, প্রবরসেন, বাণ, বিহ্লণ, ভর্তৃহরি, ভবভূতি, ভামহ, ভারবি, ভাস, ভোজদেব, মুঞ্জ, রাজশেখর, বরাহমিহির, বাক্‌পতিরাজ, বিশাখদত্ত, শিহ্লণ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরের কতকগুলি প্রথিতনামা কবি আছেন; কিন্তু এই প্রায় ৫০০ জন কবির মধ্যে—বহু স্থলে তাঁহাদের নাম দেখিয়া মনে হয়—অর্ধেকের উপর গৌড়-বঙ্গেরই কবি, এবং শ্রীধরদাসের সমসাময়িক অথবা তাঁহার কিছু পূর্বেকার কালের কবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভার প্রথিতনামা কবি জয়দেব (৩১টি শ্লোক), উমাপতিধর (৯২), শরণ (২০), আচার্য্য গোবর্ধন (৬) ও ধোয়ী কবিরাজ (২০)—ইহাদের 'সদুক্তি'র বিভিন্ন প্রবাহে পাইতেছি। তখনকার দিনে, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বেই, বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ভদ্রজাতির মধ্যে দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, পালিত, চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দেব, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর প্রভৃতি নামাংশ অনেকটা আজকালকার পদবীর মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ব্রাহ্মণের নামের পূর্বে গ্রামের নাম (গাঞি) ব্যবহারেরও রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে (যেমন 'বন্দিঘাটীয় সর্বানন্দ, ভট্টশালীয় পীতাম্বর, কেশরকোণীয় নাথোক, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক' প্রভৃতি)। 'ওক'-প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া প্রচলিত ভাষা-শব্দের নামকে বাহ্যতঃ সংস্কৃত ক-কারান্ত পদ করিয়া দেখাইবার রেওয়াজ-ও আসিয়া গিয়াছে (যেমন, 'গাঙ্গোক, গোসোক, জয়োক, জিয়োক, বিষ্ণোক, দনোক, পুণ্ডোক, শুঙ্গোক, হীরোক', ইত্যাদি)। এই প্রকার নামের ধবন দেখিয়া, এবং কতকগুলি কবির সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের বলে, 'সদুক্তি'-র কবিদের অনেকেই যে গৌড়-বঙ্গের ছিলেন, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীধরদাসের সংগ্রহ হইতে তাঁহার সময়ের বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিক আব-হাওয়ার কতকটা ইঙ্গিত পাইতেছি। জয়দেব কবির ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে মিলিতেছে; বাকী ২৬টি শ্লোক এতাবৎ আমরা জানিতাম না। এগুলি হইতে দেখা যায় যে, জয়দেব যুদ্ধেরও কবি ছিলেন, বীর-রস ও রাজপ্রশস্তি লইয়া তাঁহার ১৮টি শ্লোক এই গ্রন্থে পাইতেছি; তাঁহার রচিত মহাদেবের বন্দনাময় একটি শ্লোক-ও শ্রীধরদাস উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি সম্ভবতঃ পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কল্পনায় তিনি যে বৈষ্ণব সাধক বা মহাজন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশস্তি-কারক জয়দেব সম্ভবতঃ তাহা ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শ্রীধরদাস-ধৃত লক্ষ্মণসেন-রচিত একটি শ্লোক হইতে ও তৎপুত্র রাজকুমার কেশব-সেন-রচিত আর একটা শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের জবাবী বা পালটা শ্লোক রাজা ও রাজকুমার রচনা করিতেছেন, এবং এই দুই শ্লোক (দুইটি-ই শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'পদ্যাবলী'তে ধরিয়া গিয়াছেন, তবে তিনি দুইটি-ই লক্ষ্মণসেনের বলিয়া লিখিয়াছেন) হইতে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে যে "নন্দনিদেশতঃ" পদ আছে, তাহার সরল অর্থ 'নন্দ-রাজার নিদেশ অনুসারে', ইহা-ই গ্রহণ করিতে হইবে, পরবর্তী পণ্ডিতদের কাহারো-কাহারো এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত 'নন্দ অর্থাৎ মিলন-আনন্দের উদ্দেশ্যে' এই কষ্ট-কল্পিত অর্থ নহে। *

'সদুক্তি'র এই লক্ষণীয় শ্লোক দুইটি নীচে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

"আহূতাস্য ময়োৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা,
ক্ষীবঃ প্রেষ্যজনঃ ; কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি ?
বৎস, ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্", ইতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো,
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ। (কেশবসেনদেবস্য)

"কৃষ্ণ ! ত্বদ্‌বনমালয়া সহ কৃতং", কেনাহপি, "কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম—তদিদং প্রাপ্তং ময়া ; গৃহ্যতাম্।"
—ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাহখ্যাতে, ত্রপা-নম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ (লক্ষ্মণসেনদেবস্য)।

এই দুইটির সহিত 'গীতগোবিন্দ'র প্রথম শ্লোক তুলনীয়—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং, বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্ ;
নক্তং ; ভীরুরয়ং,—তদেব ত্বমিমং, রাধে ! গৃহং প্রাপ্রয়।"
—ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ ॥

বাঙ্গালা-দেশের ভাষা-সাহিত্যের ধারা খ্রীষ্টীয় ৯-১২ শতাব্দীর উৎস-মুখ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, 'সদুক্তি'-ধৃত শ্লোক ও সমসাময়িক অন্য সংস্কৃত-রচনা হইতে তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটি মুখ্য বিভাগ—(১) কথাত্মক 'মঙ্গল' কাব্য ও (২) গানময় 'পদ', তুর্কী-পূর্ব যুগেই পাইতেছি ; এবং এই দুই বিভাগের অদ্ভুত মিলন-ক্ষেত্র জয়দেবের

* এ-বিষয়ে বর্তমান সংকলনে ধৃত পূর্ববর্তী প্রবন্ধ "শ্রীজয়দেব কবি" দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গীতগোবিন্দে দেখিতেছি,—ইহা শ্রীকৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক উজ্জ্বল বা প্রেম রসের গীতিময় 'মঙ্গল'-ও বটে, আবার ইহাতে মধুর-কোমল-কান্ত 'পদাবলী'-ও নিহিত আছে। গীতগোবিন্দের প্রভাব বরাবর-ই বাঙ্গালা-সাহিত্যে ছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত এই প্রভাব চলিয়া আসিয়াছে; বাঙ্গালার বাহিরে অন্য ভাষায়, যথা উড়িয়া হিন্দী গুজরাটীতেও, এই প্রভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায়। মধ্য-যুগের বা মুসলমান-যুগের বাঙ্গালার প্রথম প্রধান কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গীতগোবিন্দের একাধিক পদের অনুবাদ আছে, গীত-গোবিন্দের অনেক বাক্যাংশের প্রতিধ্বনিও এই কাব্যে মিলে। শ্রীচৈতন্যোত্তর-যুগে যে বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচুর্য্য হঠাৎ আমাদের বিস্মিত করিয়া দেয়, তাহার পিছনে গীতগোবিন্দ-যুগের সংস্কৃত কবিতার একটি অনুপ্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণি' ও অন্যান্য পুস্তকের সংস্কৃত শ্লোকের আধারে যে বহু বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ রচিত হইয়াছে, তাহা দেখা যায়; এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর মতো কবি ও পণ্ডিতের মার্জিত সাহিত্য-রুচি যে মুসলমান-পূর্ব যুগের কবিদের রচনার দ্বারা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও গঠিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সংকলিত 'পদ্যাবলী' হইতে অনুমান করা যায়। ভাষার দিক্ দিয়া, এবং সহজিয়া ও দেহতত্ত্বের পদের অনুরূপ ভাবের দিক্ দিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত চর্য্যাপদগুলি যেমন মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিতে, তেমনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও তাঁহার সমসাময়িক গৌড়-বঙ্গের সংস্কৃত কবিদের শ্লোকাবলীকে (বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীকে) বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি সংস্কৃতময় রূপ বলা যায়। 'সদুক্তি'-র কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক শ্লোকের অনুরূপ বা সমশ্রেণিক শ্লোক পরবর্তী সংগ্রহ-গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমন ষোড়শ শতকের 'পদ্যাবলী'তে, যেমন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব কর্তৃক ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে সংকলিত 'সুভাষিত-রত্নভাণ্ডাগার'-এর মধ্যে; আভ্যন্তরে প্রমাণ, এগুলিকেও 'সদুক্তি'-র যুগেই লইয়া যাইতে হয়। যেমন, নিম্নের শ্লোকটি; এটি 'সদুক্তি'-তে 'দেব-প্রবাহ' মধ্যে 'গোবর্ধনোদ্ধার' নামে ৬০-সংখ্যক 'বীচি'-র দ্বিতীয় শ্লোক ('সদুক্তি' ১।৬০।২), ইহার রচয়িতার নাম 'সদুক্তি'-তে কেবল 'কস্যচিৎ' বলিয়া উক্ত, কিন্তু শ্রীরূপের 'পদ্যাবলী'-তে এটিকে জয়দেবের সমসাময়িক 'শরণস্য' অর্থাৎ শরণ-কবির বলিয়া পাইতেছি (পদ্যাবলী ২৬৫) :—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"একেনৈব চিরায়, কৃষ্ণ! ভবতা গোবর্ধনোঽয়ং ধৃতঃ—
শ্রান্তোঽসি, ক্ষণম্ আস্স্ব; সাম্প্রতম্ অমী সর্বে বয়ং দধ্মহে।"
—ইত্যুল্লাসিতদোষ্ণি গোপনিবহে, কিঞ্চিদ্‌ভুজাকুঞ্চন-
ন্যঞ্চচ্‌চৈলভরার্দিতে বিরমতি, স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

এটির সহিত তুলনীয়, 'পদ্যাবলী'-র ২৪৮-সংখ্যক শ্লোক, 'বাসব'-নামক কবির বলিয়া উল্লিখিত; এটি 'সদুক্তি'-তে নাই,—'সদুক্তি'-তে 'বাসব' বলিয়া কোনও কবির শ্লোক নাই :—

"কা ত্বং?" "মাধব-দূতিকা।" "বদসি কিং?" "মানং জহীহি, প্রিয়ে!"
"ধূর্তঃ সোঽন্যমনা—", "মনাগপি, সখি! ত্বয়্যাদরং নোজ্ঝতি।"
—ইত্যন্যোন্য-কথারসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেশবান্
নীত্বা কুঞ্জগৃহং প্রকাশিততনুঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

এই দুইটি শ্লোকের চতুর্থ পাদের শেষ অংশ "স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ" লক্ষণীয়,—মনে হয় যেন এক-ই সময়ে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় সমস্যাপূর্তি-শ্লোক হিসাবে এই দুইটি দুই জন বিভিন্ন কবির দ্বারা রচিত হইয়াছিল। 'সদুক্তি', 'পদ্যাবলী' ও অন্য সংগ্রহে "হরিঃ পাতু বঃ" এইরূপ আশীর্বচনাত্মক শেষাংশযুক্ত অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের শ্লোক পাওয়া যাইতেছে; এগুলিকে একসঙ্গেই ধরিতে হয়। উপরে উদ্ধৃত বাসব-রচিত শ্লোকটির ভাব, সখীবেশে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য-বিষয়ক বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের আধার স্বরূপ। আবার ভাব-সাম্যের দিক্ হইতে উপরে প্রদত্ত শরণের গোবর্ধন-ধারণ-বিষয়ক শ্লোকটির সহিত তুলনীয় জয়দেব-রচিত একটি শ্লোক ('সদুক্তি', ১।৬০।৫)—

"মুগ্ধে!" "নাথ, কিমাত্থ?" "তন্বি! শিখরিপ্রাগ্‌ভারভুগ্নো ভুজঃ;"
"সাহায্যং, প্রিয়! কিং ভজামি?" "সুভগে! দোর্বল্লিমায়াসয়।"
—ইত্যুল্লাসিত-বাহুমূল-বিচলচ্‌চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ (? পতিতাঃ) কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

আবার ইহার শেষ ছত্রের শেষাংশের সহিত উমাপতিধরের এই শ্লোকের অনুরূপ অংশ তুলনীয় ('সদুক্তি', ১।৫৫।৩; বিষয়, 'হরিক্রীড়া')—

ভ্রূবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়-শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই অংশটুকুর মিল দেখিয়া উপরে উদ্ধৃত গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ও লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের দুইটি অনুরূপ শ্লোককেও তেমনি একত্র গ্রথিত বা সম্পর্কিত বলিতে হয়। [দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী "শ্রীজয়দেব কবি" প্রবন্ধ।]

একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিলে, এই-সব শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক ও পরবর্তী বাঙ্গালা পদের মধ্যে একটা সংযোগ বাহির করা যায়।

'সদুক্তি'-ধৃত অন্যবিধ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়া ও বিভিন্ন প্রবাহের অন্তর্গত লক্ষণীয় কতকগুলি বিষয়-বস্তুর উল্লেখ করিয়া, এই বইয়ের পরিচয়ের সমাপ্তি করিব। এই-সকল শ্লোক এবং কবিদের উপজীব্য বিষয়-বস্তু হইতে, সাত আট শ' বা হাজার বছর পূর্বের গৌড-বঙ্গের শিক্ষিত কবি-মনের ও কবিত্ব-শক্তির দিগ্‌দর্শন করিতে পারা যাইবে।

দেব-প্রবাহে পর-পর ব্রহ্মা, সূর্য্য, শিব ও শিবের পরিকর এবং শিবের গুণাবলী ও কার্য্যাবলী, নারায়ণের দশ অবতার (বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীকৃষ্ণলীলা) ও নারায়ণের পরিকর এবং গুণ ও ক্রিয়াবলী, সরস্বতী, চন্দ্র (বিবিধ অবস্থায়), বায়ু (বিভিন্ন প্রকারের বায়ু, যথা দক্ষিণবায়ু, নদীবাত, সমুদ্রবাত, প্রাভাতিক বাত), মদন—এই-সমস্ত বিষয় অবলম্বনে ও বিভিন্ন ছন্দে রচিত ৪৭৫টি শ্লোক আছে। জয়দেব-রচিত মহাদেব-বিষয়ক একটি শ্লোক আছে, সেটি এইরূপ—

ভূতি-ব্যাজেন ভূমামমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্-
ললাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্।
বিস্তীর্ণাঘোরবক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্
বিশ্বং শশ্বদ্ বিতন্বন্ বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ ॥ ১।৪।৪ ॥

উমাপতিধর, জলচন্দ্র, যোগেশ্বর ও বৈদ্য গঙ্গাধর, শিব-বিষয়ক ইঁহাদের অনেকগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস দিয়াছেন। বৈদ্য গঙ্গাধরের একটি মহাদেব-স্তুতি—

পীযূষেণ বিষেণ তুল্যমশনং, স্বর্গে শ্মশানে স্থিতির্
নির্ভেদাঃ, পয়সোঽনলস্য বহনে যস্যাবিশেষগ্রহঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ চ ভিক্ষয়া চ গময়ন্ কালং সমঃ সর্বতো
দেবঃ স্বাত্মনি কৌতুকী হরতু বঃ সংসার-পাশং হরঃ ॥ ১।৪।৫ ॥

'বিবাহ-সময়-গৌরী'র নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর বর্ণনাটি এক অজ্ঞাতনামা কবির; সম্ভবতঃ তিনি গৌড-বঙ্গেরই ছিলেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্রহ্মায়ং—বিষ্ণুরেষ—ত্রিদশপতিরসৌ—লোকপালাস্তথৈতে ;
জামাতা কোঽত্র ? যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী !
হা বৎসে ! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবরপ্রার্থনাব্রীড়িতাভির্
দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী ॥ ১।২৩।৩ ॥

এই শ্লোকটি পাঠে যুগপৎ ভারতচন্দ্রের পার্বতীর বিবাহের বর্ণনা এবং রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতাটি মনে আসে।

কালী-সম্বন্ধে ৫টি শ্লোক আছে—এগুলিতে কালীর ধ্যান বা চিত্র আমাদেব আজকালকার কালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এবিষয়ে, ১২০০ শতকের পরে বাঙ্গালী শাক্তের দেব-কল্পনায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখা যায়। কার্ত্তিকেয়েব শিশুলীলার সুন্দর চিত্র আছে, জলচন্দ্র(সম্ভবতঃ বাঙ্গালী)-রচিত শ্লোকে ক্রীডোন্মুখ শিশু স্কন্দ পিতার জটাজূট লইয়া খেলা করিতেছেন (১।৩০।৪), এবং উমাপতিধরের শ্লোকে শিশু কার্ত্তিকেয় বেশভূষায় পিতা শিবের অনুকরণ করিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছেন (১।৩০।৫)। ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শিশুলীলা শিবের ঘরে দেখা দিয়াছে। ১।৪১ 'বীচি'তে ভৃঙ্গীর বর্ণনায় কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর কথা কবিগণ বর্ণনা করিতেছেন, এই গৃহী ও ভিখারি শিবের চিত্র একেবারে বাঙ্গালা দেশের, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই চিত্র বহু কবি আঁকিয়া গিয়াছেন, এই চিত্রের সূত্রপাত যে মুসলমান-পূর্ব যুগে, তাহা 'সদুক্তি'-র শ্লোকগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

বাঙ্গালীর গঙ্গা-প্রীতি ও গঙ্গা-ভক্তি থাকিবেই। গঙ্গা-বিষয়ক দশটি শ্লোক দেব-প্রবাহে আছে, তন্মধ্যে কেবট্ট পপীপ অর্থাৎ কেওট-জাতীয় কবি পপীপের রচিত শ্লোকটি এই—

বদ্ধাঞ্জলি র্নৌমি—কুরু প্রসাদম্, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে !
অন্তে বয়স্যঙ্কগতায় মহ্যম্ অদেহবন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ ॥

অন্যত্র পঞ্চম বা উচ্চাবচ-প্রবাহে (৫।৩১।২), 'বাণী' অর্থাৎ বাক্ বা ভাষা অথবা কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর বর্ণনায়, কেবল 'বঙ্গাল' অর্থাৎ বাঙ্গাল বা পূর্ব-বঙ্গীয় এই আখ্যায় উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা কোনও কবি, নিজ বাণীকে গঙ্গার সহিত উপমিত করিয়াছেন (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এই শ্লোকটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন)—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ ॥ (বঙ্গালস্য)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"অবহট্ঠা", অর্থাৎ অপভ্রংশ (অশুদ্ধ-শব্দে পরিপূর্ণ বলা-মুক্ত), অবীর (বাণী-পক্ষে—গভীর-অর্থ-সমন্বিত), বঙ্কিম বা আকাবাঁকা (বাণী-পক্ষে—সুন্দর বা মনোহর), ও সুজনা (সুন্দর, ঐশ্বর্য্যশালিনী), এবং কবিদের দ্বারা উপজীবিত গঙ্গাতে তথা "বাঙ্গালের বাণী"তে, অর্থাৎ বঙ্গভাষায়, এই উভয়ে অবগাহন করিলে মানুষ পবিত্র হয়। এখানে আমরা অসংকোচে "বঙ্গাল-বাণী" এই সমস্ত-পদটিকে, আমাদের সুবিধার জন্য, 'বাঙ্গালের বাণী' অর্থাৎ 'বাঙ্গাল-ভাষা' অথবা 'বাঙ্গালা-ভাষা' অর্থে লইতে পারি।

"বাণী" এখানে ভাষা-অর্থে লওয়া চলে, বিদ্যাপতি-ও 'কীর্তিলতা'তে নিজ ভাষার প্রশস্তি করিয়া গিয়াছেন—

বালচন্দ, বিজ্জাবই-ভাসা—
দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন-হাসা ॥
ও পরমেসর-হর-সির সোহই,
ঈ নিচ্চই নাঅর-মন মোহই ॥
... ...
দেসিল বঅনা সব-জন-মিট্ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্ঠা ॥

হিন্দীর সাধক-কবি কবীর (পঞ্চদশ শতক) তাঁহার ব্যবহৃত লোক-ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গাল-কবির এই শ্লোক পাঠ-কালে স্মরণীয়—

সংস্কৃত কূপজল, কবীরা! ভাষা বহতা নীর।
জব চাহৌ তবহিঁ ডুবৌ, শান্ত হোয় শরীর ॥

বিষ্ণুর দশাবতার বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার-লীলাই ৬০টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলির বৈশিষ্ট্যের এবং পরবর্তী বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের সঙ্গে এগুলির যোগের কথা পূর্বে বলিয়াছি। মনে হয়, পরম ভাগবত ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সভার সহিত এই শ্লোকাবলীর অনেকগুলি-ই বিজড়িত। 'গীতম্'-শীর্ষক শ্লোক-পঞ্চকের মধ্যে অজ্ঞাতনামা কোনও (সম্ভবতঃ বাঙ্গালী) কবির এই শ্লোকটি শুদ্ধভক্তির আকর-স্বরূপ, ইহাতে যেন শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়াবেগ ধ্বনিত হইতেছে—

যাদ্যি ঘোষবতীস্তনন্ধয়ভবানি রশনালেহানি ধন্যাত্মনাং
যে বা গোপবধূপলব্ধবিতিকরা রাধাদ্যবধোন্মুখাঃ।
যা বৃন্দাবিপিনেষু নীতগতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
বাঞ্ছাসংহিতয়া বহন্তু হৃদয়ে তাস্তেব তাস্তেব মে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুলশেখর কবির রচিত (ইনি বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না—তবে মনে হয়, ইঁহার শ্লোকে যেন চৈতন্য-চরিত্রের পূর্বাভাস পাইতেছি) 'হরিভক্তি' সম্বন্ধে চারিটি, এবং অজ্ঞাতনামা আর একজন কবির একটি, এই পাঁচটি শ্লোক-ই যে-কোনও স্তোত্র-সংগ্রহে গৃহীত হইবার যোগ্য। এই-সমস্ত শ্লোকে খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র পূর্বেই আমরা চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হরিভক্তি যেন চাক্ষুষ করিতে পারিতেছি।

দেব-প্রবাহে অন্যতম দেবতা বাত বা বায়ুর প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণনাময় কতকগুলি রোচক শ্লোকের মধ্যে, দক্ষিণ-বায়ুর বর্ণনায় দুইটি শ্লোকে সুদূর দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জাতি-সমূহের তরুণীদের কথা আনিয়া দুই জন অজ্ঞাত কবি একটু রোমান্টিক বা রমন্যাস ভাবের পবিচয় দিয়াছেন।

'শৃঙ্গার-প্রবাহ'টি বিশেষ দীর্ঘ। পুরুষ ও নারী, নায়ক ও নায়িকা, বিভিন্ন অবস্থার ও দেশের স্ত্রী, প্রেম, অভিসার, মিলন, বিরহ, গীত বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি কলা, প্রাকৃতিক দৃশ্য (যথা—প্রত্যূষ, সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা), ঋতু-বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের, বিশেষ করিয়া গৌড-বঙ্গের কবিদের মনের ভাব-সম্পুট এই প্রবাহের ৮৭৫টি শ্লোকের মধ্যে পাইতেছি। মাঝে-মাঝে বাঙ্গালার জনগণের যে-সব চিত্র শ্লোকসমূহে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুন্দর, অন্যত্র দুর্লভ, সেইজন্য এগুলির মূল্য অসাধারণ। বাঙ্গালী কবি উমাপতিধর উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলেব স্ত্রীদের প্রশংসা করিয়া শ্লোক লিখিলেন; বাঙ্গালী কবি অমৃতদত্ত নাগরিকতার সহিত তাহাদের প্রশস্তি গাহিলেন,—

উত্তরাপথ-কান্তানাং কিং ব্রূমো রামণীয়কম্?
যাসাং তুষার-সংভেদে ন ম্লায়তি মুখাম্বুজম্॥ (২।২০।৩)

আবার উত্তর-ভারতেব কবি রাজশেখর দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদের, পাশ্চাত্য স্ত্রীদের ও গৌড়াঙ্গনাদের-ও বেশ-ভূষাব বর্ণনা করিয়া যে-সব শ্লোক বাঁধিয়াছিলেন, শ্রীধরদাস তাঁহার 'সদুক্তি'তে সেগুলি দিয়াছেন। কোনও অজ্ঞাত কবি—সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালী ছিলেন—বঙ্গ-দেশের অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের মেয়েদের সজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন—

বাসঃ সূক্ষ্মং বপুষি ভুজয়োঃ কাঞ্চনী চান্দদশ্রীর্
মালাগর্ভঃ সুরভি-মস্থণৈ গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলা নির্মলং তালপত্রং—
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারাঙ্গণানাম্॥ (২।২০।৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁতাই-কাপড়ের দেশের মেয়েরা তো সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিবেই; তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশের মেয়েরা পশ্চিম-বঙ্গেও কচি সাদা তাল-পাতার পাকানো গোঁজ কানে মাকড়ির বদলে পরিত, ধোয়ীর 'পবন-দূত' হইতে সুহ্ম-দেশ বা মেদিনীপুর জেলার মেয়েদের সম্বন্ধে একথা জানা যায়। এই তাল-পাতার কর্ণভূষণ এখনও সুদূর বলিদ্বীপে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। কবি চন্দ্রচন্দ্র (নিশ্চয়ই ইনি বাঙ্গালী ছিলেন—প্রথম 'চন্দ্র' ইঁহার ব্যক্তি-গত নাম, দ্বিতীয় 'চন্দ্র' পদবী), গ্রাম্য তরুণীর বর্ণনায় (২।২১।২), কপালে কাজলের টিপ, দুই হাতে পদ্ম-ডাঁটার বালা, কানে শলাটু-ফলের (? কচি ছোটো-ছোটো বেলের) দুল, স্নানের পরে বাঁধা খোঁপায় তিল-পল্লব গোঁজা, এই চিত্র আঁকিয়াছেন। অভিসারিকা, দিবাভি-সারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, দুর্দিনাভিসারিকা—অভিসার-পর্য্যায়ে এতগুলি বিভাগ আমাদের বাঙ্গালা-পদাবলী-সাহিত্যের কথা-ই স্মরণ করাইয়া দেয়। বনবিহার-কালে একটি সুন্দরী পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া গাছ হইতে ফুল পাড়িতেছে, উমাপতিধর তাহার চিত্র দিয়াছেন (২।১০৭।২)—

দূরোদঞ্চিতবাহুমূলবিলসচ্চীনপ্রকাশস্তনা-
ভোগব্যায়তমধ্যলম্বিবসনা নির্মুক্তনাভীহৃদা।
আকৃষ্টোন্মিত-পুষ্পমঞ্জরিরজঃপাতাবকদ্ধেক্ষণা
চিত্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্র-দুস্থা তনুঃ॥

বিবিধ প্রকারের নায়কের মধ্যে 'গ্রাম্য-নায়ক'-এর বর্ণনা-প্রসঙ্গে, সেকালের কৃষক-যুবকের জীবনের সুখের চিত্র (কবি, যোগেশ্বর)—

ব্রীহিঃ স্তম্বকরিঃ প্রভূতপয়সঃ, প্রত্যাগতা ধেনবঃ,
প্রত্যুজ্জীবিতমিক্ষুণা ভৃশমিতি ধ্যায়ন্নপেতান্যধীঃ।
সান্দ্রোশীরকুটুম্বিনীস্তনভর-ব্যালুপ্তঘর্মশ্রমো
দেবে নীরমুদারমুজ্ঝতি, সুখং শেতে নিশাং গ্রামণীঃ॥ (২।৮৪।৩)

'প্রচুর জলের জন্য ধান বেশ গজাইয়া উঠিয়াছে, গোরুগুলি ঘরে ঘিরিয়া আসিয়াছে, আখও হইবে প্রচুর, অন্য চিন্তা আর নাই; ঘরের স্ত্রীও এই অবসরে স্নিগ্ধ উশীর বা বেনামূলের রসে প্রসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, আকাশ হইতে খুব জল পড়িতেছে, এই অবস্থায় গ্রামীণ যুবক আরামে নিদ্রা যাইতেছে।' এই শ্লোকে আমরা প্রালি 'সুত্ত-নিপাত' গ্রন্থের প্রাচীন-ভারতীয় কৃষকের আনন্দ-গীতের প্রতিধ্বনি পাইতেছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পক্কৌদনো সুদ্ধ-বীরোঽহমস্মি, অনুতীরে বসিয়া রন্ধন-শালে।
হয়া কুম্ভি, আহিতো গিনি ;— অথ চে পংথয়সি, পসবস্থ, দেব ! ইত্যাদি

'আমার ঘরে ভাত রাঁধা হইয়া গিয়াছে (অথবা আমার যব যান পাকিয়া উঠিয়াছে), আমার গোরুর দুধ দোহা হইয়া গিয়াছে, চিরকাল আমি মহী-নদীর তীরে বাস করি, আমার কুঁড়ে ঘরটি বেশ ছাওয়া, ঘরে আগুনও জ্বালা আছে ; যদি চাও, দেবতা, তো এখন যত ইচ্ছা জল বর্ষণ করো।'

'শিশির-গ্রাম' অর্থাৎ শীতকালে গ্রামের শোভা অজ্ঞাতনামা গৌড়ীয় কবি এইভাবে দেখাইয়াছেন—

শালিচ্ছেদ-সমৃদ্ধ-হালিকগৃহাঃ সংস্পষ্ট-নীলোৎপল-
স্নিগ্ধ-শ্যাম-যবপ্ররোহ-নিবিড়ব্যাদীর্ঘ-সীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্ত-ধেন্বনড়ুহচ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্ত-ধ্বনদিক্ষুযন্ত্র-মুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ ॥ (২।১৩৬।৫)

'শীতকালে হালিক অর্থাৎ হালিয়া বা কৃষকের যব কাটা ধানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, গ্রামের সীমান্তের ক্ষেত্রসমূহে যে প্রচুর যব হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর, পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের নীলপদ্মের মতো স্নিগ্ধ-শ্যাম, গাভী, বলদ ও ছাগ-সমূহ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় পাইয়া আনন্দিত, ক্রমাগত আখ-মাড়া কলের শব্দে মুখরিত গ্রামসকল এখন নূতন ইক্ষু-গুড়ের সৌরভে আমোদিত।'

দ্বিতীয় প্রবাহ বা 'শৃঙ্গার-প্রবাহ' সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দৈনিক জীবন, ঋতু-চর্য্যা প্রভৃতি বিষয়ের শ্লোকের সংগ্রহ, তৃতীয় প্রবাহ অর্থাৎ 'চাটু-প্রবাহ' রাজা ও মহাপুরুষ, যুদ্ধ, কীর্তি প্রভৃতি লইয়া। এই প্রবাহে বেশি নয়, ২৭০টি শ্লোক মাত্র। ইহার মধ্যে জয়দেব কবির যুদ্ধ- ও শৌর্য্য-বিষয়ক কতকগুলি শ্লোক আছে, এগুলি হইতে বুঝা যায় যে, জয়দেব কেবল 'বিলাস-কলায় কুতূহল' ও সঙ্গে-সঙ্গে 'হরিচরণ-স্মরণে সরস-মন' কবি ছিলেন না, রাজার শৌর্য্য ও বীর্য্য, যুদ্ধক্ষেত্র, তূর্য্য নিনাদ, ধর্ম-সংস্থাপন, খড়্গ-ঝঞ্ঝনা, সংগ্রাম-কীর্তি প্রভৃতি বিষয়ও তাঁহাকে দিয়া শ্লোক লিখাইয়াছিল। জয়দেবের এই-সকল শ্লোক হইতে (এগুলি আমার পূর্বপ্রকাশিত "শ্রীজয়দেব কবি"-শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি) ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এগুলি তাঁহার রচিত মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের শৌর্য্য-প্রশস্তি-মূলক কোনও বীররস-প্রধান সংস্কৃত কাব্য, যাহা অধুনা-লুপ্ত, তাহা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এই অনুমানের বশে এইটুকু বলা চলে যে, শ্রীধরদাসের উদ্ধৃত জয়দেব-নামাঙ্কিত ৩১টি শ্লোকের মধ্যে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"শ্রীকৃষ্ণবিজয়" হইতে গৃহীত; অবশিষ্ট ২৩টির মধ্যে কয়েকটি অন্ততঃ তাঁহার রচিত অন্য কোনও কাব্য হইতে গৃহীত হওয়া অসম্ভব নহে। ধোয়ী কবির 'পবন-দূত' এইরূপ অনুমানের সমর্থন করে। লক্ষ্মণসেনের প্রশংসায় রচিত জয়দেবের এই শ্লোকটি লক্ষণীয়—

লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ! জংগম-হরে। সংকল্প-কল্পদ্রুম।
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ! সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়। বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র! প্রতিরাজ-রাজক। সভালংকার। কর্ণার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল! পালক সতাং। দৃষ্টোঽসি, তুষ্টা বয়ম্॥ (৩।১১।৫)
['লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ'=লক্ষ্মীনায়ক, লক্ষ্মীকান্ত। 'জংগম-হরে'=চলন্ত নারায়ণ-স্বরূপ। 'সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়'=যুদ্ধবিদ্যায় ভীষ্ম। 'প্রতিরাজ-রাজক'=লেখক-শ্রেষ্ঠ।]

'চাটু-প্রবাহে' নানাবিধ বিষয়ের কথা আছে, যেমন, চাটু, বিদ্যা, গুণ, ধর্ম, রূপ, দৃষ্টি, দেহাংশ, অত্যুক্তি, চিত্রোক্তি, কার্য্য-গর্ব, দান, দরিদ্র-পালন, বিক্রম, পৌরুষ, শৌর্য্য, প্রতাপ, হস্তী অশ্ব নৌকা সেনা, বিবিধ খড়্গ, যুদ্ধ-যাত্রা, যুদ্ধক্ষেত্র, দিগ্বিজয়, শত্রু, শত্রুনারী, শত্রুদেশ, যশ প্রভৃতি সাধারণ জীবনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এইরূপ নানা বিষয়ের অবতারণা, যাহার জন্য মানুষকে সকলে চাটুবাদ বা প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই-সব বিষয় এই প্রবাহের শ্লোকাবলীর মধ্যে আছে।

চতুর্থ, 'অপদেশ-প্রবাহ'। 'অপদেশ' অর্থে 'স্থান', তদনন্তর 'ব্যাজ' অর্থাৎ 'ছল' অথবা 'লক্ষ্য', 'ব্যাজ-স্তুতি' অর্থাৎ 'স্তুতিচ্ছলে নিন্দা', অথবা 'নিন্দাচ্ছলে স্তুতি', কিংবা 'দ্ব্যর্থ-বাক্য', এই অর্থেও এই শব্দ গ্রহণ করা যায়। কতকগুলি দেবতা ও প্রাকৃতিক বস্তুর এই প্রকার নিন্দা- ও স্তুতি-ব্যঞ্জক বর্ণনার শ্লোক লইয়া এই প্রবাহের আরম্ভ, বাসুদেব, মহাদেব, শিবগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র (সমুদ্রের গুণ ও নিন্দা লইয়া ৬টি বীচিতে ৩০টি শ্লোক), অগস্ত্য ঋষি, জল, শঙ্খ, মণি, নানা রত্ন, ও স্বর্ণ, নদ-নদী, সরোবর (বিভিন্ন প্রকারের), মীন, সর্প, ভেক, পদ্ম, ভ্রমর, পর্বত, মলয়; বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন অবস্থার সিংহ গজ মৃগ ও অন্য পশু, নানা প্রকারের বৃক্ষ; মরুভূমি, মেঘ, চাতক, হংস, কোকিল, শুক, ইত্যাদি; কবি-প্রসিদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট বস্তুগণের বর্ণনার সমাবেশে এই 'অপদেশ-প্রবাহ'। ইহাতে ৩৬০টি শ্লোক আছে।

শেষ, 'উচ্চাবচ' অর্থাৎ বিবিধ-বিষয়ক বা প্রকীর্ণ প্রবাহ। ইহাতে মনুষ্য, সুরেন্দ্র, গো প্রভৃতি পশু, পারাবত বক আদি পক্ষী; গিরি, বন, নদ-নদী, তড়াগ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চক্রবাক প্রভৃতি কবি-স্তুত বস্তু ; ধনুর্ভঙ্গ, মহুমান্ প্রভৃতির বীরত্ব, দশমুখ রাবণের শিরশ্ছেদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার ; কবি, বিভিন্ন কবির যশ ও গুণ, কাব্যতত্ত্বের ; সজ্জন, দুর্জন, মনস্বী, সেবক, কৃপণ, কুক্ষোদর-দুঃখিত, দারিদ্র্য, দরিদ্র-গৃহ, দরিদ্র-গৃহিণী, প্রভৃতি অবস্থার মানুষ ; জরা, বৃদ্ধ ; অনুশয়, বিচার, নির্বেদ, প্রভৃতি মনোভাব ; কারুণিক, রমণ মনোৎসুক, তপস্বী প্রভৃতি ভাবের মানুষ ; ভবিতব্যতা, দেব, কাল, শ্মশান ; সমস্যা ; ইত্যাদি নানা অনপেক্ষিত বিষয়ের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবাহের শেষে শ্রীধরদাস, পিতা "প্রতিরাজ" বা রাজার লেখক বা খাস-মুন্‌শী বটুদাসের প্রশস্তি-খ্যাপক পাঁচটি শ্লোক দিয়াছেন, এগুলির মধ্যে চারিটির কবি বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন সাঙ্কাধর (? সাঁচা = সত্য + ধর), বেতাল, উমাপতিধর ও কবিরাজ ব্যাস। এই প্রবাহে ৩৮০টি শ্লোক আছে।

বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা দেখিয়া এই কবিতা-চয়নিকা পুস্তকখানির বিশ্বকরত্ব বা সর্বগ্রাহিতা অনুধাবন করা যায়—ইহাকে Poetic Encyclopædia of Life অর্থাৎ সমগ্র জীবনের কাব্যময় বিশ্বকোষ বলা যায়। শ্রীধরদাস যে একজন সংস্কৃতি-পুত চিত্তের মানুষ ছিলেন, জীবনের সব দিক্ তিনি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই অপূর্ব গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট। এই বই ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকের বাঙ্গালার সংস্কৃতির এক গৌরবময় নিদর্শন।

এতাবৎ-উপলব্ধ প্রাচীনতম মৈথিল বই, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত কথকতার পুঁথি 'বর্ণরত্নাকর' (খ্রীষ্টীয় ১৩২৫ সালের দিকে প্রস্তুত) এক হিসাবে এই ভাবের সর্বগ্রাহী গ্রন্থ—জীবনের সব কিছু লইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা ইহাতেও আছে।*

আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই বইয়ের সহিত পরিচয় হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে চাই—বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদের সহিত এই বইয়ের একটি সংস্করণ। সঙ্গে-সঙ্গে, অন্য সংগ্রহ-পুস্তক-সমূহ হইতে গৌড়-বঙ্গের কবিদের রচিত, 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র বাহিরে যে-সব শ্লোক পাওয়া যায়, সেগুলি, এবং বাঙ্গালার প্রাচীন লেখমালায় প্রাপ্ত কবিত্বপূর্ণ নমস্কার- বা মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-সমূহ,—এগুলিও দেওয়া চাই। 'গীতগোবিন্দ'-র বহু বাঙ্গালা সংস্করণ আছে ;

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসুমা মিশ্র ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থখানি, বৃহৎ ইংরেজি ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সমেত, কলিকাতার Asiatic Society হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জয়দেবের শৌরীর 'পবন-দূত' এবং গোবর্ধনাচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী'র-ও বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ সংস্করণ সাহিত্য-রসিক বাঙালী পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হওয়া উচিত। 'আর্যাসপ্তশতী'-তে আর্যাচ্ছন্দে ৭০০ প্রেম-বিষয়ক শ্লোক বা কবিতা আছে। বহু পূর্বে সংবৎ ১৯২১-এ অর্থাৎ ৮০ বৎসর পূর্বে ঢাকা হইতে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল 'আর্যাসপ্তশতী' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে বাঙ্গালীর সংস্কৃত-জ্ঞানের কীর্তি-স্বরূপ এই বই বাঙ্গালা-দেশে প্রায় অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই সমস্ত বই প্রকাশিত হইবার পরে, প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের রচিত সংস্কৃত কাব্য-কবিতার আস্বাদন এবং আলোচনা, বাঙালী সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্যামোদী এবং সাহিত্য-বিষয়ক গবেষকদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। ইংরেজি-যুগের পূর্বেকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাব-ধারা যে এই-সব সংস্কৃত কবিতায় বহুল পরিমাণে গিয়া পঁহুছায়, 'সদুক্তিকর্ণামৃত' যে বাঙ্গালা-সাহিত্যেব প্রাথমিক যুগের, সংস্কৃত-ভাষার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল একটি পট-ভূমিকা স্বরূপ বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের উপমা আশ্রয় করিয়া বলা যায়, তুর্কী-বিজয়েব পূর্বের যুগে দেশ-ভাষায় অজ্ঞাত ও অশিক্ষিত কবিবা যে গান বা পদ বা কবিতা লিখিতেন, সেগুলি ছিল যেন মাটির প্রদীপ ; সেই-সব মাটির প্রদীপ ক্ষণিকেব কাজ সাবিয়া মাটির মধ্যে কালের গর্ভে আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই-সব সংস্কৃত শ্লোক যেন ভাষাব গৌরবে স্বর্ণ-প্রদীপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নিখিল-ভারতেব কাছে সেগুলির মূল্য হইবে বলিয়া, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির কবিগণ সেই প্রদীপগুলি গড়িয়া গিয়াছেন, যেন সেগুলির বর্তিকা চিরকাল ধবিযা জলে। এই-সমস্ত উজ্জ্বল স্বর্ণ-প্রদীপ হইতে যদি সে যুগের ভাষা-কবিতার মৃৎপ্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতির কিছু আভাস পাওয়া যায়, সেকালের জনসাধারণের জীবনের চিত্র, আমাদের পূর্বপুরুষ সেকালের বাঙ্গালা-দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার, 'দৃষ্টি-ভঙ্গী'র ও কার্য্য-রীতির কিছু-মাত্রও প্রতিফলন হয়, এবং আধুনিক মানুষ আমরাও যদি ইহা হইতে কিছু পরিমাণে রসোপভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীধরদাসের এই সংগ্রহ চিরকালের জন্য সার্থক সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, ' "বিশ্বজন" যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' ॥

বিশ্বভারতী পত্রিকা
দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন, বৈশাখ ১৩৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এশিয়া-খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব

সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন রূপ বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভারতবর্ষে আনীত হয় আর্য্যগণের দ্বারা। সুদূর রুষ-দেশে উরাল-পর্বতের দক্ষিণে কাস্পিয়ান ও আরাল হ্রদ-দ্বয়ের উত্তরে, এখনকার কালের তুর্কীভাষী খিরঘিজ্ ও কাজাক জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ভূখণ্ডে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, আদি-ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা বাস করিত, ইহাদের মধ্যে যে-ভাষা ঐ সময়ে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা-ই পরবর্তী কয়েক বর্ষ-সহস্রকের মধ্যে বিবিধ প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়—হিত্তী, বৈদিক, অবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক, প্রাচীন গ্রীক, লাতীন, গথিক, প্রাচীন তুষারীয়, প্রাচীন কেল্ট, প্রাচীন বাল্ট্, প্রাচীন স্লার প্রভৃতি ভাষাতে মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের পরিণতি ঘটে। কোন্ পথ ধরিয়া ইন্দো-ইউরোপীয়গণ তাহাদের আদি পিতৃভূমি হইতে ভারতবর্ষে আসে, তাহা ঠিক-মতো জানা যায় না, তবে কতকগুলি প্রাচীন লেখের প্রমাণে এইরূপ অনুমান হয় যে, ইহাদের একটি দল আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ২২০০-র দিকে কৌকাস্ বা ককেশস্ পর্বতমালার দক্ষিণে, মেসোপোতামিয়া বা ইরাকের উত্তরে, আধুনিক কালের পুব-তুর্কীদেশে ও উত্তর-পশ্চিম ঈরানে প্রথম দেখা দেয়। এখানে কিছুকাল ধরিয়া ইহারা অবস্থান করে, পরে ধীরে-ধীরে পুর্ব-তুর্কীদেশে, ইরাকে ও পশ্চিম ঈরানে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহার পর ঈরান ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতে আসে।

আদি যুগের ইন্দো-ইউরোপীয়েরা সভ্যতায় তেমন উন্নত ছিল না, ইহাদের তুলনায় মিসরী, প্রাচীন গ্রীসের আদিম অধিবাসী, এবং বাবিল ও অসুর জাতির লোকেরা নাগরিক সভ্যতায় অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছিল। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়েরা কিন্তু প্রাচীন সভ্য জগৎকে একটি জিনিস দান করে, সেটি হইতেছে ঘোড়া। ইহাদের পিতৃভূমিতে ঘোড়া বন্য অবস্থায় চরিত, সেখানেই ইহারা ঘোড়াকে ধরিয়া পোষ মানাইয়াছিল। ঘোড়াকে বশে আনিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া ও তাহাকে দিয়া রথ বা গাড়ি টানাইয়া, সেই সুপ্রাচীন যুগে ইহারা মানব-সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত গমনাগমন সহজ হয়, বিভিন্ন জাতির দূর-দূর দেশে প্রসার ও পরস্পরের উপর প্রভাব-বিস্তার পূর্বের তুলনায় আরও দ্রুত ও ব্যাপক-ভাবে ঘটিতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইন্দো-ইউরোপীয়দের কতকগুলি উপজাতি বা দল, উরাল-পর্বতের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম মুখে গিয়া ইউরোপে উপনিবিষ্ট হয়, ইউরোপের নানা দেশে ইহাদের বংশধরেরা প্রাচীন কেল্‌টীয়, ইতালীয়, জর্‌মানীয়, হেল্লেনীয় বা গ্রীক, বাল্‌টীয় এবং স্লার প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হয়। আর একটি দল পূর্ব মুখে গিয়া মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতে থাকে, ইহাদের উত্তর-পুরুষদের পরে খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের মধ্য-ভাগে উত্তর-সিন্‌-কিয়াঙ্‌ (বা চীনা তুর্কীস্থান) দেশে 'তোখারীয়' জাতি-রূপে দেখা যায়, প্রাচীন কালে ভারতবাসীরা মধ্য-এশিয়ার এই তোখারীয় জাতির সহিত পরিচিত ছিল ও ইহাদিগকে 'ঋষিক' ও 'তুষার' নামে অভিহিত করিত। এই-সব বিভিন্ন ইউরোপীয় দল ব্যতিরেকে, আরও দুইটি দল এশিয়া-মাইনরের দিকে আসে, ইহাদের একটি কোনও অজ্ঞাত সময়ে এশিয়া-মাইনরের মধ্য-ভাগে উপনিবিষ্ট হয়, খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র দিকে ইহাদের ভাষা, হিত্তী বা কানীসীয় ভাষা, এশিয়া-মাইনরের একটি দুর্ধর্ষ শাসক জাতির ভাষা-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে দেখা যায়। দ্বিতীয় দলটি ঈরানীয় ও ভারতীয় আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের লইয়া, সম্ভবতঃ ককেশস পর্বত অতিক্রম করিয়া ইহারা উত্তর-ইরাকে ২২০০।২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আসিয়া উপনীত হয়। এই দলটি হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আর্য্য-শাখা।

খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষের কয় শতকে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আর্য্যেরা তাহাদের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থার অন্ধ তমিস্রা হইতে সুসভ্য এবং ইতিহাস-প্রবিষ্ট জাতিগণের সংস্পর্শে প্রথম আসিতেছে। অসুর-বাবিল-জাতীয় জনগণ তাহাদের প্রাচীন লেখে এই নবাগত আর্য্যদের আগমন উল্লেখ করিতেছে। আর্য্যদের আগমন উত্তর হইতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহারা ঐ অঞ্চলে প্রথম ঘোড়া আনয়ন করিয়াছিল। অসুর-বাবিল দেশের অর্থাৎ প্রাচীন ইরাকের লোকেরা ঘোড়ার সহিত পরিচিত ছিল না—তাহাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরু, ভেড়া, ছাগল, উট ও গাধা ছিল; ঘোড়া ওদেশের পশু ছিল না, আর্য্যদের নিকট হইতে তাহাদের পিতৃভূমি হইতে আনীত ঘোড়া ইহারা পরে পাইয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে যখন উরাল-পর্বতের দক্ষিণ-অঞ্চলে ও দক্ষিণ-রুষ দেশের সমতল ভূভাগে আর্য্যগণ অথবা তাহাদের পিতৃপুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয়গণ বাস করিত, তখন দক্ষিণের অসুর-বাবিল বা ইরাক দেশের লোকদের নিকট হইতে গোরুর প্রসার উত্তরে ইন্দো-ইউরোপীয়গণের মধ্যে ঘটিয়াছিল—আগে ইন্দো-ইউরোপীয়গণ ঘোড়া ও ভেড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাত্র পুষিত, গাধা, গোরু ও ছাগল তাহাদের মধ্যে ছিল না; সুতরাং দেখা যাইতেছে, দক্ষিণের গোরু উত্তরে আর্য্যদের পূর্ব-পুরুষদের দ্বারা গৃহীত হয়, এবং যেন তাহার পরিবর্তে উত্তরের ঘোড়া আর্য্যদের দ্বারায় দক্ষিণে আনীত হয়।

আর্য্যেরা ইরাকে আসিয়াছিল, কতকটা দলবদ্ধ-ভাবে লুঠ-তরাজ করিবার জন্য, ও জো পাইলে দেশে উপনিবিষ্ট হইবার জন্য; এবং কতকটা দুই-এক জন করিয়া, ঘোড়া বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে। যাহা হউক, খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে আর্য্যগণ উত্তর-ইরাকে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। ইহাদের হিত্তী বা কানীসীয় শাখার জ্ঞাতিগণ এশিয়া-মাইনরের একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতি রূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে—হিত্তী ভাষায় উৎকীর্ণ লেখমালা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মাত্র বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইঁহাদের শ্রমের ফলে প্রাচীন কালের একটি বিশিষ্ট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভাষা আমাদের সংস্কৃতের একটু দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি—এইরূপ জ্ঞাতিত্ব-সূত্রে ইহা গ্রীক, লাতীন, স্লার, বাল্টিক, জর্মানিক, কেল্টিক প্রভৃতি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির সহিতও সম্পৃক্ত।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিক্ হইতে আর্য্য ভাষার শব্দ ও নাম অসুর-বাবিলদের ভাষায় উৎকীর্ণ লেখসমূহে পাওয়া যাইতেছে। আর্য্যদের কয়েকটি শাখা ঐ সময়ের কিছু পরে, ইরাক-অঞ্চলে, স্বকীয় শৌর্য্য-বলে, কতকগুলি দেশ অধিকার করিয়া লয়, ও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে থাকে। 'মিতান্নি' নামে একটি আর্য্য-শাখা ইহাদের অন্যতম। 'কাস্সী' (=কাশি?) নামে আর একটি শাখা ১৭৪৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বাবিলন-নগরী অধিকার করিয়া লয়, এবং বাবিলনে কাশি-বংশীয় আর্য্য রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া রাজত্বও করে। 'মিতান্নি', 'কাশি', 'হার্‌রি' বা 'আর্‌রি' (আর্য্য?) নামক এই সব আর্য্য বংশ, ঐ দেশের জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদের মধ্যে বাস করার ফলে, ক্রমে নিজেদের আর্য্য ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া যায়, ও স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজ পৃথক্ জাতিসত্তা হারাইয়া ফেলে। ধীরে ধীরে এই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৪০০।১৩০০-র পরে। ঐ সময় পর্য্যন্ত ইহাদের ভাষার অস্তিত্বের বহু প্রমাণ স্থানীয় লেখাবলীর মধ্য হইতে পাওয়া যায়।

ইরাকের অসুর-বাবিল জাতির লেখ ও অনুশাসনে রক্ষিত খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ আনুমানিক ২০০০ হইতে ১৪০০ বা ১৩০০ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত আর্য্য ভাষার শব্দ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নাম পাওয়া যায়, সেগুলিকে বৈদিক সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার ভাষার শব্দ ও নাম বলা যায়। এই যুগের আর্য্যভাষা, একদিকে ভারতে আগত আর্য্যগণের বৈদিক ভাষা, ও অন্যদিকে ঈরানে উপনিবিষ্ট আর্য্যগণের প্রাচীন ঈরানী (পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তায় ও পারস্যদেশে বাণমুখ লিপিতে পর্বতগাত্রে ও অন্যত্র উৎকীর্ণ প্রাচীন-পারসীক অনুশাসনে রক্ষিত)—এই উভয় প্রকার ভাষার জননী। ইহাকে একসঙ্গে 'প্রাক্-সংস্কৃত' ও 'প্রাক্-ঈরানী' বলা যায়। ভারতে আর্য্যদের আগমন ঘটে ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরে—এই মতবাদ-ই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা ভারতে আসিয়া ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতার বাহন হইবার পূর্বেই, ইহার 'প্রাক্-সংস্কৃত' অবস্থাতেই একটি প্রতাপশালী জাতির ভাষা হিসাবে, পশ্চিম-এশিয়া-খণ্ডে ইহার কতকটা প্রতিপত্তি ও প্রসার ঘটে। অর্বাচীন কালে সংস্কৃতের ভগিনী-স্থানীয়া প্রাচীন ঈরানী ভাষার পরবর্তী রূপ প্রাচীন-পারসীক, মধ্য-পারসীক বা পহ্লবী এবং আধুনিক-পারসীক বা ফারসী ইরাকে ও পশ্চিম এশিয়ার অন্যত্র, সেই প্রসার ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

'প্রাক্-সংস্কৃত' বা বৈদিক-পূর্ব আর্য্যযুগের সংস্কৃত তখনও কোনও বিশিষ্ট সংস্কৃতির বাহন হইতে পারে নাই, কারণ আর্য্য জাতি তখনও কতকটা আদিম যাযাবর অবস্থায় ছিল—বৈষয়িক সভ্যতায় ইহারা তখনও বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই, অসুর-বাবিলদের বিরাট্ ঐশ্বর্য্যময় সভ্যতা ইহাদিগকে তখন বিশেষ-ভাবে অভিভূত করিয়াছিল, ইহারা নিজেরাই অনেক কিছু নূতন বস্তু শিখিতেছিল। কিন্তু ইহারা ইরাক-অঞ্চলে ঘোড়া আনিয়াছিল, ঘোড়াকে শিখাইবার কালে আর্য্য অশ্বপালগণ যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিত, সেইরূপ কতকগুলি শব্দ অসুর-বাবিল লেখের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই শব্দগুলির রূপ হইতে বুঝা যায় যে, এগুলি সংস্কৃতের পূর্ব অবস্থার শব্দ। যেমন, ঘোড়াকে মাঠে এক বার দৌড় করাইতে হইলে বলিত aika-wartana='অইক-র্বর্তন', অর্থাৎ সংস্কৃত 'এক-র্বর্তন', তিন বার দৌড় করাইবার কালে বলিত tera-wartana='তের(=তির বা ত্রি?)-র্বর্তন', তদ্রূপ panza-wartana=পঞ্চ-র্বর্তন, satta-wartana=সত্ত(='সপ্ত')-র্বর্তন, nawa-wartana=নব-র্বর্তন, ঘোড়াকে থামানোকে বলিত wasana 'রসন'। অন্য শব্দের মধ্যে পাইতেছি maria='মর্য' (বৈদিক শব্দ, অর্থ 'বীর' বা 'মানুষ'), tapashash='তপঃ' (উত্তাপ); দেবতার নাম=Shuriash=

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'সূর্যঃ', Maruttash='মরুত', Shugamuna=মহামারী অথবা জ্যোতির দেবতা, বৈদিক প্রতিরূপ 'শোকমনাঃ' ('শুচ্'-ধাতু দীপ্তি অর্থে, তাহা হইতে), Dakash=নক্ষত্রগণের পিতারূপে উক্ত দেবতা, সংস্কৃত 'দক্ষ' (=দক্ষ), Shimalia=*Zhimalia=উজ্জ্বল অর্থাৎ হিম বা তুষার-ধবল পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী, 'হিমালা', সংস্কৃত 'হিম'-শব্দের প্রাচীনতম প্রাক্-সংস্কৃত বা আর্য্য রূপ źhima এখানে পাইতেছি , Indara='ইন্দ্র', Mitra='মিত্র', Nashattiya ='নাসত্য' অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়, Uruwna বা Aruna='বরুণ' , এবং রাজাদের নাম, যথা Abirattash='অভিরথঃ', Shuzigash='সুজীগঃ', Artamanya='ঋতমন্য', Arzawiya='আর্জব্য', Aitagama= *'অইতগাম', বৈদিক 'এতগাম', Artashumara='ঋতস্মর', Shuwardata =*'স্বর্দাত' বা 'স্বর্দত্ত', Tushratta=Duzhratha='দুরথ', ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ ও নাম হইতে, ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা আসিবার পূর্বেই ইহার পূর্ব রূপ আর্য্য বা ভারত-ঈরানীয় ভাষা কিরূপে এশিয়া-খণ্ডের সভ্য জনমণ্ডলে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০—এই সময়ের মধ্যে আর্য্য জাতির জগৎকে আর কিছু দিবার ছিল না, এক অশ্ব-পালন ছাড়া, সুতরাং এই সময়ের মধ্যে অন্য জাতির উপরে আর্য্যদের প্রভাব, ভাষায় ও জীবনের অন্য দিকে তেমন কার্য্যকর হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ হইতে ১৩০০-র মধ্যে ইরাক হইতে আরও পূর্বে ঈরানে আর্য্যগণ আসিয়া উপনিবিষ্ট হইল, এবং ঈরান হইতে ভারতে আসিল। প্রাক্-বৈদিক ভাষা ইহাদের দ্বারা ভারতে আনীত হইল, উত্তর-পাঞ্জাবে ইহার প্রথম স্থাপনা হইল। ভারতে তখন অস্ট্রিক(কোল, মোন্-খ্মের)- ও দ্রাবিড-ভাষী লোকের বাস ছিল, ইহাদের মধ্যে দ্রাবিড-ভাষীরা নাগরিক সভ্যতায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। নবাগত আর্য্যগণ শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ লোক হইলেও, নাগরিক সভ্যতায় দ্রাবিডদের অপেক্ষা হীন ছিল বলিয়াই মনে হয়। অস্ট্রিকদের সভ্যতা মুখ্যতঃ গ্রামীণ সভ্যতাই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আর্য্যগণ আংশিক-ভাবে যাযাবর ও আংশিক-ভাবে কৃষিজীবী ছিল। পাঞ্জাবেই আর্য্যদের বাস বেশি করিয়া ঘটে, কারণ ভারতের এই অঞ্চল আর্য্যদের কেন্দ্র-স্থানীয় ঈরানের পাশেই অবস্থিত ছিল। (ব্যাপক অর্থে 'ঈরান' বলিলে, পারস্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান এই তিন দেশকেই ধরিতে হয়।) পাঞ্জাব হইতে আর্য্যগণ প্রথমটায় পূর্বদিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রসৃত হয়; পরে সিন্ধু প্রদেশে ও দক্ষিণে মরুদেশে, ও গুজরাটের এবং মহারাষ্ট্রের দিকে ইহাদের বিস্তৃতি ঘটে। গঙ্গার দেশে বেশী করিয়া অনার্য্যদের সঙ্গে আর্য্যদের মিশ্রণ ঘটে, এবং এই মিশ্রণের ফলে উত্তর-ভারতে একটি নবীন জাতি ও সভ্যতার উদ্ভব হয়—সেটি হইতেছে প্রাচীন ভারতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা। বৈদিক যুগের পর হইতে এই সভ্যতা ধীরে-ধীরে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ইহার সংগঠনে আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েরই আহৃত উপাদান মিলিত হয়। এই নবীন সভ্যতাকে 'পৌরাণিক হিন্দু' সভ্যতাও বলা যাইতে পারে। বৈদিক সভ্যতা—ঋগ্‌বেদ আদি চারি বেদ এবং ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি যাহার পরিচায়ক—তাহা হইতেছে মুখ্যতঃ আর্য্যজাতির জিনিস। ব্রাহ্মণ-যুগ হইতেই বেশি করিয়া জীবনে এবং ভাব-জগতে আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণ ঘটিতে থাকে। জৈন, বৌদ্ধ, এবং উত্তর কালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধের শেষ ভাগ হইতে যে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা আরভমান আর্য্য-অনার্য্যের মিলনের ফল।

এইভাবে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি সময়ে আর্য্য-অনার্য্য, বৈদিক-অবৈদিক অথবা হিন্দু সভ্যতা, একটি বিশিষ্ট বস্তু হইয়া দেখা দিল। আর্য্য জগতের প্রাচীন বৈদিক রূপ, আর্য্যদের বিশুদ্ধি, আর রহিল না, অনার্য্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জগৎ-ও আর অবিমিশ্র রহিল না। ভিতরে-ভিতরে বহু অনার্য্য ভাব, চিন্তাধারা ও অনুষ্ঠান এই নবীন মিশ্র সভ্যতায় স্থান পাইল। কিন্তু বাহির হইতে হইল আর্য্যের ভাষার জয়-জয়কার। উপর-উপর আর্য্য ভাষা ঠিক আছে বলিয়া মনে হইলেও, ইহাতে বহু অনার্য্য শব্দ প্রবেশ করিল, এবং নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ে ইহাতে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব আসিল, বৈদিক ভাষার ভাঙ্গন ধরিল। আর্য্যের বৈদিক ভাষা পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃতের রূপ ধারণ করিতে লাগিল—পূর্ব-ভারতেই এই পরিবর্তন একটু দ্রুত ঘটিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৫০০-৪০০ শতকে পশ্চিম-পাঞ্জাব অঞ্চলে—পাণিনির দেশে—প্রচলিত আর্য্য ভাষা তখনও বৈদিক যুগের ভাষা হইতে বেশি পরিবর্তিত হয় নাই। পাঞ্জাব অঞ্চলের এই 'লৌকিক' বা কথিত ভাষার আধারে, পাণিনির পূর্ববর্তী আচার্য্যদের এবং স্বয়ং পাণিনির চেষ্টায়, একটি সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিল, যেটি 'সংস্কৃত' নামে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল; এবং প্রথম-প্রথম বৌদ্ধ ও জৈনেরা পূর্ব-ভারতের ও মধ্য-ভারতের কথিত ভাষা, প্রাচীন প্রাকৃত (মাগধী, পালি ও অর্ধমাগধী) যদিও তাহাদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ব্যবহার করিত, তথাপি ক্রমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহারাও ব্রাহ্মণদের মতো সংস্কৃতকেও মানিয়া লইল। এদিকে সংস্কৃত ভাষা নিজেও প্রাকৃতের প্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ক্রমে ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন মুখ্য রূপে প্রকাশিত নবীন ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন হইয়া দাঁড়াইল। উত্তর-ভারতে মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য সংস্কৃতি বা সভ্যতা, যেমন-যেমন উত্তর-ভারত বা আর্য্যাবর্তের গণ্ডী বা সীমা ছাপাইয়া ভারতের অন্যত্র প্রসার লাভ করিতে লাগিল, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র পর হইতে, তেমনি-তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতও প্রসারিত এবং জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইতে লাগিল। এইভাবে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতা বিহার হইতে বাঙ্গালা-দেশে, আসামে ও উড়িষ্যায় আগমন করিল, সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্য ভাষাও তাহার সাহিত্যিক রূপ সংস্কৃতকে লইয়া এই-সমস্ত প্রদেশকে জয় করিল, স্থানীয় অনার্য্য ভাষার লোপ সাধন করিয়া অথবা সেগুলিকে কোণ-ঠেসা করিয়া দিয়া, এই প্রদেশগুলিকে আর্য্যাবর্তের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিল। সেই ভাবে গাঙ্গেয় মিশ্র আর্য্যানার্য্য বা হিন্দু সভ্যতা, আর্য্য ভাষা সংস্কৃতকে লইয়া দাক্ষিণাত্যেও পহুঁছিল, এবং উত্তর-মহারাষ্ট্রকেও আর্য্যাবর্তের অংশ করিয়া দিল। আরও দক্ষিণে, অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রবিড় বা তমিল দেশ ও কেরলে, আর্য্যাবর্তের সভ্যতা গৃহীত হইল, সংস্কৃতও গৃহীত হইল, কথা আর্য্য ভাষা প্রাকৃত কিন্তু অত দূর দক্ষিণে দ্রাবিড় ভাষাগুলির স্থান দখল করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রাকৃত ভাষার বহু শব্দ এই-সব দ্রাবিড় ভাষাতে স্থান পাইল,—আর সংস্কৃতের তো কথাই নাই। কতকগুলি বিশেষ ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে, সংস্কৃত শব্দ বিশুদ্ধতম ও প্রাচীনতম দ্রাবিড় ভাষা 'চেন্-তমিড্' বা প্রাচীন তমিলে যে-ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সেগুলিকে সংস্কৃত বলিয়া চিনিবার উপায় নাই, কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের আশ-পাশের শতকগুলিতে, এখন হইতে ১৮০০।২০০০।২২০০ বৎসর পূর্বে, সুদূর দক্ষিণ-ভারতে আদি-দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সংস্কৃত কি ভাবে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তমিলের এই-সব বিকৃত সংস্কৃতজ শব্দ হইতে বুঝা যায়। যেমন—'ঋষি' হইতে প্রাচীন তমিল 'ইরুটি', 'শ্রী' হইতে 'তিরু', 'স্নেহ' হইতে 'নেয়্' ও 'নেচম্', 'ব্রাহ্মণ' হইতে 'পিরামণন্', 'সহস্র' হইতে 'আয়িরম্', 'ধর্ম' হইতে 'তন্মম্' ও 'তরুমম্', 'সভা' হইতে 'অবৈ', 'সন্ধ্যা' হইতে 'অন্তি', 'শীর্ষ' হইতে 'ঈয়ম্', 'কৃষ্ণ' হইতে 'কিরুট্টিণন্' (এবং 'কৃষ্ণ'-শব্দের প্রাকৃত রূপ 'কণ্হ' হইতে 'কন্নন্')—এইরূপ শত-শত আছে, যেগুলি সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের উপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংস্কৃতের প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। এইভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা সুসভ্য দ্রাবিড় জনগণের ভাষাগুলিকে নিজ রাজচ্ছত্রের অধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, এখন হইতে ২০০০।১৮০০ বৎসর পূর্বেই।

নিখিল ভারত জুড়িয়া আর্য্য ও অনার্য্য উভয়-ভাষী লোকের মধ্যে এইরূপে সংস্কৃতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সাহিত্যের সংস্কৃত, 'লৌকিক সংস্কৃত' রূপ গ্রহণ করিবার অল্প কয়েক শতকের মধ্যেই। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতের আর্য্য ভাষার (বিশেষ করিয়া, ইহার প্রতীক এবং প্রাচীন ও সাহিত্যিক রূপ হিসাবে, সংস্কৃতের) দিগ্বিজয়, ভারতের বাহিরে আরম্ভ হইল। মুখ্যতঃ ব্যবসায়-সূত্রে, স্থল-পথে, হিন্দু-সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ উভয় মতের হিন্দু. ভারতের আশ-পাশের দেশ-সমূহে গতায়াত আরম্ভ করিল। সম্ভবতঃ হিন্দু সভ্যতার নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের পূর্ব হইতেই ভারতের অনার্য্যগণ অন্য দেশে যাওয়া-আসা করিত—বিশেষতঃ অষ্ট্রিক-জাতীয় অনার্য্যগণ স্থল-পথে ব্রহ্মদেশে ও জল-পথে মালয়-উপদ্বীপে, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, এবং শ্যামে ও কম্বোজে যাইত, এই-সব দেশে অস্ট্রিক অনার্য্যদের জ্ঞাতিদেরই বাস ছিল, তাহাদের সহিত প্রাগৈতিহাসিক সংযোগ কখনও ছিন্ন হয় নাই, এবং উত্তর-ভারত ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আর্য্য ও হিন্দু হইয়া গেলেও, সেই সংযোগ-সূত্র রক্ষিত হইয়াছিল, এবং আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল। হিন্দু যুগে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের কয়েক শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, সংস্কৃত ভাষা এইভাবে একদিকে যেমন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ঈরানে ও মধ্য-এশিয়ায় আর্য্যদের জ্ঞাতিদের মধ্যে, ঈরানীয় শাখার পার্থব ও পহ্লব, সুগ্‌দ বা সোগ্‌দীয় (অথবা সুলিক বা চুলিক), এবং কুস্তন বা খোতনের অধিবাসীদের মধ্যে, ও তাহাদের উত্তরে ঋষিক বা তুষার (তোখারীয়) জাতির মধ্যে, প্রসার লাভ করিল (মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়াই এই অঞ্চলে আর্য্যভাষার বিস্তার ঘটিয়াছিল), তেমনি অন্যদিকে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশে (দক্ষিণ ও মধ্য-ব্রহ্মের অষ্ট্রিক মোন্-জাতির মধ্যে, মধ্য-ব্রহ্মের এবং পরে উত্তর-ব্রহ্মের চীন-ভোট জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার ম্রন্-মা বা বর্মী জাতির মধ্যে), শ্যামে (দক্ষিণ-শ্যামের মোন্‌দের মধ্যে ও পরে উত্তর-শ্যামের চীন-ভোট জাতির শ্যাম-চীন শাখার দৈ বা থাই অথবা শ্যামীদের মধ্যে), কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যে, চম্পা বা কোচীন চীনের চাম জাতির মধ্যে, মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মালয়দের মধ্যে, যবদ্বীপে, মদুরায় ও বলিদ্বীপে, বোর্‌নিওতে, এবং সুদূর ফিলিপীন দ্বীপপুঞ্জে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে (হিন্দুত্ব এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় রূপেই প্রচারিত হইয়াছিল), সংস্কৃত ভাষাও নূতন-নূতন প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র লাভ করিল,—ঐ-সব দেশের ভাষা ভারতের দ্রাবিড ভাষাগুলিরই মতো সংস্কৃতের ছায়ায় আসিয়া সমবেত হইল। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের ও পরের কয়েক শতকের মধ্যেই, ওদিকে কাস্পিয়ান হ্রদ ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব-ঈরান ও আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপকে ধরিয়া, এদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক প্রভৃতি এবং বোর্নিও, সেলেবেস্ ও ফিলিপ্পীন পর্য্যন্ত লইয়া, এক 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া উঠিল, এই বৃহত্তর ভারতের লোকেরা (দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের লোকেবা বিশেষ করিয়া) ধর্মে ও সভ্যতায় ভারতীয হইয়া উঠিল, এবং সংস্কৃত তাহাদের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইল। তাহাদের ভাষা লিখিত ভাষা ছিল না, ভারতবর্ষ হইতে তাহারা বর্ণমালা ও লিপি গ্রহণ কবে, ভারতীয় লিপিতে তাহাদের ভাষা-সমূহ প্রথম লিখিত হইল। ভারতীয় পুস্তকের—বৌদ্ধ শাস্ত্রের এবং রামায়ণ-মহাভারতাদি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের—অনুবাদের সহায়তায় তাহাদের সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল বা সুদৃঢ কবা হইল, সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের রাজারা নিজ অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইতে লাগিলেন, ঠিক ভাবতবর্ষে যেমনটি হইত। তাহাদের ভাষা-সাহিত্য ভারতীয় [সংস্কৃত] সাহিত্যের আদর্শে পুষ্ট হওয়ার ফলে, এবং ভাবতীয় বণমালা গৃহীত ও ভাবতীয় লিপিতে তাহাদের ভাষা লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, সংস্কৃত শব্দ এই-সকল ভাষায় ভূরি-ভূরি প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ['তৎসম' শব্দ] ও বিকৃত-সংস্কৃত ['অর্ধতৎসম'] শব্দেব সদ্ভাবে, তাহাদেব ভাষা সমৃদ্ধ হইল, আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠীর মতো. তেলুগু কানাডী মালয়ালম্ তমিলের মতো, উচ্চভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ মধ্য-এশিয়ার খোতনী ভাষা ও তোখারী ভাষা আবশ্যক মতো সংস্কৃত হইতেই গ্রহণ কবিত (এ বিষয়ে সুগ্‌দ বা শুলিক ভাষা একটু স্বতন্ত্র ছিল, এই ভাষা ছিল সমৃদ্ধ পহ্লবী ভাষার ভগিনী, এইজন্য সংস্কৃত হইতে শব্দ ধার করার রীতি ইহাতে ততটা প্রবর্তিত হয় নাই), এবং মোন্ ও খ্মের ভাষা, চম্পার চরম ভাষা, পরবর্তী কালে বর্মী ও শ্যামী ভাষাদ্বয়, মালাই ভাষা ও বিশেষ করিয়া যবদ্বীপীয়, সুন্দ-ভাষা, মদুরী ও বলিদ্বীপীয়, সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন বিষয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিরই শামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সিংহলের সিংহলী ভাষা তো ভারতের আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অন্তর্গত—গুজরাট হইতে যে প্রাকৃত খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে সিংহলে নীত হয়, তাহা-ই পরে সিংহলী ভাষাতে পরিণত হয়,—প্রথম হইতে সংস্কৃত ও আর্য্য সংস্কৃতির সহিত ইহার অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল, এবং এখনও আছে।

সেরিন্দিয়া বা চীন-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের সোভিয়েৎ মধ্য-এশিয়া ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান; ইন্দিয়া মিনোর (ইণ্ডিয়া-মাইনর) বা লঘু-ভারত বা অগ্র-ভারত, অর্থাৎ এখনকার দিনের আফগানিস্থান; ইন্দোচীন বা ভারত-চীন, অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীন; মালায়া বা মালয় উপদ্বীপ, এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারত, এই-সমস্ত দেশ লইয়া, এশিয়ার এই বিরাট্ অংশে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি, প্রায় সমস্ত পণ্ডিত লোকে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এবং ব্রাহ্মণেরা, সংস্কৃত জানিতেন, সংস্কৃত বুঝিতেন। দ্বীপময়-ভারতের একজন যবদ্বীপীয় ও মধ্য-এশিয়ার একজন তোখারী ভিক্ষু তখন অক্লেশে সংস্কৃতের মাধ্যমে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারিতেন, এবং এই আলাপে ক্বচিৎ একজন চীনা ভিক্ষুও যোগদান করিতে পারিতেন। তিব্বত ও চীন, এবং চীনের শিষ্য কোরিয়া ও জাপান এবং তোঙ্-কিঙ্ ও আনাম [এখনকার ভিয়েৎ-নাম]—এই কয়টি দেশ নিজ-নিজ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল; এই দেশগুলি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেও, ভারতীয় রীতিনীতি এ-সব দেশের স্বকীয় ও প্রাচীন রীতি-নীতির উপরে ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতির উপরে সম্পূর্ণ-রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্-কিঙ্-আনাম-কে ঠিক 'বৃহত্তর ভারত' বলা যায় না—যদিও এই সব দেশের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই ছিল।

চীনে বৌদ্ধ-ধর্ম পঁহুছিয়াছিল প্রথমটা মধ্য-এশিয়ার কুস্তন (খোতন) ও তুষার (তোখারী) রাজ্যের লোকদের মারফৎ; পরে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগ ঘটে, এবং ভারত হইতে মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়া ও জল-পথে যবদ্বীপ হইয়া, ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক ও ধর্মগুরুগণ চীনে যাইতে আরম্ভ করেন; চীন হইতে উত্তরের স্থল-পথে ও দক্ষিণের জল-পথে বৌদ্ধ শ্রমণ তীর্থ-যাত্রীরাও ভারতে আসিতে আরম্ভ করেন। যে-সব ভারতীয় ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও প্রচারক চীনে গিয়াছিলেন, চীনাদের সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন এবং চীন-ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও জীবনী বহু স্থলেই চীনদেশে রক্ষিত হইয়া আছে; ইঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ করিয়া করিতে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—মধ্য-এশিয়ার তুষার-জাতীয় পণ্ডিত কুমারজীব (ইঁহার পিতা কুমার ছিলেন কাশ্মীরীয়, এবং মাতা জীবা ছিলেন তুষার-দেশের কুচী-নগরীর রাজ-কুমারী, পিতা ও মাতার নাম মিলাইয়া পুত্রের নাম হয় 'কুমারজীব'), এবং দক্ষিণ-ভারতের যোগী বোধি-ধর্ম। চীন-দেশীয় পণ্ডিত ভারত-যাত্রীদের মধ্যে ফা-হিয়েন (সংস্কৃত নাম—মোক্ষ-দেব), হিউয়েন্-ৎসাঙ্ (মহাযান-দেব) এবং য়ী-ৎসিঙ্ (পরমার্থ-দেব) সুপরিচিত। চীনা অনুবাদের প্রচার কোরিয়া, জাপান ও তোঙ্-কিঙ্-আনামেও হয়, কারণ ঐ দেশগুলির সভ্যতা ছিল মুখ্যতঃ চীনেরই সভ্যতা। চীনারা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে সংস্কৃতের চর্চা করিত; সংস্কৃত-চীনা অভিধানও কতকগুলি প্রণীত হয়; এই অভিধানগুলির সাহায্যে কোরিয়াতে এবং জাপানেও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাঝে-মাঝে সংস্কৃত পাঠ করিবার প্রয়াস পাইতেন। এইরূপ দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে সংকলিত হয়, ও অষ্টাদশ শতকে প্রাচীন পুঁথি হইতে কাঠে খোদাই করিয়া জাপান হইতে এইরূপ দুইখানি অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই দুইখানি অভিধান, মূল জাপানী সংস্করণের ছায়া-চিত্র প্রতিলিপি করিয়া ও ফরাসী ভাষায় নানা মূল্যবান্ টীকা টিপ্পনী দিয়া, পারিস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন—এই বই, ও চীন-দেশে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ডাক্তার বাগচী কর্তৃক লিখিত দুই খণ্ডের বিরাট্ পুস্তক, আধুনিক যুগে ভারতীয়দের মধ্যে চীন-ভাষার চর্চার প্রথম ফল। অভিধান দুইখানিতে প্রথম দেওয়া আছে চীনা শব্দ, তাহার নীচে সপ্তম শতকের ভারতীয় লিপিতে (যাহার সহিত ঐ যুগের ও পরবর্তী যুগের চীনারা ও জাপানীরা পরিচিত ছিল) সংস্কৃত শব্দটি (চীনা লিপির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত শব্দের অক্ষরগুলি উপর হইতে নীচে দেওয়া হইয়াছে), সংস্কৃত শব্দের পাশে চীনা অক্ষরের সাহায্যে প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ নির্দেশ—এইভাবে অভিধান রচিত হইয়াছে। একটি চীনা শব্দের একটি করিয়া মাত্র সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

ভোট বা তিব্বতীরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সুবিখ্যাত রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র রাজত্বকালে। ঐ সময়ে ভোট পণ্ডিত থোন্-মি-সম্ভোট ভারতবর্ষে আসিয়া প্রাচীন কাশ্মীরী লিপির আধারে ভোট বা তিব্বতী লিপির গঠন করেন। ভোট-ভাষায় সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হয়, এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র ব্যতীত অনেক অন্য সংস্কৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গ্রন্থও ভোট-ভাষায় অনূদিত হয়। ফলে, ভোটদের মধ্যে নিজ ভাষায় একটি বিরাট্ বৌদ্ধ সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনাদের লিপি ধ্বনি-নির্দেশক নহে; ইহা মুখ্যতঃ বস্তু-চিত্রময় ও ভাব-নির্দেশক বর্ণ-সমূহের সমষ্টি। বিদেশী ভাষার ধ্বনি চীনারা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত না, এবং তাহাদের লিখন-রীতি ধ্বনি-নিরপেক্ষ হওয়ায়, চীনারা বিদেশী নামেরও যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া নিজ ভাষার শব্দ করিয়া লইবার প্রয়াস পাইত; বিদেশী ভাষার শব্দের তো কথাই নাই। এইজন্য বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অল্প কতকগুলি সংস্কৃত নাম ও শব্দ যথাযথ সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা দেখা গেলেও, সাধারণতঃ তাবৎ সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দ চীনাতে অনূদিত হইয়াছে। 'বুদ্ধ' এই শব্দটি প্রাচীন চীনারা *Budh 'বুধ্' এই রূপে গ্রহণ করে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, এবং একটি বিশেষ বর্ণ বা চিহ্ন দ্বারা এই 'বুধ্' শব্দের নির্দেশ তাহারা করিত। বর্ণ বা চিহ্নটি অপরিবর্তিত রহিল, কিন্তু শতকের পর শতক ধরিয়া তাহার উচ্চারণ বা ধ্বনি পরিবর্তিত হইতে লাগিল, এবং সেই-সব পরিবর্তন ধরিবার কোনও উপায় তখনও ছিল না, এখনও নাই, বিশেষ গবেষণা করিয়া এখন তাহা স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ৫০০-র দিকে 'বুধ্' শব্দের চীনা উচ্চারণ *Bhyuwad 'ভ্যুঅদ্' বা *Bhyut 'ভ্যুৎ' হইয়া যায়, পরে *Bhut 'ভূৎ', এবং *Bhwat 'ভ্বাৎ, *Bhur 'ভূর্' প্রভৃতি বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে; এবং আজকাল চীনের বিভিন্ন প্রান্তে এই শব্দ Fu, Fo, Fat, Fwat 'ফু, ফো, ফাৎ, ফ্বাৎ' প্রভৃতি রূপে উচ্চারিত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে চীনাদের নিকট হইতে বর্মীদের পূর্বপুরুষগণ ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান-কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, তখন বুদ্ধ-বাচক চীনা শব্দ *Bhur 'ভুর্' তাহারা শিখিয়া লয়; খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে যখন বর্মী-ভাষা ভারতীয় লিপিতে প্রথম লিখিত হয়, তখন বর্মীরা ইহা Bhuraḥ 'ভূরাঃ' রূপে লেখে; এখনও বর্মীতে ঐ বানান-ই প্রচলিত আছে, তবে উচ্চারণ বদলাইয়াছে—আরাকানে 'ভূরাঃ' উচ্চারিত হয় Pharā 'ফরা' রূপে ও ব্রহ্মের অন্যত্র Phayā 'ফয়া' রূপে। এইভাবে সংস্কৃত শব্দটির বিকার, চীনাদের মধ্যে, ও চীনাদের নিকট হইতে ইহাকে লওয়ার পরে বর্মীদের মধ্যে, ঘটিয়াছে। চীনাতে যে অল্প কয়েকটি সংস্কৃত নাম গৃহীত হইয়াছে, সেগুলির আধুনিক উচ্চারণে প্রায়ই এইরূপ বিকার দেখা যায়; যেমন, 'ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মা'=প্রাচীন চীনা উচ্চারণে Bram 'ব্রম্' বা Bam 'বম্', আজকাল Fan 'ফান্', জাপানীদের মুখে Bon 'বোন্' বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Bong 'বোঙ্'; 'যক্ষ (=য়ক্ষ)', আধুনিক চীনায় Yat-sen 'য়াৎ-সেন্' (চীনা জন-নায়ক সুন্ য়াৎ-সেন্-এর ব্যক্তি-গত নামে এই সংস্কৃত শব্দটি-ই দেখা যায়—'সুন্'-বংশীয় 'য়াৎ-সেন্' বা 'যক্ষ' অর্থাৎ 'দেব'), 'সংঘ'=Seng 'সঙ্'; 'অমিতবুদ্ধ' (অমিতাভ)=O-mi-to-fo 'ও-মি-তো-ফো'; 'ব্রাহ্মণ' =প্রাচীন চীনা Ba-ra-mon 'বা-লা(বা-রা)-মোন্'=আধুনিক Po-lo-men 'পো-লো-ম্যান্', 'ধ্যান্' (প্রাকৃত 'ঝাণ')=আধুনিক উচ্চারণে Ch'an 'ছান্'; ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ সংস্কৃত শব্দ সংখ্যায় অতি অল্প; চীনাদের চেয়ে বরং জাপানীরা পরে আরও সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, এখনও করিতেছে। চীনারা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীদের নাম পাঠ করে; এইজন্যে শত-শত অনূদিত সংস্কৃত নাম ও শব্দ চীনা ভাষায় প্রচলিত থাকিলেও, সেগুলি আত্মগোপন করিয়া থাকে। 'অশ্ব-ঘোষ'-কে Ma-heng 'মা-হেঙ্' (অর্থাৎ 'ঘোড়ার হেষা') বলিলে, 'তথা-গত'-কে Ju-lai 'ঝূ-লাই' (অর্থাৎ 'সেই-পথে-যিনি-গিয়াছেন') বলিলে, 'অবলোকিত-স্বর(=অবলোকিতেশ্বর)'-কে Kuan-yin 'কুআন্-য়িন্' (অর্থাৎ 'যিনি কণ্ঠস্বরের দিকে অবলোকন করেন'), 'ধর্ম-সিংহ'-কে Fa-shih 'ফা-শিঃ', অথবা 'ক্ষিতি-গর্ভ'-কে Ti-tsang 'তী-ৎসাঙ্' বলিলে, সংস্কৃতজ্ঞ কাহারও পক্ষে চীনা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ধরা সম্ভবপর নহে। এই প্রাচীন রীতি—নামের অর্থের অনুবাদ, নামের ধ্বনি-নির্দেশ নহে—ধরিয়া-ই রবীন্দ্রনাথের চীনা-নামকরণ হইয়াছিল Chu Chen-tan 'চু চেন্-তান্' ('চু' অর্থাৎ 'থিয়েন্-চু'='সিন্ধু'-দেশ, India, ভারতবর্ষ; 'তান্' অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বা প্রভাতসূর্য্য=রবি, 'চেন্' অর্থাৎ বজ্র, বজ্রের দেবতা=ইন্দ্র)।

জাপান ও কোরিয়ার ভাষা এবং তোঙ্-কিঙ্-এর ভাষা চীনা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কিন্তু চীনা হইতে সহস্র-সহস্র শব্দ এই তিন ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, এবং চীন হইতে গৃহীত ভারতীয় (সংস্কৃত) শব্দ অথবা শব্দানুবাদ, এই তিন ভাষায় আগত এই-সমস্ত চীনা শব্দেরই অন্তর্গত। জাপান ও কোরিয়ার ভাষায় ও তোঙ্-কিঙের ভাষায় এই শব্দগুলির উচ্চারণ আবার অন্য ধরনের হইয়া গিয়াছে। এইরূপ শব্দের খুঁটিনাটি বিচারের আবশ্যকতা নাই। তবে জাপানীরা নূতন করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা আরম্ভ করিবার ফলে এবং নূতন করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করায়, আজকাল কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সরাসরি সংস্কৃত হইতে জাপানীতে আসিয়া গিয়াছে। জাপানে নাগরী লিপিতে প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, প্রধান-প্রধান উপনিষদ্ ও ভগবদ্-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গীতারও অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত নামগুলির যথাসম্ভব প্রাচীন চীনা অনুবাদ-ই ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, 'ধৃতরাষ্ট্র'=Ji-koku 'জি-কোকু' (='যিনি রাজ্যকে ধারণ বা রক্ষা করেন', চীনাতে Ti-kuo 'তি-কুও')। আধুনিক জাপানীতে প্রচলিত কতকগুলি নবীন ও প্রাচীন কালে আগত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত :—'বুদ্ধ'=প্রাচীন চীনায় Budh 'বুধ্', Bhyut 'ভ্যুৎ', তাহা হইতে প্রাচীন জাপানীতে Butu 'বুতু', আধুনিক জাপানীতে উচ্চারণে Bu-tsu 'বু-ৎসু', লেখাতে কিন্তু Bu-tu 'বু-তু', 'ব্রাহ্মণ'=Baramon 'বারামোঙ্', 'বসিষ্ঠ'=Bashi 'বাশী'; 'যম'=Yema 'য়েমা'; 'দুন্দুভি'=প্রাচীন জাপানীতে tudumi 'তুদুমি', আধুনিক জাপানীতে tsudzumi 'ৎসুদ্জুমি'; 'বৈরোচন'=Birushana 'বিরুশানা'; 'বৈদূর্য্য'=ruri 'রুরি' (='লুরি', 'বেলুরি, বেলুরিয়' হইতে); 'সূত্র'=Sutara 'সুতারা'; 'বোধি'=bodai 'বোদাই', 'সঙ্ঘারাম'=garan 'গারাঙ্'; 'প্রজ্ঞা'=প্রাচীন জাপানীতে pannya 'পান্ন্যা', আধুনিক জাপানীতে hannya 'হান্ন্যা'; 'ভিক্ষু, ভিক্ষুণী'=Biku, Bikuni 'বিকু, বিকুনি', 'সঙ্ঘ'=Sō 'সো' (অর্থ, 'পুরোহিত'), 'বেদ'=Bida 'বিদা', 'মণ্ডল'=Mandara 'মান্দারা, মাদারা' (অর্থ—'বর্ণ-মণ্ডল, বিভিন্ন রঙ্গের সমাবেশ'), 'সমাধি'=Samnmai 'সাম্মাই', 'শ্রমণ'=Shamon 'শামোঙ্'; 'পুণ্ডরীক'=hundarike 'হুন্দারিকে'; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই-সব শব্দ ও নাম বেশির ভাগ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতা ও ভাবাবলী সম্পর্কীয় শব্দ।

দ্বীপময়-ভারতের যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয়, মালাই প্রভৃতি ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ স্থান করিয়া লইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দ, যথা, শার্দূলবিক্রীড়িত, শিখরিণী, বসন্ততিলক প্রভৃতিও যবদ্বীপীয় ও বলিদ্বীপীয় ভাষায় বিশেষ প্রচলিত, বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যে। খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকের প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় মহাভারতের গদ্যানুবাদের আরম্ভ এইরূপ; ইহা হইতে প্রাচীনকালে যবদ্বীপে সংস্কৃতের প্রভাব অনুমান করা যাইবে—

> হন পুয় মঙ্কে বুবুসেন্, ইকঙ্ কাল তন্ হন্ আদিত্য চন্দ্র নক্ষত্র বায়ু আকাশাদিক, প্রলয় রি বেকস্ সংহারকল্প, প্রাপ্ত স্বঙ্ সর্গকাল প্রতিনিয়ত মিজিল্ স-প্রকার-ঞ্ ঙুনি ইচ্ছা সঙ্-হঙ্ তিনৃৎঞান্ হন কতেকান্ শব্দ সংহারধর্ম, সঙ্-হঙ্ শঙ্কর অতঃ কারণ-ঞান্ হন লাবন্ ভট্টারী দেহার্ধ, কারণ নির মপিসন্ লাবন্ ভট্টার ত্রিনেত্র শির, অন্ মুঙ্গিঙ্ কৈলাশ-শিখর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সদৃশ উত্তুঙ্গ সিদ্ধ প্রতিষ্ঠ, সাক্ষাৎ মণ্ডলম্ স-ভুবন ইকা তঙ্ পর্য্যঙন্ স্থান সঙ্-স্থঙ্।

দ্বীপময়-ভারতে প্রাচীন ও আধুনিক কালে সংস্কৃতের প্রচলন ও প্রভাবের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি; আমার 'দ্বীপময় ভারত' পুস্তকে (যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ ভ্রমণের কথায়) এ বিষয়ে উল্লেখ ও উদাহরণ মিলিবে। [শ্যাম-দেশ ভ্রমণের বিবরণ সহ এই পুস্তকের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, "রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ" নামে, 'প্রকাশ-ভবন', ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।] আমাদের দেশে হিন্দীর মতো, মালাই-ভাষা দ্বীপময়-ভারতে বহু প্রচলিত। মালাই-জাতির লোকেরা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে—আর তাহারা সংস্কৃত হইতে প্রাচীন কালের মতো শব্দ গ্রহণ করে না, সংস্কৃতের চর্চা তাহাদের মধ্যে আর নাই, তাহারা এখন আরবী ফারসী, ইংরেজি, ওলন্দাজ প্রভৃতি সব ভাষা হইতে শব্দ লইয়া থাকে; তথাপি সংস্কৃত শব্দ মালাই ভাষাতে ভূরি-ভূরি এখনও ব্যবহৃত হয়; এমন কি, 'আমি'-অর্থে যে শব্দ মালাই ভাষায় আজকাল প্রচলিত সেই saya 'সায়া' শব্দটি সংস্কৃত 'সহায়' শব্দের বিকার ('আমি' অর্থাৎ 'আপনার সহায় বা আপনার দাস',—এই বিনয়-প্রদর্শন হইতে 'সহায়' অর্থে 'আমি', যেমন 'আমি' না বলিয়া 'দাস' বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করা)। মালাই-ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত—'আগম (=ধর্ম), অল্প (গাফিলতি অর্থে), অংকার (=অহংকার, অর্থ জবরদস্তি, অত্যাচার), antara আন্তারা (=অন্তর, পার্থক্য), atau আতাউ (=অথবা), bahasa, basa বাহাসা, বাসা (=ভাষা), byakti ব্যাক্তি (=ভক্তি, অর্থ—সুকৃতি, সেবা), bengsa বাংসা (=বংশ, জাতি), biyasa বিয়াসা (=অভ্যাস), bijaksana বিজাক্সানা (=বিচক্ষণ, অর্থাৎ পণ্ডিত, জ্ঞানী), binasa বিনাসা (=বিনাশ), buta বুতা (ভূত), budi বুদি (=বুদ্ধি), bumi বুমি (=ভূমি), chahaya চাহায়া (=ছায়া, অর্থ—তেজ, দীপ্তি), chekrabala চেক্রাবালা (=দিক্-চক্রবাল), চিন্তা, চিন্তামানি (=চিন্তামণি, একরকম সাপ), chuku চুকু (চুক্র=সিরকা), deksina দক্সিনা (=দক্ষিণ দিক্), denda দেন্দা (=দণ্ড, জরিমানা), genta গেন্তা (=ঘণ্টা), harga হার্গা (=অর্ঘ, মূল্য), hasta হাস্তা (=হস্ত, দৈর্ঘ্যের পরিমাণ), jentera জেন্তেরা (=যন্ত্র), jelma জেল্মা (=জন্ম), kerna

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কারনা (=কারণ), kerja কের্জা (=কার্য্য), kosa কোসা (=অঙ্কুশ), maha মাহা (=মহান্), mengsa মাংসা (=মাংস), melati মেলাতি (=মালতীফুল), nadi নাদি (=নাড়ী), nama নামা (=নাম), papa পাপা (=দরিদ্র, পাপ), puteri পুতেরী (=পুত্রী, রাজকুমারী), রাজা, rupa রূপা (=রূপ), saksi সাক্সী (=সাক্ষী), sakti সাক্তি (=শক্তি, ঐশী শক্তি), segera সেগেরা (=শীঘ্র), sempurna সেম্পুরুনা (=সম্পূর্ণ), semua সেমুআ (=সমূহ), senjata সেঞ্জাতা (সংজাত=অস্ত্র), surga সুর্গা (=স্বর্গ), upaya উপায়া (=উপায়, পথ), ইত্যাদি।

ইন্দোচীনের মোন্ ও খ্মের এবং বর্মী ও শ্যামী ভাষায় ঐ প্রকার সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দেখা যায়। দ্বীপময়-ভারতের মতন এ অঞ্চলেও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ) ধর্ম ভারতবর্ষেরই মতো জনগণের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; রাজারা সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিতেন, রাজার অনুশাসন সংস্কৃতে হইত, দেশ ব্রাহ্মণের আদর্শে পরিচালিত হইত। মোন্ ও খ্মের জাতি প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে, পরে বর্মী ও শ্যামীরা ইহাদের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হয়। মোন্ ও খ্মের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে, কিন্তু এগুলি প্রায় সব সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত অবস্থায়। প্রাচীন মোন্ ভাষা হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের উদাহরণ দিতেছি ; আধুনিক মোন্ ভাষায় এগুলি আরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে, যথা—'কাল'='কাল্' ; 'শাস্ত্র'='সাস্' ; আরাধনা'='রাধনা' ; 'প্রতিসন্ধি'='পতিসন্' ; 'শীল'='সীল্' , 'ইন্দ্র'='ইন্' ; 'উদ্যান'='উদ্যা' ; 'ব্রাহ্মণ'='বুংনঃ' , 'মনুষ্য'='মনিস্' , 'নারদ'='নার্' ; 'ধর্ম'='ধর্' ; 'মাণিক্য'='মনিক্' ; 'রত্ন, রতন'='রং' , 'নগর'='নগির', আধুনিক মোন্ 'নাগোও' ; 'দোষ'='দোস্' ; 'অভিষেক'='বিসেক্' ; 'শঙ্খ'='সং' ; ইত্যাদি। কম্বোজের খ্মের ভাষার সংস্কৃত শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত, যথা—'ইন্দ্র'='ইন্, এইন্' ; 'গর্ভ'='কের্' ; 'অঙ্গ'='অং' ; 'দেবতা'=tepda 'তেপ্দা' ; 'পুরুষ'= pros 'প্রোস্' ; 'বংশ'='বং' , 'লোভ'='লোপ' ; 'শাসন' ('ধর্ম'-অর্থে)= 'সাস্' ; 'স্বর্গ'='স্বর্' ; 'রাক্'=peak 'পেআক্' ; 'নগর'=ankor 'আঙ্কর' ; 'কার্য্য'='কাপ্' ; 'শ্বেতচ্ছত্র'='স্বেতছং' ; পালি 'অস্সম' (আশ্রম)= 'অস্ম্' ; ইত্যাদি।

শ্যামী বা থাই জাতির লোকেরা বৌদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশ ভ্রমণ-কালে আমাকে সেখানকার একজন রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন—'জাতিতে বা রক্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা চীনাদের জ্ঞাতি, কিন্তু ধর্মে ও সভ্যতায় আমরা ভারতীয়।' শ্যাম-রাজ্যের সমস্ত কার্য্যে এখনও ভারতের ছাপ, সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। কম্বোজের খ্মের জাতির মধ্যেও তাই। ভৌগোলিক নাম বর্মা হইতে কাম্বোডিয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশ-ই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। বর্মী ও শ্যামী এবং মোন্ ও খ্মের ভাষায় এখনও উচ্চভাবের শব্দ সমস্ত-ই প্রায় সংস্কৃত ও ক্বচিৎ পালি হইতে লওয়া হয়। বর্মীদের প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকার নাম 'সূর্য্য' (পালি 'সূরিয়', বর্মী উচ্চারণে 'থুয়িয়া') ; জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের 'গালোন্' অর্থাৎ 'গরুড়' নামে অভিহিত করে। শ্যামী বা থাই জাতির রাজাদের নাম সংস্কৃত ; 'আনন্দ মহীদল' 'প্রজাধিপক', 'বজ্রায়ুধ', 'চূড়ালংকরণ', 'মহামুকুট' ; রাজবংশের নাম 'মহাচক্রী' বংশ। রাজ্যের নানা বিভাগের পদবী সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত—'রথচারণপ্রত্যক্ষ' (=রেল-বিভাগের ট্রাফিক-সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট্), 'বারিসীমাধ্যক্ষ' (=জলসেচ-বিভাগের পরিদর্শক), 'রিজিতরাজভৃত্যাধিকার' (রাজার খাস বিভাগের কর্মচারীর খেতাব)। সাধারণ বহু বস্তুর নামও সংস্কৃত—'আকাশযান' (উচ্চারণে 'আগাৎ-ছান্') =বিমান বা হাওয়াই জাহাজ, 'দূরশব্দ' (উচ্চারণে 'থোরো-সাপ্') =টেলিফোন, 'শতাংশ' (উচ্চারণে 'সিতাঙ্') ='সেণ্ট' নামে মুদ্রা, টিকল্ বা বাৎ অর্থাৎ শ্যামী টাকার শত ভাগের এক ভাগ। এই সব সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ-বিকৃতির জন্য কানে শুনিয়া ধরা মুশ্‌কিল হয়, কিন্তু শ্যামী বর্ণমালায় লিখিত রূপ দেখিয়াই এগুলি কোন্ ভাষার তাহা সহজে বুঝা যায়। 'অরণ্য-প্রদেশ'-কে 'আরাঞ্-পাথেৎ', 'সমুদ্র-প্রাকার'-কে 'সমুৎ-বাখান', 'ব্রজপুরী'-কে 'ফেচাবুরী', 'রাজপুরী'-কে 'রাৎবুরী' রূপে উচ্চারণ করাতে, এই শব্দগুলির স্বরূপ লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। শ্যামদেশে বিদেশী (ইউরোপীয়) পারিভাষিক শব্দাবলীর জন্য শ্যামী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত হইতে নূতন করিয়া পারিভাষিক শব্দ আবশ্যক-মতো গঠন করিয়া শ্যামী ভাষায় প্রয়োগ করিতেছেন। এইরূপ কতকগুলি শব্দ আমাদের দেশেও বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতিতে গৃহীত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, 'এক শ্যামী বিদ্যার্থী'-রচিত প্রবন্ধ, কলিকাতার 'বিশাল ভারত' নামক হিন্দী পত্রিকার ১৯৪১ সালের জুন মাসের সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হয়; পরে কাশীর 'নাগরী প্রচারিণী সভা পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৯৯৮ সংবতের, ৪৬ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায়, এই প্রবন্ধ আলোচিত হইয়াছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সিংহলের সিংহলী ভাষা আমাদের বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী মারাঠীর মতোই আর্য্যভাষা; ইহাতে বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃত ও পালির প্রভাব অব্যাহত ছিল। সিংহলী ভাষার উচ্চ ভাবের প্রায় তাবৎ শব্দ সংস্কৃতের।

প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার তোখারী ভাষা ও খোতনী ভাষা, সংস্কৃতের মতো ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সংস্কৃতের জ্ঞাতি-ই ছিল। এই দুইটিতে ভারতবর্ষীয় লিপি ব্যবহৃত হইত, সেইজন্য সংস্কৃত শব্দের আগমন সহজ ছিল। কিন্তু এগুলিতেও সংস্কৃত শব্দ, স্থানীয় উচ্চারণ-মতো বিকৃত হইত। খ্রীষ্ট-জন্মের পরে কয়েক শতক ধরিয়া উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের যে উচ্চারণ ছিল, তৎসম্বন্ধে, খোতনী ও তোখারী ভাষায় বর্ণ-বিন্যাস-রীতি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের পরিবর্তনের ধারা বিচার করিয়া, আমরা কতকটা আভাস পাইতে পারি। খোতনের পূর্বে 'ক্রোরৈন' নামে একটি রাজ্য ছিল, এখানে, এবং খোতনে, উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আগত হিন্দুদের উপনিবেশ ছিল; সেইজন্য তাহাদের ভাষা—উত্তর-পশ্চিমের প্রাকৃত—এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত রাজকীয় দলিল-পত্রে সরকারী ভাষা হিসাবে খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের এবং পরের কয়েক শতক ধরিয়া এই প্রাকৃত পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তুর্কী-ভাষী লোকদের প্রসারের ফলে মধ্য-এশিয়ায় তোখারী, খোতনী এবং উত্তর-পশ্চিমীয় প্রাকৃত—এই তিনটি আর্য্য ভাষার বিলোপ ঘটে। এখন কেবল প্রাচীন নগর-সমূহের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত এই-সব ভাষায় লিখিত কাগজ-পত্রে ও লেখ-সমূহে প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় ভাষার (বিশেষ করিয়া সংস্কৃতের) প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া যায়।

তিব্বত মধ্য-এশিয়ারই অংশ, কিন্তু তিব্বতের ভাষা চীনের ভাষার সহিত সম্পৃক্ত, ইহা অনার্য্য ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা। তিব্বতীরা ভারতীয় বর্ণমালা গ্রহণ করায়, ইহাদের ভাষাতে সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় শব্দের প্রবর্তন সহজ-সাধ্য ছিল। কিন্তু জ্ঞাতি চীনাদের প্রদর্শিত পথেই তিব্বতীরা চলিল; ইহারা সংস্কৃত শব্দ ও নাম গ্রহণ না করিয়া, চীনাদের মতন এই শব্দ ও নাম-সমূহের তিব্বতী অনুবাদ ই ব্যবহার করিতে লাগিল। বড়ো-বড়ো এবং কঠিন-কঠিন সংস্কৃত বই, পুরাপুরি নিজেদের শব্দ দিয়া, একটিও সংস্কৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শব্দ ধার না করিয়া, ইহারা অনুবাদ করিতে লাগিল। ভাব লইল, ভাষা লইল না। তিব্বতীদের মধ্যে সম্ভবতঃ মুখে-মুখে গান, গাথা বা গদ্য-কাব্য প্রচলিত ছিল, একটা জাতীয় সাহিত্য ও সুনির্দিষ্ট শব্দ-গঠন-রীতি তাহাদের ছিল। সেইজন্য হয়-তো ইহারা বিদেশী সংস্কৃতের শব্দ ধার করা আবশ্যক মনে করে নাই। এই হেতু চীনাদের মতো ইহাদের মধ্যেও ভারতীয় নাম-সমূহ অনুবাদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। যেমন—'বুদ্ধ' এই নামটিকে ইহারা অনুবাদ করিল Sangs-rgyal 'সঙ্স্-র্গ্যল্' অর্থাৎ 'জাগ্রত (=বুদ্ধ) রাজা' (আজকালকার উচ্চারণে, Seng-gye 'সেঙ্-জে' রূপে এই শব্দটি বলা হয়); 'প্রজ্ঞাপারমিতা'=Shas-rab-pha-rol-tu 'শস্-রব্-ফ-রোল্-তু'. 'অমিতাভ'=Ḥod-dpag-med ':ওদ্-দ্পগ্-মেদ্' (আজকালকার উচ্চারণে ö-pa-me 'ওা-প্যা-মে'); 'বিষ্ণু'=Khyab-jug 'খ্যব্-জুগ্', 'ভারত'=Rgya-gar 'র্গ্য-গর্'; 'সরস্বতী'=Dbyangs-chan-ma 'দ্ব্যঙ্স্-চন্-ম', 'অবলোকিতেশ্বর'=Spyan-ras-gzigs 'স্পান্-রস্-গ্জিগ্স্' (আধুনিক=Chen-re-si 'চেন্-রে-সি'), 'তারা'=Sgrol-ma 'স্গ্রোল্-ম' (=Ḍol-ma 'ডোল্-মা'); ইত্যাদি। কিন্তু এত করিয়া ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিলেও, 'র্গ্য-গর্-স্কদ্' অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার মোহে ইহারা বেশ পড়িয়াছিল; তিব্বতীদের পূজা-পাঠে সংস্কৃত মন্ত্র কিছু-কিছু ব্যবহৃত হয়, এবং 'ওঁ মণি পদ্মে হুং' মন্ত্রটিকে তো তিব্বতী বৌদ্ধদের সর্বত্র এবং সর্বজন-কর্তৃক ব্যবহৃত জাতীয় মন্ত্র বলা চলে।

মোঙ্গোল ও তুর্করাও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে, তুর্করা এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোঙ্গোলদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় ধর্ম বজায় আছে, তবে তাহারা তিব্বতীদের নিকট হইতে এই ধর্ম পায় বলিয়া, তাহাতে সংস্কৃত অপেক্ষা ভোট-ভাষা বা তিব্বতীর প্রভাব-ই বেশী। তুর্কীদের প্রাচীন ভাষাতে দুই-চারিটা মাত্র সংস্কৃত শব্দ ও নাম ঢুকিয়াছিল; তুর্কীরা তিব্বতীদের ও চীনাদের মতো শব্দ ধার-করার চেয়ে শব্দ সৃষ্টি-করার দিকেই বেশী ঝুঁকিত। তুর্কীদের ভাষাতে আগত দুইটি সংস্কৃত শব্দ পারস্য-দেশ ঘুরিয়া ফারসী শব্দ রূপেই ভারতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; একটি সংস্কৃতের 'ভগধর' শব্দ, 'ভাগ্যবান্' বা 'শ্রেষ্ঠ পুরুষ' ও পরে 'বীরপুরুষ' অর্থে; তুর্কীতে ইহার 'বগদির্, বগাদির্', প্রভৃতি বিকার ঘটে, ও শেষে ঈরানে ইহা 'বহাদুর' শব্দে পরিণত হয়; আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় আমরা ফারসী হইতে ইহাকে 'বাহাদুর' রূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গ্রহণ করিয়াছি। আর একটি শব্দ হইতেছে 'ভিক্ষু'-শব্দ ; তুর্কী ও মোঙ্গোল ভাষায় ইহার একটি রূপ হয় 'বাক্শী'। আগে নিরক্ষর যাযাবর তুর্কী ও মোঙ্গোলদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা-ই অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন হইতেন, এবং গতিকে তাঁহারা-ই সরকারী হিসাব-পত্র রক্ষার জন্য (বিশেষতঃ ফৌজের কাজে) নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে শব্দটির অর্থ দাঁড়াইয়া গেল, 'হিসাব-নবীশ', এবং ফারসীতে ইহার বিশেষ অর্থ দাঁড়াইল, 'সৈন্যদলের খাজাঞ্চি'। (ইংরেজি clerk শব্দের উৎপত্তিও অনুরূপ—ইহা মূলে cleric অর্থাৎ 'সাধু বা সন্ন্যাসী' শব্দ হইতে।) ফারসীতে এই শব্দ 'বখ্শী' রূপ ধারণ করিল, এবং 'বখ্শী' হইতে আমাদের বাঙ্গালা পদবী 'বক্শী' বা 'বক্সী'।

মধ্য- ও উত্তর-এশিয়ায় এবং পূর্ব- ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা দ্বীপময়-ভারতে যে ভাবে সংস্কৃত ভাষা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বাহন হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইন্দোচীন, দ্বীপময়-ভারত ও সিন্-কিয়াঙে যে ভাবে সংস্কৃত প্রায় দেব-ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, ঈরানে (পারস্যে) সে ভাবে সংস্কৃতের প্রসার বা প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। সংস্কৃতের মাতৃস্থানীয়া ইন্দো-ঈরানীয় বা আর্য্যভাষা প্রথমটায় উত্তর-ইরাকে ও এশিয়া-মাইনরের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ও পরে স্থানীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ভারতে সংস্কৃতের প্রতিষ্ঠার পরে, ভারতীয় আর্য্যদের নিকট জ্ঞাতি ঈরানীরা, Akhaimenes বা হখামনীষীয়-বংশের সম্রাট্‌দের সময়ে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র দিকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজা হইয়া বসে, রাজার ভাষা বলিয়া তাহাদের ভাষার প্রভাব, ভারতের ভাষা প্রাকৃতের উপরে কতকটা পড়িয়াছিল ; কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব প্রাচীন পারসীকে বা অবেস্তার ভাষায় বিশেষ করিয়া পড়ে নাই।

তাহার পরে গ্রীকদের সহিত ভারতীয়দের পরিচয়—দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক সম্রাট্ আলেক্সান্দরের অধীনে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র স্থাপন করে, গ্রীক রাজারা কয়েক শতক ধরিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বাহ্লীকে এবং ঈরানে রাজত্ব করেন ; তখন গ্রীক ভাষা ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে লেন-দেন চলিয়াছিল—কিছু-কিছু গ্রীক শব্দ আমাদের প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে আসে, এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ গ্রীকেও যায়। তবে গ্রীকদের নিকট হইতে, পশ্চিম হইতে আমদানি কতকগুলি জিনিসের নাম ছাড়া, জ্যোতিষের কতকগুলি শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংস্কৃতে আসিয়াছিল; কিন্তু ভারত হইতে পশ্চিমে রপ্তানি হইত এমন কতকগুলি বস্তুর নাম ছাড়া. কোনও দর্শন বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শব্দ গ্রীকেরা সংস্কৃত হইতে লয় নাই। 'কস্তীর' (=টিন, গ্রীকে Kassiteros 'কাস্‌সিতেরস্'), 'মুষ্ক' (=কস্তুরী, মৃগনাভি, গ্রীকে moskhos 'মস্‌খস্'), 'শর্করা' (গ্রীকে Sakkharon 'সাক্‌খারন্'=প্রাকৃত 'সক্করা'), 'তমালপত্র' (গ্রীকে malabathron 'মালাবাথ্‌রন'), 'কটুক-ফল' (গ্রীক Karuophullon 'কারুওফুল্লন্', প্রাকৃত 'কড়ুঅফল'), 'ব্রাহ্মণ' (গ্রীকে Brakhmenes 'ব্রাখ্‌মানেস্') প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ শর্করার দেশ; আখ হইতে রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় ও চিনি তৈয়ারের প্রণালী ভারতবর্ষ-ই প্রথম আবিষ্কার করে, এবং পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ভাষায় চিনি ও মিসরীর নাম ভারতের 'শর্করা' ও 'খণ্ড' এই দুইটি সংস্কৃত শব্দের বিকার হইতে জাত (যেমন ইংরেজি sugar-candy, ফারসী 'শকর-কন্দ'= 'শর্করা-খণ্ড'); কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমরা ভারতের এই দুই নিজস্ব বস্তুকে বিদেশী বস্তু বলিয়া অভিহিত করি—'চিনি' অর্থে চীনদেশ-জাত বস্তু,—'চীনী', এবং 'মিসরী' অর্থে 'মিসরদেশ-জাত'।

খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে ভারতের সহিত ঈরানের ঘনিষ্ঠ যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে অব্যাহত ছিল। ইহার পরে মুসলমান যুগে ফারসী ও আধুনিক পারসীক ভাষা, তুর্কী ও ঈরানী বিজেতার সরকারী ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল; তখন ফারসী-ই নিজে উত্তর-ভারতের ভাষাসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু খ্রীষ্ট-জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে এবং তাহার পরে সংস্কৃত ও প্রাকৃত তথা আধুনিক ভারতীয় ভাষার শব্দ ফারসীতেও গৃহীত হইয়াছে —বিশেষ করিয়া ভারতীয় বস্তুর নাম, যে-সব বস্তু ভারতের পশ্চিমে রপ্তানি হইত। ফারসীতে নীত এইরূপ ভারতীয় অথবা সংস্কৃত শব্দের নমুনা— Shakar 'শকর্' (=শর্করা), Kirbas 'কির্‌বাস্' (=কার্পাস), but 'বুৎ'=(মূর্তি, 'বুদ্ধ'-মূর্তি), 'নার্‌গীল্' nārgil (=নারিকেল), 'শমন্' (=শ্রমণ, বৌদ্ধ পুরোহিত), barahman 'বরহ্‌মন' (=ব্রাহ্মণ), Samandar 'সমন্দর্' (=সমুদ্র), 'চন্দন', lak 'লক্' (=লাক্ষা, গালা), 'নীল্', Babar 'ববর্' (=ব্যাঘ্র), 'শত্‌রঞ্জ্, চত্‌রঙ্গ্' (=চতুরঙ্গ), 'শাঘল্' (=শৃগাল), 'রায়্' (=প্রাকৃত 'রাঅ, রায়'=রাজা), ইত্যাদি। আবার এইরূপ শব্দ দুই-চারিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরবীতেও গিয়া পুহুঁছিয়াছে, যেমন—nārjīl 'নার্‌জীল' (=ফারসী 'নার্‌গীল্' =নারিকেল), 'শকর্' (=শর্করা), kāfūr 'কাফ্‌র' (=কর্পূর), 'সন্দল' (=চন্দন), misk 'মিস্ক' (=মুষ্ক, মৃগনাভি), janzābīl 'জনজাবীল' (=আদা, সংস্কৃত 'শৃঙ্গবের'), ইত্যাদি। গণিতে ও জ্যোতিষে এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় ভারতবর্ষ মধ্য-যুগের ঈরান ও আরবের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু যদিও ভারতীয় (সংস্কৃত) পুস্তক-সমূহ পহ্লবী ও আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল, ভারতীয় শব্দ তেমন পহ্লবী ও আরবীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ক্বচিৎ ভারতীয় নাম বিকৃত অবস্থায় আরবী ও ফারসীতে স্থান পাইয়াছে, ইহা সত্য বটে; যেমন—'করটক-দমনক', পহ্লবীতে Kalalag-Damnag 'কললগ্-দম্নগ্', আরবীতে Kalilah-Dimnah 'কলিলহ্-দিম্নহ্', 'বিদ্যাপতি' (প্রাকৃত 'বিদ্দাপই')=Bidpay 'বিদ্‌পয়্', বিদ্‌বয়্', 'সিদ্ধান্ত'=Sind-hind 'সিন্দ্‌হিন্দ'; 'চরক'=Sanaqa 'স্বনক্ক', ইত্যাদি। মুসলমান ধর্মের গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সূফী সাধকগণের সাধনা, দর্শন ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সূফী মতবাদের উৎপত্তিতে একদিকে যেমন আরবের 'তৌহীদ' অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর সাধনা ভিত্তি-স্বরূপ ছিল, তেমনি অন্য দিকে গ্রীসের দার্শনিক প্লাতোন্-এর চিন্তা ও তদনুবর্তী নব্য-প্লাতোনীয়দের মতবাদ ইহার মধ্যে দার্শনিকতা আনিয়া দেয়; এবং ইহার বিশিষ্ট কথা, Pāntheism বা সর্বভূতে-ব্রহ্ম-বাদ, বিশ্বপ্রপঞ্চ-মধ্যে ব্রহ্মসত্তা সদা ক্রীড়মাণ, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম মূলে এক, বিশ্বসৃষ্টি পরব্রহ্মের লীলা মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি, ভারতের ব্রাহ্মণ্য চিন্তার দান, অথবা ব্রাহ্মণ্য চিন্তার বেদান্তের প্রভাবের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুরঞ্জিত। কিন্তু এই-সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব (অন্ততঃ আংশিক ভাবে) ভারত হইতে সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন খ্রীষ্টীয় ৯০০-র পরে প্রসারিত হয়, তখন সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী আরবী ও ফারসী ভাষাতে গৃহীত হয় নাই। আরবী ভাষা বাহিরের শব্দ সিরীয়, ফারসী (পহ্লবী) ও যুনানী (গ্রীক) হইতে প্রচুর পরিমাণে লইয়াছে; কিন্তু মাঝে ফারসীর ব্যবধান থাকাতে, সংস্কৃত শব্দ সোজাসুজি আরবীতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই; আর ফারসী তখন সম্পূর্ণ-রূপে আরবীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার প্রসাদোপজীবী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মধ্য-যুগে ভারতের পশ্চিমে ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শন অল্প-বিস্তর প্রসৃত হইলেও, ভারতের ভাষা সংস্কৃত সেরূপে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই; আরবী ও ফারসীর পৃষ্ঠপোষক মুসলমান তুর্কী ও ঈরানীদের ভারত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিজয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা, বিজিত, মূর্তিপূজক ও বিজেতার চোখে হেয় হিন্দু জাতির ভাষা বলিয়া, ঈরানী তুর্কী ও আরবের কাছে আর তাহার যোগ্য সমাদর পায় নাই। (অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ অল্-বীরূনীর মতো দুই-চারিজন উদার-হৃদয় পণ্ডিতের কথা আলাদা।) এই হেতু, পূর্ব এশিয়ার মতো পশ্চিম-এশিয়ায় সংস্কৃতের জয়জয়কার ঘটিতে পারে নাই।

এইরূপে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতের গতি এশিয়া-খণ্ডে চলিয়াছিল। শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ভাষা হিসাবে, মৌলিক দৃষ্টি ও চিন্তার ভাষা হিসাবে, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশের ভাষা হিসাবে, পৃথিবীতে তিনটি ভাষার স্থান আছে—সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা। আরবী মুখ্যতঃ গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক দৃষ্টি ও চিন্তার বাহন; আরবীতে নিহিত আধ্যাত্মিক অবলোকন ও প্রকাশ জগতে নূতন বস্তু ছিল না। এই হিসাবে সংস্কৃত ভাষা সভ্যতার ও সচ্চিন্তার পোষণে সহায়তা করিয়াছে, ও ইহাতে ভারতের মর্য্যাদার বৃদ্ধি করিয়াছে। সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া চীনারা নিজ ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়, প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে; ভারতীয় ভাষার অর্থাৎ সংস্কৃতের বর্ণমালা ও ভারতীয় লিপি দেখিয়া কোরিয়ান ও জাপানীরা নিজেদের ভাষার জন্য ধ্বনি-নির্দেশক লিপির উদ্ভাবন করে। সংস্কৃতের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালা ও লিপি মধ্য-এশিয়ায়, ইন্দোচীনে ও দ্বীপময়-ভারতে বহু জাতি কর্তৃক গৃহীত হয়।

আজকাল নূতন করিয়া ইউরোপে এবং অন্যত্র সংস্কৃতের ও সংস্কৃত বিদ্যার, সংস্কৃত চিন্তার আলোচনার ফলে, সংস্কৃতের দার্শনিক ও অন্যবিধ শব্দ এখন বিশ্ব-মানবের ভাষার সাধারণ ভাণ্ডারে উপনীত হইতেছে। আধুনিক কালে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চার প্রথম ফল—আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানের উদ্ভব, আর্য্য জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা। 'গুণ, বৃদ্ধি, স্বরভক্তি, সন্ধি, সমাস, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ' প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাকরণের শব্দ এখন আন্তর্জাতিক হইয়া গিয়াছে। রুষ রসায়নবিৎ Mendelyeff মেন্দেল্যেফ্ তাঁহার আবিষ্কৃত Periodic Law বা 'পর্য্যায়-সূত্র' নামক বিশেষ সূত্রে সংস্কৃতের 'এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ' প্রভৃতি সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। 'ধর্ম', 'কর্ম', 'সংসার', 'অহিংসা', 'বুদ্ধ', 'নির্বাণ', 'বোধি', 'ব্রহ্মা' ও 'ব্রহ্মন্', 'শিব', 'নটরাজ', 'শক্তি', 'অবতার', 'আত্মন্', 'স্বরাজ', 'স্বস্তিক', 'স্বদেশী', 'মহাযান', 'হীনযান', 'বেদ', 'বেদান্ত', 'উপনিষদ্' প্রভৃতি শব্দ পৃথিবীর সর্ব-জাতির শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত হইতেছে। সেদিন একখানি জাপানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'নূতন শব্দের অভিধান' (A Dictionary of New Terms)-এ আমাদের 'স্বরাজ, স্বদেশী, সত্যাগ্রহ, বন্দে-মাতরম্' শব্দগুলিও স্থান পাইয়াছে দেখিলাম। এ-সমস্ত শব্দ আজকাল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মারফৎ বিশ্বজনসমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ ছাড়া, ভারতীয় (সংস্কৃত ও অন্য) ভাষার অপর বহু শব্দ গত ৪৫০ বৎসর ধরিয়া পোর্তুগীস্ ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজদের মারফৎ ইউরোপে নীত হইয়াছে ॥

শারদীয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা"
বঙ্গাব্দ ১৩৫০

[পরলোকগত অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা "মঞ্জূষা"-র ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যায়, এশিয়া ভূখণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার বিষয়ে আমার রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকগুলি হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রসার বিষয়ে একটি দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে। শ্লোকগুলি এখানে তুলিয়া দেওয়া হইল। বাঙ্গালাতে প-বর্গীয় 'ব' (=b) এবং অন্তঃস্থ 'ব' (=v বা w), উচ্চারণে ও আকৃতিতে অভিন্ন, কিন্তু সংস্কৃতে এই দুইয়ের উচ্চারণ পৃথক্। উভয়ের এই উচ্চারণ-পার্থক্য নির্দেশ করিতে, উদ্ধৃত শ্লোক-গুলিতে অন্তঃস্থ 'ব' (=v বা w)-স্থানে 'ব' এবং প-বর্গীয় 'ব' (=b)-স্থানে 'ৰ' ব্যবহার করা হইয়াছে।]

। সংস্কৃত-দিগ্বিজয়ঃ ॥

[অধ্যাপক-শ্রীসুনীতিকুমার-দেবশর্ম-চট্টোপাধ্যায়-বিরচিতঃ]

আর্য্যাণাম্ পিতৃভূরাসীৎ পুরোত্তরকুরোঃ পরে।
কৌকসং গিরিমুল্লঙ্ঘ্য প্রাপ্তাস্তে ধাম বৈ নবম্ ॥ ১ ॥

['উত্তরকুরু'=মধ্য-এশিয়া (সিন্-কিয়াঙ, Sin-kiang), 'কৌকস'=ককেশস্ পর্বতমালা, Caucasus Mountains।]

তিগ্রা-সুপ্রাতু-নদ্যোর্বা অন্তর্বেদী যদুচ্যতে।
তত্রাসুর-ৰবেরুভ্যঃ প্রাপ্তবন্তঃ কলাঃ ৰহু ॥ ২ ॥

['তিগ্রা'=প্রাচীন পারসীক 'তিগ্রা'=অসুর-বাবিল ভাষায় Diglat 'দিগ্‌লাৎ', আরবী ভাষায় 'দিজ্‌লাহ্'=Tigris নদী; 'সুপ্রাতু'=প্রাচীন পারসীক 'উফ্রাতু'=অসুর-বাবিল ভাষায় Puratu 'পুরাতু'=আরবী 'ফুরাৎ'=

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Euphrātēs নদী ; 'অস্থর'=Ashshur 'অশ্‌শুর'=Assyrian ; 'ববেরু'=পালি জাতকে Baveru 'ববেরু'='বাবিলু'=Babylonian ।]

ছান্দসস্য হি যা মূলম্ আর্য্যবাগ্ বৈ প্রবৈদিকী।
প্রাপ্য সা ভারতং বর্ষং রূপং জগ্রাহ সংস্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

['প্রবৈদিকী আর্য্যা বাক্'=প্রাগ্‌বৈদিক আর্য্য ভাষা (Pre-Vedic Aryan Speech) ।]

নিষাদৈর্ দ্রমিডৈশ্চাপি কিরাতৈঃ পরিবর্ধিতা।
সা সংস্কৃতাভিধা ভাষা দেবভাষাপদং গতা ॥ ৪ ॥

['নিষাদ' (Niṣāda)=অষ্ট্রিক(Austric)-ভাষী কোল ও অন্যান্য জন , 'দ্রমিড়' (Dramiḍa)=দ্রাবিড়-ভাষী জন (Drāviḍa) ; 'কিরাত' (Kirāta)=মোঙ্গোল (Mongol) বা ভোট-চীনা-ভাষী জন ।]

বিদ্যাবৈভবসম্পন্না সাহিত্যকলয়ান্বিতা।
মণ্ডলে সর্বভাষাণাম্ আসীৎ সা চক্রবর্তিনী ॥ ৫ ॥
বাল্মীকি-ব্যাসয়োঃ কীর্তির্ যদীয়ে মূর্ধ্নি বর্ততে।
ঋষিভির্ বহুভির্ যাসীৎ কবিভিঃ সেবিতা সদা ॥ ৬ ॥
মণ্ডিতা যোগিভিঃ সিদ্ধৈর্ ভক্তৈ র্লোকহিতৈর্বিভিঃ।
আচার্যৈঃ পণ্ডিতৈঃ সদ্ভির্ যা চ নীতাঽমৃতম্ পদম্ ॥ ৭ ॥
সর্বেভ্যো ভূমিপুত্রেভ্যো জাতাঃ সন্তি হি যেঽমৃতাৎ।
নিঃশ্রেয়সস্য লাভায় দিশন্তী বিবিধান্ পথঃ ॥ ৮ ॥
বিনিঃসৃতা ভারতাৎ সা ভূত্বা সংস্কৃতিবাহিনী।
ঋষিবদ্ধজিনাচারং ততানাখিলকৃষ্টিষু ॥ ৯ ॥
গম্ভীরা ললিতা বাণী পুষ্প-বজ্র-স্বরূপিণী।
ধৃতা শিরসি যত্নেন সর্বৈর্ভূলোকবাসিভিঃ ॥ ১০ ॥
সিংহলেঽভিজগামাথ দক্ষিণং নবমালয়ম্।
কম্বুজেষথ চম্পায়াম্ রামণ্যেষু চ সর্বতঃ ॥ ১১ ॥

['সিংহল' (Ceylon)=লঙ্কা ; 'কম্বুজ'=খ্মের-জাতির দেশ, কাম্বোডিয়া (Cambodia) ; 'চম্পা'=চাম্-দেশ, বর্তমান দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের অন্তর্গত ; 'রামণ্য' (Rāmaṇya)=পালি 'রামঞ্ঞ' (Rāmaññā)= Rmeñ 'র্‌মেঞ্' বা Mon 'মোন্' জাতির দেশ, দক্ষিণ- ও মধ্য-ব্রহ্ম এবং দক্ষিণ-শ্যাম ।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং বসন্তি যে প্রাচ্যাং সুদুর্ধর্ষাঃ কিরাতজাঃ।
শ্যাম-ব্রহ্ম-সমাখ্যাতা দৈ-ম্রন্মা-সংজ্ঞকা হি যে ॥ ১২ ॥

['দৈ' (Dai)='থৈ' (Thai) 'থাই' বা শ্যামী (Siamese) অর্থাৎ শ্যামদেশীয় ; 'ম্রন্মা' (Mranmā)='ম্যম্মা', 'ব্যম্মা'=ব্রহ্ম বা বর্মী ;—ইহারা ভাষায় 'কিরাত', অর্থাৎ ভোট-চীনা-ভাষী (Sinc-Tibetan)।]

রামণ্য-কম্বুজেভ্যশ্চ যৈর্লব্ধোত্তরকালতঃ।
সংস্কৃতা প্রাকৃতা গীশ্চ ভারতীয়াঽপি সংস্কৃতিঃ ॥ ১৩ ॥
আগ্নেয়ে বিদ্যতে কোণে সাগরো দ্বীপশোভিতঃ।
তত্র নীতা ররাজৈষা ভাষা রাজ্ঞীব ভারতী ॥ ১৪ ॥

['আগ্নেয়-কোণ'=পূর্ব-দক্ষিণ কোণ (South-East)।]

সেবিতাসীচ্চ বর্হিণ্যাং স্বর্ণদ্বীপে তথান্যতঃ।
যবদ্বীপে বলিদ্বীপে পূজিতা চ বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥

['বর্হিণী' (Barhiṇī)=বোর্নিও (Borneo) ; 'স্বর্ণ-দ্বীপ'=সুমাত্রা (Sumatra) ; 'যব-দ্বীপ'=Java ; 'বলি-দ্বীপ' (অথবা 'বলি-অঙ্ক')=Bali ।]

অধুনাপ্যর্চনারীতির্ বহুশো দৃশ্যতে জনৈঃ।
শ্যামাদিপ্রাচ্যদেশেষু দেশে দ্বীপময়েঽপি চ ॥ ১৬ ॥
আসিয়ায়াস্তথা মধ্যে যে যে দেশা ভবন্তি বৈ।
আর্য্যানার্য্যা জনাস্তত্র সিতপীতাদিবর্ণতঃ ॥ ১৭ ॥
তেষাম্ মধ্যে ভারতীয়া যেঽভবন্নার্য্যভাষিণঃ।
কুস্তনং নগরং তত্র স্থাপয়িত্বাঽবসন্ পুরা ॥ ১৮ ॥

['কুস্তন'=Khotan খোতান-এর প্রাচীন সংস্কৃত নাম।]

ধর্মং সংস্থাপয়ামাসুস্ তত্র তে বুদ্ধদেশিতম্।
এবং ব্রাহ্মং চ বৌদ্ধঞ্চ বচনং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯ ॥
জনেষূদীচ্যদেশেষু তদাভূচ্চিত্রকীর্তিষু।
প্রসারঃ সংস্কৃতের্ নো বৈ প্রেয়সে শ্রেয়সেঽপি চ ॥ ২০ ॥
অভূৎ ক্ষেত্রমসৌ দেশঃ কৃষ্টীনাং সংগমস্য বৈ।
ভারতস্য চ চীনস্য পর্শোশ্চ যবনস্য চ ॥ ২১ ॥

['অসৌ দেশঃ'=Serindia ; 'পর্শু' (Parśu)='পর্শ্ব', 'পর্শ্ব'=পারসীক (Persian) , 'যবন'=Iavones, Iōnes=Ionian, য়ুনানী বা গ্রীক।]

জনাস্তত্রাঽবসন্ যেঽপি শকাশ্চ সুলিকাস্তথা।
আর্য্যাণাং যবনানাঞ্চ ঋষীকা জ্ঞাতয়শ্চ যে ॥ ২২ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

['শক' = Skuthes = Scythian ; 'সুলিক' (Sulika) = সোগ্‌দীয় পারসীক, Sogdian Iranian ; 'ঋষীক' (Ṛṣika) = উত্তর সিন্‌-কিয়াঙে কুচা (Kucha) ও কারা-শার (Qara-shahr)-এ অধিষ্ঠিত ইন্দো-ইউরোপীয়গণ, তথাকথিত 'তোখারীয়' (Tokharian)।]

কিরাতজাতিজা ভোটাস্ তুরুষ্কা মঙ্গলাস্তথা।
কোরয়াশ্চ মহাচীনা যমতো-বংশজাশ্চ বৈ ॥২৩॥

['ভোট' (Bhōṭa) = 'বোদ্' (Bod) বা তিব্বতী, মূলে মোঙ্গোলীয় (কিরাত) ; 'তুরুষ্ক' (Turuṣka) = তুর্ক ; 'মঙ্গল' = মোঙ্গোল ; 'কোরয়' = কোরীয়, Korean , 'মহাচীন' (Ta-Ts'in) = চীন-দেশ ; 'যমতো' = Yamato জাপানী।]

কৈবল্যদায়িনী ভাষা সর্বৈরেতৈঃ সমাদৃতা।
অনূদিতা ক্বচিজ্জাতা চীন-ভোটানুগামিনী ॥২৪॥
যবনেষ্বপি সা ভাষা প্রস্থতা প্রিয়দর্শিষু।
বিদ্যাভ্যো জ্যোতিষাদিভ্যো যৈরাসীৎ সমলংকৃতা ॥২৫॥
আরব্য-পারসীকেষু মানিতা জ্ঞানদায়িনী।
গণিতং জ্যোতিষং শাস্ত্রম্ আখ্যানং বৈদ্যকং তথা ॥ ২৬ ॥
তেভ্য এতানি দত্তানি জ্ঞানঞ্চাধ্যাত্মিকং মুদা।
জীবব্রহ্মৈকতা প্রোক্তা ব্রহ্মনির্বাণিকা তথা ॥ ২৭ ॥

['আরব্য-পারসীক' = মধ্যযুগে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রমন্যাস ও দর্শনের (সূফীবাদের) চর্চায় আরব ও পারসীকেরা সংস্কৃতবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়।]

এবং পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে চ জনা যে শক্তিসাধকাঃ।
তেষাং যে বংশজাঃ সন্তি পাতালে জনমেজয়াঃ ॥ ২৮ ॥

['পাশ্চাত্ত্য-খণ্ড' = ইউরোপ ; 'পাতাল' = আমেরিকা।]

বাণীয়ং তৈর্গৃহীতাঽপি ভবেৎ কালোপযোগিনী।
যোগক্ষেমস্য সত্যস্য শাশ্বতস্য চ সিদ্ধয়ে ॥ ২৯ ॥
সমগ্রজনজাতানাং হিতপ্রিয়বিধায়িনী।
গীরিয়ং ভারতীয়া সা সদাস্তু স্বস্তিবর্ধিনী ॥ ৩০ ॥

"মঞ্জুষা"
৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা
খ্রীষ্টাব্দ, ১৯৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ একবার আমায় লিখেছিলেন—"প্রকাশ আমার ধর্ম। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, যেমন আমার প্রকাশ এক দিকে হ'য়েছে, তেমনি গানে আর সুরেও হ'য়েছে, ছবি-আঁকায় হ'চ্ছে, আর নাট্যাভিনয়েও হ'য়েছে।" বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত আর বিশ্বম্ভর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এত বিভিন্ন পথ ধ'রে ঘ'টেছিল যে, তা ভাব্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। যে কয়টি পথের কথা তিনি নিজে উল্লেখ ক'রেছিলেন, সে কয়টি ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিভা আরও কত বিভিন্ন প্রকারের কর্মে বা চেষ্টায় আপনাকে প্রকাশিত ক'রেছিল! কবি, ঔপন্যাসিক, নৈবন্ধিক,—তাঁর এই-সমস্ত সাহিত্যিক পরিচয় তো বিশ্ব-বিখ্যাত, এবং তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় ছিল কবি ও লেখক হিসাবেই। কিন্তু তার স্বদেশ-বাসী এবং স্বভাষা-ভাষীদের সকলেই সংগীতকার—'বাগ্‌গেয়কার' আর 'কলা-বিশুদ্ধ গীতির স্বর-সংযোগের স্রষ্টা'—ব'লে সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে আর ভালো-বেসে এসেছে। যাঁদের সে সৌভাগ্য জীবনে ঘ'টেছে, তাঁরা নাট্যাভিনয়ের প্রযোজক আর নাট্যাভিনেতা হিসাবেও রঙ্গমঞ্চে তাঁকে দেখেছেন; আর তাঁরা স্বীকার ক'র্‌বেন যে—সেখানেও তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর কলমে-আঁকা অদ্ভুত রসের ছবিগুলির মধ্যে এক-একখানি মানুষের মুখ আবার অপূর্ব মানবিকতা-রসে ভরপুর ছিল—অল্প-সংখ্যক সমঝদার রসিক-জনের কাছে সেগুলি সম্মান লাভ ক'রেছে; শিল্পীরাও তাঁর হাতের কাজ এই-সব ছবির সমাদর ক'রেছেন। নীরস শব্দতত্ত্বের আলোচনায় তিনি বাঙলা ভাষায় পথিকৃৎদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন, শাব্দিকেরাও এবিষয়ে তাঁকে তাঁদের একজন প্রধান নেতা ব'লে মেনে নিয়েছেন। এ-সমস্ত বিদ্যা আর সুকুমার শিল্পের বাইরেও, তাঁর একটা বিরাট্ কর্মি-জীবন ছিল, তার পুরা আলোচনা এখন সম্ভবপর হবে না। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে, চিন্তা আর কর্ম, দুই পথেই নিজের শক্তি সার্থক-ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি শিক্ষাব্রতী এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। কৃষি, শিল্প আর শিল্প-বিষয়ক তাঁর উদ্যোগ শ্রীনিকেতনে দেখা দিয়েছিল। নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর পাশেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অবস্থিতি ক'রে এসেছেন। বিভিন্ন জাতির মানুষকে মিলিয়ে' দেবার পথে যে-সমস্ত শক্তি বিগত শতক-পাদের অধিক ধ'রে কাজ ক'রে এসেছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই-সমস্ত শক্তির এক প্রধান উৎস—আর বোধ হয়, সারা পৃথিবীর এত নানা জাতি আর সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে, তাঁর রচনা আর তাঁর বিশ্বমানবিকতার বাণীর জন্য, তিনি-ছাড়া আর কেউ এতটা প্রিয় আর এতটা আপনার হ'তে পারেন নি।

সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংগীত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমার মতো লোকের কিছু ব'ল্‌তে যাওয়া ধৃষ্টতা। তবে আমি নিজেকে, রবীন্দ্রনাথ যাঁর পরিচয় বাঙালী পাঠকসমাজে করিয়ে' দিয়ে গিয়েছেন, সেই "উকীল শ্রীযুক্ত দুকড়ি দত্ত" মহাশয়ের সঙ্গে পুরাপুরি এক পর্য্যায়ের মানুষ ব'লে মনে করি না, কারণ সত্যসত্য-ই আমার "গান জিনিসটা শুন্‌তে বড়ো ভালো লাগে।" কেন ভালো লাগে, তার বিশ্লেষণ কর্‌বার চেষ্টা কখনও করি নি; তবে কী ভালো লাগে, ধীরে-ধীরে তার একটা বিচার ক'র্‌তে পেরেছি। রাগ বা সুরের জ্ঞান আমার নেই, 'কানেড়া রাগ' কি 'নাকেড়া রাগ', তাও ঠাওর ক'র্‌তে পারি না। তবে একটা জিনিস ছেলেবেলা থেকেই আমাকে পেয়ে ব'সেছে—সেটা হ'চ্ছে ধ্রুপদের সরল সবল স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বর-রেখার সমাবেশ।

আট-নয় বছর বয়স, এখন থেকে ৪৪।৪৫ বছর পূর্বেকার কথা। আমার মামার-বাড়ি হাওড়া শহরের অন্তর্গত শিবপুরে—তখন শিবপুর ছিল একখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, তার নিজ বিশিষ্টতা আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল; এই গ্রাম বহু চট-কলের আর পশ্চিমা কুলিদের ধাক্কায়, শালিমার-কারখানার আর রেল-লাইনের চাপে, এখন Cosmopolitan Greater Calcutta-র এক বিশিষ্টতা-বিহীন অংশ মাত্র হ'য়ে প'ড়্‌ছে। তখন শিবপুর ছিল, বাঙলা দেশের হৃদয় আর মস্তিষ্ক স্বরূপ ভাগীরথীতীরবর্তী ভদ্রগ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম; এখানে ভাগ্যবান্‌দের ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, কথকতা আর 'শখের যাত্রা'র পাট ছিল (এক নগর-কীর্তন ছাড়া বৈঠকী রস-কীর্তন তখন প্রচলিত হয়নি), সংস্কৃত-বিদ্যার চর্চা ছিল—আর ছিল, উচ্চ অঙ্গের সংগীতের চর্চা। 'কাণা নিকুন' নামে পরিচিত অন্ধ গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত তখন শিবপুরের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন, ক'ল্‌কাতা থেকে, আর অন্য দূর-দূর জায়গা থেকে তাঁর ডাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আস্‌ত, আর অন্য নামী কালোয়াত্‌ গায়ক অনেকগুলি ছিলেন, পাখোয়াজী অনেক ছিলেন—তাঁদের নাম ছেলেবেলায় শুনেছি, তাঁদের কতবার মামার-বাড়িতে দেখেছি, গান-বাজনাও তাঁদের অনেক শুনেছি—কিন্তু অন্য কারও নাম মনে রাখ্‌তে পারিনি। আমার দুই মামা ছিলেন, দু'জনেই কালোয়াতি গানের সাধক ছিলেন। তাঁদের আমলে, মামার-বাড়িতে প্রায়-ই শনিবার রবিবার গানের মজলিস ব'স্‌ত; যে-সময়ে মায়ের সঙ্গে আমরা মামার-বাড়িতে যেতুম, সে-সময়ে এই-সব মজলিসের এক পাশে উপস্থিত থাক্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'ত। ১৮৯৯ সাল, তখন আমার বয়স আট-নয় বছর, ক'ল্‌কাতায় তখন ভীষণ প্লেগের প্রকোপ,—আমরা প্রায় একটি বছর শিবপুরে মামার-বাড়ির কাছেই আমাদের একটি বাড়িতে ছিলুম, আমার পিতা শিবপুর থেকে নৌকো ক'রে ক'ল্‌কাতায় আপিস ক'র্‌তেন,—তখন এই-সব গানের জলসায় সপ্তাহে দু-বার ক'রে অন্ততঃ জমা হ'তে পারতুম। অন্যান্য মাস্‌তো ভায়েদের সঙ্গে, বাড়ির ভাগ্‌নে হিসাবে আমাদের প্রতিপত্তি আর দাপট ছিল খুব-ই। কর্তা ব্যক্তিদের অসাক্ষাতে তানপুরা খোলা পেলেই তার তার নিয়ে টানাটানি, আর পাখোয়াজের ময়দার তাল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আর লোফালুফি, এ-সব তো ছিল-ই। কালোয়াতি গানের—ধ্রুপদ আর খেয়ালের—চর্চা যখন হ'ত, সব সময়ে যে ভালো লাগ্‌ত ব'ল্‌তে পারি না, টপ্পা অবধি চ'ল্‌ত, বোধ হয় এঁরা ঠুমরি-গজলে নাম্‌তেনই না—সে-সব তখন শুনি নি। মাঝে-মাঝে বাঙলা গান হ'ত (পরে বুঝেছি, সে-সব ছিল নিধুবাবুর টপ্পা), আর কেউ হয়-তো বাড়ির মেয়েদের খুশী কর্‌বার জন্য এক-আধখানা 'শ্যামা-সংগীত' গাইতেন; ধ্রুপদ-খেয়ালের গণ্ডী কখনও-কখনও এই ভাবে দয়া ক'রে কেউ অতিক্রম ক'র্‌তেন। এক-এক সন্ধ্যায় বড়ো গোছের জলসা হ'ত, তখন নানা লোক আস্‌তেন, মামার-বাড়ির সামনের সরু গলি-পথে অনেকগুলি ঘোড়ার-গাড়ি জমা হ'ত। রবিবার দিন কখনো-কখনো সারা দিন ধ'রে গানের মজলিস চ'ল্‌ত,—গায়ক-বাদকদের কেউ-কেউ থেকে যেতেন, মামার-বাড়িতেই তাঁদের মাধ্যাহ্নিক সেবা হ'ত। তখন চায়ের রেওয়াজ ছিল না, পান তামাক হর-দম চ'ল্‌ত।

এই রকম সংগীতের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাল্যকাল অতিবাহিত হ'চ্ছিল। একদিন বর্ষাকালের দুপুর বেলা, আকাশে খুব মেঘ জ'মেছে, বৃষ্টিও ঝুপ্‌ঝুপ্‌

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ক'রে প'ড়্ছে, বাইরে গিয়ে দৌড়-ধাব ক'রে খেল্বার সময় সেটা নয়—তখন আধ-খানা না'রকেল-মালায় দড়ি বেঁধে খড়ম ক'রে প'রে, খড়মে-বাঁধা দুই দড়ি দু হাতে ধ'রে, সেই খড়ম পায়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ক'র্তে-ক'র্তে ছোটাছুটি করা শিবপুর গ্রামের ছেলেদের একটা প্রিয় খেলা ছিল। মামার-বাড়ির বৈঠকখানায় অন্ধ নিকুঞ্জ দত্ত তানপুরা নিয়ে ধ্রুপদে একখানা মেঘ-মল্লার ধ'রেছেন, একজন পাখোয়াজ ধ'রেছেন, আর অন্য দু-তিনটি মাত্র শ্রোতা চুপ ক'রে শুন্ছেন—সেই ধ্রুপদখানি-ই যেন তখন-ই আমায় চিরতরে ভারতবর্ষের ধ্রুপদ সংগীতের কেনা গোলাম ক'রে নিলে—

ঘোরে ঘোরে বরখত বদরবা।

ধ্রুপদের মোহ কখনও কাটিয়ে' উঠ্তে পারি নি। বহুদিন পরে, আমার এক মামাতো ভগিনীপতি, শিবপুরের ছেলে ব'লে তিনিও উচ্চাঙ্গের সংগীতের চর্চা ক'র্তেন, তাঁর কাছে অনুরোধ ক'রে তাঁর চমৎকার কণ্ঠে গাওয়া দু-চার খানি ধ্রুপদ বার-বার শুনেছি—

তীন গ্রাম সপ্ত সুর ইকইস মূরছনা। প্রভৃতি।

ক'ল্কাতায় সুকিয়াস্-রো-তে আমাদের বাড়ির পাশেই সংগীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাসা নিলেন, তখন কয়েক বছর ধ'রে তাঁর ওখানে ধ্রুপদ-খেয়ালের জলসায় হাজির থেকে সংগীত-রস আস্বাদনের সুযোগ হ'য়েছিল।

ধ্রুপদ ভালো লাগ্বার কারণ বোধ হয়, সবল এবং নিরাভরণ সৌন্দর্য্যের প্রতি, grand style-এর রচনার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ; যে-জন্য প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্য, হিন্দুযুগের মহাবলিপুরম আর ঘারাপুরীর ভাস্কর্য্য, পৃথিবীর সব জাতির বড়ো-বড়ো উপাখ্যান বা মহাকাব্য; অনাবশ্যক বচন-বিস্তার বা ভাবের মার-পেঁচ না দেখিয়ে' সহজ সোজা ভাবে অনুভূত আর চীনা কবিতার মতো সরল কবিতার রূপে প্রকাশিত রস-বস্তু; বাস্তুশিল্পের বিরাট্-বিরাট্ সৃষ্টি-সমূহ—যেমন গ্রীক দোরীয় রীতির মন্দির, হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির, তাজ, প্রাচীনতম যুগের বিজান্তীয় ও গথিক গির্জা, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির, তঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির;—এই-সব জিনিস ভালো লাগে। বিশেষ ক'রে তানসেনের ধ্রুপদ কেন ভালো লাগে, তার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রেছিলুম কয়েক বৎসর পূর্বে, "কবি তানসেন" নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিয়ে একটি প্রবন্ধে ('প্রবাসী' মাসিক পত্রিকার ১৩৪০ সালের বৈশাখ-মাসের সংখ্যায় এটি বেরিয়েছিল)।*

প্রাচীন ভারতের সংগীতের পুরাতন কোনও নমুনা এ পর্য্যন্ত সুরক্ষিত হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় নাচের একটা ধারণা ক'রতে পারা যায়, উদয়গিরি ভারহুৎ সাঁচীর আর মথুরা অমরাবতীর খোদিত চিত্র থেকে, অজণ্টা বাঘ গুহার আঁকা ছবি থেকে। সামগানের যে ধারা এখনও পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে, তা থেকে এক ধরনের অতি বিশিষ্ট ধর্ম-সংগীতের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সাওঁতাল মুণ্ডা টোডা প্রভৃতি অনুন্নত জাতির স্বকীয় গানের সুর থেকে ভারতেব আদিম অধিবাসীদের গানের ধাঁজটাও অনুমান করা যায়। সংগীত-সম্বন্ধে প্রাচীনতম সংস্কৃত বই কোনোটি-ই খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর ওদিক্‌কার নয়। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম দুই-তিন শতকের মধ্যে লেখা শূদ্রকরাজার 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে, নায়ক চারুদত্ত অনেক রাত ধ'রে গান শুনে বাড়ি ফির্‌ছেন—তিনি পথে চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে সঙ্গী বিদূষক মৈত্রেয়ের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাবে গায়ক বেভিলের প্রশংসা ক'র্‌ছেন—

রক্তং চ নাম মধুরং চ সমং স্ফুটং চ
ভাবান্বিতং চ ললিতং চ মনোহরং চ।
কিংবা প্রশস্তবচনৈর্বহুভির্মৃদুক্তৈর্
অন্তর্হিতো যদি ভবেদ্, ন নিতেতি মন্যে॥

তার গান এত সুন্দর যে, যদি গায়ক চোখের বাইরে থাকেন, মনে হয় কোনও নারী গাইছে। এতে গানের পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের চেয়ে মহিলোচিত মাধুর্য্যের প্রশংসাই দেখ্‌ছি। এ জিনিস মৈত্রেয়ের ভালো লাগে নি—তিনি ব'ল্‌ছেন—

মণুস্সো বি কাঅলীং গাঅন্তো, সুকণ্ঠ-সুমণো-দাম-বেট্‌ঠিদো বুড্ঢ-পুরোহিদো বিঅ মন্তং জবন্তো, দিঢং মে ণ রোঅদি॥

'পুরুষ-মানুষ যদি কাকলি গায়, তা-হ'লে শুখনো ফুলের-মালা মাথায় জড়িয়ে' বুড়ো পুরোহিতের মন্ত্র-জপ করার মতন, আমার তা মোটেই ভালো লাগে না।'

---

* 'মিত্র ও ঘোষ' হইতে প্রকাশিত লেখকের 'ভারত-সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধ-সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে (বঙ্গাব্দ ১৩৭০) এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বীণা বাজিয়ে' উজ্জয়িনীর বিদগ্ধজন-সভায় ভাব-রেভিল যে গান গেয়েছিলেন, তার ঠাট কী ধরনের ছিল, তা জান্‌বার উপায় নেই। দুষ্মন্তের অন্যতমা রাণী হংসপদিকা বীণা বাজিয়ে' যে 'বর্ণপরিচয়' বা মূর্ছনা রাজাকে উদ্দেশ ক'রে শোনাচ্ছিলেন, তাও কী ধরনের ছিল তা বল্‌তে পারা যায় না। মহাকবি বাণভট্ট অরণ্যের মধ্যে শিবের মন্দিরের অলিন্দে তরুণী তাপসী মহাশ্বেতার গানের বর্ণনা ক'রেছেন—শ্রীযুক্ত [অধুনা পরলোকগত] প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের গদ্য-কবিতাময় সুন্দর বঙ্গানুবাদে সেই বর্ণনাটুকু উদ্ধার ক'রে দেবার লোভ সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌ছি না—

> সেই মেয়েটির কোলের উপর, চন্দ্রাপীড় দেখ্‌তে পেল, প'ড়ে র'য়েছে হাতীর-দাঁতে গড়া একখানি বীণা। দক্ষিণ করের অঙ্গুলিগুলি বীণার তারের উপর লীলাভরে চ'লেছে খেলে, আর কম্পিত অধরের অবকাশ দিয়ে ঝ'রে প'ড্‌ছে দেব বিরূপাক্ষের বন্দনাগান—সেই বীণাতন্ত্রীঝংকারমিশ্র অমানুষিক স্বরলালিত্য।
>
> সাক্ষাৎ যেন গন্ধর্ববিদ্যা।
>
> গীতরবে আকৃষ্ট হ'য়ে মন্দিরদ্বারে স্থির হ'য়ে বসে আছে মৃগ বরাহ সিংহ—অনেক প্রাণী—আর বীণার ঝংকারের মাঝে মাঝে উঠ্‌ছে সেই অষ্টাদশবর্ষীয় প্রবাল-অধরের গান।
>
> চন্দ্রাপীড়ের মনে হ'ল—
>
> "……যে গান শুন্‌ছি সে গান মর্ত্যের নয়—নিশ্চয় গন্ধর্বলোকের।…"
>
> তারপরে সমাপ্ত হ'ল গীত।
>
> স্তব্ধ হ'ল বীণা, যেন শান্ত হ'ল কুমুদিনীকে ঘিরে ভ্রমরের মধুগুঞ্জন।
>
> মেয়েটি তখন উঠে শিবপ্রদক্ষিণ ক'রে নত হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌ল।

এই রকম গানের সুর-লয় যদি পাওয়া যেত! কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সে বীণাধ্বনি চিরতরে স্তব্ধ—তার ক্ষীণ ধারা হয়-তো আমাদের মধ্য-যুগের সংগীতে একটু-আধটু ঝংকৃত হ'চ্ছে।

উত্তর-ভারতের রাজপুত ছবি থেকে, পশ্চিম-বাঙলার শ্রেষ্ঠ পুঁথির পাটা থেকে, যেমন বাঘ অজন্টার ভিত্তি-চিত্রের ধারণা, ঘারাপুরী-কৈলাস-মহাবলিপুরম্‌-বাদামীর, মথুরা-অমরাবতীর আর ভারহুৎ-সাঁচীর খোদিত-চিত্রের ধারণা, সম্পূর্ণ ভাবে করা যায় না; তেমনি বোধ হয় আকবর-তানসেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময়ের, খ্রীষ্টীয় ১৬-র শতকের, হিন্দু সংগীত ধ্রুপদ থেকে (যে ধ্রুপদ গুরু-পরম্পরায় কতকটা তার তিন-চার শ' বছরের ধাঁজটুকু এখনও পর্য্যন্ত অনেকটা বজায় রেখেছে এ অনুমান করা অসংগত হবে না), খ্রীষ্টীয় ৭ম বা ৩য় অথবা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২য় বা ৩য় শতকের প্রাচীন ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে পুরা বোধ হওয়া অসম্ভব। 'সংগীতদর্পণ' প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-বিষয়ক বই থেকে, উত্তর-ভারতের ধ্রুপদ আর দক্ষিণ-ভারতের 'পদম্' আর 'কীর্তনম্'-এর মতো প্রাচীন বা প্রাচীন-গন্ধী সংগীত-রীতি থেকে, তার কতকটা অনুমান মাত্র ক'র্‌তে পারা যায়; 'সংগীতদর্পণ' প্রভৃতি প্রাচীন বই (আমাদের বাঙলা দেশের আর নেপালের বৌদ্ধ পুঁথিতে আঁকা ছবি অজন্টার আভাস যেমন কতকটা দেয় সে-রকম ভাবে) বাণভট্ট-কালিদাস-শূদ্রকের যুগের সংগীতের একটা আভাস হয়-তো দিতে পারে। কিন্তু সে-সব আলোচনা হ'চ্ছে সংগীতের ইতিহাস আর সংগীতের গতির বিষয়ে গবেষণার কথা।

ভারতে আর্য্যভাষার বিকাশ হ'য়েছে এই পথ ধ'রে—'সংস্কৃত' বা আদি-আর্য্য, 'প্রাকৃত' বা মধ্য-আর্য্য, আর 'ভাষা' বা নব্য-আর্য্য। মধ্য আর নব্য আর্য্যের সন্ধিক্ষণে আছে অপভ্রংশ, যা হ'চ্ছে একাধারে প্রাকৃতের অন্তিম রূপ, 'ভাষা'র আদিম রূপ। এই 'ভাষা'র ইতিহাস আরম্ভ হ'য়েছে খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিক্ থেকে; এখনও পর্য্যন্ত এই 'ভাষা'-যুগ অর্থাৎ নব্য-আর্য্য যুগ-ই চ'লেছে। এই নব্য-আর্য্য যুগের ভাষাতে আবার তিনটি স্তর ধরা হয়—আদ্য, মধ্য, নব্য। ভাষার ক্ষেত্রে আদি-আর্য্য, মধ্য-আর্য্য, নব্য-আর্য্য—এসব স্তরের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান; কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে, অনুরূপ নব্য-আর্য্য বা 'ভাষা' যুগের মধ্য স্তরের (অথবা আদ্য স্তরের) পূর্বেকার উপাদান আমাদের সাম্‌নে আর বিদ্যমান নেই। আমীর খুস্‌রৌ আর গোপাল নায়ক—এঁরা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের লোক; এঁদের সময় পর্য্যন্ত ধ্রুপদ-খেয়ালের সুর-লয়-যুক্ত গান রক্ষিত হ'য়েছে। এর পূর্বে আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ পাচ্ছি, খ্রীষ্টীয় বারোর শতকে, গানের কথা পাচ্ছি, সুর-তালের নাম পাচ্ছি, কিন্তু সুরটি পাচ্ছি না—অন্ততঃ বাঙালাদেশে পাচ্ছি না; শুনেছি মহারাষ্ট্রদেশে নাকি পুরাতন সুর রক্ষিত আছে। সুর-তালের নাম দেখে, গানের ঢঙ দেখে মনে হয়, গীতগোবিন্দের সে-সব গান ধ্রুপদের পর্য্যায়েরই ছিল। এর পূর্বে, খ্রীষ্টীয় বারোর শতকের প্রথম অর্ধে সংকলিত সংস্কৃত বিশ্বকোষ "মানসোল্লাস" বা "অভিলষিতার্থ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিন্তামণি"-তেও গানের কথা পাচ্ছি; কিন্তু সুর-লয় জান্‌বার উপায় নেই। শিল্পী আর শিল্পের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রাজপুত রাগ-রাগিণী-চিত্রের আলোচনা-মূলক তাঁর বিরাট্ সচিত্র গ্রন্থের ভূমিকাতে আমাদের রাগ-রাগিণীগুলির ইতিহাস আলোচনা ক'রেছেন। আমাদের সংগীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর কল্পনা কত পুরানো, তা ব'ল্‌তে পারা যায় না, তবে নাম থেকে অনুমান হয়, অন্ততঃ কতকগুলি প্রাচীন রাগ আর রাগিণী, বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত বা বিভিন্ন প্রদেশে উদ্ভূত জনপ্রিয় সুরের বা গতের আধারে তৈরী হয়েছিল; যেমন গূর্জরী বা গূজরী, মালব, বঙ্গালী, গৌড়, মালব-কৌশিক, বহ্লাড়ী, গন্ধার, ঝিঞ্ঝোটী, কানড়া। অর্থাৎ এ থেকে প্রমাণ হয়, আমাদের মধ্য-যুগে অর্থাৎ ১২০০-১৬০০-র মধ্যে যা Classical Music বা উচ্চাঙ্গের সংগীত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তা মূলে, তার হাজার বছর আগে, বহুল পরিমাণে লোক-সংগীত-ই ছিল। মার্জিতরুচির লোকের হাতে, শিক্ষিত কলাবন্তের হাতে, লোক-সংগীত বা গ্রাম-গীত, উচ্চ অঙ্গের সংগীতে উন্নীত হ'য়ে থাকে—সব দেশেই এটা দেখা যায়। পরবর্তী কালে সেই ধারা-ই চ'লে এসেছিল ব'লে মনে হয়; আমাদের প্রাচীন সংগীত কখনও স্থিতিশীল ছিল না, গতিশীল অর্থাৎ প্রাণবন্ত ছিল—আর সেইজন্যই এ জিনিস এতকাল ধ'রে জীয়ন্ত চ'লে এসেছে। দরকার-মতো বিদেশী জিনিস এতে ঢুকেছে, লোক-গীতের বা গ্রাম-গীতের সুরও এতে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, এর সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়েছে! শুদ্ধ আর মিশ্রিত, প্রাচীন আর নবীন, দু রকমেরই স্থিরীকৃত melody অর্থাৎ রাগের রেওয়াজ বোধ হয় গোড়া থেকেই আছে। আজ যা মিশ্র রাগ, classical বা প্রাচীন হ'য়ে কা'ল তা শুদ্ধ রাগের সম্মানই পেলে। তানসেনের সৃষ্টি "দরবারী কানড়া" বা "মিয়াঁ-কী মল্‌হার"—এই রকম রাগকে কেউ এখন আর non-classical অর্থাৎ নিকৃষ্ট, অথবা উৎকৃষ্ট বা উচ্চাঙ্গের নয়, এমন কথা ব'ল্‌বেন না।

খ্রীষ্টীয় বারোর-তেরোর শতকের পর, এদেশে তুর্কী-বিজয়ের পর থেকে, ফারসী বা মুসলমান ঈরানের সংস্কৃতি নোতুন ক'রে ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করে। ধর্মের আর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে ঈরান থেকে একটা প্রবল সূফী প্রভাব ভারতের নব-জাগরিত ভক্তি-বাদের উপরে প'ড়েছিল ব'লে মনে হয়। সূফী অনুভূতি আর দর্শন হ'চ্ছে মুখ্যতঃ শেমীয় আরব ইস্‌লামের ধর্মভাব আর অনুভূতির প্রতি আর্য্য ঈরানের মনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রতিক্রিয়ার ফল,—কিন্তু এর সংগঠনে ভারতের বেদান্তেরও যে একটা বড়ো স্থান ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তর-ভারতের বাস্তু-শিল্পেও বেশ প্রচুর পরিমাণে ঈরানের প্রভাব পড়ে, ভারতীয় আর ঈরানীয়।

এই দুই বাস্তু-রীতির মিশ্রণে মধ্য-যুগের উত্তর-ভারতীয় বাস্তু-রীতিতে তার এক নোতুন Indo-Moslem বা ভারতীয়-মুসলমান ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষাতে আর সাহিত্যেও (উত্তর-ভারতে বিশেষ ক'রে, যেখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘ'টেছিল) ঈরানী প্রভাব প'ড়্‌তে থাকে—বিভিন্ন উত্তর-ভারতীয় নব্য-আর্য্য ভাষায় ফারসী শব্দ এসে নিজেদের ঠাঁই ক'রে নিতে থাকে,—আর, সতেরোর-আঠারোর শতকে দকনী অর্থাৎ দক্ষিণাপথে উত্তর-ভারতের মুসলমানদের দ্বারায় নীত আর প্রতিষ্ঠিত হিন্দী, আর উর্দূ অর্থাৎ উত্তর-ভারতের মুসলমান রাজ-দরবারে প্রচলিত হিন্দী, এই দুটি ভারতীয় ভাষা, মুসলমান ঈরানের ফারসী ভাষা আর সাহিত্যের আদর্শে গ'ড়ে উঠে। উত্তর-ভারতের সংগীতেও সেই রকম মুসলমান (অর্থাৎ ঈরানী) প্রভাব কিছু কম পড়ে নি। কিন্তু ঈরানের গজল-মর্সিয়া-কাওয়ালির সুর এসে গেলেও, আমাদের ভারতীয় সংগীতের জা'ত একেবারে যায় নি, আমাদের রাগ-রাগিণীর ঠাট ঠিক-ই বজায় ছিল, বাইরে থেকে যা এসেছিল তাকে একেবারে হজম ক'রে নিজের অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিল। ভারতীয় সংগীতের বিকাশ তার পুরানো ধারা বজায় রেখেই চ'ল্‌ল। মুসলমান গায়কেরা আর সংগীতের মুসলমান পৃষ্ঠপোষকেরা সকলেই প্রাচীন যুগ থেকে উপলব্ধ রাগ-রাগিণী-মূলক ভারতীয় সংগীতের রীতি বা পদ্ধতিকে গ্রহণ ক'র্‌লেন। দেশে ধ্রুপদ ছিল, আমীর খুস্‌রৌ ঈরানী প্রভাব এতে সংযুক্ত ক'র্‌লেন, তিনি আর তাঁর সমসাময়িক সংগীত-রসিকেরা নোতুন জিনিস আন্‌লেন—'খ্যাল' বা খেয়াল। পাঞ্জাবের প্রচলিত লোক-সংগীতের আধারে গ'ড়ে উঠ্‌ল 'টপ্পা', শোরী মিঁয়ার প্রভাবে যা উত্তর-ভারতের প্রৌঢ় বা শিক্ষিত সংগীতের সভায় একটি মর্য্যাদার আসন পেলে। তেমনি বুন্দেলখণ্ডের লোক-সংগীত থেকে 'দাদরা' এল'। প্রাচীন কালে যে ভাবে প্রাদেশিক সংগীতের ক্ষেত্র থেকে প্রাণরস নিয়ে ভারতীয় শিক্ষিত বা উচ্চকোটির সংগীত-তরু সমৃদ্ধ হ'য়েছিল, এ সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি হ'ল। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হাতে 'কীর্তন'-এর সৃষ্টি হ'ল, ষোলোর আর সতেরোর শতকে; এর মূলে ছিল প্রাচীন রাগ আর তার তাল। কিন্তু বাঙলার স্থানীয় লোক-সংগীতের প্রভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প'ড়ে কীর্তন একটা বিশিষ্ট রূপ ধ'রে নিলে। প্রাচীন ভারী আর বিলম্বিত চালের কীর্তন কখনও-কখনও ধ্রুপদকেই স্মরণ করিয়ে' দেয়; কিন্তু হাল্‌কা চালের কীর্তনও এল'। বাঙলাদেশে এদিক্‌কার কালে এই জিনিসের চল বেশী ক'রে হ'ল। বাঙলাদেশ উত্তর-ভারতের রাজধানী দিল্লীর তুর্কী পাঠান আর মোগল দরবার থেকে দূরে ছিল ব'লে, মধ্য-যুগে বাঙলার লোক-সংগীত উত্তর-ভারতের উচ্চ-কোটির সংগীতকে তেমন কিছু দিতে পারে নি—নিজের প্রকৃতি আর রুচি অনুযায়ী বাঙলাদেশের লোকেরা কীর্তন আর বাউল, ভাটিয়াল, রামপ্রসাদি প্রভৃতি কতকগুলি ঢঙের সুর নিয়েই খুশী ছিল; আর পশ্চিমের সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে পেরেছিলেন এমন শিক্ষিত সংগীতজ্ঞদের মধ্যে বাঙলাদেশেও ধ্রুপদ-খেয়াল একটা সম্মানের আসন ক'রে নিলে। পশ্চিম-বাঙলায় বিষ্ণুপুর-নগর মল্ল-বংশীয় রাজাদের আমলে আঠারো শতকের গোড়া থেকে ধ্রুপদ-খেয়ালের একটি কেন্দ্র হ'য়ে পড়ে, পূর্ব-বঙ্গে ঢাকাও সেই রকম পশ্চিম থেকে আগত কালোয়াতি গানের আর একটি কেন্দ্র হয়। লখ্‌নৌয়ের শৌখীন বাদশাহদের আমলে উত্তর-ভারতের সংগীতের গতি অব্যাহত থাকে, গজল কাওয়ালি আর টপ্পা-ঠুমরির খুব-ই উন্নতি হয়। ধ্রুপদ-খেয়ালের পাশে-পাশে বাঙলাদেশেও টপ্পা-ঠুমরির প্রচলন হয়, আর এই বিষয়ে রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) উনিশের শতকের মধ্য-ভাগে বাঙলা সংগীতে তাঁর গান আর সুরের সাহায্যে যুগান্তর আনয়ন করেন।

দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটক-পদ্ধতির সংগীতের ইতিহাস আমরা ঠিক জানি না। বিগত শতকের মধ্য-ভাগে তেলুগু-ভাষী কবি আর সংগীতকার, শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত ত্যাগরাজ, দক্ষিণের ধ্রুপদ 'কীর্তনম্' রচনা করেন; দক্ষিণ-ভারতের সংগীতে, উত্তর-ভারতের তানসেনের মতোই তাঁর গৌরবময় স্থান। ত্যাগরায়ের তেলুগু কীর্তনম্-গুলি রামচন্দ্র-বিষয়ক, উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের ধ্রুপদের পদের মতন কর্ণাটকীয় সংগীতে এগুলির প্রসিদ্ধি—তমিল কানাড়ী আর মালয়ালী গায়কেরাও তেলুগু কীর্তনম্ গেয়ে থাকেন, যেমন মারাঠী, পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, গুজরাটী, বাঙালী গায়কেরাও তানসেনের ব্রজভাষা-হিন্দীতে নিবদ্ধ ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। দক্ষিণ-ভারতের সংগীতে বোধ হয় আমাদের খেয়াল-টপ্পা-ঠুমরির মতো প্রাচীনের নবীনতর রূপভেদ দেখা দেয় নি—মুসলমান-পূর্ব যুগের, শুদ্ধ হিন্দু-সংগীতের রূপটি বোধ হয় দক্ষিণ-ভারতেই বেশি ক'রে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আধুনিক কালে ভারতবর্ষের সংগীতে সুর-স্রষ্টা অনেক হ'য়েছেন। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—অন্য কারও সে রকম স্থানটি নেই ব'লে মনে হয়। বড়ো-বড়ো গায়কদের কথা ব'ল্‌ছি না, ভাতখাণ্ডে প্রমুখ প্রাচীন সংগীতের সংশোধক বা গবেষক এবং সংস্কারকদের কথা ব'ল্‌ছ না। আধুনিক বাঙলা গানকে অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষেরই সংগীতকে পুষ্ট ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। এখন, বিশেষ ক'রে বিগত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে রেডিও আর বেশি ক'রে সিনেমার কল্যাণে, নিখিল ভারতের সংগীত বিভিন্ন-প্রদেশ-নির্বিশেষে এক-ই ছাঁচে ঢালা হ'য়ে যাচ্ছে। এক-ই হিন্দী গান বোম্বাই, পুনা, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, হাইদরাবাদ, মদুরা, নাগপুর, ক'ল্‌কাতা, ঢাকা, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, লখ্‌নৌ, দিল্লী, লাহোর, করাচী, অজমেরের রাস্তায় পথ-চল্‌তি লোকের মুখে শোনা যাচ্ছে—এই-সব গান, সিনেমার প্রভাবের ফল। পারসী থিয়েটারের মারফৎ বোম্বাইয়ের প্রচলিত সুর (প্রাচীন রাগ-রাগিণী ভেঙে, অথবা বিলিতি গান ভেঙে তৈরী) বাঙলাদেশে এসে যাচ্ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর হালে গুরুসদয় দত্ত, ইংরেজি সুরও বাঙলায়—ভারতবর্ষে—আমদানি ক'রেছেন। বাঙলা গানের সুর ততটা ভারতের অন্যত্র স্থান পাচ্ছিল না ; এক তো এই-সব গানের ভাষা বাঙলা, বাঙলার বাইরের লোকে বোঝে না—আর বাঙলা গানে (classical বা প্রাচীন গানের চেয়ে) কথার স্থানটি অনেক উঁচুতে ; তারপর এই-সব গানের সুর, নিখিল-উত্তর-ভারত-কর্তৃক সম্মানিত ভারিক্কে রাগ-রাগিণীর নয়, ভাঙা রাগ-রাগিণীর। এই দুই কারণে, প্রচলিত বাঙলা গানের সুর বাইরে ততটা যেতে পারে নি—কীর্তন বাউল ভাটিয়াল তো দূরের কথা। এগুলি খাঁটি বাঙালী Folk-music বা লোক-সংগীতের পর্য্যায়ের ব'লে, বাঙলার ভিতরে অনেকটা, আর বাইরে, অপাংক্তেয় ছিল ; এক কীর্তন তো সেদিন-মাত্র দেশবন্ধু-চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, রসময় মিত্র আর সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়দের চেষ্টায় বাঙালার শিক্ষিত সমাজে নিজের স্থান ক'রে নিয়েছে। নইলে, কীর্তন কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই নিবদ্ধ ছিল, বাউল ভাটিয়াল যে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা পেয়েছে, তা মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে। বাঙালী ওস্তাদ বা কালোয়াতদের কাছে এগুলির মর্য্যাদা ছিল না, সেইজন্য বাঙলার বাইরেকার ওস্তাদ আর কালোয়াতদের শ্রদ্ধাও এই-সমস্ত বিশিষ্ট বাঙলা সংগীত পেতে পারে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ-খেয়াল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পের প্রশস্ত রাজমার্গের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তিনি এগুলিকে উপেক্ষা করেন নি। প্রথম-প্রথম শুদ্ধ বা প্রাচীন রাগ-রাগিণীর সংগীতের মোহে তিনিও প'ড়েছিলেন, এবং তাতে ফল ভালোই হ'য়েছিল। প্রথম জীবনে রচিত তাঁর অনেক গানের সুরে আমরা শুদ্ধ প্রাচীন সংগীতের পূর্ণ অনুকরণ দেখ্‌তে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—তাঁর সুপরিচিত ব্রহ্ম-সংগীতটি—

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছে ভুবন·····।

এটি ঝিঁঝোটী (বা ঝিঁঝিঁট) রাগের একটি বিখ্যাত ধ্রুপদ-চৌতালের ব্রজ-ভাষা গানেরই সুরের পুরা অনুকরণ ; এই প্রাচীন ব্রজভাষা বা হিন্দী গানটি এই ; কার রচনা এটি জানি নে *—

তেরো রী নয়ন বান, ভৌ হৈ ধনুখ, চৌন্দ্র-বদন-পর ঝলকত মোহত মন ॥
অরুন-বরন অধর, দৌন্ত কুন্দন বহার দেত ;
সোহৈ ঐসী বেনী সির-পর—নাগ-কৌ ফন ॥
শ্রবন ঝুণ্ডল, নাস বেসর, কৌণ্ঠ মাল ; ভুজ ত্রিনাল, কুচ উতৌঙ্গ, নাভি ভ্রমর ;
পহিরৈ নীল সাড়ী ॥
কটি কিঙ্কিনী, কদলী-খৌম্ভ জৌঘ, চরন কনক-নূপুর ; চলত চাল
গতি মরাল, জোবন-ভরী ॥

কিন্তু নিছক ধ্রুপদের মৃদঙ্গ-নির্ঘোষ—কালোয়াতি সংগীতের, শুদ্ধ বা উচ্চ হ'লেও এ যুগের লোক আমাদের মধ্যে বেশির ভাগের কাছে, কতকটা আড়ষ্ট আর প্রাণহীন গীত—সকলকার প্রীতি-দায়ক হয় না ; সংগীতেও এমন সব জিনিস চাই, যা তার আশ-পাশের জীবনের পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্যুত বা পৃথগ্‌ভূত নয়। এই জন্যই, যেমন মধ্য-যুগের হিন্দী বাঙলা ভেঙে আধুনিক হিন্দী বাঙলা, তেমনি মধ্য-যুগের সংগীতের ধারা কালোয়াতি সংগীতের বিকাশে বা বিকারে জাত আধুনিক সংগীত, রবীন্দ্রনাথকে সহজ ভাবেই টেনে নিলে।

* শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিষ্ণুপুর ঘরাণা" বইয়ে এই গানটিকে বাঙলার প্রখ্যাত ধ্রুপদী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের রচিত ব'লে উল্লিখিত ক'রেছেন (কলিকাতা বুক্‌ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৩৭)। বাঙলার ধ্রুপদী গাইয়েদের কেউ-কেউ যে ব্রজভাষাতে তাঁদের বাণী রচনা ক'রেছেন, তার যথেষ্ট উদাহরণ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংস্কৃত-চর্চার বারণ নেই, কিন্তু ভাষার চর্চাও চাই; সংস্কৃত-চর্চা নিজেই একটা উদ্দেশ্য হ'তে পারে, কারণ তা একটি বড়ো দরের মানসিক বা আধ্যাত্মিক আনন্দের সাধন স্বরূপ হ'য়ে থাকে; কিন্তু সংস্কৃত-চর্চা বাঙলা-ভাষার উন্নতির জন্যও হ'তে পারে। উচ্চ অঙ্গের সংগীত কতকটা আধুনিক সংগীতেরই পটভূমিকা-স্বরূপ বিদ্যমান, তাই তার চর্চা আবশ্যক—আধুনিক সংগীতের দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখ্‌লে এ কথাটি বলা যায়।

অপূর্ব রসানুভূতির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ যখন গান বাঁধ্‌তে আর সুর দিতে নিযুক্ত হ'লেন, তখন তাঁর সৃষ্ট বাঙলা গানের সুর একটা স্বতন্ত্র বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। তিনি গানে কথার যথোচিত মূল্য দিলেন। গানের বাণী বা কথা, আর গানের সুর, এই দুইয়ে হাত ধরাধরি ক'রে না চ'ল্‌লে, একটিকে না দেখে কেবল আরটির দিকেই দৃষ্টি দিলে, গান আর গান থাকে না, হ'য়ে দাঁড়ায়—হয় খালি কবিতা, নয় কেবল গৎ। বাক্য আর অর্থের মতো, কথা আর সুরের হর-গৌরী-মিলন হ'লেই সত্যকার 'গান' হয়। কবি নিজেই তাই গেয়েছেন—

প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও কথা, তুমি মোরে দাও সুর॥

প্রাচীন 'বাগ্‌গেয়-কবি' অর্থাৎ সংগীত-রচকেরা একথা বুঝ্‌তেন, সেইজন্যই জয়দেবের পদের এত যত্ন-সাধ্য লালিত্য; তানসেন-প্রমুখ ধ্রুপদ আর অন্য সংগীত-রচকেরাও বুঝ্‌তেন—তানসেন, আমার মনে হয়, কেবল সংগীতকার ছিলেন না, বড়ো দরের কবিও ছিলেন, তা তাঁর রচিত বাণী বা কথা থেকে উপলব্ধি করা যায়। তানসেনের কাছেও তাঁর গানের কথা বা বাণী যথোচিত মর্য্যাদা পেয়েছিল। তাঁর রচিত একটি গানের শেষে তিনি ব'লেছেন—

তানসেন অন্তর-বানী ধ্রুপদ পুকার॥

অর্থাৎ, তানসেনের অন্তরের বাণী এই ধ্রুপদ-গানেই উচ্চ-রবে ঘোষিত হ'চ্ছে।

কিন্তু মাঝের যুগের ওস্তাদ বা কালোয়াত অর্থাৎ ব্যবসায়ী গায়ক, যাঁদের হাতে বেশি ক'রে সংগীত-শিক্ষা সমাজের তরফ থেকে দেওয়া হ'য়ে থাকে, তাঁরা এ কথাটা প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা হ'য়ে পড়েন সংগীতের নিছক বৈয়াকরণ; সংগীতের কথার মূল্য তাঁদের কাছে বড়ো একটা ছিল না—যা তা শব্দ বা অক্ষর হ'লেই তাঁদের চ'ল্‌ত। বাঙলার ওস্তাদের হাতে তানসেনের শুদ্ধ ব্রজভাষার মতো অমন সুন্দর আর মার্জিত একটা সাহিত্যের ভাষার কি 'হেনস্থা'ই না ইদানীং হ'য়েছিল! অজ্ঞাতার্থ হিন্দী শব্দের কথা ছেড়ে দিচ্ছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পশ্চিমা উচ্চারণে শুদ্ধ সংস্কৃত কথাগুলিরও অদ্ভুত সব বিকৃতি ঘ'টেছিল, 'সদ্যোজাত' হ'য়ে গিয়েছিল 'সাধ্যেও জাত', 'মোক্ষদায়িনী' (উচ্চারণে 'মোচ্ছ-দায়িনী') হ'য়ে গিয়েছিল 'মুচ্ছে দায়িনী'; 'পক্ষিগণ', 'পাচিগণ'; 'অধ্যয়ন', 'আধেয়ান'; আর 'বীচ মেঁ' হ'য়ে গিয়েছিল 'বিছুমে', 'উমড়-ঘুমড়' হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল 'উমডে গুমডে', ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী'র সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ ক'রে যে সুন্দর আর বাঙলা-সাহিত্যে সুপরিচিত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে এ সম্বন্ধে তিনি ব'লেছেন—গানের কথায় আছে 'চলত রাজকুমারী', কিন্তু সুরের মোহে প'ড়ে গিয়েছেন যে ওস্তাদ গাইয়ে', তিনি ঘুরে ফিরে 'চ-ল-ত' শব্দটিকে নিয়েই সুরের পেঁচ ক'ষ্‌তে লেগে গিয়েছেন—এদিকে রাজকুমারীর চলা আর হয় না, কালোয়াতি সংগীতের সমঝদারদের তাতে আপত্তি নেই। গানের মধ্যে কথার মূল্যের প্রতি তিনি আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌লেন। এ সম্পর্কে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, বাঙলার কীর্তনে সুর আর বাজনার একটা বড়ো স্থান থাক্‌লেও, কথার উপরেই একটু বেশি জোর দেওয়া হ'ত—কীর্তনের মধ্যে আঁখর দেবার রীতি এর-ই ফল, এই জন্যও বোধ হয় ওস্তাদ-মহলে কীর্তন জা'তে উঠ্‌তে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে ভারতবর্ষে সুপরিচিত ওলন্দাজ-জাতীয় সংগীতবিদ্ ও গবেষক শ্রীযুক্ত [অধুনা পরলোকগত] A. A. Bake আর্নল্ড্ বাকে যা ব'লেছেন, তা উদ্ধার ক'রে দেওয়া যেতে পারে—

Knowing the old *rāgas* perfectly well, he too had the right to use and change them as his own inspiration told him to do. Had not the old mystics created their own *rāgas*, the *Bāuls* their own tunes, and had not *Kīrtan* adapted the old forms to new needs ?

His perfect balance of words and melody, and his simplicity and conciseness of construction, are contributions to the whole of Indian music that cannot be under-rated easily.

It is characteristic ef the genius of Rabindranath Tagore that he has, as if by instinct, found the *Dhrūpad* the only form in ancient Indian music that could serve as a basis for his creations. From long before the Muhammadan conquest, even up to our present days, this form of Indian music, regarded as most sacred, continued to exist, in which the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

words had and have their importance. Still the holy character implied the use of very difficult tune and very dignified *rāgas*. The poet has succeeded in keeping the essential features of construction, but nevertheless has made the form supple and clear, fit for the direct appeal even to the heart of the simple peasant.

This happy combination of the *Dhrūpad* and folk-music is the strongest feature of the musical *œuvre* of Tagore. ('Rabindranath Tagore's Music', in the *Golden Book of Tagore*).

কথা আর সুর পরস্পরের সঙ্গে এতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকার দরুনই রবীন্দ্রনাথের গানের এতটা জনপ্রিয়তা। তা ছাড়া, কথার নিজের বিশেষ কাব্য-সৌন্দর্য্য আর মর্য্যাদা বুঝে, তাকে তিনি তাঁর সংগীত-রচনায় যথোচিত স্থান দেন। বাঙলার বাউল আর ভাটিয়াল, বাঙলার কীর্তন,—Folk-lore অর্থাৎ 'লোক-যান' (অর্থাৎ কিনা আধুনিক শিক্ষা হ'তে দূরে থেকে, প্রাচীন মনোভাব নিয়ে যে-সব গ্রামীণ ব্যক্তি প্রাচীন সংস্কৃতির আব-হাওয়ায় পরিবর্ধিত হ'য়ে চিরাচরিত রীতিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁদের চর্য্যা অর্থাৎ আচার এবং বিচার, সংগীতও এর অন্তর্গত) আলোচনা করেন এমন পণ্ডিতেরা, অথবা গ্রামীণ পদ্ধতির জীবনের প্রতি দরদী লোকেরা, হয়-তো কালে-ভদ্রে যার চর্চা ক'রবেন, কিন্তু যা ক্রমে শিক্ষার আর আধুনিকতার প্রসারের সঙ্গে 'সেকেলে' আর 'গ্রাম্য' ব'লে লুপ্ত হ'য়ে যাবে,—এরকম লোক-সংগীতের গণ্ডীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আর নিবদ্ধ রইল না, বাঙলার জাতীয় সংগীতের পর্য্যায়ে উন্নীত হ'ল; শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে স্থান পেয়ে, রবীন্দ্রনাথের গানে স্থান পেয়ে, বাঙলার এই-সব লোক-সংগীত এখন নিখিল ভারতের নিকট গৃহীত হ'চ্ছে; তাই আমরা হিন্দী আর অন্য ভাষার সবাক্ চিত্রের গানে কীর্তন ভাটিয়াল বাউলের ঝংকার মাঝে-মাঝে শুন্‌ছি। শ্রীযুক্ত বাকে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ক'রে লিখেছিলেন—It was the folk-music of Bengal that stirred the depth of his nature with such wonderful results. তিনি আরও মন্তব্য ক'রেছেন—Only the fact that the educated classes of his country

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

who live in towns have lost contact with the real folk-life accounts for the discredit of his music in the appreciation of so many who love and admire his poems,—এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক না হ'লেও, আংশিক-ভাবে ঠিক তো বটেই। পূর্ব-বঙ্গের বাউল আর ভাটিয়াল, আর পশ্চিম-বঙ্গের কীর্তন—এইতে মিলে তাঁকে সারা বাঙলার লোক-সংগীতের রাজা ক'রে তুলেছে।

রবীন্দ্র-সংগীতের আর একটি বড়ো জিনিস হ'চ্ছে, তার দেওয়া সুরের মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটুকু—the Rabindra touch. আমরা 'হিন্দুস্থানী দরদ'-এর কথা শুনি, হিন্দী গানে কোথাও-কোথাও তা অনুভবও করি। দু-একটা এমন খোঁচ-খাঁচ, টান-টোন, গলার কাঁপুনি গানের সুরের মধ্যে থাকে, তাতেই জিনিসটি একেবারে যেন কোন্ ঊর্ধ্বে উঠে যায়, তার সাধারণত্ব আর থাকে না! এই Rabindra touch—রবীন্দ্রের পুণ্যস্পর্শ, রবীন্দ্রের হাত, বা রবীন্দ্র-শ্রী—আমরা সকলেই বুঝি; রবীন্দ্র-সংগীতের ভালো গাইয়েরা এইটুকুই প্রকাশ ক'রতে পারেন ব'লেই তাঁদের কদর। 'আমারে করো তোমার বীণা', 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী', 'আজি দখিন দুয়ার খোলা', 'অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে', 'এসো, এসো বসন্ত ধরাতলে', 'আমার নিশীথ-রাতের বাদলধারা', 'কার বাঁশী বাজিল', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না', 'মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে',—ইত্যাদি ইত্যাদি কত গান মনে পড়ে, যা তরুণ অবস্থা থেকে শুনে আসছি, দরদী গায়কের মুখের ধ্বনি যে-সব গানের সুরের মধ্যে নিহিত এই অবর্ণনীয় রবীন্দ্র-শ্রীটুকুকে ফুটিয়ে' তুলে মনের মধ্যে একটি অব্যক্ত আকুলতা এনে দিয়েছে, এখনও এনে দেয়। গুরু-পরম্পরায়, আর রেকর্ডের সাহায্যে এই জিনিসটি রক্ষিত হ'তে পারবে। কালের স্থূল হস্তাবলেপের ফলে এই রবীন্দ্রীয় শ্রীটুকু হয়-তো বা বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে; কিন্তু তাহ'লে রবীন্দ্র-সংগীতের অনেকটাই চ'লে যাবে। আশা করি, এই জিনিসটুকু আধুনিক ভারতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দান ব'লে, এটুকুর রক্ষার জন্য সকলেই অবহিত হবেন। এটা একটা বিশেষ ঢঙ্ বা ভঙ্গী নয়; এটি আরও সূক্ষ্ম, তুলির টানের মতন গলার বিশেষ রেশের ব্যাপার। আমার মতন অনভিজ্ঞ মানুষের কানে যে ভাবে এই Rabindra

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

touch-এর প্রকাশটুকু তার স্পর্শ এনে দিয়েছে, কেবল তারই বিষয়ে কিছু বল্‌বার জন্য এই অক্ষম চেষ্টা-মাত্র ক'র্‌লুম—বিশেষজ্ঞরা আমার কথাগুলি ক্ষমা-ভাবের সঙ্গে গ্রহণ ক'র্‌বেন।

এই-সব, আর নিশ্চয়ই আরও অনেক-কিছু জড়িয়ে' রবীন্দ্র-সংগীতকে ভারতের সংগীতের ইতিহাসে তার একটা নিজস্ব স্থান দিয়েছে। আমাদের দেশের বড়ো সংগীত-কারদের সঙ্গে তুলনা কর্‌বার দরকার নেই, মহাকাল যথা-সময়ে যার যে স্থান তা ঠিক ক'রে দেবেন; কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে ভারত-সংগীতের আলোচনা ক'র্‌তে গেলে, আধুনিক কালে ভারতের সংগীত-বিষয়ক প্রচেষ্টার সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে হ'লেই, রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না ক'রে পারা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতে ইউরোপীয় সংগীতের Harmony অর্থাৎ বিবাদের মধ্যে সংবাদ আন্‌বার পক্ষেও ছিলেন। পথিকৃৎ বা সংস্কারক না হ'লেও, সংগীতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রধান রসস্রষ্টা আর পদপ্রদেষ্টা॥

গীতবিতান বার্ষিকী
বঙ্গাব্দ ১৩৫০
(স্বল্প সংযোজন সহ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অহম-রাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ

আমাদের প্রাদেশিক ইতিহাস, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-ভারতের অংশ-স্বরূপ বাঙ্গালার ইতিহাস, আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। বাঙ্গালী অর্থাৎ বঙ্গভাষী জনগণের এবং অসমিয়া ও উড়িয়া-ভাষী জনগণের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত করিবার উপাদান যাহা আছে, তাহা হইতে কতকগুলি অনুমান করা চলে মাত্র। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেকার কয়েক শত বৎসর হইতে এই পূর্ব-ভারত অঞ্চলে আর্য্য প্রাকৃত ভাষার স্থাপনার ও ইহার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, ভবিষ্যতের বাঙ্গালা- অসমিয়া-উড়িয়া-ভাষী জনগণের উদ্ভব সম্ভবপর হইল। আদিম 'নিষাদ' বা Austric অষ্ট্রিক অর্থাৎ 'দাক্ষিণ'-ভাষী জাতি, এবং দ্রাবিড়-ভাষী-জাতি, ইহাদের আধারের উপরে আসিল আর্য-ভাষী জাতি। পূর্ব-ভারতে—হিমালয়ের দক্ষিণ পাদ-দেশে, উত্তর-বঙ্গে, পূর্ব-বঙ্গে ও আসামে—উপনিবিষ্ট হইল 'কিরাত' অথবা মোঙ্গোল জাতির মানুষ, উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালার কতকগুলি জেলায় এবং ব্রহ্মপুত্র-নদের দেশে; অনুমান হয়, ঐ অঞ্চলের মিশ্রিত দাক্ষিণ বা নিষাদ তথা দ্রাবিড়-ভাষীদের প্লাবিত করিয়া দিয়া বা তাহাদের নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের পথ ধরিয়া নবাগত কিরাত বা মোঙ্গোল জাতির নানা শাখা আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের দেশে, নাগা, মিকির, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া এবং গারো পাহাড়ে, মণিপুরে, কাছাড়ে ও শ্রীহট্ট জেলায় (সুরমা নদীর দেশে), ত্রিপুরা ও কুমিল্লায়, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও রঙ্গপুরে, দিনাজপুরে, জলপাইগুড়িতে ও কোচবিহারে উপানিবিষ্ট হয়। এই সমস্ত মোঙ্গোল জনগণ বেশির ভাগ এখন বাঙ্গালী ও অসমিয়া জাতির-ই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

কিরাত বা মোঙ্গোল-জাতীয় মানুষের ভারতে আগমন ঘটিয়াছিল সম্ভবতঃ আর্য্যদের আগমনের পূর্বে। শুক্ল যজুর্বেদে (৩০।১৬) পর্বতগুহাবাসী কিরাতের উল্লেখ প্রথম পাই;—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-এর বহু পূর্বেই ইহাদের কতকগুলি গোত্র বা গোষ্ঠী পূর্ব-হিমাচলের সানুদেশে আসিয়া প্রথম উপনিবিষ্ট হয়। মহাভারত ও মনুসংহিতায় পর্বতবাসী কিরাতদের কথা আছে। গ্রীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লেখকগণও খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি সময়ে Kirrhadoi নামে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহারা উত্তর পুর্ব-ভারতের পর্বতাঞ্চলে থাকিত।

ভারতীয় সভ্যতার আর্য্য, দ্রাবিড় ও নিষাদ বা দাক্ষিণ জাতিত্রয়ের আহৃত উপাদান লইয়া বিচার, আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত চলিতেছে; কিন্তু কিরাত বা মোঙ্গোল জাতির দ্বারা পুর্ব-ভারতে ভারতীয় সভ্যতা কী ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, কী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, তাহার বিচার বা আলোচনা এখনও হয় নাই—সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা। উত্তর-পুর্ব ও পুর্ব-ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির যে অভিনব এবং স্বতন্ত্র বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও আমরা—শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বিশেষতঃ—এখনও সচেতন হই নাই। আসামের ও উত্তর এবং পুর্ব-বঙ্গের হিন্দু তান্ত্রিক বা শাক্ত ধর্মের, বৈষ্ণব ধর্মের এবং গ্রাম্য লোক-ধর্মের বা লোকযানের যে বিকাশ দেখা যায়, এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান তীর্থ-গুলির পশ্চাতে যে অধুনা-লুপ্ত প্রাগ্-হিন্দুধর্ম-জগতের ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই, সে-সমস্ত কথা এখনও আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র হইয়া উঠে নাই। এই অঞ্চলে উপনিবিষ্ট এবং এখনকার কালের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিলীন ও বিলীয়মান, ভোট-চীন-ভাষী অহম, কুকি, নাগা এবং মোন্-খ্মের-ভাষী খাসিয়াদের বৈশিষ্ট্য—তাহাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রকৃতি বা ধর্মপ্রবণতা, এবং তাহাদের চিন্তা-ধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টা—স্থানীয়, অর্থাৎ আসাম এবং উত্তর ও পুর্ব-বঙ্গের জনগণের জীবনে ও ইতিহাসে যে প্রতিফলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোট-চীন ও মোন্-খ্মের-ভাষী এই সমস্ত মোঙ্গোল-জাতীয় মানুষের চরিত্রে যে-সব বিশিষ্ট গুণ আছে, সাধারণ ভাবে সে-সব গুণের নির্ধারণ বা নিণয় করা কঠিন ব্যাপার; তবে সাহস ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্মপ্রাণতা, এবং তৎসঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনা ও চিত্তের প্রফুল্লতা—একটি সদানন্দ ভাব—ইহাদের কতকগুলি লক্ষণীয় সদ্‌গুণ, এবং সরল-বিশ্বাস-প্রবণতা (ভাবুকতা বা ভাবপ্রবণতা নহে), পশু ও মানুষ উভয় সম্পর্কে নিষ্ঠুরতা (কখনও-কখনও বর্বরের ন্যায় নিষ্ঠুরতা)—ইহাদের দুইটি অবগুণ বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর, মোঙ্গোল-জাতীয় মানুষ (এক চীনদেশের কথা আলাহিদা) বেশির ভাগ হইতেছে কৃতকর্মা, ভাবুক বা চিন্তাশীল নহে; জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে ইহাদের প্রণিধান ভাসা-ভাসা বা উপর-উপর, গভীর নহে; ইহারা তথ্য-প্রিয়, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নহে। যখন পুর্ব-ভারতের ইতিহাসে, সম্ভবতঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখন হইতে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই মোঙ্গোল-জাতির মানুষ আসিয়া দেখা দিল (ভারতে ইহাদের আগমন সম্ভবতঃ ইহারও পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল), এবং মিশ্র হিন্দু বা ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই এই ইতিহাসে ইহাদের চরিত্রের ছাপ পড়িল। একটি জিনিস উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গ এবং আসাম সম্বন্ধে দেখা যায়—বিদেশাগত তুর্কী এবং উত্তর-ভারতীয় মুসলমান আক্রমণকারীকে এই অঞ্চলের মোঙ্গোল-জাতীয় লোকেরা যতটা বাধা দিয়াছে, ভারতের অন্য বহু অঞ্চলের মানুষেরা ততটা বা তার চেয়ে বেশি বাধা হয়-তো দিয়াছে; কিন্তু অন্য অঞ্চলের লোকেরা এই আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। দিল্লী হইতে বিজাপুর যত দূর, কোচবিহার, গৌহাটি বা ত্রিপুরা তাহা অপেক্ষা বেশি দূর নহে; এবং মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্র বাঙ্গালা দেশের গৌড় ও ঢাকা নগর হইতে এই প্রদেশগুলি খুব দূরেও নহে। ইহাতে অবশ্য উত্তর- ও দক্ষিণ-ভারতের পাঞ্জাবী হিন্দু, রাজপুত ও অন্য লড়াকিয়া সম্প্রদায়সমূহ, মারাঠা, তেলুগু ও কানাড়ীদের শৌর্য্যের অমর্য্যাদা নাই। বঙ্গ-দেশের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের ব্যাহত করিতে—দেশের ভৌগোলিক সমাবেশ এবং দেশের জলবায়ু—এই দুইটি নিঃসন্দেহে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল; বিদেশী শত্রু কর্তৃক রুষদেশ আক্রমণের সময়ে একজন রুষ সম্রাট্ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন—রুষদেশের দুইটি অজেয় সেনাপতি আছে, সেনাপতি জানুয়ারি ও সেনাপতি ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ রুষের ভীষণ শীত—সেইরূপ মন্তব্য বাঙ্গালা ও আসাম সম্বন্ধেও করা যায়; আমাদের এই পূর্ব অঞ্চলের দেশের দুইটি অজেয় সেনাপতি—আষাঢ় ও শ্রাবণ, বর্ষার দুই মাস—বহুবার বিদেশী আক্রমণকারীদের ব্যর্থ করিয়াছে। আকবর বাদশাহের সময়েই কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় পূর্ব-ভারতে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিরাট্ স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। সমগ্র আসাম কখনও তুর্কী বা ভারতীয় মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় নাই। শ্রীহট্ট বিজিত হইলেও, পার্বত্য-ত্রিপুরা বরাবর-ই স্বাধীন ছিল, বার-বার আক্রমণেও আসাম এবং ত্রিপুরা আত্মরক্ষা করিয়াছে, কৌশল ও শৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই বিদেশীদের দূরীভূত করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, মোগলদের হাতে উত্তর-বঙ্গের জয় ছিল নাম-মাত্র, তাহাদের অধিকার ছিল পরোক্ষ, প্রায়-স্বাধীন জমিদারদের মারফৎ তাহারা নিজেদের ক্ষমতা পরিচালনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করিবার চেষ্টা করিত। উত্তর-বঙ্গে "কম্বোজ" জাতির রাজারা এক সময়ে, তুর্কীদের আগমনের পূর্বে, হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, খ্রীষ্টীয় দশম শতকে; অনুমান হয়, এই "কম্বোজ" জাতি "কণ্ডচ" বা "কোঁচ" অথবা "কোচ" ছাড়া আর কিছু-ই নহে—এই কোচেরা ভোট-চীন জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত বিরাট্ "বড়" বা "বোড়ো"-ভাষী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ইহারা বঙ্গভাষী ও হিন্দু (অথবা মুসলমান) হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১১৯৮ সালে বখ্‌ত্যার খল্‌জীর অধীনে তুর্কীরা প্রথম আসাম আক্রমণ করে—উত্তর-বঙ্গের ও আসামের ভোট-চীন বোড়ো-জাতীয় কোচ ও মেচগণের সহিত তুর্কীদের সংঘর্ষ হয়; এই কোচ ও মেচগণ চেহারায় মোঙ্গোল জাতির অন্য শাখা তুর্কীদেরই মতো ছিল, একথা মুসলমান ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রথম আক্রমণে বখ্‌ত্যারের তুর্কেরা পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া, কোনও ক্রমে বিরাট্ বাহিনীর অল্পসংখ্যক লোক লইয়া ফিরিয়া আসে। এই ঘটনার পরে প্রায় দশ-বারো বার উত্তর-বঙ্গ ও আসাম বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান কর্তৃক ও পরে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেব কর্তৃক আক্রান্ত হয়—তুর্কীরা, এবং পরে বাঙ্গালী সেনা ও রাজপুত সেনা লইয়া মোগল মুসলমানেরা দুই-একবার আসামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে ১৬৮১ সালে আসামের অহম-রাজ স্বর্গদেব গদাধর সিংহ (চু-পাং-ফা) কর্তৃক এই বিদেশীরা বিতাড়িত হয়। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে, ত্রিপুরা-রাজগণ (বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে মহারাজ ধন্যমাণিক্য) একদিকে আরাকানের মগদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান ও মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে সগর্ব উক্তি—"এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে"—ত্রিপুরার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের কুকি-জাতীয় সেনাপতি রায় চয়চাগ অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল দেখাইয়া ত্রিপুরা-আক্রমণকারী বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান হোসেন শাহের সেনাকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়া দেন। আকবরের সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা বিজয়মাণিক্য (১৫৩৫-১৫৮৩) শ্রীহট্ট জয় করেন—শ্রীহট্ট মুসলমান বাঙ্গালার অধীন ছিল,—খাসিয়াদের জৈন্তিয়া রাজ্যও জয় করেন, এবং বাঙ্গালার শেষ পাঠান সুলতানের সঙ্গেও ইনি যুদ্ধ করেন। গৃহবিবাদের ফলে ত্রিপুরার রাজারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুর্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু পার্বত্য-ত্রিপুরা বরাবর-ই বিদেশীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে, উত্তর-বঙ্গে রাজা বা জমিদার 'কাঁশ' অর্থাৎ কংশ, দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজবংশকে উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের পত্তন করেন ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তুর্কী-বিজয়ের পরে উত্তর-ভারতের আর কোনও হিন্দু রাজা যাহা করিতে সাহস করেন নাই, ইনি তাহা করিয়াছিলেন—নিজের নামে ইনি হিন্দুভাবের মুদ্রা বাহির করেন। ইঁহার নামে কতকগুলি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; মুদ্রাগুলির একদিকে বাঙ্গালা অক্ষরে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য-স্থাপনের পরে গৃহীত ইঁহার নাম পাওয়া যায়—"শ্রীশ্রীদনুজমর্দনদেবস্য"—ও অন্য দিকে "শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণস্য", তারিখ শকাব্দায় দেওয়া, এবং টাঁকশালের নামও দেওয়া আছে "পাণ্ডুনগর" বা "পাণ্ডুয়া", "সপ্তগ্রাম" বা "সাতগাঁ" বা "চট্টগ্রাম"। এই-সব টাঁকশালের নাম হইতে বুঝা যায় যে, সারা বাঙ্গালা জুড়িয়া ইঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। ইঁহার পরে সম্ভবতঃ ইঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেব রাজা হন, মহেন্দ্রদেবের-ও অনুরূপ রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে ইঁহার এই পুত্র, অথবা হয়-তো আর এক পুত্র, মুসলমান হইয়া জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। নূতন করিয়া পুনঃস্থাপিত হিন্দু রাজ্যের এই ভাবে অবসান হয়। কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে, বিদেশী রাজার শাসন হইতে এই মুক্তিলাভের ব্যাপার উত্তর-বঙ্গেই ঘটিয়াছিল, এবং হয়-তো এই স্বাধীনতার যুদ্ধে উত্তর-বঙ্গের দুর্ধর্ষ ও শক্তিমান্ ভোট-চীন বংশসম্ভূত হিন্দু প্রজারই কৃতিত্ব ছিল, কোচ ও অন্য বোড়ো-জাতীয় পরাক্রান্ত পাইক বা পদাতিক সৈন্য বর্মাবৃত অশ্বারোহী তুর্কী মুসলমান সেনাকে পরাজিত করিয়াছিল। দনুজমর্দনদেবের পুরা পরিচয় ঠিকমতো জানা যায় নাই; ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথবা কায়স্থ ছিলেন, এইরূপ বিভিন্ন মত আছে। হয়-তো ইনি আদৌ উত্তরবঙ্গের হিন্দু কোচ বংশীয়-ই ছিলেন—পরবর্তী কালের কোচ রাজাদের মতো। এ সম্বন্ধে আর-ও অনুসন্ধান আবশ্যক।

ভোট-চীন মোঙ্গোল-জাতীয় যে-সমস্ত বিভিন্ন গণ পূর্ব-ভারতে (আসাম ও বাঙ্গালায়) উপনিবিষ্ট হয়, তাহারা বেশির ভাগ ছিল বোড়ো শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর বা উপজাতির। সম্ভবতঃ ইহাদের অভিজাত-সম্পদায়, হিন্দু ধর্মের অনুপ্রাণনায়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকে, তুর্কীদের আগমনের পূর্বে, উত্তর-বঙ্গে (বরেন্দ্র ভূমিতে) "কম্বোজ" রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের রাজারা-ই খ্রীষ্টীয় বারোর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তেরোর শতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন এবং তখন তুর্কীদের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়াছিলেন। উত্তর-বঙ্গের কোচ ('নারায়ণী') রাজবংশ, ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশ, কাছাড়ের হিড়িম্বা রাজবংশ, পূর্ব-আসামের চুটিয়া রাজবংশ —ইহাদের সকলেরই প্রজা ও যোদ্ধা ছিল বেশির ভাগ বোড়োদের লইয়া। ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে পাতকই পর্বত অতিক্রম করিয়া পূর্ব আসামে অসম বা অহম জাতির লোকেরা, তাহাদের রাজা ও অভিজাত বংশের নেতৃত্বে আসিয়া, দেশের বোডো ও অন্য মিশ্র দাক্ষিণ ও দ্রাবিড়-জাতীয় হিন্দু বা হিন্দু-ভাবাপন্ন লোকেদের জয় করে, এবং পূর্ব-আসামে অহম রাজ্য স্থাপন করে। পরে ধীরে-ধীরে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অহমদের অধিকার বিস্তৃত হয়—অহম বা অসমদের নাম হইতেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নাম হয় "আসাম"। এই অহমরা ছিল ভোট-চীনদের Dai দৈ বা Thai শাখার; ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত জাতি হইতেছে শ্যামের থাই বা শ্যামী, ও ব্রহ্মের শান Shan এবং ইন্দোচীনের Lao জাতি। অহমরা বিশেষ সাহসী ও সৈনিকগুণযুক্ত জাতি ছিল, এবং তাহাদের আগমনে আসাম ও পূর্ব-ভারতের ক্ষাত্রশক্তির বিশেষ প্রাবল্য ঘটে। অহমরা নিজেদের দেশ উত্তর-ব্রহ্মে ও শ্যামে হিন্দু সভ্যতার সহিত সংস্পর্শে আসে, কম্বোজীয় বা খ্মের ও শ্যামী জাতির নিকট হইতে ইহারা ভারতীয় লিপিবিদ্যার সহিত পরিচিত হয়, এবং সম্ভবতঃ আসামে আসিয়া ব্রাহ্মণদের সহায়তায় হিন্দু দেবতাদের সঙ্গে তাহাদের নিজেদের দেবতাদের একটা সমীকরণ করে—যেমন "চাও-ফা" অর্থাৎ স্বর্গদেব বা ইন্দ্র, "জাচি-ফা" অর্থাৎ "সরস্বতী, "লাউথ" অর্থাৎ বিশ্বকর্মা, "লুঙ্-চাই-নেৎ" অর্থাৎ বায়ু, "খান্-খাম্-ফা-ফা" অর্থাৎ আদ্যাশক্তি, "খুন-তুন্-ফা" অর্থাৎ চন্দ্রদেব, "খন্-বান্ফা" অর্থাৎ সূর্য্যদেব, ইত্যাদি। অহম রাজারা তাঁহাদের হিন্দু প্রজার কাছে "ইন্দ্রবংশের রাজা" বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু ইঁহাদের স্বকীয় পুরাণকথা, নিজেদের ধর্মানুষ্ঠান পূজা-পদ্ধতি, "দেওধাই" নামে নিজেদের পুরোহিত-সম্প্রদায়, নিজেদের কালগণনা-রীতি, নিজেদের ভাষা ও বর্ণমালা কয়েক শত বৎসর ধরিয়া—১২২৮ হইতে আনুমানিক ১৬৫০-১৭০০ পর্য্যন্ত—বলবৎ রাখেন। ইঁহাদের আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতি হিন্দু ধর্ম গ্রহণের পরেও কোনও-কোনও বিষয়ে লক্ষণীয় রূপে অহিন্দুই থাকিয়া যায়। রাজাদের নাম অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত অহম ভাষায় হইত; যেমন "চুকাফা, তেও-খম্-থি, চু-ডাঙ্-ফা, চু-গিম্-ফা",

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইত্যাদি। ১৪৯৭ হইতে রাজাদের অসমিয়া ভাষায় একটা করিয়া উপনাম হইতে থাকে, যেমন "খোরা-রজা, ভগা-রজা, নরিয়া-রজা, ল'রা-রজা", ইত্যাদি। অহম রাজ চু-তাম-লা (১৬৫৪-১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম উপরন্তু সংস্কৃত নাম গ্রহণের রীতি প্রবর্তিত করেন—তিনি "জয়ধ্বজ সিংহ" নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পরে মাত্র পাঁচ জন অল্প দিনের রাজা ভিন্ন, সমস্ত অহম-রাজগণ সংস্কৃত নামেই সুপরিচিত হন। চু-পাং-ফা বা গদাধর সিংহ হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখান, কিন্তু তিনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। গদাধর সিংহ আসামে মোগল অধিকারের বিলোপ-সাধন করেন। গদাধর সিংহের পুত্র চু-খ্রু-ফা বা রুদ্রসিংহ আসাম অঞ্চলে মোগলের ক্ষমতার অবসান করেন, এবং করতোয়া নদী পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-বঙ্গ, আসামের সীমান্ত বলিয়া দাবি করিয়া বাঙ্গালার মোগল সুবেদারের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন —ঢাকার উদ্দেশে অভিযান করিবার সময়ে পথে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অহমদের পূর্বে আসামে ষোড়শ শতকে বিশেষ প্রবল হন কোচ-রাজা মল্লদেব নরনারায়ণ সিংহ। ইঁহার ভ্রাতা ও ইনি অহমদের পরাজয় করেন, কাছাড় ও জৈন্তিয়া রাজ্য জয় করেন, এবং এমন কি ত্রিপুরা-ও জয় করেন বলিয়া কথিত হয়—যদিও ত্রিপুরার ইতিহাসে এ কথা নাই। পাথরে-তৈয়ারী কামাখ্যার বর্তমান দেবীর মন্দির ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়ের) যত্নে নির্মিত হয়। হিন্দু সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত বিদ্যা নিজ রাজ্যে প্রজাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে কোচরাজগণ বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু ইহা ব্যতীত, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বপ্ন বা দূর-দৃষ্টির পরিচয় ইঁহারা কেহ দেন নাই। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার বিরাট্ রাজ্য (সাম্রাজ্য বলাও চলে) গৃহবিবাদের ফলে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শুক্লধ্বজের পুত্র) রঘুদেব নারায়ণের মধ্যে বিভক্ত হয়, ইহার পরে কোচ জাতির রাজ্যশ্রী আর কখনও পূর্ব গৌরবে উন্নীত হইতে পারে নাই।

কোচবিহারের, আসামের (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার), কাছাড়ের, জৈন্তিয়া রাজাদের, শ্রীহট্টের রাজাদের এবং ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস, বাঙ্গালীর কাছে—বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙ্গালীর কাছে—গৌরববোধের সহিত আলোচনার বিষয়। বাঙ্গালার মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত বলিয়া, আসামের ইতিহাসও বাঙ্গালী ছেলেদের পাঠ্য হওয়া উচিত; আর কোচবিহার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার ইতিহাস তো বাঙ্গালার ইতিহাসেরই অংশ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে প্রাথমিক ও সহজ-লভ্য বই তেমন নাই। তবে পরলোকগত রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দুই খণ্ডে প্রকাশিত বাঙ্গালার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ "বৃহৎ বঙ্গ" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গাব্দ ১৩৪২) পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষের দিকে অতি মনোজ্ঞ-ভাবে লিখিত এই ইতিহাসের সার-সংকলন পাওয়া যাইবে। কোচবিহারের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য দুইখানি বই আছে, দুই-ই কোচবিহার সরকার হইতে প্রকাশিত—একখানি হইতেছে, হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি-এল মহাশয় সংকলিত The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements, Cooch Behar, 1903 (৭০০ পৃষ্ঠারও অধিক বড়ো বই, ইহার ইতিহাস-অংশ, পৃঃ ২০১-২৮৭, এই অংশে মহারাজ নরনারায়ণের সাম্রাজ্যের মানচিত্র লক্ষণীয়), এবং অন্যখানি খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহ্‌মদ সাহেব কর্তৃক সংকলিত "কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড," কোচবিহার রাজশক ৫২৬=১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (৪৫৫+৩পৃষ্ঠা)। চৌধুরী আমানতউল্লা খাঁ সাহেবের পুস্তকখানি ইতিহাসের দিক্ হইতে বিশেষ উপযোগী এবং সুলিখিত। ত্রিপুরার ইতিহাসের মুখ্য আধার হইতেছে বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত "রাজমালা" গ্রন্থ—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভ হইতে ধারাবাহিক-ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পুস্তক লিখিত হয়। এই পুস্তকের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। রাজমালার আধারে বহু পূর্বে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজমালা" নাম দিয়া প্রণয়ন করেন। সমগ্র রাজমালা পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া, ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে টীকাটিপ্পনীর সহিত এই গ্রন্থের ছয় "লহর"-এর মধ্যে প্রথম তিন লহর, এক অতি-সৌষ্ঠবময় রাজসংস্করণে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট অংশ তিনি প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্করণের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে একদেশদর্শী পক্ষপাতদুষ্ট ফারসী ইতিহাসের বাহিরে, পূর্ব-ভারতের ইতিহাস আলোচনার বহু মূল্যবান্ সাধন হইতেছে আসামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"বুরঞ্জী" বা ইতিহাস-সাহিত্য। অহম-রাজারা ব্রহ্মদেশ হইতে তাঁহাদের ভাষায় ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি আসাম-দেশে প্রবর্তন করেন। এই ইতিহাসকে অহম-ভাষায় "বু-রন্-জী" বলে। অহম-ভাষার এই "বু-রন্-জী" শব্দ ("বু"= পুরানো বা না-জানা কথা; "রন্"=জানা; "জী"=ভাণ্ডার) 'ইতিহাস' অর্থে অসমিয়াতে এখন সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছে। ভারতের আর কোনও ভাষায় এই প্রকার ঐতিহাসিক সাহিত্য নাই; এ বিষয়ে অসমিয়া ভাষা একক। সন তারিখ দেওয়া রীতিমতো ইতিহাস রচনার রীতি আসামে অহম রাজারাই প্রবর্তন করেন। অহম-ভাষায় একটা বেশ বড়ো বুরঞ্জী-সাহিত্য আছে; কিন্তু অহম-ভাষা বিগত ঊনবিংশ শতকের মধ্যেই প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়— অসমিয়া-ভাষীদের মধ্যে বাস করিতে-করিতে এই ভাষার অস্তিত্ব রাখা অহমদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, অহম "দেওধাই" বা পুরোহিতেরা এই ভাষা কিছু-কিছু জানিতেন। কিন্তু এখন অহম-জানা লোক আর নাই বলিলেও চলে। ইংরেজ ইতিহাসানুরাগীদের চেষ্টায় দুই-একখানি অহম-ভাষার বুরঞ্জী ইংরেজি অনুবাদ সমেত অহম অক্ষরে মূলের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ অহম-ভাষাতেই বুরঞ্জী বা ইতিহাস লেখা হইত। পরে, অহম-রাজদরবারে ও রাজবংশে আর্য্য অসমিয়া ভাষার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে, অসমিয়া ভাষাতেও বুরঞ্জী লিখিত হইতে থাকে। অসমিয়া ভাষায় রচিত অনেকগুলি বুরঞ্জী পাওয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, অসমিয়া ভাষাতে রচিত বুরঞ্জীগুলি-ও আসাম সরকারের "ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা বিভাগ"-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আসামের সুবিখ্যাত কবি ও সুসাহিত্যিক, গৌহাটীর কটন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞা এম-এ, বি-এল (কলিকাতা), পি-এচ-ডি (লণ্ডন), রায় বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া (ও দুই-এক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অনূদিত হইয়া) প্রকাশিত হইতেছে। আসামের অহম-রাজাদের ইতিহাস-সম্পর্কে, তাঁহাদের রাজ্যশাসন, সামাজিক ও অন্য রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এই বুরঞ্জীগুলি একমাত্র প্রামাণিক পুস্তক তো বটেই; এতদ্ভিন্ন, কোচবিহারের রাজাদের সম্বন্ধে, কাছাড়ী ও জৈন্তিয়া রাজাদের সম্বন্ধে, এবং এমন কি ত্রিপুরার রাজাদের সম্বন্ধেও, অন্যত্র অপ্রাপ্য নানা তথ্য ও ইতিহাসের কথা এই-সকল বুরঞ্জী হইতে পাওয়া যায়। ইংরেজি সক্ষিপ্তসার সমেত এগুলির প্রকাশ দ্বারা অধ্যাপক সূর্য্যকুমার ভূঞা মহাশয় ও অন্য অসমিয়া পণ্ডিতগণ পূর্ব-ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার পক্ষে অমূল্য উপাদান আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন; এই জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ ভারতের ইতিহাসের আলোচক প্রত্যেক সুধীজনের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

অধ্যাপক ভূঞা ১৯৩৮ সালে "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" নামে একখানি অতি মূল্যবান্ বুরঞ্জী-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী পাঠকদের দৃষ্টি এই পুস্তকের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করেন আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, গৌহাটীর কটন কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ। ইনি ২৩এ ভাদ্র ১৩৫২ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা"-তে এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন; এবং যতীন-বাবুর মুখে শুনিয়া, আমি "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"-র গুরুত্ব প্রথম উপলব্ধি করি। পরে বিগত ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে শিলঙ্-এ "নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন"-এ যোগ দিবার কালে, গৌহাটীতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞার সৌজন্যে "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" এক খণ্ড ও অন্য বুরঞ্জী গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া এই বই পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করি। সূর্য্যকুমার-বাবু স্বকীয় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য ধরিয়াছেন, এবং ভূমিকায় এই বই সম্বন্ধে নিজ বিচার অতি সমীচীন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"-র লিখনকাল ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ; সরল ভাবে লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হিসাবে বইখানি অপূর্ব। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে অহম এবং ত্রিপুরা রাজ-দরবারের বর্ণনা-চিত্রের মাধ্যমে, এই পূর্ব-ভারতের দুই হিন্দু রাজবংশের রীতি, নীতি, তথা ইহাদের বাহ্য সংস্কৃতির সূক্ষ্ম আলেখ্য-রচনায় ইহা অমূল্য, এবং সম্পূর্ণ অনপেক্ষিত। এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার বস্তুতান্ত্রিক ও নির্বৈয়ক্তিক বর্ণনায়, "ত্রিপুরা বুরঞ্জী"র লেখকদ্বয়কে আন্তরিক সাধুবাদ না দিয়া পারা যায় না, কটকী রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগীকে একাধারে উচ্চকোটির সাহিত্যিকের ও ঐতিহাসিকের, এবং চক্ষুষ্মান্ দর্শকের ও বর্ণনা-কুশল লিপিকরের-ও সম্মান দিতে হয়।

"ত্রিপুরা বুরঞ্জী"তে নিতান্ত অনপেক্ষিত ভাবে আসামের অহম-রাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের ভাবনা ও সুদূর-প্রসারী দেশাত্মবোধের ও সংস্কৃতি-রক্ষামূলক প্রচেষ্টার পরিচয় আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। একটি প্রাচীন গ্রীক প্রবাদ আছে—ইলিয়াদ মহাকাব্যের বীর রাজা Agamemnōn আগামেমনোন্-এর পূর্বেও শূর-বীর অনেক হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁহাদের বীরত্ব-কথাকে অমর করিয়া রাখিবার জন্য Homer হোমের-এর ন্যায় কবির অভাব ছিল, সেই জন্য তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির অতলে চলিয়া গিয়াছে। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের ভাবের ভাবুক হয়-তো আরও অনেক ছিলেন—কিন্তু রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের মতো কেহ তাহার কোনও পরিচয় রাখিয়া যায় নাই—রাখিয়া গেলেও, হয়-তো তাহা মহাকালের করাল গ্রাসের মধ্যে গিয়া অবলুপ্ত হইয়াছে। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব যাহা চাহিয়াছিলেন—তাহা হয় নাই; মহাকালের বিধান, এখন তাহা লইয়া আফ্‌শোশ করিবার কিছু নাই। খ্রীষ্টীয় ষোলো, সতেরো ও আঠারোর শতকে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, বিরোধ ও মিলনের পথে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মিলিত সৃষ্টি আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা সজ্যমান। ভারতের ভিতর এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে কোথাও বৈরিভাব, কোথাও-বা মৈত্রী দৃষ্ট হয়; এবং বহু স্থলে বৈর ও মিত্রতা পাশাপাশিই অবস্থান করিতেছিল, এখনও যেমন করিতেছে। মুসলমানের দ্বারা পূর্ণভাবে বিজিত হয় নাই বলিয়া, এবং মোগল রাজশক্তি তখনও বিজীগিষু বলিয়া, আসামের মানুষের কাছে, ত্রিপুরার মানুষের কাছে, মুসলমানের সংস্কৃতি ছিল—স্বাধীনতা-নাশক শত্রুর দুর্বোধ্য বা অবোধ্য ব্যাপার ও মনোভাব। এখানে কালধর্ম এবং পারিপার্শ্বিক বিচার করিতে হইবে। ইস্‌লাম সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ধ্বংসমূলক আগ্রহে ক্রিয়াশীল ইস্‌লাম সম্বন্ধে, সোমনাথের পুরোহিতদের, পৃথ্বীরাজ চৌহানের, বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা বুক্ক রায়ের ও মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের, মহারাণা সংগ্রাম সিংহের, মহারাণা প্রতাপ সিংহের, মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর, শিখ নেতা বন্দা বাহাদুরের, শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের যে মনোভাব থাকা স্বাভাবিক, সম্রাট্ আকবরের পার্ষদ বীরবলের ও রাজা মানসিংহের নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ও রাজা রামমোহন রায়ের, মুসলমান-যুগের সূফী মতের সহিত পরিচিত ফারসী-পড়া হিন্দু শিক্ষিত জনের, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো সাধকের, এবং মুসলমান সংস্কৃতি ও চিন্তার সহিত সুপরিচিত আধুনিক কালের সহৃদয় শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে, সে মনোভাবটি ঠিক পাওয়া যাইবে না। সেইরূপ হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে সাধারণ অশিক্ষিত তুর্কী সৈনিকের যে ধারণা বা বোধ বা বিচার ছিল, সুলতান মহ্‌মুদ গজনবীর যে ধারণা ছিল, ঔরঙ্গজেব বাদশাহের ঐতিহাসিক বদাউনী প্রভৃতির যে ধারণা ছিল এবং এমন কি আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক দল বিশেষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনও-কোনও মুসলমান নেতার মনে যে ধারণা দেখা যায়, সে ধারণা বহু সূফী সাধকের নহে, অল্-বীরূনী, আবুল ফজল ও ফয়জীর মতো পণ্ডিতের নহে, আকবর বাদশাহ্ ও রাজকুমার দারা শেকোহের নহে, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও আধুনিক কালের শত-শত শিক্ষিত মুসলমানের নহে। ইস্‌লামের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যাহারা নরহত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাহারা, এবং ইস্‌লামের রহস্যবাদের মধ্যে নিহিত সংস্কৃতি, ইস্‌লামের নাগরিকতা—এই দুইটি যে বিভিন্ন জগতের বস্তু, তাহা উভয় সম্প্রদায়ের সুধীবৃন্দ জানেন। কিন্তু তথাপি, ভাবশুদ্ধির সহিত বিচার করিয়া দেখিলে, যাহাদের বিদেশীয় আততায়ী এবং ধর্মদ্বেষী বলিয়া মনে করি, যাহারা আমার দেশকে ও আমার দেশের মানুষকে নিজের অধীনে আনিয়া আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়-ই ধ্বংস করিতে চাহে, সেইরূপ শত্রুর সহিত সমস্ত শক্তি দিয়া লড়িতে যে চেষ্টা করে, এই অত্যাবশ্যক শত্রু-দূরীকরণে যে দৈহিক শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করিতে চাহে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্র-ই তাহাকে সাধুবাদ দিবেন। রাজা স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ সেই-রূপ নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে পূর্ণরূপে সাধুবাদ পাইবার যোগ্য; এবং অনুরূপ অবস্থায় যদি কেহ পড়ে, তিনি তাহারও অনুকরণের পাত্র। নিজের ধর্ম ও স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও সমাজ—সংক্ষেপে, নিজের "চোটী বেটী রোটী" শিখা বা ধর্ম অর্থাৎ মেয়েদের সম্মান, এবং অর্থ নৈতিক জীবন—যে হিন্দু, অথবা অন্য ধর্মের মানুষ, বিধর্মী ধ্বংসকামীর হাত হইতে বাঁচাইতে চাহে, শিবাজী ও রুদ্রসিংহের মতো বীর তাহার নমস্য, তাহার অনুকরণীয়।

মহারাজ রুদ্রসিংহের পিতা স্বর্গদেব গদাধরসিংহ বহু দুঃখের মধ্য দিয়া জীবনের এক অংশ অতিবাহিত করেন। ইনি রাজা হইবার পূর্বে গদাপাণি নামে পরিচিত অহম-রাজবংশের এক কুমার ছিলেন; রাজসিংহাসনে ইঁহারও দাবি ছিল। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে, শক্তি-পরিচালনা লইয়া ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল। বিভিন্ন দলের প্রধানরা যাহাকে খুশী রাজা করিতেছিলেন, এবং রাজার নামে নিজেদেরই অভীষ্ট-সিদ্ধি করিতেছিলেন। এইরূপে ১৬৪৯ হইতে ১৬৭৯ পর্যন্ত ৩০ বৎসরের মধ্যে ১১ জন রাজা আসামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে দীর্ঘতম রাজত্ব হইতেছে রাজা জয়ধ্বজ সিংহের (৯ বৎসর, ১৬৫৪-১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও রাজা চক্রধ্বজ সিংহের (৭ বৎসর, ১৬৬৩-১৬৭০)। এই ১১ জনের শেষ রাজা ছিলেন চু-লিক্-ফা ওরফে "ল'রা রজা" বা "শিশু রাজা"। রাজবংশীয় গদাপাণি পাছে ইঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, এই আশঙ্কায় অত্যাচারী মন্ত্রী নিমাতি বর-ফুকন ইহাকে ধরিয়া বধ করিবার সংকল্প করেন। গদাপাণি, লাই ও লেচাই নামে নিজ দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, নাগা-পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লয়েন, এবং পরে নানা স্থানে তাঁহাকে আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাঁহার পত্নী সাধ্বী জয়মতী কুয়ঁরী ধরা পড়েন। স্বামীর পলায়নস্থান তাঁহার শত্রুদের জানাইয়া দিবার জন্য জয়মতী কুয়াঁরীর উপর নানা নিষ্ঠুর অত্যাচার চলে। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। গদাপাণি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বন্দী ও মৃতপ্রায় স্ত্রীর সঙ্গে গিয়া দেখা করেন, কিন্তু পাছে স্বামী ধরা পড়েন, এই আশঙ্কায় জয়মতী কুয়ঁরী যেন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই এই ভাব প্রকাশ করেন, ও চোখের ইঙ্গিতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে স্বামীকে অনুরোধ করেন। গদাপাণি নিরুপায় হইয়া স্ত্রীর অনুরোধ পালন করেন, এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জয়মতীর মৃত্যু হয়। দেশের মধ্যে অরাজকতা; ওদিকে বাহিরে মোগলদের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। তখন নিমাতি বর-ফুকনের বিরুদ্ধে অন্য কয়েক জন সেনাপতি ও উচ্চবংশীয় রাজপুরুষ ষড়যন্ত্র করিয়া, গদাপাণিকে রাজা নির্বাচিত করিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গদাপাণি, "চু-পাৎ-ফা" বা "স্বর্গদেব গদাধরসিংহ" নাম লইয়া, "ল'রা-রজা"র স্থানে রাজা হইলেন।

গদাধরসিংহ ও তৎপুত্র রুদ্রসিংহ (পূর্বনাম ছিল 'লাই'), ইঁহাদের দুই জনের আমলে অহম রাজশক্তি সর্বোচ্চ শিখরে উত্থিত হয়। গদাধরসিংহ যে অতি যোগ্য পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বের সব কথা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। দেশের ভিতরে নানা স্বার্থপরতা ও নীচতা, বিরূপ ভাব ও ষড়্যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে লড়িতে হয়। পার্বত্য জাতি মিরি এবং নাগাদিগের বিরুদ্ধে (তাহারা পাহাড হইতে নামিয়া সমতল ভূমিতে অসমিয়া প্রজার উপর অত্যাচার করাতে) গদাধরসিংহকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পনেরো-বৎসর-ব্যাপী রাজত্বের সব-চেয়ে গৌরবময় কৃতিত্ব হইতেছে এই যে, তিনি স্বদেশের যে অংশ মোগলদিগের অধীনে ছিল—গৌহাটী নগর ও কামরূপ জেলা—তাহা অধিকার করিয়া লয়েন; গৌহাটীতে মোগলদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভীষণ পরাজয় ঘটে, এবং মোগল সেনার প্রচুর দ্রব্য-সম্ভার—সোনা, রূপা, হাতী, ঘোড়া, গোরু, মহিষ, নানা আকারের কামান ও বন্দুক, তরবারি বর্ষা ও অন্য অস্ত্র,—অহমদের হস্তগত হয়। ১৬৮১ সালে এই বিজয়ের পরে, আসাম আর কখনও মুসলমান সেনার দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই।

গদাধরসিংহ হিন্দু নাম লইলেও, পুরাপুরি হিন্দু হয়েন নাই—কতকটা আধা-হিন্দু-ই ছিলেন। তিনি যোদ্ধা ছিলেন, এবং প্রকৃতিতে আদিম অহম-ই ছিলেন। অসাধারণ শক্তির মানুষ ছিলেন তিনি। পুরাতন বুরঞ্জী মতে, আসামের ঐতিহাসিক Sir Edward Gait স্যর এড্‌ওয়ার্ড গেট লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রচুর ভোজন করিতেন, এবং মোটা নূতন চাউলের ভাত ও অগ্নিদগ্ধ বাছুরের মাংস তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। তাঁহার ভীষণ বিদ্বেষ ছিল আসামের বৈষ্ণব মহন্তদিগের উপরে। এই মহন্তগণ জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, রাজার তাহা পছন্দ হয় নাই। ব্যক্তিগত ব্যাপারে, রাজা হইবার পূর্বে, কতকগুলি মহন্তের আনুকূল্য না পাওয়াতে—গদাধরসিংহের ক্রোধের কারণ ছিল। বৈষ্ণব মহন্তগণের শিক্ষায় নিরামিষাশী হইয়া পড়িলে, তাঁহার প্রজাগণ সৈন্য-হিসাবে অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কাও তাঁহার ছিল। কিন্তু স্বদেশ আসামের পক্ষে উপকারক এবং উপযোগী কিছু বাহির হইতে পাইলেই তিনি গ্রহণ করিতেন—বাঙ্গালা ও কোচবিহারে প্রচলিত জমির মাপের ও খাজানা নির্ধারণের পদ্ধতি তাঁহার নিজ রাজ্যেও তিনি প্রবর্তিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, অহম-রীতি অনুসারে, অহমদের প্রাচীন রাজধানী চরাই-দেওতে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়, এবং প্রত্যহ তাঁহার সমাধিতে শূকর, মুরগি, মাছ ও মদের নৈবেদ্য তাঁহার আত্মার উদ্দেশে অর্পিত হইবার ব্যবস্থা হয়। শ্রাদ্ধ-উপলক্ষ্যে অহমদিগকে প্রচুর পরিমাণে শূকর ও মহিষ মাংস খাওয়ানো হয়।

"পিতা গদার মহত্ত্ব, মাতা জয়ার সতীত্ব,
পুত্র রুদ্রর বীরত্ব, তিন অসমর বিশেষত্ব।"

—এইরূপ একটি উক্তি আসামে প্রচলিত আছে। ইহা হইতে অসমিয়া জনগণের কাছে পিতা মাতা ও পুত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

গদাধরসিংহের পুত্র, ইঁহার অহম নাম "চু-খুং-ফা", হিন্দু নাম রুদ্রসিংহ, ১৬৯৬ সালে রাজা হন, এবং ১৭১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বৈষ্ণবদের উপরে যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ ছিল, রাজা হইয়াই রুদ্রসিংহ সে-সমস্ত তুলিয়া দিলেন, ধর্ম বিষয়ে বৈষ্ণবদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, কিন্তু কেবল বৈষ্ণবদের সমস্ত সত্র ব্রহ্মপুত্র-মধ্যস্থিত মাজুলি-দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন। আসামের জনগণ যাহাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভারতের অন্য অংশসমূহের তুল্য হইয়া উঠে, সেই চেষ্টায় তিনি বাঙ্গালা দেশ হইতে বহু কারুশিল্পী, পূর্তকার, সংগীতকার, বাদক, পণ্ডিত প্রভৃতিকে আসামে আনান। সংস্কৃত বিদ্যালয় তিনি অনেক স্থাপিত করেন এবং বাঙ্গালা দেশের বড়ো-বড়ো সংস্কৃত-বিদ্যার কেন্দ্রে আসাম হইতে বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী পাঠান। শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য তিনি বাঙ্গালা দেশ হইতে শান্তিপুর মালিপোতা নিবাসী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যকে আসামে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন—শেষে, তিনি স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও, নিজের পুত্রদিগকে এবং সভার তাবৎ ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করান, এবং তাঁহাকে কামাখ্যা-মন্দিরের অধ্যক্ষ করিয়া দেন। এইভাবে তাঁহার চেষ্টায় অহমগণ দ্রুত পুরাপুরি হিন্দু বনিয়া যাইতে থাকে, এবং আসামে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রুদ্রসিংহ শিবসাগরের নিকটে রঙ্গপুর নামক ক্ষুদ রাজধানী নগরে নিজের বাসের উপযোগী ইষ্টক-নির্মিত প্রাসাদাদি বাঙ্গালী মিস্ত্রি আনাইয়া তৈয়ারী করান—ইহার পূর্বে অহম-রাজগণ মুখ্যতঃ কাঠের বাড়িতে বাস করিতেন। নিজের মাতা সতী সাধ্বী জয়মতী কুয়রীর স্মৃতির উদ্দেশে "জয়সাগর" নামে একটি বিরাট্ পুষ্করিণী এবং "জয়দৌল" নামে ইষ্টক-নির্মিত মন্দির উৎসর্গ করেন। মৃত্যুর পরে হিন্দু-মতে তাঁহার দেহের দাহের ব্যবস্থা হয়—অহম-মতে সমাধি দেওয়া হয় নাই।

রুদ্রসিংহের কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা আসাম সরকারের মুদ্রাসংগ্রহে আছে। যোগিনীতন্ত্রের বর্ণনা-মতো কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ অর্থাৎ অহমদের অধিকৃত দেশ অষ্টভুজ বলিয়া কল্পিত হওয়ায়, আসামের মুদ্রাসমূহ, গোলাকার হইত না, অষ্টভুজ হইত। ১৬১৮ শকাঙ্কিত একটি মুদ্রায় পুরাতন অসমিয়া (বা বাঙ্গালা) অক্ষরে এক দিকে লেখা আছে—"শ্রীশ্রীমৎ স্বর্গদেবরুদ্রসিংহস্য শাকে ১৬১৮"; ইহার তলায় আছে, সিংহাকৃতি dragon ড্রাগন বা অহম-জাতির কল্পিত মহানাগ মূর্তি; এবং অন্য দিকের লেখা হইতেছে "শ্রীশ্রীহরগৌরীপাদাম্বুজমধুকরস্য।" সরল রেখার পরে বিন্দুর নক্‌শা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুদ্রার ধারে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আর এক প্রকারের মুদ্রায় আছে এক দিকে "শ্রীশ্রীমৎসৌমরেশ্বরদেবরুদ্রসিংহস্য শাকে ১৬১৯"; ইহার তলায় পলায়মান হরিণের পশ্চাতে ধাবমান সিংহ বা ব্যাঘ্র অথবা ড্রাগন, এবং অন্যদিকে "শ্রীশ্রীহরগৌরী-পদ-যুগল-কমল-মধুকর।" এই দুই প্রকারের লিপি- এবং চিত্র-যুক্ত রূপার পুরা মুদ্রা বা টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অর্ধমুদ্রা বা আধুলিও আছে। আধুলির একদিকে লেখা "শ্রীশ্রীরুদ্রসিংহস্য', ও অন্যদিকে "শ্রীশ্রীশিবপদপরস্য"। এই আধুলিও অষ্টকোণ। অহম ভাষায় রুদ্রসিংহের কোনও মুদ্রা এতাবৎ পাওয়া যায় নাই, যদিও তাঁহার পরবর্তী দুই একজন রাজার অহম-ভাষায় ও ফারসী ভাষায় লেখা সমেত পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রা আছে, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রা তো আছেই। রুদ্রসিংহের পিতা গদাধরসিংহের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেবল অহম-ভাষায়। অহম রাজারা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। আসামের কাছাড়ী, চুটিয়া ও অন্য বোড়ো-ভাষী হিন্দু পাঁচটি কিরাত জনসমূহের মধ্যে অহমরা একটি জন-মাত্র ছিল। ১৫৩০-এর দিকে রাজা চু-হুংমুং-র নেতৃত্বে অহমদের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—ইহারা চুটিয়া ও কাছাড়ীদের জয় করে, এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহাদের ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়। বাহিরের জগতের সহিত অহমদের তখন সংযোগ ঘটে। অহম-রাজ চু-ক্লেং-মুং (১৫৩৯-১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম নিজ মুদ্রা প্রচার করেন—অহম-ভাষায়। ইহার পূর্বে কোচ-রাজ নরনারায়ণ-(১৫৪০-১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ত্রিপুরা-রাজ প্রথম-ধন্যমাণিক্য (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় নিজ নিজ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। সম্ভবতঃ সমগ্র বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজা দনুজ-মর্দনদেব (১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তৎপরে নরনারায়ণ ও ধন্যমাণিক্যের মুদ্রার অনুকরণে অহম-রাজ সু-তাম্-লা বা জয়ধ্বজ-সিংহ (১৬৫৪-১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মুদ্রা বাহির করেন—ইহার মুদ্রার এক দিকে আছে "শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণদেবস্য শাকে ১৫৭০" ও অন্য দিকে "শ্রীশ্রীহরিচরণ-পরায়ণস্য।" তদনন্তর চু-পুং-মুং বা চক্রধ্বজসিংহ (১৬৬৩-১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ) অনুরূপ মুদ্রা বাহির করেন—এক দিকে লেখা "শ্রীশ্রীস্বর্গদেব-চক্রধ্বজ সিংহস্য শাকে ১৫৮৫" এবং অন্য দিকে "শ্রীশ্রীশিবরাম-পদারবিন্দ-পরায়ণস্য।"

রুদ্রসিংহের রাজত্বের লক্ষণীয় ঘটনা দুইটি; একটি হইতেছে কাছাড়ী ও জৈন্তিয়া রাজার যুদ্ধ, এবং নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে কাছাড় ও জৈন্তিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজ্য অহম সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া যাওয়া; এবং দ্বিতীয় ঘটনা হইতেছে, তাঁহার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ ও মোগলের সহিত শক্তি পরীক্ষায় আয়োজন। কাছাড় রাজ্য ইতিপূর্বে অহমদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অহম-রাজের সামন্ত-রাজ্য-রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অহমদের সহিত কাছাড়ীদের যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে তাম্রধ্বজ পরাজিত হইলেন, এবং অহম সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশেষ বিপন্ন হইলেন। তখন জৈন্তিয়া-রাজ রামসিংহ, অহমদের বিরুদ্ধে তাম্রধ্বজকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। রামসিংহের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল—বিপন্ন তাম্রধ্বজকে নিজের বশে পাইয়া তিনি কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিলেন; ভবিষ্যতে কাছাড়-রাজ্য অধিকার করা ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। বন্দী অবস্থায় তাম্রধ্বজ আসাম-দেশীয় দুইজন বৈরাগীকে পাইয়া তাহাদের মারফৎ নিজের খবর তাঁহার রানী চন্দ্রপ্রভার নিকটে পাঠাইলেন। চন্দ্রপ্রভার সম্বন্ধে প্রাচীন অসমীয়া বুরঞ্জীতে লিখিয়াছে—"কছারী রজার দেবীজনা (প্রধানা রানী) মহাসুন্দরী। চন্দ্র-সূর্য্যতে মলি আছে দেবীতে মলি নাই। কেশ সাত-হাতীয়া।" বৈরাগীর মুখে খবর পাইয়া চন্দ্রপ্রভা দেবী ইহাদের হাতে রুদ্রসিংহকে পত্র দিলেন, মাথার কেশ একগাছি নিদর্শন রূপে দিলেন—রুদ্রসিংহের শরণাপন্ন হইয়া, বিশ্বাসঘাতক জৈন্তিয়া-রাজের হাত হইতে স্বামীর মুক্তির জন্য অনুরোধ করিলেন। কিছুকাল পরে, রুদ্র-সিংহের সেনাপতিদের কৌশলে, কাছাড়-রাজ তাম্রধ্বজ সমেত জৈন্তিয়া-রাজ রামসিংহ ধৃত হইয়া রুদ্রসিংহের দরবারে প্রেরিত হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে দুইটি প্রবল হিন্দু রাজ্য অহম-রাজার অধীনে আসিল। ১৭০৮ সালে অহম-রাজার অধীনে আসার পরে, তাম্রধ্বজ ও রামসিংহ উভয়েরই মৃত্যু হয়। এই দুই দেশে রুদ্রসিংহ নূতন রাজা প্রতিষ্ঠিত করেন, যুদ্ধে অহম-রাজকে তাঁহারা সৈন্য সাহায্য করিবেন এই শর্তে।

ইহার পরে রুদ্রসিংহ বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত মুসলমান মোগল শাসকের সহিত শক্তি পরীক্ষার সংকল্প করিলেন। এই সংকল্পের পিছনে ছিল এক বিরাট্ আদর্শ—সমস্ত পূর্ব-ভারতে মুসলমান শাসনের স্থানে পুনরায় হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। যে আদর্শের অনুপ্রেরণায়, গুরু সমর্থ শ্রীরামদাসের শিষ্য শিবাজী, সমগ্র ভারতে "হিন্দুপদ-পাদশাহী" স্থাপনের জন্য মহারাষ্ট্রে "ভগবা ঝাণ্ডা" উড়াইয়াছিলেন, নিজ গুরুর উত্তরীয়কে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর গৈরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঊর্ধ্ববাসকে, পতাকা করিয়া, পুনরুজ্জীবিত হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—এ যেন সুদূর প্রাচ্য-ভারতে সেই আদর্শের এক প্রতিস্পন্দন-রূপে দেখা দিয়াছিল। শক্তি ও যুক্তি—এই দুইয়ের সমাবেশ রামদাস ও তাঁহার শিষ্য শিবাজীর কাম্য ছিল। রুদ্রসিংহের পিতা মোগলকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; তিনি পিতার আরব্ধ কার্য্য পূর্ণ করিতে এবং তাঁহার নির্দিষ্ট পথে আরও অগ্রসর হইতে চাহিলেন।

স্বর্গদেব রুদ্রসিংহ "বঙ্গাল মারিবলৈ" অর্থাৎ বাঙ্গালা-দেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে সেনা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের বুরঞ্জীর কথায়, মহারাজা আপনার দেশের অস্ত্র—তীর, ধনুক, বর্ষা, তরওয়াল, বন্দুক, গুলি বারুদ এবং নৌকা প্রভৃতি, ভাণ্ডারে বা অস্ত্রাগারে যত ছিল তাহার হিসাব করিলেন, এবং আরও অধিকাধিক রূপে করাইতে লাগিলেন। হাতী-ঘোড়া আরও সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং দেশের লোকেদের বেশি করিয়া অস্ত্র ব্যবহার শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাড়া, বাঙ্গালা দেশে আসামের কথা প্রচারের জন্য এবং বাঙ্গালার জনসাধারণের মনে আসাম-রাজের প্রতি প্রীতি-ভাব উৎপন্ন করাইবার জন্য, নানা শ্রেণীর লোককে, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, গুণী, গায়ন, কারিগর প্রভৃতি লোকেদের আহ্বান করিয়া আনিয়া, সকলকে "দ্রব্য সামগ্রী" দিয়া খুশী করিতে লাগিলেন। যে-সব প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বয়ং আসামে আসিতে পারেন নাই, প্রণামী স্বরূপ তাঁহাদের সোনা রূপা দিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে আসামের রাজা গুণিগণ-পরিপোষক বলিয়া চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়, এবং বহু ব্যক্তি বাঙ্গালা হইতে আসামে আসিতে থাকে।

আনন্দিরাম মেধি, বা বৈষ্ণব আনন্দিরাম, বাঙ্গালা দেশ হইতে রুদ্রদেবের সভায় আসিলেন। তিনি গায়ক ও গুণী ছিলেন, রাজাকে সংকীর্তন শুনাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কাছ পরিয়া মুরলী ধরিয়া নৃত্য দেখাইলেন। রাজা খুশী হইয়া তাঁহাকে অর্থাদি দিয়া কাছে রাখিলেন।

ইতিমধ্যে, রাজা রুদ্রসিংহ তাঁহার পিতা স্বর্গীয় গদাধরসিংহের গয়াকৃত্য করিবার জন্য গয়ায় তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে পাঠাইয়াছিলেন। ফিরিবার কালে, ঢাকায় তাঁহার সহিত স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুবংশ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। তর্কবাগীশ পরে ঢাকায় সুবংশ রায়ের নিকট রাজাদেশে এই অনুরোধ জানাইবার জন্য রত্নকন্দলী কটকীকে পাঠান যে, সুবংশ রায় যেন আসামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কতকগুলি ভালো গুণী গায়ক পাঠাইয়া দেন। সুবংশ রায় রত্নকন্দলীকে বলিলেন—"রুদ্রসিংহ মহারাজা কাছাড় ও জৈন্তিয়া রাজ্য জয় করিয়াছেন। ত্রিপুরার রাজা বড়ো রাজা; তিনি যদি এখন ত্রিপুরা-রাজের সহিত প্রীতি-সম্বন্ধ করেন, তাহা হইলে অনেক কার্য্য হয়।" রত্নকন্দলী এই কথা মহারাজের গোচরে নিবেদন করেন—সেই কথা মহারাজের মনে ছিল।

মহারাজা রুদ্রসিংহ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, আনন্দিরাম ত্রিপুরার দরবারে পরিচিত, ত্রিপুরার মহারাজও তাঁহাকে জানেন। তখন রুদ্রসিংহের কথা-মতো স্থির হইল যে, অহম-রাজের অন্যতম প্রধান-মন্ত্রীর প্রেরিত দুই জন প্রতিনিধি বা দূত সঙ্গে করিয়া আনন্দিরাম ত্রিপুরায় যাইবেন, এবং দুই রাজার মধ্যে যাহাতে মিত্রতা ঘটে, তাহার চেষ্টা আনন্দিরাম এবং তাঁহার সঙ্গের রাজকীয় দূতদ্বয় করিবেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দিরামের সহিত রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস ত্রিপুরায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন মহারাজ রত্নমাণিক্য (রাজ্যকাল, ১৬৯৮-১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ)। ত্রিপুরায় পঁহুছিয়া দূতদ্বয় বাঙ্গালা দেশের দিকে আগমনের কারণ প্রথমটায় এই রূপ দিলেন যে, আসামের অন্যতম প্রধান মন্ত্রী সুরথসিংহ বড়-বড়ুয়ার নির্দেশে তাঁহারা গঙ্গাজল আনিতে আসিয়াছেন। আনন্দিরাম মেধির ব্যবস্থায় মহারাজ রত্নমাণিক্যের সহিত দূতদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। ইহাদের সহিত আলাপ করিয়া ত্রিপুরা-রাজেরও স্বাধীন হিন্দু রাজা আসাম-রাজের সহিত সৌহার্দ্য করিবার ইচ্ছা হইল; এবং তিনি রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের সঙ্গে আপনার দুইজন উকীল বা দূতকে আসামে পাঠাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। এই দূত দুইজনের হাতে তিনি রুদ্রসিংহদেবের নামে পত্র দিলেন, বড়-বড়ুয়াকেও পত্র দিলেন। এই দুই পত্র-ই সংস্কৃতে লিখিত হইল, যেরূপ হিন্দুরাজ্যে রীতি ছিল। উভয়কে যথাযোগ্য স্বর্ণালংকার, অস্ত্র, মূল্যবান্ বস্ত্র প্রভৃতি উপঢৌকনও দিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রূপে রামেশ্বর ন্যায়ালংকার ভট্টাচার্য্য ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, ইঁহারা আসাম যাত্রা করিলেন। কাছাড় হইয়া ইঁহারা চারি জনে রুদ্রসিংহের দরবারে উপস্থিত হইলেন—আনন্দিরাম মেধি আর গেলেন না। ইঁহাদের সহিত ত্রিপুরা-রাজ দশজন অনুচর দেন, তন্মধ্যে একজন বৈদ্য, দুইজন নাপিত। সমারোহের সহিত পূর্ণ দরবারে আসাম-রাজ ত্রিপুরা-রাজের দূতদের স্বাগত করিলেন (জুলাই ১৭১১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এইরূপে দুই রাজার মধ্যে দূত মারফৎ সংযোগ স্থাপিত হইল। রুদ্রসিংহ তাহার পরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাসের হাতে ত্রিপুরা-রাজের পত্রের উত্তর দিলেন, উপযুক্ত উপঢৌকনাদিও দিলেন। রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস-ও সঙ্গে গেলেন—তাঁহাদের হাতে ত্রিপুরা-রাজের জন্য রুদ্রসিংহ একখানি 'রহস্য পত্র' দিলেন। প্রকাশ্য পত্র যাহা ত্রিপুরার দূতদের হাতে দেওয়া হইল, তাহা ছিল সংস্কৃতে; ব্যক্তিগত এই রহস্য-পত্র বাঙ্গালা ভাষায় ছিল। সুরথসিংহ বড়-বড়ুয়াও ত্রিপুরার মহারাজকে পৃথক্ পত্র দিলেন, তাহাও বাঙ্গালা ভাষায়। ত্রিপুরার দূতেরা আসামের রাজধানী শিবসাগরের নিকট অবস্থিত রঙ্গপুর নগরে দুর্গোৎসব দেখিবার জন্য রহিয়া গেলেন। পরে আসাম-রাজ ও বড়-বড়ুয়ার নিকট হইতে উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়া সকলে ত্রিপুরায় যাত্রা করিলেন (১৭১১ নভেম্বর)।

রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের সঙ্গে এবার ৩৪ জন পাইক অনুচর চলিল। কতক স্থলপথে, কতক নৌকায়, কতক ঘোড়ায় করিয়া, তাঁহারা ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে পঁহুছিলেন, ১৭১২ সালের মার্চ মাসের শেষে। এপ্রিলের মাঝামাঝি রত্নমাণিক্য মহারাজের সহিত ইঁহাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। তিন দিন পরে রুদ্রসিংহের রহস্য-পত্র ত্রিপুরার মহারাজকে দেওয়া হইল। ত্রিপুরা-রাজ ও তাঁহার দেওয়ান এবং দূত উদয়নারায়ণ ভিন্ন ত্রিপুরার আর কেহ সেখানে ছিল না। দেওয়ান আগ্রহের সহিত মোগল ও অসমিয়ার মধ্যে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন।

রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস ত্রিপুরার যথাসম্ভব পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। আসাম হইতে ত্রিপুরা যাইবার পথ, পথে যে-যে জাতির লোক বাস করে, দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কী কী জিনিস পাওয়া যায়, হাট কোথায়-কোথায় হয়, হাটে আনীত দ্রব্যাদি, কোথাকার লোকে হাটে বিকিকিনি করিতে আসে, রাজধানী উদয়পুরের খুঁটিনাটি বর্ণনা, রাজার প্রাসাদ ও রাজ-দরবারের রীতি-নীতি আদব-কায়দা, ত্রিপুরার পূর্ব ইতিহাস, তাঁহাদের অবস্থান-কালে ত্রিপুরার ঘটনাবলী,—এ-সব কথা অতি অনাড়ম্বর সারল্যের সহিত লেখকদ্বয় বিবৃত করিয়াছেন। রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস তাঁহাদের বইতে দুই রাজার মধ্যে প্রেরিত প্রত্যেক পত্রের অনুলিপি দিয়াছেন, কী কী উপঢৌকন রাজদ্বয় পরস্পরকে পাঠাইয়াছিলেন এবং বড়-বড়ুয়া ও ত্রিপুরা-রাজের মধ্যেও যে-সমস্ত উপহারের আদান-প্রদান হইয়াছিল, তাহারও পূর্ণ তালিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিয়াছেন। এমন কি, দ্বিতীয় বার রাজ্যে প্রবেশ করিবার পরে, ত্রিপুরা-দরবার হইতে ত্রিপুরার অতিথি হিসাবে তাঁহারা খাদ্যের জন্য ও অন্য বাবতে যে সিধা পাইতেন তাহার বিবরণও দিয়াছেন; যেমন সম্মাননীয় অতিথিদের জন্য ও পাইক ও ভৃত্যদের জন্য মাস-মাস মাথা পিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে ভালো আতপ চাউল ও সাধারণ চাউল, মুগের দা'ল ও কলাইয়ের দা'ল, শাকশবজী, ঘৃত, তৈল, লবণ, মশলা, পাইকদেব জন্য হাঁস ও খাসী, নিয়মিত মাটির হাঁড়ি ও অন্য পাত্র, জ্বালানী কাঠ, পূজার ফুল-পত্রাদি, সমস্ত-ই ত্রিপুরা সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। ত্রিপুরার রাজা ও প্রধান রাজপুরুষগণ দরবার প্রভৃতিতে কী কী পোষাক ও অলংকার পরিয়া আসিতেন, তাহার বর্ণনা করিতেও ভুলেন নাই। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিপুরা ও আসামের রাজাদের—ও প্রজাদের—জাঁক-জমকের ও সংস্কৃতির এমন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা আর কোথাও মিলিবে না। এইজন্য রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের এই বই অমূল্য।

দ্বিতীয় বার ত্রিপুরায় অবস্থান-কালে, রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসকে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরার একটি রাজবিপ্লবের মধ্যে পড়িতে হয়। রত্নমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুবরাজ ঘনশ্যাম কতকগুলি পারিবারিক কারণে রাজার প্রতি বিরূপ হন। স্বয়ং রাজা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায়, দুইজন বিদেশী মুসলমান (মোগল)-এর সাহায্য লইয়া, তিনি রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন ও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহার পরে হঠাৎ সরলবিশ্বাসী এবং অসহায় রত্নমাণিক্যকে নিজ বশে আনিয়া, তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে তৎস্থানে রাজা হইয়া বসিলেন। মন্ত্রী ও সেনাদলের কেহ-কেহ ঘনশ্যামের পক্ষে ছিলেন, এবং রত্নমাণিক্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও সাধারণ প্রজা ছিল নিরপেক্ষ; সুতরাং ঘনশ্যামের রাজা হইয়া বসা সহজ হইল। ঘনশ্যাম রাজা হইয়া মহেন্দ্রমাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন, এবং রত্নমাণিক্যকে কিছুকাল বন্দী করিয়া রাখিবার পরে তাঁহার হত্যা-সাধন করাইলেন। এই ঘরোয়া রাজবংশীয় বিপ্লবে কতকগুলি প্রাণ গেল, তন্মধ্যে রত্নমাণিক্যের শ্যালক একজন, এবং রত্নমাণিক্যের ও ঘনশ্যামের ভগিনীপতি একজন। ইঁহাদের পত্নীরা স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইলেন। এই-সমস্ত ঘটনা যথাযথ নিরপেক্ষ-ভাবে রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস তাঁহাদের ত্রিপুরা-বুরঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হিসাবে ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘনশ্যাম বা মহেন্দ্রমাণিক্য আসামের দূতদ্বয়কে নূতন করিয়া যথারীতি আপ্যায়িত করিলেন, এবং আসাম-রাজের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত পত্র দিলেন, বড়-বড়ুয়া সুরথসিংহকেও পত্র দিলেন। এবার নিজ উকীল রূপে অরিভীম-নারায়ণ নামে ত্রিপুরা-জাতীয় এক রাজপুরুষকে রত্নকন্দলী ও অর্জুন-দাসের সঙ্গে আসামে পাঠাইলেন, আসামের দূতদ্বয়কে যথাযোগ্য পুরস্কারও দিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরা হইতে এই দ্বিতীয় পত্র মহারাজ রুদ্রসিংহের হস্তগত হইল।

এই পত্রের উত্তরে, ১৭১৪ সালের এপ্রিল মাসে রুদ্রসিংহ ও বড়-বড়ুয়া কর্তৃক মহেন্দ্রমাণিক্যকে লিখিত সংস্কৃত পত্র লইয়া অরিভীম-নারায়ণ, রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাস ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রত্নকন্দলী ও তাঁহার সাথীর ত্রিপুরার দরবারে এই তৃতীয় দৌত্য। ১৭১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিপুরায় পৌঁছিয়া তাঁহারা শুনিলেন, ইতিমধ্যে মহেন্দ্রমাণিক্যের গ্রহণী রোগে মৃত্যু হইয়াছে, নূতন রাজা হইয়াছেন রত্নমাণিক্যের আর এক ভ্রাতা দুর্জয়সিংহ, ইনি মহারাজ ধর্মমাণিক্য (দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য) নাম গ্রহণ করেন। মে মাসের মাঝামাঝি ধর্মমাণিক্য ইঁহাদের দরবারে আহ্বান করিলেন, এবং মে মাসের শেষে সাধারণ-ভাবে আসাম-রাজের সহিত সংস্কৃত পত্রে মৈত্রী ভাব প্রকাশ করিয়া, উপঢৌকন-সহ রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসকে বিদায় দিলেন। ত্রিপুরা হইতে আসামে এবার আর দূত পাঠানো হইল না।

অসমিয়া দূত দুইজন ১৭১৫ সালের আগস্ট মাসে আসামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশ আক্রমণের জন্য রণসজ্জা করিতে-করিতে ১৭১৪ সালের আগস্ট মাসে—রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের আসাম প্রত্যাবর্তনের এক-বৎসর পূর্বে—রুদ্রসিংহ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র স্বর্গদেব শিবসিংহ তখন আসামের রাজা হইয়াছেন। পিতার মতো ভাবুক ও কর্মী তিনি ছিলেন না। ত্রিপুরা ও আসাম উভয় দেশের দুই রাজার উৎসাহের অভাবে, স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের কল্পনা আর কার্যে পরিণত হইল না—তাঁহার উচ্চাশার ও কামনার উপর যবনিকা পড়িয়া গেল।

রুদ্রসিংহের কামনা ও আশা এই ভাবে তাহার এই দুই বিশ্বস্ত দূত তাঁহাদের রচিত বুরঞ্জীতে প্রকাশ করিয়াছেন: "রুদ্রসিংহ মহারাজ দেবতা, জয়ন্তা ও কাছাড় এই দুই দেশ দখল করিয়া, পরে বাঙ্গালা দেশ দখল করিবার উদ্যম করিলেন। তাহার পরে সেই দেশের অন্তর্গত (মিথিলা-সংলগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নেপাল-দেশের অংশ) মৌরঙ্গের রাজা, বন-বিষ্ণুপুরের রাজা, নদীয়ার রাজা, বেহারের (সম্ভবতঃ কোচ-বিহারের) রাজা, বর্ধমানের কীর্তিচন্দ্র জমিদার, বড়নগরের উদয়নারায়ণ জমিদার, এই সকলের নিকটে (আসামের অন্যতম প্রধান কর্মচারী) বড়-ফুকনের নামে লোক পাঠাইয়া, তাঁহাদেরও লোক আনাইয়া, বড়-ফুকন-ই যেন মহারাজকে জানাইতেছেন এইভাবে তাঁহাদের লোককে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া, সেই সকল রাজা ও জমিদারের জন্য উপঢৌকন দিয়া ও তাঁহাদিগকে প্রীতিপূর্বক পত্র দিয়া, আমাদের লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এই রূপে মনুষ্য গতায়াত করাইয়া তাহাদিগকে বশ করিয়া লইয়া, পরে তাঁহাদিগকে কহিয়া পাঠাইলেন—'আমরা হিন্দুধর্মস্থ রাজাসকল বিদ্যমান থাকিতে, যবনে ধর্ম নষ্ট করে। এই কারণে, সকলে এক-বাক্য হইয়া যবনকে নিগ্রহ করিয়া ধর্ম রক্ষা করিলে, যাহা হইতে পারে, তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন।' এইরূপে সকলেরই নিকট লোক পাঠাইয়া জানাইলেন। তাঁহারাও অনুমোদন করিলেন।"

ত্রিপুরা-রাজ ধর্মমাণিক্যকে যে 'রহস্য-পত্র' দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে এইরূপ লিখা ছিল—"সমাচার এই, জন-ঘোষ এমন প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, মোগলের বৈপরীত্য-চেষ্টাতে বেদোক্ত ধর্ম রক্ষা পায় না। এই কারণ তৎ-প্রতিকারার্থ ব্যাপার করিতে যদি তোমার মনে ভাল বাসে, তবে তোমার সহিত যে যে বড় লোকের হার্দতা আছে, তাঁহাদের সহিত সমালোচনা করিয়া যথাবৃত্ত সামর্থ্য শক্তি আমার কাছে বিশেষিয়া লিখিবে। সমস্ত লোক ঈশ্বরের অধীন; তথাপি যেমতে আপন দেশেতে অন্যের পরাভব ব্যতিরেকে সচ্ছন্দে রাজচেষ্টা করিতে পাই, তথা যথা-ইষ্ট ব্যবহারেতে অন্য সাপেক্ষ না হয়, তাহার প্রতি সর্বথা যত্ন করিতে সমুচিত হয়।"

A word to the wise—এই ভাবে অল্প কথায় মহারাজ রুদ্রসিংহ নিজ অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মোগলের বিরুদ্ধে লড়িবার পূর্বে তিনি বাঙ্গালার ও পূর্ব-ভারতের তাবৎ স্বাধীন ও অ-স্বাধীন হিন্দুরাজার সাহায্য চাহিয়াছিলেন, একটি হিন্দু confederacy বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। যেভাবে ত্রিপুরার সঙ্গে এই চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার পরিচয় রত্নকন্দলী ও অর্জুনদাসের "ত্রিপুরা বুরঞ্জী" ("ত্রিপুরা দেশের কথার লেখা। শ্রীশ্রীরুদ্রসিংহ মহারাজা-দেবে ত্রিপুরা দেশের রাজা রত্নমাণিক্য সহিত প্রীতিপূর্বক কটকী [=দূত] গতাগত করা কথা : শক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১৬৪৬") পুস্তকে পাইতেছি। অন্যান্য স্থানে প্রেরিত দূতগণের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় নাই—হয়-তো সে কথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অনপেক্ষিত নাতি-দীর্ঘ গ্রন্থ হইতে, পুর্ব-ভারতের হিন্দু সংস্কৃতি-সংরক্ষক একজন উৎসাহী ও বিজয়ী রাজার দৃষ্টি-ভঙ্গীর ও কর্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় পাইতেছি; এবং এই রাজাকে আমরা "পুর্ব-ভারতের শিবাজী" আখ্যা দিয়া তাঁহার গৌরবে পুর্ব-ভারতের হিন্দু আমরা আমাদের গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি॥

শারদীয় "হিন্দুস্থান"
বঙ্গাব্দ ১৩৫৩
[স্বল্প পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঋগ্‌বেদ

সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধে ভারতের প্রবীণ রাজনীতিক নেতা শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজগোপালাচার্য্য বলিয়াছেন যে, Sanskrit is the symbol of our seniority among the nations of the world—পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের প্রাবীণ্যের বা শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং ভারতের ধর্মচিন্তার ও সভ্যতার উৎস-স্বরূপ হইতেছে 'ঋগ্‌বেদ'।

প্রাচীনত্বে, এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্য্যাদায়, পৃথিবীর পাঁচ-ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্বপ্রাচীন। মানবজাতির ইতিহাসে, ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে মিসর, মেসোপোতামিয়া (ইরাক—সুমের ও আক্কাদ) ও এশিয়া-মাইনর এবং সিরিয়া দেশের নানা জাতির মানুষ, ভারতবর্ষে আর্য্য সভ্যতার পত্তন, গঠন ও বিকাশের বহু পূর্বে, সভ্য জীবন-ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজ-নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং সেই জীবন-ধারা ও ধর্মের প্রকাশক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণীয় সাহিত্য-সর্জনাও তাহাদের দ্বারা ঘটিয়াছিল। কাল-ক্রমে ঐ-সমস্ত দেশে, নানা বিদেশী বিজেতার প্রভাবে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন আসিয়া যায়, ভাষায় বিপর্য্যয় আসিয়া পড়ে, এবং বহু ক্ষেত্রে জাতির মানুষ বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়; ভাষা লোপ পায় অথবা আমূল পরিবর্তিত হয়, এবং ভাষার প্রাচীন লিপির জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু বিগত ঊনবিংশ শতকে ও এই বিংশ শতকে, প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের নানা দেশের ঐতিহাসিক, প্রত্নবিৎ, বাক্‌তত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের চেষ্টার ফলে, পাথরে, মাটির ফলকে, ধাতু-ফলকে, পাপিরস্ কাগজে বা চামড়ার কাগজে উৎকীর্ণ বা মুদ্রিত অথবা লিখিত এই-সমস্ত বিলুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যের পাঠোদ্ধার হয়, এবং মানবের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু, চীনা প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় উপলব্ধ এবং জন-সমাজে পঠিত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সুপরিচিত সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী কতকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব বিরাট্ প্রাচীন সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার ঘটে। এই-সমস্ত লুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যিক রচনার পুনরাবিষ্কারের ফলে জানা যায় যে, সর্বজন-মান্য ধর্মগ্রন্থের পদে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রাচীনতম কতকগুলি গ্রন্থকে আর সর্ব-প্রাচীন বলা যায় না—তাহাদের চেয়ে আরও পুরানো গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঋগ্‌বেদ ও অন্য বেদ, প্রাচীন গ্রীসের Homer হোমের-রচিত মহাকাব্যদ্বয় *Iliad* ইলিয়াদ ও *Odyssey* ওডিসি, প্রাচীন ঈরানের *Avesta* অবেস্তা, চীনের *Shi-King* শী-কিঙ্ (বা *Shih-Ching* শ্যঃ-চিঙ্), *Shu-King* শূ-কিঙ্ ও *I-King* ঈ-কিঙ্, যিহুদীদের প্রাচীন গ্রন্থ *Thorah* থোরাহ্ (হিব্রু ধর্ম-পুস্তকের প্রাচীনতম অংশ) প্রভৃতি গ্রন্থের পিছনে, আরও প্রাচীন কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় ও অন্যবিধ গ্রন্থ এখন পাওয়া গেলেও, এবং বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-মহলে সেগুলির পঠন-পাঠন ও আলোচনা রীতিমতো-ভাবে আরম্ভ হইয়া গেলেও, প্রাচীন পুস্তকগুলির (ঋগ্‌বেদ, হোমের, শী-কিঙ্, থোরাহ্ প্রভৃতির) প্রতিষ্ঠা কমে নাই—গত আড়াই তিন হাজার বছর ধরিয়া সেগুলির পঠন-পাঠন ও চর্চা আজিকার দিনেও অব্যাহত আছে। প্রাচীন মিসরীয়, প্রাচীন মেসোপোতামিয়ার সুমেরীয় ও আক্কাদীয় (বাবিলনীয় ও অসুরীয়) ভাষায় রচিত সাহিত্য, সিরিয়া দেশের কতকগুলি শেমীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি, এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন কানিশীয় বা হিত্তী ভাষায় রচিত গ্রন্থ—এগুলির চর্চা মূল ভাষায় ও লিপিতে আরম্ভ হইলেও, পণ্ডিতগণের মধ্যে-ই তাহা সীমাবদ্ধ; এবং সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন চীনা ও হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্যের মতো আধুনিক মানব-জীবনে সেগুলির কার্য্যকরতা নাই—যদিও বহুশঃ এগুলি এ-তাবৎ আমাদের নিকটে সর্ব-প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা কয়েক শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে যে, ঋগ্‌বেদকে সাধারণ ভারতীয় হিন্দু আমরা তো পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া জানি, তাহা হইলে তাহার বয়স কত—রচনা-কাল ও সংকলন-কাল কত পূর্বেকার? ভারতের (এবং ভারতের মতো অন্য সমস্ত দেশের) প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই কয়েকটি মৌলিক কথার যৌক্তিকতা আমাদের প্রথমেই মানিয়া লইতে হইবে—এই নিম্ন-লিখিত প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকার করিতে হইবে, সেগুলির বিরুদ্ধে গেলে চলিবে না। সেই প্রতিজ্ঞাগুলি হইতেছে এই—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এক—ভারতের ইতিহাস, ভারতের আর্য্য, আর্য্যেতর এবং মিশ্র আর্য্যানার্য্য জাতির মানুষের ইতিহাস, পৃথিবীর এবং সমগ্র বিশ্বমানবের ইতিহাসেরই অংশ-মাত্র; বাহিরের পৃথিবীকে বাদ দিয়া ভারতের ইতিহাসকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া ধরা চলে না। জগতে মানব-জাতির প্রগতির সহিত সংযোগ রাখিয়া, তাহার সহিত তাল রাখিয়া, যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। অতএব প্রাচীন ভারতের ইতিকথা আলোচনা করিতে গেলে, ঋগ্‌বেদের রচনার ও সংকলনের কাল নির্ধারণ করিতে গেলে, ভারতের সহিত সংযুক্ত ভারতের বাহিরের কথাকে অন্যতম আধার রূপে দেখিতে হয়। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও প্রণিধান করিতে হয় যে, সর্বদেশে সর্বমানুষের ইতিহাসে, বিভিন্ন জাতির মানুষের ভাষায়, রক্তে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রণ এক অতি সাধারণ ব্যাপার—ভারতেও ইহার ব্যত্যয় হয় নাই।

দুই—ভারতের মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে, এবং মুখ্যতঃ জাতি-মিশ্রণের ফলে, ভারতীয় চিন্তা-ধারায় ও জীবন-রীতিতে, বিচারে ও আচারে, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আসিয়া যায় (এইরূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সকল জাতির মানুষের মধ্যে পাওয়া যাইবে)। কিন্তু তথাপি বলিতে হয়, সাধারণ মানবিক প্রকৃতিতে ভারতীয় মানব, বিশ্বমানবের বাহিরে নহে; ভারতের মানবের প্রতি (অন্যদেশীয় মানবের প্রতিও যেমন) অদৃশ্য বিশ্ব-শক্তির কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই। এই হেতু, প্রাচীন ভারতীয় মানব, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সাহিত্য বিধির বিধানে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব-প্রাচীন, একক এবং অদ্বিতীয়,—তুলনাত্মক দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা বলা চলে না, যদিও নানা বিষয়ে তাহার উৎকর্ষ এবং বিশ্বজনগ্রাহিতা অবশ্যই স্বীকর্তব্য। প্রায় তাবৎ জাতি ও ধর্মের মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ দৌর্বল্য আছে—তাহার নিজ-নিজ জাতি (ও ভাষা) এবং ধর্মকে ঈশ্বরানুগৃহীত এবং ভগবানের-ই বিধানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে—কি ইংরেজ আর কি ব্রাহ্মণ, কি মুসলমান বা য়িহুদী আর কি জাপানী, কি শ্বেতকায় ইউরোপীয় আর কি পীতকায় চীনা। কিন্তু গীতায় ঈশ্বর-বাণী বলিয়া প্রচারিত এই মহাবাক্যকে সকলেরই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয় —সদ্ভাব-প্রণোদিত কোনও ব্যক্তি এই উক্তির বিরুদ্ধে চলিতে পারিবেন না—'সমোঽহং সর্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি, ন প্রিয়ঃ।' The Chosen People of God; *Herrenvolk* বা প্রভু-জাতি; ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

God's noblest handiwork, the English Gentleman; সূর্য্যদেবী Ama-terasu-Ohomi-Kami আমা-তেরাসু-ওহোমি-কামির বংশধর জাপানী মানুষ;—ইহারাই মানবজাতির সেরা; আবার কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষ-ই ঈশ্বরের খাস তালুকের প্রজা;—সুযুক্তি-মূলক চিন্তায় এ ধরনের বিশ্বাসের কোনও স্থান নাই—Theological Bias অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট দৈববাদ-জাত ঝোঁক না থাকিলে, সরল কথা আমরা সহজ-ভাবেই লইতে পারি।

তিন—আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক বিচার, এই দুইটি হইতেছে বিভিন্ন পর্য্যায়ের বস্তু; মূলে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যেমন বিরোধ নাই, তেমনি এই দুইটির মধ্যে বিরোধ নাই। তথাপি, অন্ধবিশ্বাস-প্রণোদিত একের সঙ্গে অপরের মিশ্রণে, আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাস উভয়-ই ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে, মানবীয় ভাষায় রচিত কোনও রচনা-সম্পুটের আলোচনা করিতে গেলে, উহাকে মানব-চিত্তের ও মানব-সংস্কৃতির প্রকাশক Human Sciences বা 'মানবী বিদ্যা' অথবা 'মানবিকী'র অংশ বলিয়া-ই ধরিতে হয়। যেমন বাহ্য বিশ্ব-প্রপঞ্চ, পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চভূতময় Physical World বা এই ভৌতিক জগৎ, Physical Sciences অর্থাৎ 'ভৌতিকী'-বিদ্যার আলোচ্য। প্রতিভার দিব্য দীপ্তি থাকিলে, ভৌতিকী বা মানবিকীকে যদি ঈশ্বরীয়, অতিপ্রাকৃতিক, অতিমানব, বা অপৌরুষেয় বলি, তাহাতে শ্রদ্ধা ও আস্থা এবং ধর্মবোধি তৃপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিতর্ক-মূলক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিচার ও আলোচনার পথ তাহাতে অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যায়।

এই তিনটি বিষয় মনে রাখিলে, ঋগ্‌বেদকে (অথবা পৃথিবীর অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থকে) অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়াও, মানবের কল্পনা ও চিন্তার এক সুপ্রাচীন এবং মহনীয় প্রকাশভূমি রূপে আমরা ইহার (এবং ইহার পর্য্যায়ের অন্য রচনার) পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারি; দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ হইলেও, নিরবধি কাল ধরিয়া বিপুলা পৃথিবীর তাবৎ মানব-সন্তানের পক্ষে ইহার অন্তর্নিহিত কতকগুলি গভীর অনুভূতি, উপলব্ধি ও মৌলিক বিচারশৈলীর উপযোগিতা আমরা শুভ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সহজেই স্বীকার করিতে পারি।

সমগ্র বিশ্বজগতে নরাকার বানর-শ্রেণীর দ্বিপদ পশু হইতে আদিম মানবের উদ্ভব হইল। তদনন্তর লক্ষ-লক্ষ বৎসর পরে আদিম মানব, পশু অপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইল। ক্রমে খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ও আত্মরক্ষার তাগিদে আদিম মানব-পশু দলবদ্ধ হইয়া বাসের সুবিধা আবিষ্কার করিল, অগ্নি ব্যবহার করিতে শিখিল, কুশল দুই হাতের সাহায্যে পাথর ভাঙ্গিয়া বা ঘষিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ও কর্তনাস্ত্র তৈয়ার করিতে জানিল, পাহাড়ের গুহায় বা মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া বাস করিবার পথ আবিষ্কার করিল, কাঠ-পাতার ঘর বাঁধিতে, গাছের ডাল দিয়া ভেলা বানাইতে ও গাছের গুঁড়ির ভিতরটুকু কাটিয়া তাহা হইতে নৌকা করিতে শিখিল। এইভাবে শতাব্দীর পরে শতাব্দী, সহস্রাব্দীর পরে সহস্রাব্দী অতিবাহিত হইল। অবশেষে মানুষ যখন সমাজ-বদ্ধ জীবনের মোটামুটি পত্তন করিতে সমর্থ হইল, পশু ও মৎস্য শিকার ও ফলমূল আহরণ দ্বারা কেবল খাদ্য-সংগ্রহের পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়া, গোমেষাদি পশুপালন ও নদীমাতৃক দেশে যব-ব্রীহি-গোধূমাদি শস্যের চাষ দ্বারা খাদ্য-উৎপাদনের স্তরে গিয়া পঁহুছিল, তখন সে সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বৈদিক, প্রাচীন ঈরানীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন শেমীয় সভ্যতা ইহার বহু পরেকার ব্যাপার। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, মানুষের মধ্যে প্রথম সভ্য জীবনের উন্মেষ ঘটিয়াছিল এখন হইতে অনধিক ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে। তখনও মানব তাহার বন্য ও আদিম অবস্থার পরিবেশের মধ্যেই ছিল। ইমারত বাড়িঘর প্রস্তুত করা, প্রস্তর ও ব্রঞ্জ বা কাংস্যের অস্ত্রের সাহায্যে চাষ-বাস করা, যুদ্ধ করা, ধর্ম সম্বন্ধে বিচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা—এ-সব আরও পরেকার কথা। কৃষির ও পশুপালনের সাহায্যে অন্নের সংস্থান দ্বারা সভ্য অর্থাৎ সুগঠিত সমাজে বদ্ধ গ্রাম- ও নগর-বাসী মানুষের প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেকার ৪০০০।৫০০০ বৎসরের ওদিকে যায় না। মিসরে নীল-নদের উপত্যকা এবং মেসোপোতামিয়ার ফুরাৎ ও দিজ্‌লহ্‌ অর্থাৎ এউফ্রাতেস্‌ ও তিগ্রিস্‌ নদীর অন্তর্বেদি, এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু দ্বারা বিধৌত ভূখণ্ডে—বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার নগর-মন্দির এবং রাজা-পুরোহিত চাষী-শিল্পী বণিক্‌-সৈনিক প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া যে মানব-সভ্যতার আদি পত্তন হয়, তাহার সর্ব-প্রথম যুগের ক্ষেত্র ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার এই তিনটি নদীমাতৃক দেশ। ইহা এখন হইতে ৫০০০ বছরের অনধিক কালের কথা। পরে ঐ তিন নদীমাতৃক দেশ হইতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'সভ্যতা' বলিতে যাহা বুঝি তাহা প্রসার লাভ করে, এবং যখন মিসর, মেসোপোতামিয়া, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি Near East বা 'অন্তিক-প্রাচ্য' ভূখণ্ডের মানব সভ্যতার পথে অনেকটা আগুয়াইয়াছে, তখন উত্তর-কালে ভারতে উপনিবিষ্ট আদি-আর্য্য জাতির পূর্ব-পুরুষ ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা (এবং ইন্দো-ইউরোপীয়গণের প্রাচীনতর পূর্বজ ইন্দো-হিত্তীগণ) অর্ধ-যাযাবর অবস্থায় রুষ-দেশে উরাল পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চলে ইউরেশিয়ার শাদ্বল সমতল ক্ষেত্রে বাস করিত। 'সভ্যতা' বলিতে তাহারা নিজেরা তখনও কিছু-ই গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, বরঞ্চ মেসোপোতামিয়ার লোকেদের নিকট হইতে গো-পালন, অজ-পালন, তাম্র-নির্মিত অস্ত্র এবং সভ্যতার আর কিছু-কিছু অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০।৪০০০ বৎসরের দিককার কথা। ইহার বহু পরে, যখন এই যাযাবর ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকেরা, দক্ষিণে কৌকাসস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া, উত্তর-ইরাকে পহুছিল, তথায় তাহারা খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০-এর দিকে উপনিবিষ্ট হইয়া বাস করিতে লাগিল, ঐ অঞ্চলে 'আর্য্য'-নাম লইল, এবং তদনন্তর ইরান-দেশ হইয়া ভারতবর্ষে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রথম পদার্পণ করিল—তাহা হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-র পরেকার কথা। এই সময়েই প্রাগ্‌বৈদিক আর্য্য সভ্যতার পত্তন হয়, এবং ঋগ্‌বেদে সংগৃহীত সূক্ত বা স্তোত্র অথবা কবিতা রচনার রীতি অধিকাধিক-ভাবে প্রবর্তিত হয়।

বৈদিক সাহিত্যকে—ঋগ্‌বেদকে—অনেকে এক অসম্ভব প্রাচীন যুগে লইয়া যাইতে চাহেন। কেহ-কেহ ইহাকে ভূতাত্ত্বিকগণ দ্বারা নির্ধারিত Pliocene 'বহু-নবীন' ও Miocene 'অল্প-নবীন' যুগের গ্রন্থ বলেন—যে যুগ এখন হইতে কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বেকার, তখন পূর্ণ মানবের উদ্ভব-ই হয় নাই। ৫০,০০০, ৪০,০০০, ৩০,০০০, ২৫,০০০ বৎসরের কথাও কেহ-কেহ বলিয়াছেন। এইরূপ অসম্ভব কল্পনা, মানব-ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্রের বহির্ভূত। দুই-পাঁচজন কল্পনা করেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৪০০০ বৎসর, বৈদিক যুগ ও সাহিত্যের কাল,—জর্মান অধ্যাপক Hermann Jacobi হের্‌মান য়াকোবি এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ঋগ্‌বেদের সময় খ্রীষ্ট-পূর্ব ২০০০ বর্ষ ধরা হইয়া থাকে। মহাভারতের কাহিনী এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐতিহাসিক আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত;—কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পিছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই;—ইহা-ই হইতেছে আধুনিক কালের ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার অভিমত। মহাভারত-কাহিনীর অন্যতম প্রধান পাত্র, এবং আদি মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস, একদিকে যেমন প্রাচীন আর্য্য-ভাষী জনগণের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনী, জগদুৎপত্তি, দেবতা রাজা ও ঋষিদের চরিত্র, বীর-গাথা, রম্য-কাহিনী প্রভৃতি সংগ্রহ করেন ও সেগুলিকে 'পুরাণ' গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত করেন; তেমনি অন্যদিকে তাঁহার-ই চেষ্টায় আর্য্য-ভাষী ঋষি পুরোহিত বিজ্ঞজন জ্ঞানী ও তপস্বীদের মধ্যে নিবদ্ধ এবং দেবার্চনায় ব্যবহৃত নানা স্তব-স্তোত্র ও অন্য প্রাচীন কবিতা গান প্রভৃতিও সংগৃহীত করেন, এবং সেগুলিকে 'বেদ' নামে তিন (বা চার) মুখ্য রচনা-সম্পুট বা গ্রন্থে বিভক্ত করেন—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ (এবং অথর্ববেদ)। এবং এই হেতু ঋষি পরাশর ও দাস-রাজকন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম হয় 'বেদ-ব্যাস', অর্থাৎ বেদের যিনি সংগ্রথন করেন। সুতরাং ভারতের সর্বজন-গৃহীত প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে, বেদ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়, মহাভারতের যুদ্ধের কালে, মহাভারতের পাত্রপাত্রীদের সময়ে।

এ দেশে একটি ধারণা প্রচলিত—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩১০১ বর্ষে কলিযুগের আরম্ভ হয়, দ্বাপরের শেষে। ওদিকে আবার প্রাচীন ধারণা অনুসারে দ্বাপর যুগের অন্তভাগে, কলির পূর্বেই, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ ঘটে। সুতরাং এই মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩১০০ বা ৩২০০, মহাভারত-ঘটনার তথা বেদ-ব্যাস ঋষির এবং ঋগ্‌বেদাদির সংকলনের কাল। কিন্তু এই বিষয়ে বিচার-কালে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি মনে রাখিতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকায় আর্য্য-জাতির কোনও শাখার পক্ষে এত প্রাচীন তারিখ গ্রহণযোগ্য নহে।

সূক্ষ্ম আলোচনায় না গিয়া, বেদের রচনা-কাল ও সংকলন-কাল সম্বন্ধে যে মত, ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যুক্তিতর্ক-অনুসারী বলিয়া মনে করি, তাহা-ই সংক্ষেপে এখানে বলিতেছি। নৃতত্ত্ব, বাক্‌তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, বিশ্বেতিহাস—এই-সমস্ত আধুনিক বিদ্যা বা বিজ্ঞানের অনুমোদিত এই মতবাদ। ইংরেজ ভারতবিদ্যাবিদ্ F. E. Pargiter এফ. ঈ. পার্জিটর, কেবল পুরাণ-সমূহে লিপিবদ্ধ প্রাচীন ভারতের রাজবংশ ও রাজাদের তালিকা অবলম্বন করিয়া, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত এই রাজাদের সম্বন্ধে উল্লেখ এবং প্রাচীন গুরু-পরম্পরা প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই নিষ্কর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন যে, মহাভারতের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সময় হইতেছে খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ৯৫০—অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের মধ্যভাগে। ওদিকে ভারতীয় গবেষক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পুরাণের বংশ-পরম্পরাকে অনৈতিহাসিক ও বহুশঃ পুরাণ-সংগ্রাহকদের স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, কেবল অর্বাচীন বৈদিক শাস্ত্রে (ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে) রাজবংশ ও রাজা ঋষি ও ঋষি-পরম্পরার উল্লেখকে-ই মুখ্যতঃ আশ্রয় করিয়া, এই এক-ই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের ব্যাপার। পরস্পর-বিরোধী দুইটি বিচারের সমাধান এক-ই সিদ্ধান্তে মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ও কৃষ্ণ বাসুদেব বার্ষ্ণেয়, এই দুই মহাপুরুষের জীবৎকাল রূপে পাজিটর ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রস্তাবিত খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের মধ্য-ভাগ, জৈন ঐতিহ্য-দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। L. D. Barnett এল্. ডি. বার্নেট দেখাইয়াছেন যে, জৈন ইতিকথা অনুসারে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী (বুদ্ধদেবের সমসাময়িক, খ্রীঃ-পূঃ ৫০০) ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের ২০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হন, এবং পার্শ্বনাথের প্রায় ২০০।২৫০ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ প্রায় ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে) জীবিত ছিলেন দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথ। জৈন-মতে ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-মতে ইনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র। ভাগবত পুরাণে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ আছে, এবং ইঁহার উল্লেখ-প্রসঙ্গে জৈন-দর্শনের 'কেবলী' শব্দের ব্যবহার আছে। শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভারতের কাল যে দশম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতকের মধ্যভাগে, তাহা জৈন আচার্য্যগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির কালনির্ণয় দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে।

ঋগ্‌বেদের কাল সম্বন্ধে এই যে স্থাপনা করা হইয়াছে, বাক্‌তত্ত্ব বা তুলনাত্মক-ভাষা-তত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্বের দ্বারাও তাহা সমর্থিত হয়। ঈরানের প্রাচীন আর্য্য ভাষা দুইটি মুখ্য বিভাষায় পাওয়া যায়—(১) অবেস্তার ভাষা, (২) প্রাচীন পারসীক ভাষা। এই দুইটিকেই বৈদিক সংস্কৃতের আপন সহোদরা বলা যায়, এই দুইটি ভাষাতে উপলব্ধ রচনা ও বৈদিক ভাষায় প্রাপ্ত রচনার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হইতেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঋষি জরথুশ্‌ত্র অর্থাৎ জরতুষ্ট্রের রচিত 'গথা' অংশ—ইহার রচনাকাল খ্রীঃ-পূঃ ৬০০-র দিকে, এবং প্রাচীন পারসীকের নিদর্শন ঈরানের Achaemenian বা হখামনীষীয় সম্রাট্‌দের উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫৫০ হইতে এই লিপিসমূহ উৎকীর্ণ হয়। ঋগ্‌বেদের ভাষা এবং প্রাচীন পারসীক ও অবেস্তা ভাষার মধ্যে মাত্র ৩।৪ শত বৎসরের ব্যবধান থাকিতে পারে—তাহার অধিক নহে। ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বেদের সংকলন-কাল, এবং ৬০০-৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অবেস্তার গাথা অংশ ও প্রাচীন পারসীক লেখের কাল,—ইহাতে ভাষার দিক হইতে বেশ সামঞ্জস্য হয়। বেদকে ২০০০-৪০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে লইয়া গেলে, এ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। সুতরাং বাক্‌তত্ত্বের হিসাবে ঋগ্‌বেদ—শেষপর্ব ১০০০-৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ, অবেস্তার প্রাচীন অংশ ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ—বেশ মিল খায়।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকের কোনও সময়ে ঋগ্‌বেদাদি বেদ সংকলন দ্বারা 'বেদ-ব্যাস' আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সময়কে বেদ-সংহিতা সাহিত্যের *terminus ad quem* অর্থাৎ 'উত্তর-সীমা' বা 'অন্ত্য বা শেষ অবধি' বলা যাইতে পারে। যদিও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতক বেদ-ব্যাসের সময়ের পরেও বেদ-সংহিতা ছিল open book. বা 'খোলা পুস্তক', অর্থাৎ ইহাতে 'খিল' বা পরিশিষ্ট-রূপে ও অন্যভাবে কিছু-কিছু পরবর্তী রচনা সংযোজনার দ্বার অবারিত ছিল, বেদ-সাহিত্য এখনকার মতো closed book বা পূর্ণ ও সংবদ্ধ রুদ্ধদ্বার পুস্তক হয় নাই। বেদের অন্তিম অবধি দশম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতক হইলে, *terminus a quo* অর্থাৎ 'প্রারম্ভিক অবধি' অর্থাৎ বেদ-রচনার আরম্ভকাল কত পূর্বের? ঋগ্‌বেদের ১০১৮টি সূক্ত, তদ্রূপ অথর্ববেদের ৭৩০টি সূক্ত, সবগুলিই এক পুরুষে বা এক-ই কালে রচিত হয় নাই। অন্ততঃ কয়েক শত বৎসরে ৮।১০ পুরুষ ধরিয়া বেদের মধ্যে সংগৃহীত সূক্তগুলি রচিত হইয়া আসিতেছিল, পরে সেগুলি একত্র গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয়, এইরূপ অনুমানের পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। পৃথিবীর অন্য দেশে, এবং ভারতবর্ষে-ও, একটি জাতির মধ্যে প্রচলিত কবিতা, স্তোত্র, গান, পদ, ছড়া প্রভৃতি এই ভাবে-ই একাধিক যুগের সাহিত্য-সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঋগ্‌বেদে ও অন্য বেদ-সংহিতায় যে ভাষা পাই, তাহার পাণিনি-প্রোক্ত প্রাচীন নাম হইতেছে 'ছান্দস', এবং সাধারণতঃ আমরা এই ভাষাকে 'বৈদিক সংস্কৃত' বলিয়া থাকি। ইহা আমাদের সাধারণ সংস্কৃত—'লৌকিক সংস্কৃত' হইতে বহু বিষয়ে পৃথক্। ইহার ব্যাকরণ লৌকিক সংস্কৃতের অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং ইহার সাধারণ শব্দাবলী বহুশঃ প্রচলিত সংস্কৃতের শব্দাবলীর সহিত মিলে না। ইহা হইতেছে সংস্কৃতের আদি বা প্রাথমিক ভারতীয় রূপ। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কর্তৃক খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে যখন বেদ প্রথম সংকলিত হয়, ইহা মুখ্যতঃ সেই সময়ের প্রচলিত ও জনসাধারণের পক্ষে বোধগম্য ভাষাই ছিল। তবে সংকলনের সময়ের পূর্বে—এমন-কি বহু পূর্বে—ঋগ্‌বেদের বহু সূক্ত রচিত হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করিলে, সেই-সমস্ত প্রাচীন সূক্তের ভাষা অনেক স্থলে হয়-তো বেদ-ব্যাসের যুগে-ও সকলের বোধগম্য ছিল না। বাঙ্গালা বৈষ্ণব মহাজনপদের সংগ্রহে যেমন। আদি চণ্ডীদাস কবি এখন হইতে খুব সম্ভব ৫৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাহার রচিত বলিয়া আমাদের মধ্যে এখন পঠিত ও গীত প্রায় তাবৎ পদ, ব্যাকরণে ও শব্দাবলীতে আমাদের আধুনিক বাঙ্গালার মতোই লাগিবে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচার ও গবেষণার সাহায্য লইয়া চণ্ডীদাসের ভাষার আলোচনা করিলে, এবং প্রাচীন পুঁথির পাঠের খুঁটিনাটি বিচার করিয়া চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষার প্রকৃতি উদ্ধার করিয়া, বস্তুটিকে দেখিলে, অধুনা-প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে লব্ধ বা গায়কের মুখে শ্রুত চণ্ডীদাসের সেই সহজবোধ্য আধুনিক বাঙ্গালার ঢঙ্গের পদ একটু অন্য ধরনের লাগিবে, ক্বচিৎ বা বোধগম্যই হইবে না। ঋগ্‌বেদের কোনও সূক্ত যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১২০০ বা ১৩০০ বা ১৪০০-র দিকে রচিত হইয়া থাকে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ৯৫০-এর দিকে প্রচলিত ভাষার সহিত তাহা অভিন্ন হইতে পারে না। তাহা কিছুটা পৃথক্ নিশ্চয়-ই ছিল। আধুনিক তুলনাত্মক বাকতত্ত্বের সাহায্যে সেই পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে দুইটি ছত্র দিয়া, কি-ভাবে ভাষার বিবর্তন হয় তাহা দেখাইবার প্রয়াস অন্যত্র করিয়াছি। প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া, নিম্নে ভাষা-সরণি ধরিয়া বঙ্গভাষার সেই বিকাশ-পথ এক্ষেত্রে পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ছত্র দুইটি এই—

'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয়—চিনি উহারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই ছত্র দুইটি -আধুনিক কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় লিখিত হইলেও, ইহার দুইটি শব্দ হইতেছে সাহিত্যিক, একেবারে কথ্য ভাষার নহে—'তরী', এটি সংস্কৃত হইতে গৃহীত তৎসম শব্দ, এবং 'উহারে', ইহা মধ্য-যুগের পুরাতন বাঙ্গালার রূপ. কলিকাতার ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ 'ওকে', অন্যত্র ইহার প্রতিরূপ 'ওরে'। 'তরী'র স্থলে নৌকা-অর্থে এখনকার প্রচলিত রূপ 'না'-শব্দ (নৌ—নার—নাও—না), ও 'উহারে'-স্থলে 'ওরে'-শব্দ বসাইয়া, ছত্র দুইটিকে এই ভাবে সম্পূর্ণ-রূপে আধুনিক মৌখিক বাঙ্গালা ভাষায় পরিবর্তিত করা যায়—

আধুনিক বাঙ্গালা (খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৫) :

গান্ গেয়ে না বেয়ে কে আসে [=আশে] পারে ;
দেখে যেন [=জ্যানো] মনে হয়, চিনি ওরে ॥

পর-পর ছত্র দুইটির প্রাচীনতর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা বা গৌড়ীয় ভাষা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ) :

গান্ গায়া (গাইহা) নাও বায়্যা (বাইহা) কে
আশ্যে (আইশে) পারে,
দেখ্যা (দেইখ্যা) জেন্অ (জেন্হ, জেহেন) মনে
হোএ, চিনী (চিন্হী, চিন্হীয়ে) ওআরে (ওহারে) ॥

প্রাচীন গৌড়ীয় (আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ) :

গাণ গাহিআ নার বাহিআ কে আইশই পারহি,
দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই,
চিণ্হিঅই ওহারহি ॥

মাগধী-অপভ্রংশ (আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ) :

গাণঁ গাহিঅ নারঁ বাহিঅ কই (কি) আরিশই
পারহি (পালহি) ;
দেক্খিঅ জইহণ (জইশণ) মণহি হোই,
চিণ্হিঅই ওহঅরহি (ওহঅলহি) ॥

মাগধী-প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ) :

গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নারং বাহিঅ (বাহিত্তা)
কগে (কএ বা কে) আরিশদি পালধি (পালে) ;
দেক্খিঅ (দেক্খিত্তা) যাদিশণং মণধি হোদি (ভোদি),
চিণ্হিআদ অমুশ্শ-কলধি (= অমুশ্শ-কদে) ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আদি-যুগের প্রাচ্য-প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) :

গানং গাথেত্বা নারং রাহেত্বা ককে (কে) আরিশতি
পালধি (পালে),
দেক্‌খিত্বা য়াদিশং (য়াদিশনং) মনধি (মনশি)
হোতি (ভোতি), চিণ্‌হিয়তি অমুশ্‌শ-কলধি (বা
কতে) ॥

মৌখিক বৈদিকের রূপ-ভেদ (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ) :

গানং গাথয়িত্বা নারং রাহয়িত্বা ককঃ (=কঃ)
আরিশতি পালধি বা পারধি (=পারে) ;
দক্ষিত্বা (=দৃষ্ট্বা) যাদৃশম্ মনোধি (মনসি) ভবতি,
চিহ্নতে অমুষ্য-কলধি বা করধি (=কতে)
(=অসৌ অস্মাভির্ চিহ্নতে, যদ্বা জ্ঞায়তে) ॥

ঋগ্‌বেদের ভাষা ও তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদের জানা চাই। এতদিন পর্যন্ত, কি ভারতের বাহিরে আর কি ভারতে, আধুনিক-মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে ঋগ্‌বেদের ভাষা 'বৈদিক সংস্কৃত' পৃথিবীর তাবৎ 'আর্য' অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হোমেরের কাব্যগুলির ভাষা ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ওদিকের নহে। প্রাচীন লাতীন ভাষা ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের এদিককার। অবেস্তা ও প্রাচীন পারসীকের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জর্মানিক ভাষা গথিক, কেল্‌টিক ভাষা প্রাচীন-আইরিশ, বাল্‌টিক ভাষা লিথুআনীয়, প্রাচীন-স্লার ভাষা, তোখারীয়, আর্মেনীয়, আল্‌বানীয়—এ সব ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন খ্রীষ্টোত্তর যুগের। সুতরাং খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০—১২০০-এর বৈদিক, আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের মধ্যে, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সম্মান পাইত। কিন্তু কতকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই প্রাচীনতার গৌরব আর টিঁকে না। প্রথম, ১৯০৩ সালে মেসোপোতামিয়াতে Mitanni মিতান্নি আর্য ভাষা আবিষ্কৃত হইল—এই ভাষা প্রাগ্‌-বৈদিক, ইহার চেহারা দেখিয়াই তাহা বুঝা যায়। তারপরে ১৯১৭ সালে এশিয়া মাইনরে Kanisian কানিশীয় বা Hittite হিত্তী ভাষা বাহির হইল, পঠিত হইল। ইহাও বেদ-পূর্ব যুগের—খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০।১৪০০-র দিকের। এবং সর্বশেষ, সম্প্রতি গত দশ বৎসরের মধ্যে দুইজন ইংরেজ গ্রীকবিদ্যাবিৎ প্রত্নতাত্ত্বিক Michael

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

Ventris মাইকেল ভেন্ট্রিস্ ও John Chadwick জন চ্যাড্উইক, প্রাচীন গ্রীসে প্রাপ্ত অজ্ঞাত একটি বর্ণমালায় উৎকীর্ণ কতকগুলি লেখ, যাহার পাঠোদ্ধার কেহ-ই এতাবৎ করিতে পারেন নাই, সেগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই-সকল লেখের ভাষা হইতেছে এক অতি প্রাচীন ধরনের গ্রীক, হোমেরের কাব্যের ভাষা হইতেও বহু প্রাচীন; এবং এই পাঠের ফলে, এই লেখগুলিকে অবলম্বন করিয়া গ্রীক ভাষার নিদর্শন ৮৫০ খ্রীষ্ট-পূর্ব হইতে ১৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে নীত হইল। এবং গতিকে এখন এই সুপ্রাচীন গ্রীককেই বৈদিক অপেক্ষা প্রাচীনতর ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে এই প্রকারের অনপেক্ষিত ব্যাপার আমাদের সমক্ষে এখন উদ্ঘাটিত হইতেছে।

ইহার পূর্বে, ঋগ্বেদের আগে, ভাষার যে-যে অবস্থা বা স্তর ছিল, সেই প্রাক্-বৈদিক অবস্থা বা স্তরগুলিকেও আমরা প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, কেলটিক, বাল্টিক, স্লাব, এবং জরমানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠিত করিতে পারি।

এইভাবে, ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক—'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥' যখন ঋগ্বেদ-গ্রন্থে মহর্ষি বেদ-ব্যাস কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাহার ভাষার চেহারা যাহা ছিল, প্রচলিত পাঠে তাহার অনেকটাই রক্ষিত হইয়া আছে। তবে বৈদিক কালের মতো উচ্চারণ আমরা করি না, আমাদের পক্ষে করা সাধারণতঃ সম্ভবপরও নহে। নীচে রোমান লিপিতে, এখনকার প্রচলিত উচ্চারণ, এবং বৈদিক যুগের উচ্চারণ দেখাইবার প্রয়াস করা যাইতেছে—

agnim ɪḷē (=īḍē) purōhitaṁ /
yajñasya dēvam ṛtvijam /
hōtāraṁ ratna-dhātamam //

বৈদিক যুগের উচ্চারণ কতকগুলি বিষয়ে আজকালকার সংস্কৃত উচ্চারণের তুলনায় পৃথক্ ছিল। হ্রস্ব-'অ' ছিল, বিবৃত-'অ'= 'আ'-এর মতো, অর্থাৎ আজ-কালকার হিন্দীর মতো সংবৃত-'অ', অথবা বাঙ্গালা উড়িয়া অসমিয়ার মতো বর্তুল-'অ' নহে; চ-বর্গের উচ্চারণ ছিল 'ক্য, গ্য'-র মতো; ত-বর্গ ছিল দন্তমূলীয়, ঠিক দন্ত্য নহে—ইংরেজি জরমান জাপানি অসমিয়া প্রভৃতি ভাষার *t*, *d*-র মতো,—Italic ছাঁদের *t*, *d* লিখিয়া এই দন্তমূলীয় উচ্চারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নির্দেশ করা যাইতেছে ; 'এ, ও'-র উচ্চারণ ছিল হ্রস্ব সন্ধ্যক্ষর 'অই, অউ' ; 'ঐ, ঔ'-এর উচ্চারণ ছিল দীর্ঘ সন্ধ্যক্ষর 'আই, আউ'। তদনুসারে, বৈদিক ধরনে পাঠ হইবে—

agnim īḷai purauhitaṁ (বা puraudhitaṁ) /
yag'ñasya *d*aiwam ṛtwig'am /
hautāraṁ ratna-*dh*ātamam //

১৫০০-এর দিকে সংগৃহীত এই ঋকের দ্রষ্টা বা রচয়িতা ঋষি মধুচ্ছন্দাঃ যদি খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৩০০ বা ১৪০০-র মানুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার সময়ের ভাষায় (তুলনাত্মক বাক্‌তত্ত্বের দ্বারা যাহার পুনর্গঠন সম্ভবপর হইয়াছে) ঋকটি কতকটা এই ধরণের ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—

agnim izdai purazdhitaṁ /
yaz'ñasya *d*aiwam ṛtwig'am /
z'hautāraṁ ratna-*dh*ātamam //

বেদ-ব্যাসের দ্বারা উপলব্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের রূপটি, যথা :—

তৎ সবিতুর্ বরেণ্যম,
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্র চোদয়াৎ ॥

tat savitur varēṇyam /
bhargō dēvasya dhīmahi ,
dhiyō yō naḥ pra cōdayāt //

ইহার বৈদিক উচ্চারণ কতকটা এইরকমের ছিল—

***tat* sawitur waraiṇiam /**
bhargau *d*aiwasya *dh*īma(*d*)hi /
***dh*iyau yau naḥ pra k'audayāt //**

এই গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা বিশ্বামিত্র ঋষি ১৪০০ বা ১৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মানুষ হইলে, ইহার মূল রূপটি এই ধরনের ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—

***tat* sawitṛz waraiṇiam /**
bhargaz *d*aiwasya *dh*īmadhi/
***dh*iyaz yaz nas pra k'audayāt //**

মানুষের ভাষা অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রগুলিকে, অতি সহজ ভাবেই এবং সার্থক ভাবে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারের বিষয়ীভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করা চলে। মূল কথা হইতেছে, আমাদিগকে অপৌরুষেয়তা-বাদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া, অন্য সমস্ত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের মতো ঋগ্‌বেদকে-ও মানুষের রচনা বলিয়া বিচার করিতে হইবে—সে রচনার মধ্যে যতই সত্য, শক্তি, সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাতিগতা থাকুক না কেন।

ঋগ্‌বেদকে কি চক্ষে দেখিব? বহু পূর্বে, বাঙ্গালা ১২৮৪ সনে (ইংরেজি ১৮৭৭ সালে) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতো প্রাচীন-পন্থী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে যে আশ্চর্য্য সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় ৮৮ বৎসর পূর্বে দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার এই প্রবন্ধের মূল্য বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক, এমন কি আধ্যাত্মিক প্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণের ও ভক্তিবাদের পুষ্পপত্র-স্তূপের ভিতর হইতে মানব শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ) যে সার্থক চেষ্টা করেন, ইহা তাহারই সমশ্রেণিক। ('হরপ্রসাদ-রচনাবলী', দ্বিতীয় সম্ভার, ঈস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি, কলিকাতা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৮৯-৩৯৮ দ্রষ্টব্য)। এই মূল্যবান প্রবন্ধ হইতে কতকটা অংশ বহুল-ভাবেই উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

> বেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে ভয়ভক্তি-সম্বলিত কেমন একটা প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়। বেদ যে পড়িল, সে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ—যে বেদ ব্যাখ্যা করিল, সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার। বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে। যে বেদ পড়িল, সে মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন, অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখান হইতে মন্ত্র পড়িলাম, দিল্লীতে আমার শত্রু-নিপাত হইল। বন্ধ্যার বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমন্ত্রে হয়, রোগী আরোগ্য হয়, নির্ধনের ধন হয়, লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে হইলে 'বেদের বচন' বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাই। এইরূপ অজ্ঞলোকের সংস্কার, বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বারা অসাধ্য-সাধন হয়, কিন্তু উহা দুর্বোধ্য, দুষ্পাঠ্য, দুষ্প্রবেশ্য, দুরধিগম্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সরস্বতীর বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে, পূর্বজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে, বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে।

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিস? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদির সংগ্রহ মাত্র। আমরা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভরসা করি যাঁহারা কেবল সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ব্রহ্মার প্রণীত, তাঁহারা এই অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন। প্যালগ্রেভ্‌স্ গোল্ডেন ট্রেজারী অব সংস্ এণ্ড্ লিরিক্‌স্! Palgrave's *Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems in the English Language* *] হইতে এই জিনিসের প্রভেদ নাই। পূর্বোক্ত ইংরেজি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি-প্রণীত কবিতা ও গানের সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষি-প্রণীত সূক্ত বেদে গ্রথিত আছে। যদি গোল্ডেন ট্রেজারীর সহিত তুলনা করিতে কষ্টবোধ হয়, স্কান্দিনেভীয় 'সাগা' সংগ্রহের সহিত ঠিক তুলনা হইবে। আজি লডব্রক ভূগর্ভস্থ কারাগৃহে শত্রুপুরী-মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক সাগা মৃত্যুগীত রহিল, কালি মার্টন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগা হইল। এইরূপ সাগাগুলি একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইরূপ, কিন্তু সাগা-সংগ্রহ হইতে বেদের আদর-গত এত তারতম্য কেন? গীত-সংগ্রহ গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্মের উপর এত আধিপত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত মাথা-ব্যথা কেন?

প্রধান কারণ, বেদের প্রাচীনত্ব। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়-তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয় সময়-তালিকাকারগণ-কৃত সময়-নির্দেশ ভ্রমাত্মক। আমরা যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি, তাঁহারা উহাকে ১৫০০ বৎসরের বলিতে চান। আমরা বেদ-সংগ্রহকে

* প্রথম প্রকাশিত, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

†স্কান্দিনেভীয় Saga 'সাগা'কে বেদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না—সাগা-গ্রন্থগুলি গদ্যে নিবদ্ধ ইতিবৃত্ত বা পুরাণ-কথা মাত্র। শাস্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ স্কান্দিনেভীয় Edda 'এদ্দা' গ্রন্থের কথা ভাবিতেছেন—এই Edda সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

৪৯৭৭ বৎসরের পুরাণ বলিতে চাই; উঁহারা বলেন, যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদ সংগ্রহ হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাইবেল উহা হইতে নূতন। যদি-ই তুরানীয় বা অন্য জাতীয় অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে, তবে তাহা অপেক্ষাও আর্য্যজাতির বেদ যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর এক কথা এই যে, যে কালে বেদ রচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে হইলে আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই, অথচ মানব-জাতির বাল্যাবস্থার ভাব কি ছিল জানিবার জন্য লোকের বড়ই ঔৎসুক্য। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। মনে করুন, ৩০০০ বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়া গেল, কেবল গোল্ডেন ট্রেজারী রহিল। তখন গোল্ডেন ট্রেজারীর-ও এইরূপ মান হইবার সম্ভাবনা, কারণ, উহা ভিন্ন ইংরেজ জাতির চিন্তাশক্তি, কবিত্বশক্তি, সমাজ-প্রণালী ইত্যাদি জানিবার আর উপায় থাকিল না।

ইতিহাস-লেখক ও প্রত্নতত্ত্ব-ব্যবসায়িগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য মাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি, তিনি দেখিবেন, বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নাই। বেদ হোমরের একখানি মহাকাব্য মত নহে, কিন্তু বেদের এক একটি সূক্ত এক একখানি মহাকাব্য। মানব-জাতির তখন শৈশব-কাল; বাহ্যজগতে এখন তাহাদিগের যেরূপ অসীম আধিপত্য জন্মিয়াছে, তখন সেরূপ কিছুই ছিল না। তখন অগ্নি বায়ু মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ বাত্যা সকলেই দেবতা। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি নহে, অগ্নি-ই দেবতা। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন। শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকেই শিশুর চক্ষে দেখিতেন, সকলই উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোমরের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনায় যে জ্ঞান, যে পরিশ্রম, অন্তর্জগতের উপর যে আধিপত্য প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং তাঁহারা কেবল হৃদয়ের গভীর ভাব ভয় ভক্তি স্নেহ আশঙ্কা আশা ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাঁহারা কিরূপে করিয়াছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয় মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্; ভাবও সরল প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্; অলংকারের দোষ, পরিচ্ছেদের ভয় নাই, সুরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী নাই। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক, এবং একরূপ মহত্ত্বসম্পন্ন। বেদের সূক্ত অধ্যয়নকালে হৃদয়ের সম্প্রসারণ হয়, প্রকাণ্ড সুন্দর ও নূতন পদার্থ পর্য্যালোচনায় কল্পনার আমোদ, কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার ঔৎকর্ষ হয়। সেকালে তাঁহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড, তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই, তাঁহারা সামান্য পর্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে সামাজিক বন্ধন ভয়ে আমরা মনের ভাব ফুটিয়া বলিতে পাই না, তাঁহারা সেইভাবে শতগুণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন। যে বিস্ময় কবি-হৃদয়ের সর্বব্যাপী ভাব, তাঁহারা সেই বিস্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন, আধুনিক কবিরা তাঁহাদের তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক।

বেদের ধর্মগ্রন্থত্ব সম্বন্ধেই অধিক আদর, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা এইজন্য বেদ পড়েন। যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধর্মপুস্তক বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে, সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই যে, কতকগুলি গান ও কবিতা কিরূপে ধর্মগ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে হইলে 'সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল' বলিয়া চুপ করিয়া থাকা নির্বোধের কার্য্য। বাস্তবিক, উহাতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। যাহারা ঐ গান লিখিয়াছেন, তাহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে, লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। তুমি কবি, আমি অকবি, দুইজনেই একত্র থাকি, একত্র বাস করি। তুমি কল্পনা-বলে জগৎ-সংসার কত সুন্দর দেখ; আমি অকবি, মাটীকে মাটীই দেখি, আকাশকে আকাশই দেখি। তোমায় আমায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই প্রভেদ। আমরা জানি যে, আমাদের দুইজনেরই মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না। কবি যখন গান করিতেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে, তখন তাহা অপেক্ষা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল? যেমন সর্বত্র কবিরা দেবতা দেখিতেন, এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন; বলিলেন, দেবতা আমায় প্রণোদন করিয়াছেন। অন্য লোকেও দেখিল, আমরা যাহা পারি না, এ পারে কেন,—অবশ্য এ দেবতা সহায় পাইয়াছে।

এই যে মনের চঞ্চলতা, ইহাকেই সাহেবেরা inspiration বলেন। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন, সেই দেবতাই বেদ-রচক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য্য লিখিলেন, যিনি মন্ত্র দেখিলেন, তিনিই ঋষি। ঋষ্ ধাতুর অর্থ, দর্শন। এই জন্যই কালিদাসের 'মন্ত্রকৃতাং' লেখা দেখিয়া ভবভূতি যেন চটিয়াই লিখিলেন, 'মন্ত্রকৃতাং' নহে, 'মন্ত্রদৃশাং'। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময়। এইরূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তক-রূপে পরিণত হইল।

উপরে উদ্ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বেদ-সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি-ভঙ্গী, ইহা হইতেছে আধুনিক বিচারশীল মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী, এবং ইহা-ই ছিল বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদের প্রথম অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্তের দৃষ্টি-ভঙ্গী। ইহাতে বিশ্ব-সাহিত্যে বেদের যথার্থ স্থান কি প্রকারের, তাহার বিচার আছে, এবং বেদ-সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীলতা-ও আছে। একটি সমগ্র প্রাচীন জাতির মানুষের বহু পুরুষ ধরিয়া সাহিত্যিক বা কবিত্বময় আত্মপ্রকাশ, এই হিসাবে বেদের সহিত তুলিত হইতে পারে এমন কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোনও দেশে, বিশেষ কোনও কালে, সেই দেশের জনসমাজে নিবদ্ধ, সাধারণ্যে প্রচলিত স্তোত্র, গীতি-কবিতা, গাথা প্রভৃতির সংগ্রহ বলিয়া বেদকে অভিহিত করায়, আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহারা কোনও কোনও স্থলে আক্ষেপের সহিত কটূক্তি করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য বেদানুশীলক পণ্ডিতগণ বেদের অপৌরুষেয়তা ও ইহার পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ধরিতে না পারিয়া, বেদকে 'চাষার গান' বলিয়া, অবহেলার সহিত উল্লিখিত করিয়াছেন। যাঁহারা বেদকে 'মানবী বিদ্যা' বলিতে দ্বিধা করেন না, এমন আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতদেরও প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা সীমিত ভাষা-নিবদ্ধ রচনা-সম্পুট বলিয়া, কৃষিজীবী আর্য্য জাতির সাহিত্য বলিলে বেদের কোনও নিন্দা বা অমর্য্যাদা করা হয় না।

বেদের—বিশেষেতঃ ঋগ্‌বেদের—বিশ্লেষাত্মক আলোচনা—ইহার সূচী-নির্ঘণ্ট—এই প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভবপর হইবে না। এ বিষয়ে অন্য পুস্তক ইংরেজি ও বাঙ্গালায় যথেষ্ট মিলিবে। (সহজলভ্য একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের উল্লেখ করা যায়—শ্রী'অনির্বাণ'-রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা', কলিকাতা গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঋগ্‌বেদ-কে কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক বলিয়া 'পল্‌গ্রেভস্ গোল্ডেন ট্রেজারি অব সংস্ এণ্ড লিরিক্‌স্' নামে বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা-সংগ্রহের সহিত তুলিত করিয়াছেন। উভয়-ই এক পর্য্যায়ের পুস্তক; তবে ঋগ্‌বেদ হইতেছে হিমালয়, আর ঋগ্‌বেদের সমক্ষে 'গোল্ডেন ট্রেজারি' হইতেছে সামান্য একটি 'ডুংরি' বা ছোটো পাহাড় মাত্র। উভয় গ্রন্থের জাতি এক, আকার-প্রকার পৃথক্। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে উদ্ভূত, ঋগ্‌বেদের অনুরূপ কয়েকটি প্রধান কবিতা-সংগ্রহের গ্রন্থের উল্লেখ ধরা যাইতেছে।—

(১) *Shi-King* 'শী-কিঙ' বা *Shih-Ching* 'শ্যঃ-চিঙ', প্রাচীন চীনের লোক-কবিতা-সংগ্রহ, মনীষী Confucius কনফুশিয়স্ বা K'ung Fu-Tse খুঙ্ ফূ-ৎসে কর্তৃক খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ ৫০০-এর দিকে সংকলিত। কবিতাগুলির সংখ্যা ৩০৫ বা ৩১১। সামাজিক, রাজনীতিক, পারিবারিক, ও ব্যক্তিগত জীবনের কবিতা—ধর্ম ও দেবতা বিষয়ক কবিতা অতি অল্প, সংখ্যায় নগণ্য। কম্যুনিস্ট যুগ পর্য্যন্ত চীন-দেশে এই গ্রন্থ অন্যতম ধর্মগ্রন্থ এবং রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মূল্যায়ন অনুসরণ করিয়া, শ্রেষ্ঠ লোক-গীতি ও লোক-জীবনের পুস্তক বলিয়া এই বই নূতন-ভাবে সমাদর লাভ করিতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(২) Old Testament বা হিব্রু ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র সংগ্রহ *Sepher Tehellim* 'সেফের্ তেহেল্লীম্' বা স্তবগ্রন্থ অথবা *Tehellim* বা 'স্তব', যাহার ইংরেজি নাম *Book of Psalms* বা *Psalms*। ইহা প্রাচীন হিব্রু ভাষায় রচিত প্রার্থনা-গীতির সংগ্রহ, রাজা David দাবীদ বা দাউদ-এর রচিত স্তব ও প্রার্থনাই অধিক। সমগ্র গীতির সংখ্যা মাত্র ১৫০। ধর্মানুষ্ঠানে য়িহুদীদের মধ্যে মূল হিব্রু পঠিত হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ইহার পাঠ ও চর্চা ধর্মানুষ্ঠানের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার সঙ্গে, হিব্রু ভাষায় রচিত *Shi'r Shi'rim* 'শি'র্ শি'রীম্' অর্থাৎ 'গানের গান', ইংরেজিতে *Song of Songs* নামে সুপরিচিত আর একখানি ক্ষুদ্র প্রেমগীতি-সংগ্রহকেও ধরিতে হয়। ঈশ্বর ও মানবাত্মার প্রেম ও মিলন বিষয়ক রূপক বলিয়া এই গীতগুলিকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মীয় মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

(৩) খ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র কাছাকাছি ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে Is-land বা Iceland আইসলাণ্ড দ্বীপে Saemund স্যামুণ্ড নামে একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসলাণ্ডের স্কান্দিনেভীয় জনগণের মধ্যে তাহাদের Skald বা ঋষি অথবা ভাট ও চারণ জাতীয় কবিদের মুখে-মুখে প্রচলিত, দেবতা ও বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত গাথা ও কবিতার সংকলন করেন। এগুলি যেন পৌরাণিক গাথা, ঋগ্‌বেদের আখ্যান-কবিতার ধরনে রচিত। ভাষা প্রাচীন স্কান্দিনেভীয়; ভারতের আর্য্যগণের জ্ঞাতি জর্মানিক জাতির মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ধর্মের সমশ্রেণিক ধর্মের কবিতা ও পদের নাতিবৃহৎ সংগ্রহ। এই ক্ষুদ্র বইখানির নাম Edda 'এদ্দা' অর্থাৎ 'পিতামহী'। এই বইয়ে জগৎসৃষ্টি, প্রলয়-কালের মহাযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের গাথাও আছে। আমাদের ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের পাশে রাখিবার মতো পুস্তক—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও।

(৪) জাপানের Man'yoshiu 'মান্‌য়োশিউ' (অর্থাৎ 'অযুত-পত্র-সঞ্চয়ন') নামে বিরাট্ কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক। ইহা খ্রীষ্টীয় ৩৪৭ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ৭৬৪ পর্য্যন্ত প্রাচীন জাপানী জীবন-যাত্রা, যুদ্ধ, প্রেম, প্রকৃতি-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন কবির রচিত প্রায় ৪৫০০ কবিতার সংগ্রহ। ইহাকে এক হিসাবে জাপানের ঋগ্‌বেদ বলা যায়। তবে কাব্যরসে অপূর্ব হইলেও, এই গ্রন্থের ধর্মীয় কোনও মূল্য বা প্রয়োগ নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

(৫) দক্ষিণ-ভারতের Nayanmār 'নয়নমার্' বা শৈব ভক্তগণের প্রার্থনা- ও আত্মনিবেদন-বিষয়ক তমিল্ পদ ও কবিতার সংগ্রহ *Tevāram* 'তেরারম্' বা 'দেরারম্'। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নম্‌পি-অণ্টার্-নম্‌পি নামে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংকলিত। ইহা তমিল্ শৈব সম্প্রদায়ের কাছে বেদ ও উপনিষদের মতো সম্মানিত, এবং ধর্মানুষ্ঠানে গীত, পঠিত ও আলোচিত হয়।

(৬) আঠারো জন তমিল্ Āzhvār 'আড্‌বার্' বা বৈষ্ণব ভক্তগণের পদ-সংগ্রহ *Nāl-āyirap-Pirapantam* 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্' অর্থাৎ 'চতুঃ-সহস্র-প্রবন্ধ' পুস্তক। (ইহার একটি অংশ, প্রায় এক-সহস্র-পদময় 'সহস্র-গীতি', আড্‌বার্ শঠকোপ- বা নম্মাড্‌বার্-বিরচিত 'তিরু-বায়্-মোড়ি' অর্থাৎ 'শ্রীমুখবাণী' খণ্ড, বঙ্গাক্ষরে মূল তমিল্ ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস কর্তৃক খড়দহ শ্রীবলরাম ধর্মসোপান উজ্জীবন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ*)। শ্রী-সম্প্রদায়ের তমিল্ বৈষ্ণবগণের নিকট এই সংগ্রহ-গ্রন্থ 'দ্রাবিড বেদান্ত' বলিয়া সম্মানিত, এবং ইহার পদ, 'তেরারম্'-এর পদের মতো মন্দিরে ও অন্যত্র গীত হয়, পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। 'তেরারম্'-এর কবিতা বা পদ যখন সংকলিত হয়, ঠিক সেই সময়েই, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে, শ্রীনাথমুনি কর্তৃক এই তমিল্-বৈষ্ণব-পদ-সংহিতা গ্রথিত হয়।

(৭) শিখ 'আদি-গ্রন্থ', বা 'গুরু-গ্রন্থ', বা 'গ্রন্থ-সাহিব'। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন, গুরু শ্রীনানক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পূর্বের গুরুগণের রচিত পদ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সংকলিত করেন। তাঁহার সময়ে পাঞ্জাবে প্রচলিত সন্ত কবীরদাসের ও অন্য কয়েকজন সুপরিচিত ভক্ত কবির বহু পদ-ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন। পরে গুরু তেগ বাহাদুরের সময় পর্যন্ত ইহাতে অন্য শিখ গুরুগণের পদও গৃহীত হয়। এই পুস্তক হইতেছে শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ, সমস্ত শিখ গুরুদ্বারায় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইহার পদসমূহ গীত, পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইহার ভাষা পাঞ্জাবী-মিশ্র প্রাচীন হিন্দী (ব্রজভাষা, দিল্লী অঞ্চলের ভাষা, অপভ্রংশ ইত্যাদি)। এই বইকে 'মধ্যযুগের পাঞ্জাবের ঋগ্‌বেদ' বলা চলে। ইহার পদসংখ্যা ৩৩৮৪।

(৮) বাঙ্গালা বৈষ্ণব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গঠিত হইল, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের

* এতৎসম্পর্কে এই প্রবন্ধ-সংগ্রহে সংকলিত পরবর্তী নিবন্ধ 'শঠকোপ-কৃত সহস্র-গীতি' দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অন্যতম অঙ্গ হিসাবে জয়দেব কবি (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ) হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণ-লীলা এবং চৈতন্য-জীবনী অবলম্বন করিয়া যে-সমস্ত পদ বা গান লিখিতেন, সেগুলি লইয়া 'কীর্ত্তন' গান করার পদ্ধতি আসিয়া গেল। এইরূপ গানের (মহাজন-পদের) কতকগুলি সংগ্রহ খ্রীষ্টীয় ১৬৬০-এর পর হইতে বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইতে থাকে। বৈষ্ণব অলংকার ও রসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, বিভিন্ন পর্য্যায়ে পদগুলিকে এই-সব সংগ্রহে সাজানো হইত—যথা, 'পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মান, খণ্ডিতা, মিলন' প্রভৃতি। এইরূপ প্রাচীন সংগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে 'পদকল্পতরু', ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ প্রস্তুত করেন, ১৭০ জন কবির রচিত ৩১০১-টি পদ ইহাতে আছে। ইহাকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজন-পদের ঋগ্‌বেদ-সংহিতা' বলা যায়। (কিছুকাল হইল, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের সম্পাদনায় এইরূপ গৌড়-বঙ্গীয় বৈষ্ণব মহাজনপদের পূর্ণতম সংগ্রহ, টীকা-টিপ্পনী সহ, দুই শতের অধিক কবির রচিত ৩৭৫৬-পদময় বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—কলিকাতা 'সাহিত্য সংসদ্', খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬১।)

(৯) ফিন্‌লাণ্ড দেশের, তুর্কী-ভাষার জ্ঞাতি ফিন্-ভাষায়, Elias Loenrott এলিয়াস ল্যোন্‌রোট্ নামে একজন পণ্ডিত, খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে, ফিন্-জাতির জনগণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন বীরগাথা সংগ্রহ করিয়া যেমন সেই গাথাগুলিকে মিলাইয়া, অবশেষে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২২,৭৯৩-ছত্রে নিবদ্ধ *Kalevala* 'কালেভালা' নাম দিয়া এক অভিনব জাতীয় মহাকাব্যের সংকলন করেন, তেমনি তিনি ফিন্-জাতির লোকগীতি এবং কবিতার সংগ্রহও করেন। Kantele 'কান্তেলে' বলিয়া একরকম তারের যন্ত্র (বীণা) বাজাইয়া এই-সব গান গায়ক কবিরা গাহিত, এই জন্য এই সংগ্রহ-গ্রন্থের তিনি নাম দেন *Kanteletar* 'কান্তেলেতার' অর্থাৎ 'বীণাবাদক'। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত এই বইখানিকে ফিন্-ভাষার ঋগ্‌বেদ-পর্য্যায়ের বই বলা যায়।

(১০) সোভিয়েৎ রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত Estonia এস্তোনিয়া-দেশের পণ্ডিত Friedrich Reinhold Kreutzwald ফ্রীদ্‌রিখ্ রাইন্‌হোল্ট্ ক্রয়ট্‌স্‌ভাল্ট্ ফিন্‌দের জ্ঞাতি এস্ত্-জাতির মধ্যে প্রচলিত বীরগাথা সংগ্রহ করিয়া, সেগুলির আধারে ১৯,০০০-ছত্রময় এক মহাকাব্য *Kalevipoeg* 'কালেভিপোয়েগ্' ১৮৬১ সালের দিকে প্রকাশিত করেন। এই কাব্য ফিন-ভাষার *Kalevala* 'কালেভালা'র অনুরূপ। পরে আর একজন লোক-যান- ও লোকসাহিত্য-বিৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এস্ত্‌ পণ্ডিত Pastor Jakob Hurt পাদ্রি য়াকোব হুর্ত্‌, বিস্তর পৌরাণিক কথা, নানা উপাখ্যান এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান ছড়া প্রভৃতির সংগ্রহ করেন (১৮৭৫-১৮৮৬)। প্রায় ২০,০০০ গানের এই সংগ্রহ *Vaana Kannel* 'ভানা কান্নেল্' অর্থাৎ 'প্রাচীন বীণা' নামে প্রকাশিত হয়। ইহা ফিন-জাতির 'কান্তেলেতার'-এর মতো বই, এবং ইহাকে 'এস্ত্‌-ভাষার ঋগ্‌বেদ-সংহিতা' বলা যায়।

(১১) বাল্টিক সাগরের তীরের দেশে, সোভিয়েট-রাষ্ট্রসংঘ-ভুক্ত Lithuania লিথুআনিয়া ও Latvia লাট্‌ভিয়া গণতন্ত্রদ্বয়ের অধিবাসী লিথুআনীয় ও লাট্‌ভীয় জাতির লোকেরা, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর Balt 'বল্‌ৎ' বা 'বাল্ট' শাখার (*ভট-শাখার) অন্তর্ভুক্ত—ভারতের আর্য্যজাতির জ্ঞাতি এই Balt বাল্ট জাতি। খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের প্রারম্ভ হইতে ইহাদের খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করা হয়, আক্রমণকারী পোল ও জর্‌মানদের দ্বারায়। নামতঃ খ্রীষ্টান হইবার পরেও, ইহারা নিজেদের প্রাচীন ধর্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। এই ধর্ম আদিম বৈদিক ধর্মের পর্য্যায়ের। এই দুই জাতির মধ্যে, ইহাদের প্রাচীন ধর্মের সহিত সংপৃক্ত সহস্র সহস্র গাথা, গান বা সূক্ত সেদিন পর্য্যন্ত লিথুআনীয় ও লাট্‌ভীয় ভাষায় প্রচলিত ছিল। এগুলির বিরাট্ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, পণ্ডিতদের দ্বারা আলোচিত হইতেছে, জনসাধারণ এখনও এই-সব গান গাহিয়া থাকে। এইরূপ গানকে বাল্টিক ভাষায় daina 'দাইনা' বলে, শব্দটি বৈদিক সংস্কৃতের ভাষা-অর্থে 'ধেনা' শব্দের বাল্টিক প্রতিরূপ বলিয়া মনে হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে Liudvikas Reza ল্যুদ্‌ভিকাস্ রেজা ৮২টি লিথুআনিয়ান 'দাইনা'র একটি সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত করেন ; পরে এখন লিথুআনীয় ভাষা ও সাহিত্য পরিষৎ প্রায় ৬০০০ গানের সংগ্রহ বাহির করিতেছেন। লাট্‌ভিয়ান ভাষায় Krishjanis Barons ক্রিশিয়ানিস্ বারোন্‌স্ সহকর্মীদের সহায়তায় পাঠভেদ-সহ সাত লাখের উপর 'দাইনা' সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন (১৮৮৬-১৯২৩)। এই লাট্‌ভীয় গানগুলি বেশির ভাগ-ই চার ছত্রের ক্ষুদ্র রচনা। বারোন্‌স্-এর বৃহৎ সংগ্রহ Latviu Daina 'লাৎভিউ দাইনা', ও লিথুআনীয় দাইনা-সংগ্রহ, এই দুইটিকে মিলিত-ভাবে Veda-sambita Baltica 'বাল্‌তিকী (বা *ভটিকী) বেদ-সংহিতা' এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় লোক-গীতির ও লোক-গাথার এবং ধর্ম-গীতের সংগ্রহ আছে, সেগুলি ঋগ্‌বেদকে মনে করাইয়া দেয়। মেক্সিকোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রাচীন Aztec আস্তেক জাতির প্রাচীন ধর্মের দেবতাদের সম্বন্ধে গান, দেবকথাময়, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাময় গান, স্পেনীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতেরা সংগ্রহ করিয়া কিছু কিছু প্রকাশিত করিয়াছেন। আফ্রিকার নানা জাতির নিজস্ব ধর্মসংগীতেরও সংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে। পলিনেসীয় জাতির অতি সুন্দর নানা সংগীত, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ হইতে সংগৃহীত, অনূদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এই-সব ধর্মসংগীতের সংগ্রহ ঋগ্‌বেদের সমজাতিক। এমন কি, আধুনিক কালে ইংরেজদের Church of England 'চ্যর্চ অব ইংলাণ্ড'-এর ও অন্য খ্রীষ্টান ধর্মগোষ্ঠীর গির্জায় গীত খ্রীষ্টান প্রার্থনা-সংগীতের ও উপাসনা-পদের সংগ্রহ, বাঙ্গালা দেশের সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের 'ব্রহ্ম-সংগীত' সংগ্রহ, ঋগ্‌বেদেরই সমশ্রেণীর গ্রন্থ। ঋগ্‌বেদের আগে প্রাচীন সুমেরীয় ভাষায় এবং প্রাচীন আক্কাদীয় বা আসিরিয়ো-বাবিল ভাষায়, প্রাচীন মিসরী ভাষায়, ও অন্যান্য অধুনা-লুপ্ত কতকগুলি ভাষায়, এই ধরনের জীবন-গীতি ও দেবতার স্তব এবং প্রার্থনা-স্তোত্র পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা এখন সেই-সবের চর্চা করিতেছেন।

ঋগ্‌বেদের ১০১৮টি সূক্তের মধ্যে বেশির ভাগ-ই মানুষের জীবন লইয়া। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বা বিচারের সূক্ত সংখ্যায় ৫০টির বেশি হইবে না। তবে এখানে ওখানে সেখানে ঋগ্‌বেদের মধ্যে গভীর ভাবের—দার্শনিক চিন্তার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ঋক্ বা শ্লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের মধ্যে (এবং অন্য বেদেরও মধ্যে) বিক্ষিপ্ত এই সমস্ত মহাবাক্য, মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও আধিমানসিক প্রসন্নতার পক্ষে এক অপূর্ব শক্তিপূর্ণ সাধন-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ঋগ্‌বেদ ও অন্য বেদের মধ্যে নিহিত এইরূপ মহাবাক্য, যেগুলিকে গায়ত্রী মন্ত্রের মতো 'শ্রুতি-শিরস্' বলা যায়, বহুশঃ সংগৃহীত হইয়া টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। মানবের গভীরতম জীবনে ও অনুভূতিতে এইরূপ উদ্ধৃতি কতটা কার্য্যকর হইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে অনুভবশীল পাঠক নিজের অভিজ্ঞতা হইতে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ডক্টর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অতি সুন্দর বৈদিক সূক্তি-সংকলন ও তাহার ব্যাখ্যা-মূলক অনুবাদ পুস্তক *The Call of the Vedas*-এর উল্লেখ করা যায় (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০, 'ভারতীয় বিদ্যা ভবন', বোম্বাই)। বেদ-সংহিতার শাশ্বত আধ্যাত্মিক আবেদনের প্রেরণাস্থল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই-সব সূক্তির চমৎকার সংগ্রহ এইরূপ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। এইরূপ সূক্তি বা মহাবাক্য, এবং কাব্যরসে ভরপুর ও রমন্যাসে পূর্ণ কতকগুলি অন্য সূক্ত অথবা ঋক্, ঋগ্‌বেদের তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক প্রথম ও প্রধান গৌরবের বস্তু। ইন্দ্রের ও অন্য দেবতার সম্বন্ধে সূক্ত ও ঋক্‌গুলি গভীর-ভাব-দ্যোতক। উষাদেবীর সম্বন্ধে যে মনোহর ঋক্‌গুলি ঋগ্‌বেদের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে, কবিত্বরসে সেগুলি অপূর্ব, পৃথিবীর সাহিত্যে সেরূপ সৌন্দর্য্যময় কবিতা সুদুর্লভ। এতদ্ভিন্ন, পুরূরবা-উর্বশীর কথোপকথনাত্মক অপূর্ব-সুন্দর প্রেম-গাথা ঋগ্‌বেদেই আছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে 'জীবন-দেবতা'র কল্পনা দেখা যায়, যাহার প্রকাশ হয় তাঁহার যৌবনকালের এবং বার্ধক্যেরও কতকগুলি সুন্দর ও মনোহর কবিতায়—'চিত্রা', 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র কতকগুলি কবিতা—'চিত্রা', 'সিন্ধুপারে', 'উর্বশী', 'বিজয়িনী', 'মানসী' প্রভৃতি যে কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম—সেগুলির এক প্রধান উৎসমূল ঋগ্‌বেদের এই পুরূরবা-উর্বশী সূক্ত।

ঋগ্‌বেদের সাহিত্যিক রমন্যাস-বিষয়ক, ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক এবং আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিচার বহু পুস্তকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন বিভাগ (দশ মণ্ডল, এবং প্রতি মণ্ডলে সম্পূর্ণ কতকগুলি করিয়া সূক্ত ; আবার আট অষ্টকেও বিভাগ আছে), প্রতি সূক্তের সূচী বা প্রতিপাদ্য বিষয়, ঋগ্‌বেদের সূক্তের দেবতা ও রচক (বা 'দ্রষ্টা') ঋষি এবং ছন্দ, প্রভৃতির আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম, তাহা অন্যত্র মিলিবে। ঋগ্‌ ও অন্য বেদ-সংহিতার অন্তর্নিহিত বিষয়-বস্তুর আলোচনার জন্য, এই বেদ-সংহিতা ও বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় উপযোগী কয়েকখানি প্রামাণিক বই আছে, সেগুলি হইতে আবশ্যক তথ্য মিলিবে। এ বিষয়ে যত পুস্তক ও প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা লইয়া বেশ বড়ো একটি গ্রন্থ-সংগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক কালে জর্‌মান ভাষাতেই বোধ হয় বেদ-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক মৌলিক আলোচনা হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যুগে 'আর্য্য'-জাতির (বা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির) প্রাচীনতম পুস্তক বলিয়া, 'আর্য্য'-ভাষী সুপণ্ডিত জর্‌মান জাতির মানুষ ঋগ্‌বেদ লইয়া মাতিয়া গিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবে, এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের প্রভাবেও, জর্‌মানিতে, ১০০-১২৫ বৎসর পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নূতন 'রোমান্টিক আন্দোলন'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অর্থাৎ রমন্যাসনিষ্ঠ ভাববিলাস দেখা দিয়াছিল, যাহার স্থায়ী প্রভাব তখনকার দিনের ও তৎপরবর্তী কালের জর্মান ও ইউরোপীয় সাহিত্যে বিদ্যমান।

ঋগ্‌বেদের ও অন্য বেদের চর্চা গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই, এখন হইতে ২৫০০ বৎসর পূর্ব হইতেই, ঋগ্‌বেদের পণ্ডিতোচিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। যাস্কের নিরুক্ত ও নিঘণ্টু, 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলি, 'প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থগুলি, পাণিনির ব্যাকরণ, প্রাচীন ভারতে বেদের আলোচনার প্রথম ফল। পণ্ডিত লোকে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, সমস্ত বেদ-সংহিতা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন, যজ্ঞাদি ধর্মীয় কার্যে বেদের সূক্ত ও ঋক্ প্রয়োগ করিতেন, পঠন ও পাঠন করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন। গুরুপরম্পরায় বেদপাঠ—বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা ও বেদের ব্যাখ্যা আলোচনা করা—তিন হাজার বছর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। মধ্য-যুগে বেদের বড়ো-বড়ো টীকা রচিত হইয়াছে। এই-সব টীকা বা ভাষ্যের মধ্যে, দক্ষিণ-ভারতের নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের স্থাপয়িতা (১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) বুক্করায়ের সভাপণ্ডিত সায়ণাচার্যের টীকা বা ভাষ্যে, সমগ্র ঋগ্‌বেদের প্রাচীন পরম্পরার পূর্ণ ব্যাখ্যা সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রালোচনার পরম্পরা অনুসারে এক বিরাট্ এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই মহাগ্রন্থ। কিন্তু সাধারণতঃ প্রাচীন যুগের অবসানের পরেই, অর্থাৎ বিগত দুই হাজার বছর ধরিয়া, বেদ মুখ্যতঃ পূজার বেদির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। জনসাধারণের কাছে বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পূজার বস্তু, প্রাণের উপলব্ধির বস্তু নহে। অবশ্য বেদের অন্তর্নিহিত গভীরতম দর্শন, 'বেদের অন্ত' বা শেষ কথা—ইংরেজি প্রতিরূপে, 'বেদস্য অন্ত'=Wit's end—ভারতের 'বেদান্ত' মত, চিরকাল ধরিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্মের আধার হইয়া আছে।

ইউরোপের পণ্ডিতেরা এদেশে আসিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে বেদের খবর পাইলেন, বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন, দক্ষিণ-ভারতে *Ezourvedam* অর্থাৎ যজুর্বেদের নকলে নূতন এক কৃত্রিম বেদ-গ্রন্থের অবতারণা তাঁহারা করিলেন, ফরাসী ভাষায় এই নকল বেদের 'অনুবাদ' ও মুদ্রণও হইল। কিন্তু ভগবদ্‌গীতা, শকুন্তলা, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ ও সংস্করণ বাহির হইবার পরে, তাঁহারা বেদ লইয়া পড়িলেন। ১৭৮৪ সালে Sir Charles Wilkins স্যর চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ সরাসরি সংস্কৃত হইতে গীতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইংরেজি অনুবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত করিলেন। ১৭৮৯ সালে Sir William Jones স্যর উইলিয়াম্ জোন্স্, কলিকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর ইংরেজি অনুবাদ Sacontala বাহির করিয়া দিলেন—স্বল্পকালের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ রসরচনা ইউরোপের চিত্তকে জয় করিয়া ফেলিল। জর্‌মান কবি, পণ্ডিত ও দার্শনিক Johan Wolfgang von Goethe যোহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্ ফন্ গ্যোটে ইহার ভাবশুদ্ধ প্রশস্তি করিলেন তাঁহার সুবিখ্যাত জর্‌মান কবিতায়। ১৭৯২ সালে কালিদাসের 'ঋতুসংহার' বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইল। জোন্স্-কৃত মনু-সংহিতার ইংরেজি অনুবাদও বাহির হইল। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র মাধ্যমে ভারতের মহাগ্রন্থ মহাভারতের অতি সুন্দর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ নাগরাক্ষরে কলিকাতায় প্রকাশিত হইল। এইভাবে জগতে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনার যুগ আসিয়া দেখা দিল। ১৮৩৮ সালে জর্‌মান পণ্ডিত F. Rosen রোজেন লাতীন অনুবাদের সহিত এক ঋগ্‌বেদ-সূক্ত-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, নাগরী অক্ষরে, জর্‌মানি হইতে। ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধে ইহা-ই প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত পুস্তক। ১৮৪৯-১৮৭৪, এই কয় বৎসরে জর্‌মান পণ্ডিত Friedrich Max Mueller ফ্রীদ্‌রিখ্ মাক্স ম্যুলর ('ভট্ট মোক্ষ-মূলর') তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করেন—ছয়টি বিরাট্ খণ্ডে অতি সুন্দর নাগরী হরফে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য-সহ সম্পূর্ণ ঋগ্‌বেদ। ১৮৬২-৬৩ এই কয় বৎসরে আর একজন জর্‌মান পণ্ডিত Theodor Aufrecht তেওদোর্ আউফ্‌রেখ্‌ৎ রোমান লিপিতে মূল ঋগ্‌বেদ প্রকাশিত করেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঋগ্‌বেদের অনুবাদ-কার্য্য বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় আরম্ভ হইল। ইংরেজিতে, Horace Hayman Wilson হরেস হেম্যান উইলসন ছয় খণ্ডে (১৮৫০ হইতে ১৮৮৮ সালের মধ্যে), Ralph T. H. Griffiths রাল্‌ফ্ গ্রিফিথ্‌স্ (দুই খণ্ডে, ১৮৮১-১৮৯২ সালে); জর্‌মানের Alfred Ludwig আলফ্রেড্ লুড্‌ভিক্ (ছয় খণ্ডে, ১৮৭৬-১৮৮৮), Hermann Grassmann হের্‌মান্ গ্রাস্‌মান্ (কাব্যময় অনুবাদ, ১৮৭৬-১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), এবং Karl Friedrich Geldner কার্ল ফ্রীডরিখ গেল্‌ডনার্ (প্রথম খণ্ড, Leipzig লাইপ্‌ৎসিক্ ১৯২৩, পরবর্তী খণ্ডসমূহ আমেরিকার Harvard হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চার খণ্ডে ১৯৫১-১৯৫৭ সালে ; ইহা-ই হইতেছে ঋগ্‌বেদের আধুনিকতম পূর্ণ অনুবাদ) ; ফরাসীতে, S. A. Langlosis লাঁগ্লোআ (চার খণ্ডে, ১৮৫১)। ইউরোপীয় নানা ভাষায় আংশিক ভাবে ঋগ্‌বেদ বহুশঃ অনূদিত হইয়াছে। জাপানের বৌদ্ধশাস্ত্র, চীনা ও সংস্কৃতের বিরাট্ পণ্ডিত Junjiro Takakusu জুন্‌জিরো তাকাকুস্থ (মৃত্যু ১৯৪৫) জাপানী ভাষায় ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রকাশিত করেন।

বাঙ্গালা ভাষায় এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "কাশীর এক পণ্ডিতের সাহায্যে ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।...১৭৬৯ শকের ১লা ফাল্গুন [১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ] তারিখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ঋগ্বেদ সংহিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ...১৭৯৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে [১৮৭১ খ্রীঃ অঃ] প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ পর্য্যন্ত [প্রথম মণ্ডলের ১০৮টি সূক্ত] প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল।" (দ্রষ্টব্য "ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদ", 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শক ১৯৩৯ [খ্রীঃ অঃ ১৯১৭], ভাদ্র, পৃঃ ১১৫-১৮)। "...পরে কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গভাষার এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা হয় নাই।" (রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত ঋগ্‌বেদ-সংহিতার অনুবাদের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। 'বেদপ্রকাশিকা' নামে প্রকাশিত (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), রমানাথ সরস্বতী-কৃত সটীক আংশিক অনুবাদ উপলক্ষ্য করিয়াই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রে "বেদ ও বেদব্যাখ্যা"-শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন (এই প্রবন্ধটি হইতে কিছু অংশ পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে)। রমানাথ সরস্বতীর পরে এই অনুবাদ-কার্য্যে উদ্যোগী হন রমেশচন্দ্র দত্ত। সমগ্র ঋগ্‌বেদ-সংহিতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ (১৮৮৫-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) মহানুভব রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কৃতিত্বের ও কীর্তির জয়স্তম্ভ-স্বরূপ। রমেশচন্দ্র একদিকে ভারতীয় পরম্পরায় সায়ণাচার্য্য ও অন্য দিকে মাক্স-ম্যূলর প্রমুখ ইউরোপীয় বেদবিৎ পণ্ডিত, এই উভয় শ্রেণীর বিদ্বদ্বর্গের অনুসরণ করিয়া, বহু মূল্যবান্ টীকা-টিপ্পনীর দ্বারা তাঁহার এই অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অলংকৃত করেন। কেবল বাঙ্গালা ভাষাতে নহে, বস্তুতঃ আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে, এই বঙ্গানুবাদ-ই হইতেছে ঋগ্‌বেদ-সংহিতার প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ ইংরেজি ১৯০৯ সালে, রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে, এই অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রস্তুত তৃতীয় সংস্করণে (১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) রমেশচন্দ্রের মূল্যবান্ টীকা-টিপ্পনীগুলি সংরক্ষিত হইলে ভালো হইত, গ্রন্থের মূল্য ও উপযোগিতা তাহাতে অনেক বাড়িয়া যাইত। বোধ হয় গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা করা হয় নাই। এই-সব টীকা-টিপ্পনী পৃথক্ এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার যোগ্য।

রমেশচন্দ্রের অনুবাদ সম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

> ···রমেশচন্দ্রের এই কীর্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।··· কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইঁহার •ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, 'বিবিধ' খণ্ড, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃঃ ২৪৯, পাদটীকা)

এই তৃতীয় সংস্করণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে (পুস্তকের) "বর্তমান পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম বিশ্বসমাদৃত মহাগ্রন্থ, বঙ্গভাষী জনগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক তথা আধিভৌতিক সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন, ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রকাশ ঋগ্‌বেদ ও মহাভারতের মধ্যে অন্যতর ও প্রাচীনতর, আবার বহু বৎসর পরে বাঙ্গালী তাহার মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে নূতন করিয়া পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিল। ইতিপূর্বে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় ঋগ্‌বেদের (ও অন্য বেদের) মূল ও সটীক আংশিক বাঙ্গালা অনুবাদ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করেন (হাওড়া ১৯১৯ হইতে)। কিন্তু বেদ বুঝিবার পক্ষে এই অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনীর বিশেষ কোনও মূল্য নাই।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাতেই ঋগ্‌বেদের পূর্ণ অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সরস্বতী ঋগ্‌বেদ ও অন্য সমস্ত বৈদিক সাহিত্য হিন্দীতে প্রকাশিত করিবার সংকল্প করেন, এবং তাঁহার 'ঋগ্‌বেদ ভাষ্য-ভূমিকা' তিনি সংস্কৃতে লিখিয়া যান। বেদকে আর্য্য-সমাজের মতবাদের ও ধর্মবিষয়ক পুনর্জাগৃতির মুখ্য আধার বলিয়া দয়ানন্দ স্বামী উহার প্রচার করিতে আগ্রহশীল হন। কিন্তু বেদ-ব্যাখ্যায় তাঁহার যে দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল, যাহা আর্য্য-সমাজের পণ্ডিত, পরিচালক ও প্রচারকদের দৃষ্টি-ভঙ্গী, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতান্তরের অবকাশ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পূর্বে উল্লিখিত তাঁহার 'বেদ ও বেদব্যাখ্যা' প্রবন্ধে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক অনুসৃত বেদ-পর্য্যালোচনার রীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা-ও লক্ষণীয়। তাঁহার বক্তব্য এই—

> দয়ানন্দ সরস্বতী এক জন এক্ষণকার লোক, তিনি সমাজ সংস্কারক, তিনি হিন্দুসমাজ 'ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চান'। তিনি যদি বলেন, তোমরা এই এই ভাবে এই এই কার্য্য কর, এই কর্ম করিও না,—কে তাঁহার কথা শুনিবে? এই জন্য তিনি বেদের শরণ লইয়াছেন। বেদ গান মাত্র; উহাতে তাৎকালিক সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জানা যায় বটে, কিন্তু সব জানা যায় না। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতি-ভেদ ছিল না, স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইয়োরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন, বেদ একেশ্বরবাদী। শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়া গিয়াছেন; দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর বলেন। অগ্রে নীয়তে—এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ণ অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন, দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপত্তিতেই উহার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাঁহার মতে, ধান্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধান্য। ঈশ্বর পৃথিবী ধারণ করেন, অতএব ঈশ্বর ধান্য। তাঁহার মত এই—সায়ণাচার্য্য ভ্রান্ত। মহাভারতের পূর্বে যে টীকা লিখিত হয়, সেই টীকা সেই প্রমাণ। নিগম নিরুক্তাদি সেই টীকা। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সায়ণ নিজের মত কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেন নাই, সর্বত্র নিগম নিরুক্তের কথায় চলিয়াছেন। তথাপি দয়ানন্দ তাঁহাকে ঠেলিলেন। দরকার এমনই জিনিস।

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোজা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুরূহ। যদি অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আমরা একবার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনাবলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক ভাল বুঝিব। তৎকালীন লোকের কার্য্যকলাপ রাজনীতি প্রভৃতির মধ্যে অনেক প্রবেশ করিতে পারিব, তাহাদের কথা অনেক বুঝিতে পারিব। কিন্তু সেই জগতের প্রবেশ বড় সহজ কথা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে, প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল সেইটী বিশেষ জানা চাহি—শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে, যেখানে যেখানে আর্য্যজাতি, সেই সেই খানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জানা চাহি। [হরপ্রসাদ-রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৩৯৬-৩৯৭।]

যাহা হউক, দয়ানন্দ স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে হিন্দীতে ঋগ্‌বেদের দুইটি অনুবাদ বাহির হয়—প্রথম, অজমের বৈদিক মন্ত্রালয় হইতে নয় ভাগে প্রকাশিত (খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪-১৯১৩); এবং দ্বিতীয়, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত (পরে ইহার পুনর্মুদ্রণ হয়)। এতদ্ভিন্ন, সনাতন অর্থাৎ আর্য্যসমাজ-বিরোধী প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মণ মতানুসারে আরও দুইটি হিন্দী অনুবাদ বাহির হয়, প্রয়াগ ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত রামগোবিন্দ ত্রিবেদী বেদান্তশাস্ত্রীর অনুবাদ (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ), এবং মথুরা গায়ত্রী তপোভূমি হইতে প্রকাশিত শ্রীরামশর্মা আচার্য্য-কৃত অনুবাদ (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। আর্য্য-সমাজের বিচার অনুসারে ঋগ্‌বেদের একটি পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদও বাহির হয়, দুর্গাপ্রসাদ-কৃত, লাহোর ১৯১২-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও ঋগ্‌বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখ করিতে হয়—তেলুগু (বেল্লারি হইতে ১৯১৩-১৯১৫ সালে প্রকাশিত, ক. চ. রাউ কৃত অনুবাদ); কানাড়ী (ত. র. স. বেঙ্কটকৃষ্ণয্য-কৃত অনুবাদ, বঙ্গলুর, ১৯১৩-১৯১৫); মারাঠীতে দুইটি অনুবাদ বাহির হইয়াছে—(১) সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রী চিত্রার-কৃত, পুনা, ১৯২৮, এবং (২) কোল্‌হটকর- ও পটবর্ধন-কৃত অনুবাদ, পুনা, ১৯৪২ ; গুজরাটী, ঘোড়-কৃত অনুবাদ, খম্বাত বা কাম্বে নগরী, ১৯২০। মালয়ালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাষায় দুইটি অনুবাদ হইয়াছে—(১) প. ক. নম্বুদিরি (কোল্লম্ বা কুইলন, ১৯২৫), এবং (২) কেরলের বিখ্যাত মালয়ালী কবি বল্লতোল নারায়ণ মেনোন্-কৃত কবিতাময় অনুবাদ।

আশা করা যায়, রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদের এই নবীন সংস্করণ দ্বারা এখন বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গভাষী পাঠকের পক্ষে ভারতের সংস্কৃতির ও ধর্মের মূল উৎস আলোচনা করিবার সুযোগ আবার আসিয়াছে। এই জনহিতকর এবং শিক্ষা- ও সংস্কৃতি-মূলক কার্য্যের জন্য শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিয়া আমার এই অক্ষম ঋগ্‌বেদ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিতেছি॥

রবীন্দ্র-জন্মতিথি
বৈশাখ, শকাব্দ ১৮৮৫
মে ৯, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমণি চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত ঋগ্‌বেদ বঙ্গানুবাদের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা-রূপে লিখিত, ও 'জ্ঞান-ভারতী', কলিকাতা হইতে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এখানে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে পুনর্মুদ্রিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শঠকোপ-কৃত "সহস্র-গীতি"

(নম্মাড়্বার্-তিরু-বায়্-মোড়ি)

ভারতের ভক্তিধর্ম

ভারতে ভক্তিবাদের উদ্ভব, প্রচার ও বিকাশের সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত আছে—

উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি র্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
অন্ধ্রদেশে ক্বচিৎ ক্বচিদ্—গূর্জরে বিলয়ং নীতা॥

শ্লোকটির বিভিন্ন পাঠান্তর আছে,—তবে মোটামুটি এই শ্লোকের বক্তব্য হইতেছে যে, ভক্তিবাদের উদ্ভব ও প্রাথমিক বিকাশ দক্ষিণ-ভারতে হইয়াছিল—'দ্রাবিড়' অর্থাৎ তমিল্*-মালয়ালম্-ভাষীদের মধ্যে, তদনন্তর 'কর্ণাটক' বা কানাড়ী-ভাষীদের মধ্যে, ও কিছু-কিছু 'অন্ধ্র' বা তেলুগুদের মধ্যে; এবং শেষে উত্তরাঞ্চলে প্রসারের সময়ে, ভক্তিবাদের বিশুদ্ধির হানি ও বিকৃতি এবং বিনাশ ঘটিয়াছিল, উত্তর-ভারতের গুজরাটী প্রভৃতি আর্য্য-ভাষী জনগণের মধ্যে। ভক্তিধর্মের এইরূপ ইতিহাস, শ্লোকটিতে যাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা সর্বথা মানিয়া লইতে পারা যায় না। দক্ষিণাপথের মতো উত্তরাপথেও ভক্তিধর্মের প্রসার ও বিকাশের কথা বিশেষভাবে গৌরবময়; একথা বলা চলে না যে, আর্য্য-ভাষী জনগণের মধ্যে, দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত ভক্তিবাদ গৃহীত হয় নাই, বা গৃহীত হইলেও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তবে এ-কথাও ঠিক যে, ভক্তির পথে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা, সাহিত্যে বিধৃত প্রমাণ বিচার করিলে, সর্বপ্রথমে দক্ষিণ-ভারতেই ব্যাপক-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে; এবং ভক্তিধর্মের এক বিশিষ্ট ও মহিমময় সাধক-পরম্পরা প্রথমেই তমিল্-ভাষী (সংকুচিত অর্থে

---

* এই শব্দটির মূল ভাষায় বানান হইতেছে 'তমিল্'—অন্ত্য 'ল্'-ধ্বনি সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য—'তা-মি-ল' নহে। Tamizh, Tamil, Tamil প্রভৃতি বানানে ইহার রোমান প্রতিবর্ণ করা হয়। Tamil, ইংরেজিতে প্রচলিত এই সাধারণ বানান ধরিয়া এবং বাঙ্গালার বাহিরে অ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব-আ-কারের মতো হয় বলিয়া, আমরা সাধারণতঃ 'তামিল' রূপেই এই নামটি লিখিয়া থাকি। উপস্থিত ক্ষেত্রে লেখকের রুচি-মতো দুইটি বানান-ই মান্য—'তমিল্', 'তামিল'; এবং উপরন্তু 'তমিড়্' এই বানানকেও মান্যতা দিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'দ্রমিড়' বা 'দ্রাবিড়' জাতীয়) জনগণের মধ্যে দেখা দেয়। তমিল্-ভাষায় রচিত কতকগুলি অমূল্য কাব্যময় ভক্তিগ্রন্থকে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় ভক্তিধর্মের অন্যতম আকর-শাস্ত্র বা আধার-গ্রন্থ বলা যায়।

তমিল্-ভাষায় ভক্তি-সাহিত্যের পত্তন

প্রাচীন তমিলে ভক্তিধর্মকে লইয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহা একদিকে শিব ও অন্যদিকে বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইয়াছে। ভক্তি-রসাপ্লুত আত্মনিবেদনময় এই অপূর্ব প্রাচীন তমিল্ গ্রন্থরাজি, একদিকে যেমন তমিল্ সাহিত্যের, ও সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম গৌরবের বস্তু, তেমনি অন্য দিকে বিশ্বের ধর্মানুভূতিময় ভাবুকতার জন্য ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় আস্থার জন্য জগতে অতুলনীয়। কী করিয়া এই ভক্তিস্রোতের বন্যা আসিয়া দ্রাবিড়ে বৈষ্ণব ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ের তমিল্-সাধকদের ভাসাইয়া লইল, এবং তমিলে অপূর্ব কবিত্ব-মণ্ডিত ও ভাবশুদ্ধিময় ভক্তিকাব্য সৃষ্টি করিল, তাহার কারণ এখনও অজ্ঞাত। তবে মনে হয়, খ্রীষ্ট-জন্মের পরেকার প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধে পল্লব-বংশীয় রাজারা ইহার সমধিক পুষ্টিতে সহায়তা করেন। পল্লব রাজগণ বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের সময়ে নব-জাগরিত পুরাণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, তাহার বিষ্ণু ও শ্রী, এবং শিব ও উমা প্রভৃতি দেবতাদের অবদান লইয়া, দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাট, অন্ধ্র ও দ্রমিড় অর্থাৎ কানাড়ী, তেলুগু ও তমিল্‌দের মধ্যে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-ভারত হইতে বহু ব্রাহ্মণবংশ দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়-ভাষীদের মধ্যে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদের প্রচারিত বৈদান্তিক দর্শনের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতাবাদ ও পূজানুষ্ঠানাদি, পল্লব রাজাদের আগ্রহে তমিল্ প্রভৃতি দেশেরা লোকেরা নূতন উৎসাহে গ্রহণ করিতে থাকে। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বে, বৌদ্ধ ও জৈন মতের শুষ্ক নীতিনিষ্ঠতা ও ধর্মীয় বিচারের কাঠিন্য ধর্মজীবনে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, লোকে তাহাতে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পাইতেছিল না। মানব-জীবনকে নূতন জীবনধারায় অভিষিক্ত করিতে পারে এমন বেদান্তাশ্রিত পৌরাণিক ধর্ম, এবং তদুপরি ভাস্কর্য্যে ও দেবায়তনে এই ধর্মের এক অপরূপ মূর্তিগ্রহণ—যেমন, মহাবলিপুরম্-এ ও অন্যত্র স্থাপিত পল্লব ও চোড় যুগের ভাস্কর্য্যে ও দেবায়তন-সমূহে—তমিল্ দেশের জনগণের প্রাণে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিল। দ্রাবিড় জাতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিল্পি-প্রাণের গোপন কোণে ধর্ম-সম্বন্ধে যে mysticism বা রহস্যবোধ সুপ্ত ছিল, তাহা যেন নূতন করিয়া প্রাণ পাইল। উপরন্তু কতকগুলি বৈষ্ণব ও শৈব সাধকের আবির্ভাবে, ও লোক-সমক্ষে তাঁহাদের উপদেশ ও জীবনবেদ প্রকাশের ফলে, সর্বত্র যেন একটা নূতন প্রাণ-স্পন্দন দেখা দিল। দিব্যোন্মাদ-যুক্ত তমিল্ বৈষ্ণব আড়্বার্ এবং শৈব নয়ন্মার্গণের রচিত পদ ও গাথা এই প্রাণস্পন্দনের অবিনশ্বর সাহিত্যিক রূপ—বিশ্বজন 'যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

প্রসঙ্গতঃ এ-কথারও উল্লেখ করিতে হয় যে, কতকগুলি খ্রীষ্টান লেখকের মতে দ্রাবিড় দেশে তমিল্‌দের মধ্যে এই ভক্তিধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রভাবে। দক্ষিণ-ভারতে ও অন্যত্র একটি প্রাচীন খ্রীষ্টান ইতিকথা প্রচলিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে যীশু-খ্রীষ্টের এক সাক্ষাৎ শিষ্য কতকগুলি অনুচর লইয়া রোমান ও যিহুদিদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, এবং এখনকার মাদ্রাজের নিকটে প্রথম খ্রীষ্টান বসতি ও ধর্মকেন্দ্রের স্থাপন হয়। উত্তর কালে আবার সম্ভবতঃ ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে সিরিয়া হইতে সিরিয়া দেশের খ্রীষ্টানগণ আসে, এবং কেরলের রাজাদের অনেকে এই সিরিয়ান খ্রীষ্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে খ্রীষ্টান ধর্মমতের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিবার পক্ষে এই অনুমানের পিছনে তেমন যুক্তি নাই। যীশুর জীবনকে অবলম্বন করিয়া চারিখানি জীবনী-পুস্তক, যীশুর শিষ্যদের ক্রিয়াকলাপ, সন্ত পাউলের পত্রময় উপদেশাবলী, তথা রূপকচ্ছলে রচিত Apocalypsis বা Revelation অর্থাৎ 'প্রকাশ'-গ্রন্থ—এগুলির মধ্যে ঈশ্বরে গভীর আস্থা ও আত্মনিবেদনের কথা থাকিলেও, তাহা ভারতের ধর্মসাধনার ধারায় এমন নূতন বস্তু ছিল না যে আগত-মাত্রেই তাহার প্রভাব ভারতীয় জনগণের জীবনে পড়িবে। শৈব, বৈষ্ণব ও সৌগত ভাগবত ধর্ম, এবং গীতোক্ত ভক্তিবাদ, খ্রীষ্ট-জন্মের বহু পূর্বেই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তক্ষশিলায় গ্রীক রাজা অন্তলিকিত (আন্তিআল্‌কিদাস্ Antialkidas)-এর রাজদূত হেলিওদোর Heliodoros, যিনি মালবদেশের রাজা ভাগভদ্র ত্রাতার সভায় আসিয়াছিলেন, একটি শিলাস্তম্ভ-লেখে 'ভাগবত' বা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, এবং তিনি একটি বিষ্ণুমন্দিরের সংশ্লিষ্ট গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'প্রপন্না ভক্তি' ভারতের প্রাচীন শিক্ষা, খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের শিক্ষা। সুতরাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভক্তিধর্মের সিরিয়া বা পালেস্তীন হইতে ভারতে আসিবার কথা স্বীকার করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এইভাবে পুনরুজ্জীবিত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অবলম্বন করিয়া, ভক্তিবাদ আসিয়া দক্ষিণে তমিল্‌দের জয় করিয়া লইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তমিল্-দেশে এই ভক্তিবাদ, শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। সগুণ ঈশ্বর, মানবাকারে দৃষ্ট ঈশ্বর—মানবের তাবৎ শ্রেষ্ঠ গুণের ও শক্তির আধ্যাত্মিক জগতে উন্নয়ন করিয়া, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কালে নানা দেশে নানা জনের মধ্যে যে সমস্ত দেবতার রূপ ধ্যান করা হইয়াছে, যে-সমস্ত দেব-কল্পনা মানুষের অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করিয়াছে, তন্মধ্যে, শিব ও বিষ্ণুর ধ্যানের ও রূপের মতো বিশ্বদ্ধর, বিশ্বপ্রপঞ্চের অতিগামী ও ইহার মধ্যে নিলীন, ও সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তিত্বশালী ও কবিত্বময়, মানবের শাশ্বত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা কেবল যাহাতেই পাওয়া যায়, এমন ধারণা আর কোথাও মিলে না। বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে গ্রথিত হইয়া দার্শনিক বিচারে বিষ্ণু ও শিবের স্থান বহু ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়াছে। দক্ষিণ তথা সমগ্র ভারতে জ্ঞান-মূলক শিব-কেন্দ্রিক বেদান্তের চরম বিকাশ হইয়াছে শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতে, ভক্তিময় বিষ্ণু-কেন্দ্রিক বেদান্ত তেমনি পূর্ণ হইয়াছে শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত মতে। এতদ্ভিন্ন, কাশ্মীরের ত্রিক শৈব মত, তমিল্-দেশের শৈব-সিদ্ধান্ত মত, পূর্ব-ভারতের শাক্তগণের স্ফোটবাদ, প্রাচীন পাশুপত মত, বৈষ্ণব নিম্বার্ক মত প্রভৃতি আছে। সেইরূপ বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া দক্ষিণের বিশিষ্টাদ্বৈত মত, গুজরাটের পুষ্টিমার্গ, বাঙ্গালার বা গৌড়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, আসামের এক-শরণিয়া ধম প্রভৃতি আছে। শতকের পরে শতক ধরিয়া, এইভাবে শিবকেন্দ্রিক ও বিষ্ণুকেন্দ্রিক বেদান্ত ভারতের চিত্ত ও হৃদয়কে উর্বর ও সরস করিয়া রাখিয়াছে। ইহা লক্ষণীয় যে, উপনিষদ্ ও গীতোক্ত বেদান্ত-দর্শনের যে দুই প্রধান বিরাট্ এবং নিখিল ভারতব্যাপী প্রকাশ দেখা যায়—শাঙ্কর-বেদান্ত ও রামানুজ-বেদান্ত, সে দুইটির উদ্ভব ঘটে ভক্তিবাদের উৎস-স্বরূপ দ্রাবিড় দেশে—দ্রমিড-কেরলের হৃদয় ও মস্তিষ্ক হইতে।

'নয়নমার্' বা শিবভক্তগণ—তমিল্ শিবভক্তি-বিষয়ক পদসংগ্রহ

তমিল্-ভাষায় শৈব-ভক্তির আকর-গ্রন্থ হইতেছে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নম্পি-অণ্টার্-নম্পি নামে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক সংকলিত বৃহৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংগ্রহ-গ্রন্থ 'পন্‌নিরু-তিরুমুরৈ'। এই পুস্তক একাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার মধ্যে প্রথম সাত খণ্ড 'তেরারম্' ('দেবতায় অর্পিত মালা') নামে পরিচিত। ইহাতে সম্বন্ধ ('চম্পন্তন্'), অপ্পর্, সুন্দর ('চুন্তরর্')—এই তিন জন শৈব ভক্তের রচিত পদ নিবদ্ধ আছে। অষ্টম খণ্ড 'তিরু-বাচকম্'-এ আছে ভক্ত মাণিক্ক-বাচকর্-এর রচিত ৫১টি কবিতা। এই চারজন—সম্বন্ধ, অপ্প, সুন্দর ও মাণিক্য-বাচক—ইঁহারা-ই মূল শৈব ভক্ত—শিবভক্তি-শাস্ত্রের মধ্যমণি ইঁহাদের রচিত। নবম খণ্ডে আছে অপর নয় জন শিবভক্তের পদ। দশম খণ্ডে যোগী তিরু-মূলর্, যিনি সুপ্রাচীন যুগে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার পদ। একাদশ খণ্ডে অন্য নানা শৈব ভক্তের রচিত পদ, এবং শিবলীলা-বর্ণনাত্মক কতকগুলি কবিতা আছে, নম্‌পি-অণ্টার্-নম্‌পি-র নিজেরও দশটি পদ আছে। এই একাদশ খণ্ডে 'তিরুমুরৈ'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী কালে চেক্কিড়ার্-রচিত শিবলীলা-বিষয়ক গ্রন্থ 'পেরিয়-পুরাণম্' ('মহাপুরাণ')-ও তমিল্-দেশে সুপরিচিত। এই একাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'তিরুমুরৈ' ছাড়া, পরবর্তী কালে 'চতুর্দশ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র' বেদান্ত-সূত্রের আধারের উপরে রচিত হয়, এইগুলিও শৈব ভক্তি ও দর্শনের মৌলিক ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

মাণিক্ক-বাচকর্-এর 'তিরু-বাচকম্' ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ করিলেও অপূর্ব আধ্যাত্মিক আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এইরূপ গ্রন্থ পাঠ-কালে দৈব-আরাধনার আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায়, আমরা মহান্ ভক্ত-প্রাণের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য সাযুজ্য লাভ করি। ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থকে (এবং অন্য তিন জন শিব-ভক্তদের গ্রন্থকে) তথা তমিল্ আড়্বার্ বা বিষ্ণু-ভক্তগণের রচনাকে, ভাবশুদ্ধিতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় রচনা বলা যায়। নয়ন্‌মার্ বা ভক্তগণের রচনাকে তমিল্ শৈবগণ উপনিষদের পর্য্যায়ের গ্রন্থ মনে করেন।

'আড়্বার্' বা বিষ্ণুভক্তগণ—বিষ্ণুভক্তি-বিষয়ক তমিল্ পদের সংগ্রহ

তমিল্-ভাষায় শৈব ভক্তগণের রচনার সঙ্গে-সঙ্গে, বৈষ্ণব ভক্ত আড়্বারগণের পদ-সংগ্রহের উল্লেখ অপরিহার্য্য। তমিল্ বৈষ্ণবগণের পরম্পরায় আড়্বারগণের আবির্ভাব হয় প্রাচীন যুগে। পরবর্তী শ্রীনাথমুনি বারো জন আড়্বারের পদ সংগ্রহ করেন। শ্রীনাথমুনি, আধুনিক তমিল্-সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মতে, 'তিরুমুরৈ' বা শৈব ভক্তিসাহিত্যের সংকলন-কর্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'নম্‌পি-অণ্টার্-নম্‌পি'-র সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু শ্রীসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি ইঁহার বহু পূর্বে আবির্ভূত হন। এই বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্' (বা 'প্রবন্ধম্') নামে সুপরিচিত। ইহা শৈব 'তিরুমুরৈ'-এর সম-পর্য্যায়-ভুক্ত।

আড়্বার্দের সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য প্রথম বিবরণ প্রকাশিত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বর্গত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ। বহুদিন ধরিয়া ইনি মাদ্রাজে ছিলেন, আড়্বার্দের সম্বন্ধে ইঁহার প্রবন্ধাবলী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় বহু বৎসর অতীত হইল প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে, ১৩১৮ সালে ইঁহার দেহত্যাগের পরে, ১৩১৯ সালে ইঁহার রচিত উপাদেয় তথ্যপূর্ণ 'শ্রীরামানুজ-চরিত'-এর ভূমিকা রূপে এই আড়্বার্-কাহিনী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় (প্রথম সংস্করণ বাঙ্গালা ১৩১৯ সন; তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬ সন)। তদনন্তর আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস মহাশয় আড়্বার্দের সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করেন—ধারাবাহিক-ভাবে তাঁহার 'উজ্জীবন' পত্রিকায়, ও পরে পুস্তকাকারে ('আড়্বার্', শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ১৩৬৫ সাল)। এই অতি চমৎকার পুস্তকে আড়্বার্দের সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে, বহু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। সাধারণ পাঠকের আড়্বার্ ও 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্' সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার, তাহা আচার্য্য শ্রীরামানুজদাস এই মূল্যবান্ গ্রন্থে পাণ্ডিত্য ও অধিকার-সহ প্রকাশ করিয়াছেন; এই বিষয়ে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অপরিহার্য্য। এই বারোজন আড়্বারের নাম হইতেছে—(১) পোয়্কৈ, (২) ভূদত্ত বা পুতত্তর্, (৩) পেয়্, (৪) তিরু-মড়িচৈয়র্, (৫) তিরুপ্পন্, (৬) তোণ্টরাটি-প্পোটি, (৭) তিরু-মঙ্কৈ, (৮) কুলশেখর, (৯) পেরিয়, (১০) আণ্টাল্, (১১) নম্মা বা শঠকোপ, এবং (১২) মধুরকবি। ইঁহারা সকলেই দিব্যোন্মাদ-যুক্ত ভক্ত ছিলেন। ইঁহাদের তমিল্ নাম ভিন্ন প্রত্যেকের একটি করিয়া সংস্কৃত নামও আছে—উভয় ভাষার নাম আচার্য্য রামানুজদাসের পুস্তকে পাওয়া যাইবে। 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্' গ্রন্থে ইঁহাদের রচিত ৪০০০ পদ, নিম্নে প্রদত্ত কয়টি বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত দেখা যায়; যথা—

[১] মুতলায়িরম্—৯৪৭টি পদ—ইহার মধ্যে পেরিয়াড়্বার্, আণ্টাল্, কুলশেখর, তিরু-মড়িচৈয়র্, তোণ্টরাটিপ্পোটি, তিরুপ্পন্ এবং মধুরকবি—এই সাতজনের পদ আছে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[২] **ইরণ্টাম্**—১১৩৪টি পদ—এই খণ্ড সম্পূর্ণভাবে তিরুমঙ্কৈ আড়্বার্ কর্তৃক রচিত ;

[৩] **মুন্'র'ান্ (তিরু-বায়্-মোড়ি)**—১১০২টি পদ, সম্পূর্ণ-রূপে নম্মাড়্বার্ বা শঠকোপের রচিত পদ এগুলি ;

[৪] **ইয়র্পা**—৮১৭টি পদ, ইহাতে পোয়্কৈ, ভূদত্ত, পেয়্ এবং উপরন্তু তিরু-মড়িচৈয়র্, নম্মাড়্বার্ এবং তিরু-মঙ্কৈয়াড়্বার্-এর রচনা আছে।

'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্'—নম্মাড়্বার বা শঠকোপের 'তিরু-বায়্-মোড়ি' বা সহস্র-গীতি

প্রস্তুত 'সহস্র-গীতি' পুস্তকখানি হইতেছে 'নাল্-আয়িরপ্-পিরপন্তম্'-এর চারি সহস্র পদের মধ্যে তৃতীয় খণ্ড 'তিরু-বায়্-মোড়ি' ; এক সহস্রের কিঞ্চিদধিক হইলেও, ইহাকে শঠকোপ-রচিত 'সহস্র-গীতি' বলা হয়। সমস্ত-পদটির অর্থ—'শ্রী-মুখ-বাণী' ; 'তিরু'=শ্রী, 'বায়্'=মুখ, এবং 'মোড়ি'=ভাষা, বচন, বাণী। বঙ্গাক্ষরে মূল তমিল্ পদ, প্রতি পদের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের বা বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদ, বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ এবং ভাবার্থ টীকা—এইগুলি লইয়া এই পুস্তক বাঙ্গালা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ভারতীয় সাহিত্যে একটি অনুপম গ্রন্থ হইয়াছে।

আড়্বারগণের ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকারী আমি নহি। এ বিষয়ে আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস যাহা তাঁহার 'আড়্বার্' গ্রন্থে বিশদ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা হইতে আড়্বার্ ভাব-ধারার সম্যক্ প্রণিধান হইবে। আড়্বার্-ভাবধারায় আচার্য্য শ্রীরামানুজদাস এই বিষয়গুলির বিচার করিয়াছেন—(ক) জ্ঞানাধিক (বা জ্ঞানাতীত) অবস্থা, (খ) প্রেমদশা, (গ) দাস্যভাব, (ঘ) সখ্যভাব, (ঙ) বাৎসল্যভাব, (চ) নায়িকাভাব—(চ-১) শ্রীদেবী, ভূমিদেবী ও নীলাদেবীর ভাব, (চ-২) সীতাদেবীর ভাব, (চ-৩) কৃষ্ণমহিষী এবং মথুরানাগরীগণের ভাব, (চ-৪) গোপীগণের ভাব, (চ-৫) আণ্টালের নায়িকা-ভাব, এবং (চ-৬) নায়িকা-ভাবের উপসংহার। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাব, যাহা বৈষ্ণব সাধনার পথ বা উপায় অথবা নির্দেশ স্বরূপ, এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে যাহার পরিচয় পাই, সে সমস্তই আড়্বারগণের গীতির মধ্যে পরিপূর্ণ এবং বিশদ-ভাবে নিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণব সাধনায় মধুর-ভাবে সাধনা হইতেছে একটি বিশিষ্ট বস্তু, ইসলামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সূফী-সাধনা যাহার অনুরূপ। সেই মধুর-ভাবে সাধনাকে লইয়া যেমন বাঙ্গালায় বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী, হিন্দীতে সুরদাস প্রভৃতির পদ, সে-সমস্তের পূর্বচ্ছায়া আমরা আড়্বার্-গীতিতেই পাইতেছি। বঙ্গদেশ-সমেত সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব মধুর-রসের আলোচনায় তমিল্ আড়্বার্-গীতিসমূহকে প্রাথমিক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

স্ত্রী-আড়্বার্ আণ্টাল্ (আণ্ডাল্) বা গোদাদেবীর ৩০টি পদ 'তিরুপ্পাবৈ' বা 'শ্রীব্রত' হইতে গোপী-ভাবে প্রেমের পথে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষার ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ৩০টি পদের একাধিক ইংরেজি অনুবাদও হইয়াছে। তিরুপতি দেবস্থান হইতে অতি সুন্দর ৩০ খানির অধিক রঙ্গীন চিত্রে শোভিত তমিল্ ও তেলুগু অক্ষরে ইহার দুইটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে চিত্রময় টীকারূপে এই মহিলা আড়্বার্-প্রোক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সাধনার সার্থক ও মনোহর বর্ণনা দেখিতে পাই।

শ্রীরামানুজস্বামী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব ধারা বা পরম্পরা এই আড়্বারদের মধ্যে। ইঁহারা-ই শ্রীরামানুজস্বামীর দার্শনিক প্রকাশের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন। সেইজন্য শ্রীসম্প্রদায়ের আলোচনায় আড়্বারদের জীবনী ও রচনাকে অন্যতম মুখ্য আধার বলিয়া ধরিতে হয়। শ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যে দিব্যজ্ঞান এবং দিব্যানুভূতির দুইটি ধারা সমমূল্য বলিয়া বিবেচিত—(১) সংস্কৃত বা বেদ-বেদান্তের ধারা, এবং (২) তমিল্ আড়্বারদের পদ-গীতির ধারা। উভয়-ই 'বেদান্ত'-পদবাচ্য—এই দুই বেদান্ত মতকে, সংস্কৃত এবং তমিল্—'উভয়-বেদান্ত' বলা হয়। ইহা হইতেই তমিল্ দেশে বৈষ্ণব সাধনায় 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর মর্য্যাদা অনুমান করা যায়। এই পুস্তককে তমিল্ বৈষ্ণব ভক্তদের পদের 'বেদ-সংহিতা' বলা যাইতে পারে।

বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এবং জ্ঞান ও সাহিত্যবোধের সহিত 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর আক্ষরিক সংস্কৃত অনুবাদ ও সংস্কৃত টীকা শ্রীসম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণ করিয়া গিয়াছেন, এবং এই-ভাবে তমিল্-জগতের বাহিরে ইহার প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর (১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গদেশে যেমন তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ 'পদামৃতসমুদ্র'-তেও তাঁহার স্বকৃত সংস্কৃত টীকা সংযোজিত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনপদের মান্যতা বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। বহু পূর্বে বাঙ্গালার বৌদ্ধ সহজ-যানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চর্য্যাগীতির-ও এইরূপ সংস্কৃত টীকা রচিত হইয়াছিল। লোকভাষায় লোকোত্তর সাহিত্য রচিত হইলে, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে তাহার সমাদরের অভাব কখনও হয় নাই।

তমিল্-দেশের এবং তমিল্-দেশের বাহিরেকার শ্রীসম্প্রদায়-শাসিত বা -পরিচালিত মন্দিরে বেদ-মন্ত্রের মতো 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর পদ নিত্য গীত ও পঠিত হয়। এই তমিল্ ভাষার গৌরব যে কতটা, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। 'সহস্র-গীতি' বা 'শ্রীমুখ-বাণী' গ্রন্থের প্রস্তুত সংস্করণে বাঙ্গালী পাঠককে, তমিল্ ভাষার ধ্বনি ও প্রকৃতি বুঝিতে, বিশেষ করিয়া আর্য্য-ভাষা সংস্কৃতের পাশে এই দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষার পার্থক্য বুঝিতে কতকটা সাহায্য করিবে।

দ্রাবিড় ভাষা—প্রাচীন তমিল

সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে —উচ্চারণ-ঘটিত, ব্যাকরণ-ঘটিত, এবং ধাতু-, প্রত্যয়- ও শব্দ-ঘটিত। আবার দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবের ফলে কতকগুলি বিষয়ে সমতাও দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় একাক্ষর ধাতুতে, গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ নিয়ম অনুসারে কতকগুলি পরিবর্তন হয়, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় ধাতু সর্বত্র অবিকৃত থাকে। সংস্কৃত ও দ্রাবিড় উভয় ভাষাতেই ধাতুর পরে প্রত্যয় বসে, কিন্তু সংস্কৃতে প্রত্যয়ের সংখ্যা ও কার্য্য দ্রাবিড়-প্রত্যয় হইতে অনেক অধিক, এবং সংস্কৃত ও দ্রাবিড় উভয় ভাষায় প্রত্যয়ের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। দ্রাবিড় প্রত্যয়গুলি মূলে পৃথক্ পৃথক্ ধাতু বা শব্দ, অন্য ধাতুর পরে আসিয়া সেগুলি প্রত্যয়ের কাজ করে। যেমন বাঙ্গালায় 'মানবেরা' ='মানব'+'-এরা'-প্রত্যয়, অন্যত্র এই প্রত্যয় '-এরা' নিরর্থক শব্দ, বাক্যে অব্যবহৃত—ইহা সংস্কৃতের অনুসারী; কিন্তু বাঙ্গালা বহুবচনে 'মানব-সকল' বা 'মানব-গণ', 'মানব' শব্দ+বহুত্ববাচক শব্দ 'সকল' বা 'গণ', এখানে এইরূপ সংযোজিত শব্দ প্রত্যয়ের কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু মূলে এই দুইটি পৃথক্-সত্তা-বিশিষ্ট শব্দ। আদি সংস্কৃতে বা প্রবৈদিক ভাষায় এক সময়ে নাম বা সর্বনাম শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত কতকগুলি অব্যয় ছিল, সেগুলি ইংরেজির Prepositions-এর মতন, বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে বসিত, বাক্যের মধ্যে স্বাধীন ভাবে অন্যত্রও বসিত। এই Preposition-ধর্মী অব্যয়গুলি পরে ক্রিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সহিত সংযুক্ত 'উপসর্গ' হইয়া দাঁড়ায়। দ্রাবিড় ভাষায় এই উপসর্গের পাট একেবারেই ছিল না ও নাই। দ্রাবিড়ে ক্রিয়ায় নঞ্-বাচক কাল-রূপ আছে, সংস্কৃতে তাহা অজ্ঞাত; যেমন—'কুম্বিক্‌কিরে'ন্' '=আমি স্নান করি; 'কুম্বিত্‌তেন্' '=আমি স্নান করিয়াছি; 'কুম্বিপ্‌পেন্' '=আমি স্নান করিব; কিন্তু 'কুম্বিয়েন্' '=আমি স্নান করি না, করি নাই, বা করিব না। দ্রাবিড় ভাষার সাধারণ ধাতু ও শব্দ সংস্কৃত ভাষার ধাতু ও শব্দ হইতে একেবারে পৃথক্। এই-রূপ নানা মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও, ভারতে সুপ্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ফলে, যেমন একদিকে সংস্কৃত ভাষার সহস্র-সহস্র শব্দ দ্রাবিড় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে শত-শত দ্রাবিড় শব্দ-ও সংস্কৃতে গৃহীত এবং সংস্কৃতের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তবে 'সহস্র-গীতি'র মতো তমিল্ পুস্তকের যে কোনও ছত্র সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, এই দুই ভাষার মধ্যে যে একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

'সহস্র-গীতি' গ্রন্থের প্রস্তুত সংস্করণের মূল্য ও উপযোগিতা

উত্তর-ভারতের লোকেদের মধ্যে তমিল্ অথবা অন্য দ্রাবিড় ভাষা চর্চার তাগিদ বা আগ্রহ নাই; এবং সংস্কৃতের সঙ্গে অন্য আর্য্য ভাষা (প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষা) দক্ষিণে বিশেষরূপে প্রচলিত হওয়ায়, উত্তর-ভারতের আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই যে দক্ষিণ-ভারতের লোকেদের সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী না শিখিয়া উপায় নাই, আমাদের পক্ষে তমিল্ তেলুগু অনাবশ্যক। এইরূপ মনোভাব, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় সংহতির পক্ষে অনুকূল নহে। দক্ষিণ ও উত্তর, দ্রাবিড় ও আর্য, এই দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান-বিস্তার এবং সাহিত্যিক আদান-প্রদান যত হয়, ততই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল। এ বিষয়ে দক্ষিণের লোকেদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা বরাবরই সংস্কৃত শিখিয়া আসিয়াছেন। উপরন্তু এ কথা-ও ঠিক যে, ভারতে সংস্কৃত ভাষার গঠনে দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণেরও হাত আছে; এবং সংস্কৃত নিখিল ভারতের সংস্কৃতিবাহিনী ভাষা, ইহা কেবল উত্তর-ভারতের নহে। তবে দক্ষিণের লোকেরা এখন হিন্দী শিখিতেছেন, এবং হিন্দীতে নানা তেলুগু, কানাড়ী, তমিল্, মালয়ালম্ বইয়ের অনুবাদও করিতেছেন; তেলুগু তমিল্ প্রভৃতি ভাষার বই নাগরী অক্ষরে ছাপা হওয়ায় উত্তর-ভারতের লোকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পক্ষে পাঠের সুবিধা হইতেছে। দিল্লীর সরকারী সংস্থা 'সাহিত্য একাডেমী' (বা 'অকাদেমী') বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই পারস্পরিক অনুবাদের কাজ হাতে লইয়াছেন। কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও দ্রাবিড় ভাষার প্রচার বা চর্চা উত্তর-ভারতে তেমন অগ্রসর হইতেছে না।

এই অবস্থায়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস যে তমিল্-এর এই বিরাট্ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মূল সহ অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিলেন, তজ্জন্য ভারতের Integration বা সংহতি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সসম্মান সাধুবাদ দিবেন। বহু বৎসর পূর্বে, ১৩৪৪ সালে, স্বর্গত অধ্যাপক ডাক্তার নলিনীমোহন সান্যাল প্রাচীন তমিলের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, মানুষের ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে ত্রিবর্গ ধর্ম, অর্থ এবং কাম লইয়া রচিত অপূর্ব পুস্তক, কুর'ল্'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তাহাতে মূল তমিল্ নাই এবং বাঙ্গালা অনুবাদটি ছিল ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ। 'সহস্র-গীতি' ('তিরু-বায়্-মোড়ি') বা 'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্'-এর পুরা ইংরেজি অনুবাদ বাহির হয় নাই। কেবল নানা সংগ্রহ-গ্রন্থে দুই-দশটা পদের অনুবাদ পাওয়া যায়, এবং আণ্ডাল্-এর 'তিরুপ্পাবৈ' খণ্ডের ৩০টি শ্লোকের একাধিক ইংরেজি অনুবাদ-ও আছে। সোজা তমিল্ হইতে, অবশ্য সংস্কৃত অনুবাদের ও টীকার সহায়তা লইয়া, প্রত্যেক তমিল্ পদ বা বাক্যের আক্ষরিক বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়া, বঙ্গভাষী জনগণের সমক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস এই মহাগ্রন্থের একটি পুরা খণ্ড, ইহার এক চতুর্থাংশ, ধরিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি বাঙ্গালা ও তমিলের মধ্যে মিলন-সূত্র বাঁধিয়া দিলেন, তাঁহার এই কাজের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিব।

তমিল্ লিপির বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

তমিল্ বর্ণের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণ যাহা এই পুস্তকে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। আচার্য্য শ্রীরামানুজদাস তমিলের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, ইহা তাঁহার বঙ্গাক্ষরে অনুলিখন হইতে সুস্পষ্ট। তিনি বাঙ্গালা লিপিতে কোনও নূতন বর্ণের আমদানি করেন নাই, বিন্দু বা রেখা বা অন্য চিহ্ন দিয়া কোনও বাঙ্গালা বর্ণকে পরিবর্তিত করিয়া ব্যবহার করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার প্রতিবর্ণীকরণে কতকগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অসম্পূর্ণতা তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই। তমিল্ ভাষায় এমন কতকগুলি ধ্বনি ও সেই ধ্বনির প্রকাশক বিশেষ বর্ণ আছে, যেগুলি সংস্কৃত ও সংস্কৃত-জাত আর্য্য ভাষায় অজ্ঞাত। তমিলের বর্ণমালা ও বানানের পদ্ধতি 'সঙ্গম্' সাহিত্যের যুগের অন্ত্য ভাগে—খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নির্ধারিত হইয়া যায়। ইহার পূর্বে ব্রাহ্মী লিপিতে প্রথম প্রাচীনতম তমিল্ লিখিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি, যেগুলির ভাষা প্রাচীন তমিল্ বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন, সেগুলির ভাষা সম্বন্ধে লিখন ও অর্থ উভয় দিকেই সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। আজকাল যে তমিল্ লিপি প্রচলিত আছে, তাহা দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-বংশীয় রাজাদের যুগে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপির একটি সংক্ষিপ্ত বা লঘু রূপ মাত্র। সংস্কৃতে প্রযুক্ত সকল বর্ণ তমিলের পক্ষে অনাবশ্যক বিধায়, সংস্কৃতের অনেকগুলি বর্ণ নূতন-গঠিত তমিল বর্ণমালায় গৃহীত হয় নাই। এখন হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্বেকার তমিলের উচ্চারণ ধরিয়া এই লিপি গঠিত বা গৃহীত হইয়াছিল। সেই উচ্চারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে লিপি, প্রাচীন বানান, মধ্য-যুগের ও আধুনিক কালের উচ্চারণ বিচার করিয়া এ বিষয়ে কতকগুলি নিষ্কর্ষে পঁহুছানো গিয়াছে।

প্রাচীন তমিল্-এর বর্ণমালা এইরূপ ছিল—

স্বরবর্ণ—**অ, আ** ; **ই, ঈ** ; **উ, ঊ** ; হ্রস্ব **এ**, দীর্ঘ **ে (ে)** ; হ্রস্ব **ও**, দীর্ঘ **ো (ো)** ; **ঐ** , **ঔ** ; [ঋ, ৠ, ঌ—এগুলি তমিলে নাই]

ব্যঞ্জনবর্ণ—স্পর্শবর্ণ—**ক, ঙ** ; **চ, ঞ** ; **ট, ণ** ; **ত, ন** ; **প, ম** ; [ঘোষবৎ **গ, জ, ড, দ, ব** (বর্গীয় ব= b) এবং মহাপ্রাণ **খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ ভ** বর্ণ ও ধ্বনিগুলি তমিলে নাই ; পরবর্তী কালে, 'সঙ্গম্' যুগের বহু পরে, শব্দের মধ্যে একবার মাত্র আসিলে, **ক চ ট ত প** ঘোষবৎ **গ জ ড দ ব** (=ব, b)' রূপে উচ্চারিত হইত ; এবং **চ**-ও, **শ**, **স** রূপে উচ্চারিত হইত।]

অন্তঃস্থবর্ণ—**য** (=য়), **র, ল, ব** (=র, =w বা v) ; [উষ্মবর্ণ 'শ ষ স হ' নাই] ; বিসর্গ-স্থানীয় একটি বিশেষ বর্ণ আছে—ஃ. নাম 'অয়্তম্' ;

দন্তমূলীয়—**ন', র'** ; মূর্ধন্য—**ষ** (=বৈদিক ळ), এবং **ড়** [শেষের এই বর্ণ বা ধ্বনি তমিলের নিজস্ব ; সংস্কৃত অঘোষ মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষ-রূপ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রোমান লিপিতে ইহাকে অনেক সময়ে zh রূপে লিখিত হয়; বহু পূর্বে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষবৎ রূপ বলিয়া, আমি ইহাকে 'র্ষ' রূপে লিখিতে চাহিয়াছিলাম—এখন দেখিতেছি তাহা জটিল, এবং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর হইবে; পরে আমি এই তমিল্ বর্ণকে বাঙ্গালায় (ইংরেজি zh-এর অনুকরণে) 'ঝ' রূপেও লিখিয়াছি। এখন মনে হয়, আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজ-দাস মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিন্দু-যুক্ত ড=ড় (=rzh, zh) ব্যবহার করাই সর্বথা সহজ এবং উপযোগী হইবে।—তবে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, এই ড় আমাদের বাঙ্গালার 'ড়' নহে, ইহা জিভ উলটাইয়া উচ্চারিত zh-এর ধ্বনি।]

রোমান লিপিতে এই রীতি অনুসারে তামল্ বর্ণমালার প্রতিরূপ এই :

a a ; i ī ; u ū ; e ē ; o ō ; ai, au ;

k, ṅ ; c, ñ ; ṭ, ṇ ; t, n ; p, m ; y, r, l, v ; n', r' ;

l ; ẓ ; ḥ (=অয়্তম্)।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ 'এ'-কার এবং 'ও'-কার এবং দন্ত্য ন ও দন্তমূলীয় ন', তথা দন্ত্য র এবং দন্তমূলীয় র', এবং দন্ত্য ল, মূর্ধন্য ল—এগুলির মধ্যে বিদ্যমান যে পার্থক্যটুকু আছে তাহা রক্ষিত না হওয়াতে, এই পুস্তকে ব্যবহৃত Bengali Transliteration of Tamil, তমিলের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ, একটু অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা মারাত্মক অপরাধ নহে। তমিল্-ভাষায় একটু অধিকার হইলেই, বাঙ্গালী পাঠক সহজেই এই অসম্পূর্ণতা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন।

আমার জ্ঞান-গোচর মতো, নূতন কোনও বর্ণ বাঙ্গালা লিপির মধ্যে না আনিয়া এবং কেবল একটি 'সূচক-চিহ্ন' ['] ব্যবহার করিয়া, আচার্য্য শ্রীরামানুজদাসের পদ্ধতিকে একটু-আধটু পরিবর্তিত করিয়া লইলেই চলিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইঁহার সংস্করণে প্রদত্ত আদিম এবং অন্তিম ইতুটি পদের প্রতিবর্ণী-করণ, এবং ঐ পদদ্বয়ের আমার প্রস্তাবিত প্রতিবর্ণীকরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পৃঃ ১— উয়র্বর বুয়র্নল মুডৈয়ব নেবনন্,
ময়র্বর, মদিনল, মরলিন নেবনবন্,
অয়র্বরু, মমরর্ক, লদিপদি, য়েবনবন্
দুয়ররু, সুড়ড়ড়ি, তুডুদেড়ন্ মননে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইহার পূর্ণতর প্রতিবর্ণ—

উয়র্‌বর' বুয়র্‌নল মুটৈয়বন্‌' এবন'বন্‌',
ময়র্‌বর' মতিনল মরুন্তান'ন্‌ এবন'বন্‌' ;
অয়র্‌বরু' মমরর্‌কন্ত' তিপতিয়্‌-এবন'বন্‌'
তুয়ররু' চুটরটি তোডুতেড়েন্‌' মন'নে' !

পৃঃ ৪৭২— সুড়্‌ন্দকন্‌ রাড়্‌ন্দুয়র্‌ন্‌ দমুডি বিল্‌পেরুম্‌ বাড়েয়ো !
সুড়্‌ন্দদ নির্‌পেরি য়পর নন্‌মলরস সোদীয়ো !
সুড়্‌ন্দদ নির্‌পেরি য়সুড়ব্‌ ঞানবিন্‌ পমেয়ো !
সুড়্‌ন্দদ নির্‌পেরিয়-এন্ন বাবরস্‌ সুড়্‌ন্দায়ে।

পূর্ণতর প্রতিবর্ণ—

চুড়্‌ন্ত'কন্‌' রাড়্‌ন্তুয়র্‌ন্‌ তমুটি বিল্‌পেরুম্‌ পাড়েয়ো !
চুড়্‌ন্তত নি'র্‌'পেরি য়পর নন্‌'মলর্‌চ্‌ চোভীয়ো !
চুড়্‌ন্তত নি'র্‌'পেরি য়চুটর্‌ ঞান্‌'বিন পমেয়ো !
চুড়্‌ন্তত নি'র্‌'পেরি য়-এন্‌'ন' বাবর'চ্‌ চুড়্‌ন্তায়ে !

পূর্ণতর প্রতিবর্ণ ধরিয়া ইচ্ছামত তমিলের আধুনিক উচ্চারণ পাঠ করা যাইবে—যেমন **চ** স্থানে **শ** বা **স**, **ট** স্থানে (বাঙ্গালা ও হিন্দীর মতো) **ড়**, **ক** স্থানে **গ** বা **হ**, **প** স্থানে **ব** (b) বা **ব** (v, w), **র্‌'-র'** = **ত্তু** বা **ট্টু**, এবং **ন্‌'র'** বিকল্পে **ণ্ডু** রূপে উচ্চারিত হয়, **ব** সর্বত্র w বা v ; এবং **ড়**-কে, মূর্ধন্য ষ-কারের ঘোষবৎ রূপ, zh বা rzh রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। 'সহস্র-গীতি' পুস্তকে ব্যবহৃত তমিলের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ **এ** এবং **ও** লইয়া একটু মুশ্‌কিলে পড়িতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা আক্ষরিক অনুবাদে মূল তমিল্‌ ছত্রগুলির মধ্যে অবস্থিত শব্দসমূহের সন্ধি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, অল্প জানিলেও ঠিক পাঠ বা বর্ণান্তরীকরণ ধরা তাদৃশ কষ্টকর হইবে না।

তমিল্‌ বানান, যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহা দেড় হাজার বছরের পূর্বেকার প্রাচীন তমিলের উচ্চারণের পরিচায়ক। এই প্রাচীন বানান বজায় আছে, কিন্তু আধুনিক উচ্চারণ বহুশঃ একেবারে অন্য ধরনের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ তমিল্‌-ভাষী পণ্ডিত পর্য্যন্ত-ও এ বিষয়ে অবহিত নহেন—তাঁহারা মনে করেন যে আধুনিক উচ্চারণ-ই পূর্ণভাবে প্রাচীন তমিলেও প্রচলিত ছিল। উপরে প্রদত্ত 'তিরু-বায়্‌-মোড়ি'-র দুইটি পদ, লিখিত তমিলের বানান ধরিয়া রোমান লিপিতে নিম্নে বর্ণান্তরিত করা হইল,—ইহা হইতে ৭০০ হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১৫০০ বৎসর পূর্বেকার প্রাচীন তমিলের উচ্চারণ বুঝা যাইবে। এবং ইহার সঙ্গে-সঙ্গে, আধুনিক তমিলের উচ্চারণ-ও রোমান বর্ণমালার সাহায্যে দেখানো হইল। এই প্রতিবর্ণীকরণে, - (হাইফেন)-চিহ্ন দ্বারা সন্ধি-বিশ্লেষ করিয়া দেখানো হইতেছে।

(১) প্রথম পদ—'বর্ণান্তরীকরণ' দ্বারাই প্রাচীন তমিল উচ্চারণের প্রদর্শন ; —অনুরূপ পদ্ধতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সুবৃহৎ তমিল্ অভিধানে তমিল্ শব্দের রোমান প্রতিবর্ণীকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে।

uyarv-ar'a-v-uyar nalam-uṭaiyavan' evan' avan'
mayarv-ar'a mati-nalam aruḷān'an' evan' avan'
ayarv-ar'um-amar-ar'-kaḷ-atipati-y evan'-avan'
tuyar-ar'u cuṭar-aṭi toẓut-eẓ-en' man'an'ē !

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাসকে অনুসরণ করিয়া, অন্বয়-মুখে এই পদটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে—

uyarvu-ar'a=**uyarv-ar'a**=অধিক-শূন্য ; **uyar**=বর্ধমান , **nalam-uṭaiy-avan'**=আনন্দবান্ , **evan' avan'**—যিনি, তিনি ; **mayarvu-ar'a**=**mayarv-ar'a**=অজ্ঞান-রহিত ; **mati-nalam**=জ্ঞান (মতি) ও আনন্দ ; **aruḷ-ān'an'**=কৃপা করিয়া দান করিয়াছে ; **evan' avan'**=যিনি, তিনি ; **ayarvu**+**ar'um**=বিস্মৃতি-শূন্য ; **amar-ar'-kaḷ**=অমর বা দেবতাগণ, দেবতাগণের, নিত্যসূরীগণের ; **atipati**=অধিপতি ; **-y-evan' avan'**=যিনি, তিনি , **tuyar-ar'u**=দুঃখ-নিবর্তক ; **cuṭar-aṭi**=তেজঃপূর্ণ চরণ ; **toẓutu eẓu en'**=**toẓut-eẓ-en' man'an-ē**=প্রণামপূর্বক উত্থিত হও, হে আমার মন !

শ্রীযুক্ত রামানুজদাসের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ—

নিরবধি পরিমাণ, তহিঁ পুনঃ বর্ধমান, অনন্ত আনন্দধাম যিনি।
অজ্ঞান তিমির নাশি' বিতরিয়া জ্ঞান-রাশি, মোরে কৈল ভক্তি-ধনে ধনী ॥
ভ্রান্তিহীন নিত্যসূরী, তাঁরাও অধীন যাঁরি, আদিদেব পুরুষ পরম।
জ্যোতির্ময় দুঃখহারী, বহি' পদ-যুগ তাঁরি, উজ্জীবন লভ মম মন ॥

আধুনিক উচ্চারণ—শব্দ-মধ্যস্থ t (=ত) সাধারণতঃ ð (ইংরেজি this, then-এর th-এর ধরনে), এবং k (=ক), γ (=ফারসীর 'ঘায়েন' অক্ষরের ধ্বনি) অথবা h (=হ) রূপে উচ্চারিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

uyarvar'a vuyarnala muḍaiyavan' evan'avan'
mayarvar'a madinala (maḍinala) maruḷān'an' evan'avan'
ayarvar'u mamarar'haḷadiwadiy evan'avan'
tuyarar'u śuḍaraḍi toẓudeẓen' man'an'ē !

(২) দ্বিতীয় পদ—বর্ণান্তরীকরণ ও প্রাচীন উচ্চারণ :

cuẓnt-akan'r'-āẓntuyarnta muṭiv-il peru-m-pāẓē-y-ō !
cuẓnt-atan'ir'-periya para nan'malarc cōtī-y-ō !
cuẓnt-atan'ir'periya cuṭar ñān'av-inpamē-y-ō !
cuẓnt-atan'ir'periy en'n' avā-v-ar'ac cūẓntāyē !

পদটির অন্বয়-মুখে ব্যাখ্যা—

akan'r'u+āẓntu+uyarn cuẓntu=(তুমি) অষ্ট দিক্ অধঃ এবং ঊর্ধ্ব সর্বত্র ব্যাপ্ত ; **muṭlvu+ii-peru pāẓē-y-ō**=(তুমি) নাশ-রহিত মহাক্ষেত্রের (প্রকৃতি তত্ত্বের) আত্মস্বরূপ—অহো ! **atan'il periya param**=তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ; **nal-malarc-cōtī-cuẓntu ō**=সমীচীন বিকস্বর জ্যোতির (আত্মবস্তুর) আত্মস্বরূপ (তুমি)—অহো ! **atan'il periya**=তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ; **cuṭar ñāna-v-inpamē cuẓntu ō**= উজ্জ্বল জ্ঞান আনন্দে ব্যাপ্ত (তাহার আধারভূত)—অহো ! **atan'il periya en' avā**=তত্তোঽধিক (তোমার প্রতি) আমার অভিনিবেশ ; **ar'ac cuẓntāyē cuẓntu**=তাহাকেও পরাভূত করিয়া তুমি আমার মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়াছে ; অর্থাৎ আমার সেই অভিনিবেশ হইতেও আমার প্রতি অতি মহান্ অভিনিবেশ লইয়া তুমি এখন আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস-কৃত বঙ্গানুবাদ—

ব্যাপিয়া র'য়েছো তুমি দিকে দিকে দশদিকে ।
আর আছো নিত্য সদা ব্যাপ্ত করি' প্রকৃতিকে ॥
ব্যাপ্ত তুমি শ্রেষ্ঠতর, বিকস্বর আত্মা মাঝে ।
ততোধিক উজ্জ্বল জ্ঞানানন্দ যথা রাজে ॥
আধার তাহার তুমি, নিত্য জ্ঞানানন্দময় ।
আশ্রিতে ব্যামোহভরা—এই তব পরিচয় ॥
সেই মহা প্রেম ল'য়ে অন্তরে প'শেছো এসে ।
এ দাসের ক্ষুদ্র প্রেম তুচ্ছ হ'ল তারি পাশে ॥
এত প্রেম আর্তি দিয়ে, আড়্বারে করি' ধনী ।
ল'য়ে চলে নিত্যধামে পরম দয়াল স্বামী ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আধুনিক উচ্চারণ—

śuṛndahan' r'āṛnduyarn damuḍi vilperum pāṛēyō !
śuṛndada n'ir'peri yawara nan'malarc cōdiyō !
śuṛndada n'ir'peri yaśuḍar ñān'avin pamēyō !
śuṛndada n'ir'periy en'n'a vāvar'ac cūṛndāyē !

মূল তমিল্ থাকায় এইভাবে প্রস্তুত পুস্তকের মাধ্যমে তমিল্ ভাষার সহিত এবং ভারতের ভক্তিশাস্ত্রের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সম্পূর্ণ এক-চতুর্থাংশের সহিত বঙ্গভাষী পাঠক একটু সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

'সহস্র-গীতি'র ভাবধারা ও আধ্যাত্মিকতা

'নাল্-আয়িরপ্-প্রবন্ধম্' অথবা তাহার তৃতীয় খণ্ড নম্মাড্বার্-শঠকোপ মুনির 'তিরু-বায়্-মোড়ি'র আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ করা আমার যোগ্যতার ঊর্ধ্বে। আমি সে বিষয়ে অনধিকার-চর্চা করিতে বসিব না। আড্বার্-গণ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত আচার্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস মহাশয়ের 'আড্বার্' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে আড্বার্-ভাবধারার মুখ্য কথাগুলি জানিতে পারা যাইবে। আমাদের বাঙ্গালার বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলীর মতো এই বইয়ের বিভিন্ন পদ আস্বাদন করিবার জন্য, তাহার দার্শনিক বা ভক্তিশাস্ত্রানুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ কাহারও কাছে মুখ্য বস্তু, আবার কাহারও কাছে তাহা গৌণ ব্যাপার মাত্র। অনুবাদক ও টীকাকার, গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও পদ-সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত। বাঙ্গালা বৈষ্ণবপদের তিনি একজন প্রথিতনামা গায়ক ও রসবেত্তাও বটেন। গৌড়-বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তার সহিত শ্রীসম্প্রদায়ের অনুরূপ বিষয়গুলির তুলনাত্মক আলোচনা তাঁহার ব্যাখ্যা, অনুবাদ ও বিচারকে যেন মণিকাঞ্চন-যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মূল তমিলে যাহা আছে, তাহা তাঁহার অন্বয়মুখে বাঙ্গালা অনুবাদে যথাযথ পাওয়া যাইবে। 'গাথা-সার' শীর্ষক ক্ষুদ্র টীকায় প্রত্যেক পদের আভ্যন্তর অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে, এবং অবশেষে উহার বাঙ্গালা কবিতাময় অনুবাদে, ভাষা জানিবার বা মূলের আক্ষরিক অনুবাদ পাঠ করিবার যাঁহাদের সময় বা আগ্রহ নাই, তাঁহারা, বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের অনুসারী করিয়া দেওয়াতে, বাঙ্গালী মন লইয়া এই মহাগ্রন্থের রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। এক-একটি তমিল্ পদ এই বাঙ্গালা সংস্করণে চতুর্মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে—১। মূল পদটি, ২। অন্বয়মুখে আক্ষরিক বাঙ্গালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুবাদ, ৩। গাথাসারে বক্তব্যের বিচার, এবং ৪। বাঙ্গালা কবিতায় ভাবপূর্ণ ভাষায় পদের প্রকাশ।

উপসংহার

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগ বিদ্যমান। একটি ভাষার একখানি মহাগ্রন্থের সানুবাদ ও সটীক সংস্করণ, অন্য একটি ভাষায় প্রকাশিত হইলে এই সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে আরও দৃঢ় করিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গালা-দেশ ও তমিল্-নাডের মধ্যে, ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ যোগ বহু শতক ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে 'হরিনাম-মূর্তি' শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ এই যোগকে ঘনীভূত করিতে সহায়তা করিয়াছিল। 'বেদান্তমূর্তি' স্বামী বিবেকানন্দকে তমিল্-ভাষী জনগণ ঠিক বাঙ্গালীরই মতন আপন জন করিয়া লইয়াছেন। বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী ও তমিল্ সন্ন্যাসীর দল, ভারতের অন্য প্রদেশের-ও সন্ন্যাসীদের সহিত মিলিত হইয়া, আধুনিক যুগে ভারতের আত্ম-চেতনাকে, তাহার হৃত অন্তরাত্মাকে ফিরাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামানুজদাস এই পুস্তক ও অনুরূপ অন্য পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার করিয়া আবার বাঙ্গালীর জীবনে ভারতের শাশ্বত বাণী ও কর্মপ্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। তাঁহার এই 'উজ্জীবন'-চেষ্টা সার্থক হউক, ও আমাদের অমৃতের সাধনার সহায়ক হউক। ইতি॥

১লা নভেম্বর ১৯৬৩।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র রামানুজদাস মহাশয় কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত তমিল্ 'সহস্র-গীতি' গ্রন্থের ভূমিকা রূপে প্রথম প্রকাশিত (বলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪-পরগণা, ১৯৬৩ সাল); এখানে কিছু-কিছু সংশোধন- ও সংযোজন-সহ পুনর্মুদ্রিত হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতে রোমক লিপি

ভারতের সমস্ত ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিবার একটি প্রস্তাব বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই প্রস্তাবটি আপাত-দৃষ্টিতে এমনিই অনাবশ্যক ও জাতীয়তা-বিরোধী যে, আমাদের দেশে প্রায় সকলেই এই প্রস্তাব উত্থাপন-মাত্রেই তাহা জাতীয়তাবোধ-বর্জিত পাগলের প্রলাপ বলিয়া "পত্রপাঠ" বর্জন করিয়া বসেন, তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে চাহেন না। কিন্তু প্রস্তাবটি উঠিয়াছে; যদিও এখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহার পক্ষে, এবং দেশের জনসাধারণ ইহার সম্বন্ধে উদাসীন অথবা ইহার বিরোধী, তথাপি আমার মনে হয়, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ধীরে-ধীরে, অতি ধীরে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। তুর্কীদেশে আতা-তুর্ক কামাল পাশা রোমান হরফ চালাইয়াছেন, সকলেই তাহার তারিফ করিতেছে—সমগ্র আরবী কোরানও তুর্কীরা রোমান হরফে ছাপাইয়াছে; পারস্যেও রোমান হরফ গ্রহণের প্রস্তাব উঠিয়াছে, এবং ফারসী ভাষায় ইউরোপীয় স্বরলিপি ব্যবহৃত হয় বলিয়া ঐ স্বরলিপির সহিত যে-সব ফারসী গান প্রকাশিত হয়, বাধ্য হইয়া সেগুলি রোমান হরফেই লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে; কারণ ইউরোপীয় স্বরলিপির গতি বাম হইতে দক্ষিণে, এবং ফারসী লিপি চলে দক্ষিণ হইতে বামে। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার বর্ণমালা বদলাইয়া যে রোমান অক্ষর গ্রহণ করা যায়, খবরের কাগজ যাঁহারা পড়েন তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। জিনিসটা বাহিরের জাতিদের সম্বন্ধে আর নূতন নয়। কিন্তু এখন ঘরে রোমান অক্ষর গ্রহণের কথা উঠিলে অনেকে সেটা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টাও করেন না।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস-গৃহীত নেহরু কমিটির রিপোর্টের এই মন্তব্যটি একপ্রকার সর্বজনগৃহীত হইয়া গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবে 'হিন্দুস্থানী', এবং হিন্দুস্থানী দেবনাগরী অথবা আরবী (উর্দূ) হরফে লেখা হইবে। বিগত কলিকাতার কংগ্রেসে সর্বদল-সম্মেলনে একজন পশ্চিমা মুসলমান সদস্য একটি সংশোধক প্রস্তাব আনয়ন করেন যে, এই রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী, দেবনাগরী এবং আরবী উভয় প্রকার হরফেই লেখা হইবে। অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরবী হরফ লোকে পড়িতে পারুক বা না পারুক, যেখানে জাতীয় রাজনৈতিক দলের অথবা জাতীয় শাসনতন্ত্রের কোনও বিজ্ঞাপন, বিধি অথবা প্রস্তাব হিন্দুস্থানীতে প্রচারিত হইবে, সেখানে অধিকন্তু আরবী হরফেও তাহা প্রকাশিত হইবে। সর্বদল-সম্মেলনে এই সংশোধক প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায়। তারপরে একজন সিন্ধী হিন্দু প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী কেবল রোমান লিপিতে লিখিত হইবে। একজন বাঙ্গালী হিন্দু প্রতিনিধি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, কিন্তু আর সকলেই বিপক্ষে থাকায় এই প্রস্তাবও নাকচ হইয়া যায়।

কিন্তু রোমক লিপি গ্রহণের কথাটা কংগ্রেসের মধ্যে এইভাবে ধামাচাপা পড়িয়া গেলেও, কংগ্রেসের বাহিরে দুই চারিজন করিয়া ব্যক্তি এই বিষয়ে অনুকূল মত পোষণ করিতেছেন। এই বৎসর (১৯৩৪ সালে) ফরিদপুরে বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপকদের একটি সম্মেলন হয়, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা লিখনের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের প্রচলন অনুমোদন করিয়া একটি প্রস্তাব আসে। ৩২ জন সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ও ২৫ জন প্রস্তাবের পক্ষে থাকায়, তাহা পরিত্যক্ত হয়। আমার বিশ্বাস, এই ২৫ জনের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে। বঙ্গদেশের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সর্বজনসমাদৃত লেখক—একাধারে তিনি রস-রচয়িতা ও বৈজ্ঞানিক—তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার হাতে কামাল-পাশার মতো ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আইন করিয়া দেশে বাঙ্গালা ভাষায় তিনি রোমান অক্ষর প্রচলন করাইতেন। আবার এরকম বিরোধী লোকও আছেন, হাতে ক্ষমতা থাকিলে যাঁহারা রোমান লিপির সমর্থকদিগকে জেলে পাঠাইতেন।

ভারতে রোমান অক্ষর প্রচলন ব্যাপারটি এখন একটি জাতীয় সমস্যা বা কর্তব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয় নাই, কিন্তু যেরূপ হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অচিরে ইহা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে একটি প্রধান স্থান লইয়া বসিবে। বাঙ্গালা অক্ষরের বদলে আমাদের মাতৃভাষায় রোমান অক্ষর চালাইলে আমাদের লাভ ও লোকসান কী কী হইবে, এবং তাহা করা সম্ভব কিনা, ও করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত কিনা, তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাদের ভারতীয় লিপি ও রোমান লিপির ইতিহাস তথা এই লিপির অন্তর্নিহিত প্রণালী বা পদ্ধতি একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। আধুনিক ভারতবর্ষে লিপিগুলির ইতিহাস মোটামুটি-ভাবে নিম্নলিখিত বংশ-পীঠিকা মতো :—

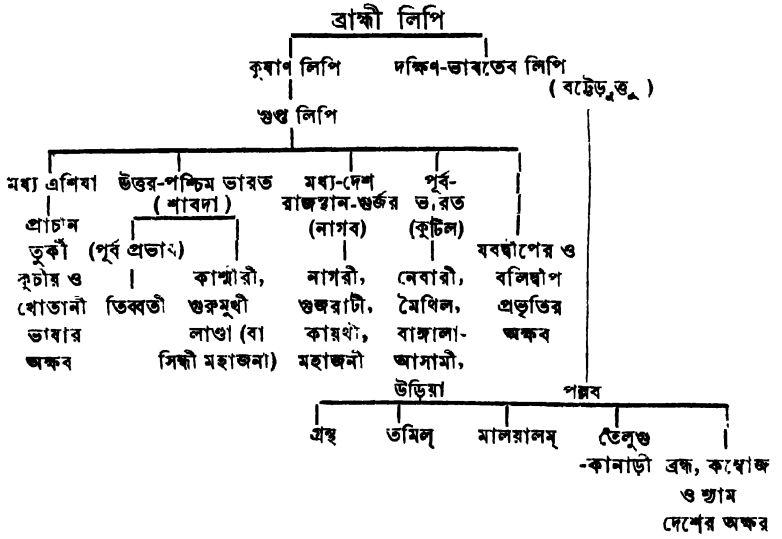

ব্রাহ্মী লিপি ভারতের সর্বপ্রাচীন লিপি যাহা আমরা পাঠ করিতে পারি—আর্য্য ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট ইহা-ই ভারতের প্রাচীনতম লিপি। আমাদের হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস অনেক প্রাচীন ; পুরাণে খ্রীষ্টপূর্ব বহু শত বৎসরের কথা বলে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৩০০-র পূর্বেকার কোনও ভারতীয় আর্য্য ভাষার লিপি এতাবৎ আবিষ্কৃত বা পঠিত হয় নাই। মৌর্য্য যুগের ব্রাহ্মীকেই উপস্থিত আধুনিক ভারতীয় লিপিসমূহের আদি বলিতে হয়। ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। এতাবৎ প্রায় সকলেই মনে করিতেন, মূলে ইহা ফিনীশীয় অক্ষর (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ এর পূর্বেই সিরিয়া দেশের ফিনীশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিয়া গঠিত প্রাচীন ফিনীশীয় লিপি) হইতে উৎপন্ন ; হয় দক্ষিণ-আরব ঘুরিয়া, না হয় পারস্য-উপসাগর হইয়া, দ্রাবিড়-জাতীয় বণিক্‌দের মারফৎ এই অক্ষর খ্রীঃ পূঃ ৯০০-৮০০-র দিকে ভারতে আনীত হয়, ও পরে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া এই অক্ষরমালার (ব্রাহ্মীর) সম্পূর্ণতা-সাধন ঘটে। কেহ কেহ ফিনীশীয় অক্ষর হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরের উদ্ভব স্বীকার করিতেন না ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁহারা মনে করিতেন, ভারতবর্ষে আর্য্যভাষী জনগণ কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে, কোনও প্রকার মৌলিক চিত্রলিপি হইতে ব্রাহ্মীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। সম্প্রতি মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পায় প্রাপ্ত শত-শত মুদ্রালিপি হইতে একটি নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে যে, প্রাগার্য্য যুগের চিত্রলিপির-ই এক বিকাশ ব্রাহ্মী-লিপি। আর একটি মত এই যে, প্রাচীন প্রাগ্-আর্য্য যুগের মোহেন্-জো-দড়োতে যে লিপি পাওয়া যায়, তাহার আধারেই ব্রাহ্মী লিপি গঠিত হয়, সম্ভবতঃ আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম শতকে; এই সময়ে এই আদি বা প্রথম উদ্ভাবিত ব্রাহ্মী লিপিতে-ই চতুর্বেদ সর্বপ্রথম লিখিত হয়, এবং সংস্কৃত ভাষায় এই লিপি পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। এই মতটি-ই সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

যাহাই হউক, একথা ঠিক যে, খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর দিকে, অশোক প্রভৃতি মৌর্য্য সম্রাট্‌দের কালে ব্যবহৃত, আমাদের প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তির কাল বলিয়া ধরা যায়। ব্রাহ্মী লিপির অক্ষরগুলি সরল, এগুলিতে মাত্রা বা অন্য প্রকার কোনও অনাবশ্যক বাহুল্য ছিল না; অক্ষরগুলির ছাঁদ ঋজু ও সবল, গ্রীক বা রোমান "কাপিটাল" বা বড়ো হাতের অক্ষরের মতো। স্বরবর্ণের জন্য আ-কার, ই-কার, দীর্ঘ-ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার প্রভৃতি বিশেষ-বিশেষ চিহ্ন অক্ষরের মাথায় গায়ে পায়ে লাগানো হইত। এই পদ্ধতি এখনও ভারতীয় অক্ষরে বিদ্যমান।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় অশোকের সময়ে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপির চিত্র দেওয়া হইল। অশোকের ও তাঁহার পরবর্তী রাজাদের প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অনুশাসনে সংস্কৃতের সব বর্ণ পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের সংস্কৃত লেখ দেখিয়া, অশোকের ব্রাহ্মীতে এই সমস্ত সংস্কৃত বর্ণের পূর্ব রূপ অনুমান করিয়া লওয়া যায়—কিন্তু তাহা অবিসংবাদিত হইবে না। অশোকেব অনুশাসনে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণবিন্যাসে অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা যায়, যেমন—সংযুক্ত ব্যঞ্জন 'প্র' লেখা হইয়াছে 'র্প' রূপে; 'ব্য' পাইতেছি 'য্ব' রূপে; এবং অন্য ক্ষেত্রেও সংযুক্ত ধ্বনি প্রকাশের রীতি নিতান্ত অসম্পূর্ণ।)

ব্রাহ্মী বর্ণগুলির সারল্যের মধ্যে একটা ভাস্কর্য্য-সুলভ গুণ বিদ্যমান। এই অনাড়ম্বর অক্ষর, ধীরে ধীরে ছেনির দ্বারা পাথরের উপরে না কাটিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া কলম দিয়া ভূর্জত্বক্ বা তালপত্রের উপরে লিখিবার ফলে, উহার রূপ বদলাইতে লাগিল, অক্ষরগুলি ক্রমে কুণ্ডলাকৃতি ও জটিল হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

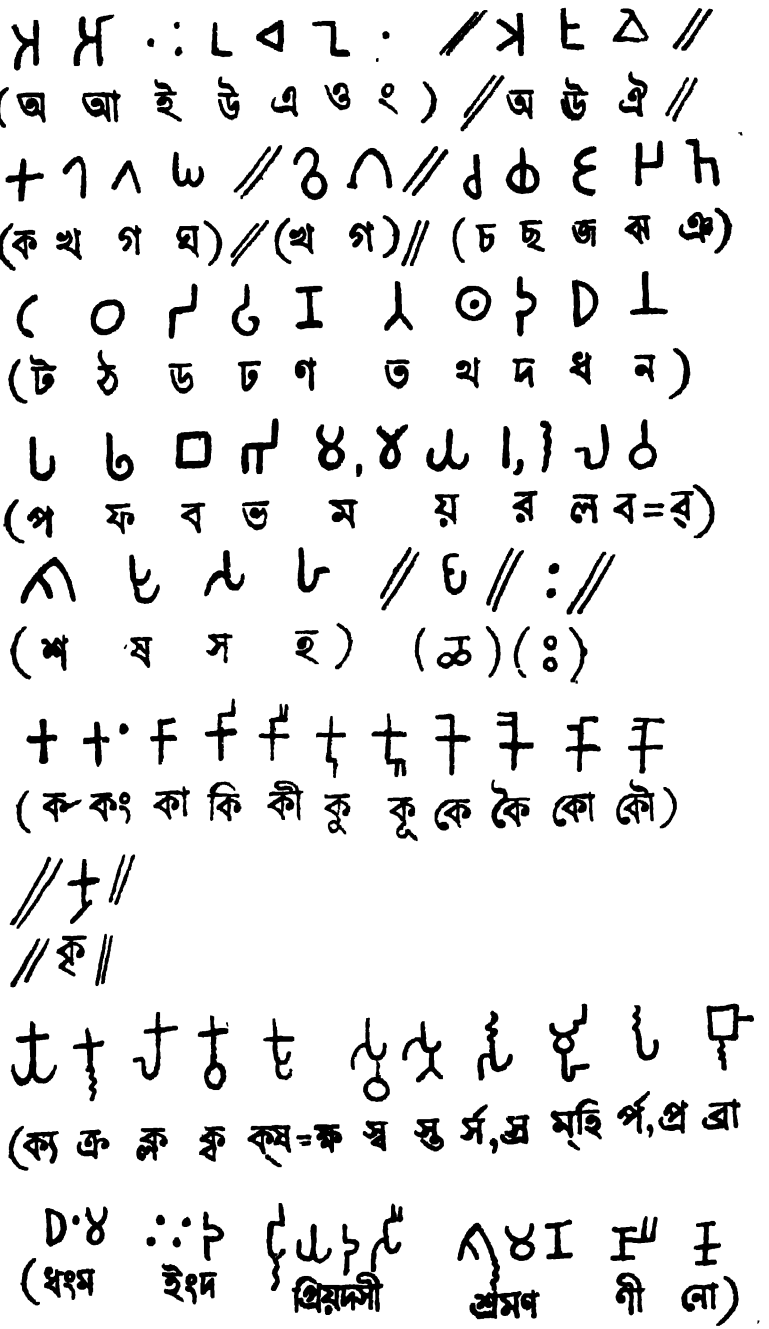

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লাগিল। হাতের লেখায় অক্ষরের যে দশা অবশ্যম্ভাবী, তাহা ঘটিল। ক্রমে এই অক্ষরমালা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা প্রাদেশিক অক্ষরে পরিণত হইল। ব্রাহ্মীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই-সমস্ত প্রাদেশিক অক্ষর ক্রমে বিশেষ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেবনাগরী অক্ষর বাঙ্গালার পূর্ব রূপ নহে; নাগর বা দেবনাগরী, বাঙ্গালা অক্ষরের সোদর-স্থানীয়। উভয়ের উদ্ভব প্রায় এক-ই কালে, এখন হইতে মাত্র এক হাজার বৎসর পূর্বে। ব্রাহ্মী অক্ষর এখন হইতে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার, একথা বলা চলে। ভারতবর্ষে লিপির ইতিহাস হইতেছে—ক্রমবর্ধনশীল জটিলতার ইতিহাস।

ওদিকে কিন্তু রোমান লিপিকে যেরূপে আমরা পাইতেছি, তাহা তাহার প্রাচীনতম রূপ হইতে বিশেষ পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। ফিনীশীয় অক্ষর হইতে খ্রীঃ পূঃ ৮০০-র দিকে গ্রীক অক্ষরের উদ্ভব। দক্ষিণ-ইতালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের নিকট হইতে রোমের অধিবাসিগণ ইহার ২।১ শত বৎসরের মধ্যে লিপিবিদ্যা শিক্ষা করে, রোমানদের হাতে গ্রীক-লিপি ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া রোমান লিপিতে পরিণত হয়। প্রথম রোমান লিপিতে কেবল capital বা বড়ো-ছাঁদের অক্ষরগুলিই ছিল; এই বড়ো-ছাঁদের অক্ষর এখনও প্রায় অবিকৃত রূপে বিদ্যমান—যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে যে রূপটি ছিল, সেই রূপটি এখনও বিদ্যমান। খ্রীষ্ট-জন্মের ২০০।৩০০ বৎসর পরে রোমান অক্ষরের small letters বা ছোটো হাতের অক্ষরগুলির উদ্ভব হয়—দ্রুত-লিখন-চেষ্টার ফলে। এই small letters-ও প্রায় অবিকৃত আছে। মোটা কলমে একটু বাহার দেখাইয়া লিখিবার চেষ্টায়, ইউরোপে মধ্যযুগে রোমান অক্ষরের চেহারা নানা স্থানে একটু একটু বদলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মূল রোমান লিপির সারল্যটুকু লোকে এখন বিস্মৃত হয় নাই। এখনও জর্মানিতে এই মোটা-ছাঁদের বাহারে' অক্ষর —German Black Letter বা Gothic—কিছু কিছু চলে, কিন্তু জর্মানির লোকেরা এই বাহারে' অক্ষর বহুশঃ বর্জন করিয়া, সরল রোমান অক্ষরই গ্রহণ করিতেছে। ইহা-ই হইল সংক্ষেপে লিপির ইতিহাস।

ভারতবর্ষে পর্তুগীসদের আগমনের সময় হইতে এদেশে রোমান অক্ষরের আগমন। রোমান অক্ষর ইউরোপীয়দের ভাষার বাহন বলিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনেক বেশি। সঙ্গে-সঙ্গে, ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায়, এবং জগৎ ব্যাপিয়া ইউরোপীয়দের ছড়াইয়া পড়ায়, বহু নিরক্ষর ভাষা প্রথম রোমান লিপিতেই লিখিত হইয়াছে; এরূপটি ভারতেও কতক পরিমাণে হইয়াছে। প্রাচীনকালে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ) প্রচারক ও বণিক্‌দের প্রভাবের ফলে যেমন মধ্য-এশিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুলাবেসি বা সেলেবেস, ফিলিপ্পীন প্রভৃতি দেশে তত্তৎ স্থানের ভাষা লিখনের জন্য ভারতীয় বর্ণমালা প্রসারলাভ করিয়াছিল। এখন কতকগুলি জাতি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজ প্রাচীন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া রোমান লিপি গ্রহণ করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তুর্কীরা ইতিমধ্যেই করিয়াছে,—ইন্দোনেসিয়াতেও গৃহীত হইয়াছে, এবং পারস্যে, জাপানে, ও কতক পরিমাণে চীনদেশেও এই চেষ্টা চলিতেছে।

রোমান তথা ভারতীয় লিপির অন্তর্নিহিত লিখন-প্রণালীর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে—সেটুকু প্রথম বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। এই দুটিই বিষয়ে এই পার্থক্য লক্ষণীয়—[১] ভারতীয় লিপিতে স্বরবর্ণগুলি ক্বচিৎ গৌণরূপে ধরা হয়, রোমান লিপিতে স্বরবর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সর্বত্র তুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়। 'ক'=ka,—এই অক্ষরে ব্যঞ্জন 'ক্'=k মুখ্য-রূপে ও স্বরধ্বনি 'অ'=a গৌণ-রূপে লিখিত, অ-কার ব্যঞ্জনের গায়ে অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। 'কা, কি, কু, কে' ইত্যাদি স্ববযুক্ত 'ক্' ধ্বনির লিখনে, স্বরধ্বনিদ্যোতক অক্ষরগুলি ব্যঞ্জনের আশ্রিত, তাহার আশেপাশে পায়ে মাথায় কোনও রকমে স্থান করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় লিপিতে স্বরধ্বনির বর্ণ দুই প্রস্থ—এক প্রস্থ, যখন স্বরধ্বনি শব্দের আদিতে (ক্বচিৎ মধ্যে) থাকে, তখন লিখিত হয় (অ, আ, ই, ঈ, ঋ, ৯, এ, ও, ঐ, ঔ), অন্য প্রস্থ, যখন ব্যঞ্জনের পরে আসে, তখন লিখিত হয় (া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৯, ে, ো, ৈ, ৌ)। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, ভারতীয় লিপির আধার হইতেছে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত করিয়া সৃষ্ট syllable বা 'অক্ষর'; পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র ধৃত স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রতীক letter বা 'বর্ণ' নহে। যেমন 'চতুর্থ' এই শব্দে তিনটি অক্ষর—'চ—তু—র্থ'; প্রত্যেকটি অক্ষরকে আবার ব্যঞ্জন ও স্বরে বিশ্লেষ করিতে পারা যায়। রোমান লিপিতে কিন্তু প্রত্যেক অক্ষর একা একটি স্বতন্ত্রাবস্থিত স্বর- বা ব্যঞ্জন-ধ্বনির প্রতীক—যথা—caturtha—c-a-t-u-r-th-a=c (চ্)+a (অ)+t (ত্)+u (উ)+r (র্)+th (থ্=ত্+হ্, মহাপ্রাণ ত্)+a (অ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[২] ভারতীয় লিপিতে ব্যঞ্জনের পরেই ব্যঞ্জনধ্বনি আসিলে, দুইটি বা ততোধিক ব্যঞ্জনের বর্ণকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মিলিত করিয়া 'সংযুক্ত' অক্ষর করা হয়। অনেক সময় সংযুক্ত অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ নূতন অক্ষরের রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। যথা—'ক্+ত'='ক্ত'; 'হ্+ম'='হ্ম'; 'র্'+'ম'='র্ম'; 'ক্+র'='ক্র'; 'স্+ত্+র্+ঈ'='স্ত্রী'; ইত্যাদি। ইহাতে শিক্ষণীয় অক্ষরের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে,—নূতন-নূতন বহু অক্ষর শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করিতে হয় মাতৃভাষার পঠন শিক্ষা করিতে গেলে, সাধারণতঃ বাঙ্গালী বা হিন্দীভাষী বালককে দুই বৎসর ব্যয় করিতে হয়। রোমান লিপিতে এ বালাই নাই: k+t=kt; h+m=hm; r+m=rm; k+r=kr, বাঙ্গালা 'অ+ত্+য়্+উ+ক্+ত্+ই'='অত্যুক্তি', কিন্তু রোমানে a+t+y+u +k+t+i=atyukti—কোনও ঝঞ্ঝাট নাই।

তবে একথা ঠিক যে, প্রত্যেকটি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ রোমান বর্ণমালায় পৃথক করিয়া লেখায়, ইহাতে জায়গা একটু বেশি লাগে;—সংযুক্ত-বর্ণ থাকায়, বাঙ্গালা নাগরী প্রভৃতি ভারতীয় লিপিতে একটু জায়গা বাঁচে। কিন্তু সে লাভটুকু বর্জন করিলে, সাধারণতঃ যে বেশি লোকসান হইল, তাহা বলা চলে না।

স্বরবর্ণের গৌণত্ব, তথা সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অবস্থান—এই দুই কারণে ভারতীয় অক্ষরের সাহায্যে ভাষার শব্দের বিশ্লেষণ দেখানো একটু কষ্টকর হইয়া উঠে। শব্দের বিশ্লেষণ দুই উপায়ে হয়—[১] ধ্বনির বিশ্লেষণ, [২] রূপ বা ধাতু-প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ। যেমন 'রাখিলাম' rākhilām শব্দ [১] ধ্বনি-মূলক বিশ্লেষণ—'র্-আ-খ্-ই-ল্-আ-ম্'; [২] ধাতু প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ—যথা '(ধাতু) রাখ্+(অতীত-বাচক প্রত্যয়) -ইল্- +(পুরুষবাচক তিঙ্-প্রত্যয়) -আম'। এইরূপ বিশ্লেষণ রোমান লিপিতে ভারতীয় লিপি অপেক্ষা অনেক সহজে দেখানো যায়। যথা—[১] r-ā-kh-i-l-ā-m; [২] rākh-il-ām; ভাষা শিক্ষার পক্ষে রোমান লিপির উপযোগিতা অনেক বেশি।

স্বরবর্ণ পৃথক্ করিয়া লিখায়, রোমান লিপিতে একটু স্থান বেশি লাগে, কিন্তু লেখা সুখপাঠ্য হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং 'ক্ষ, জ্ঞ, স্ত্রী, স্ট্রে, শ্ম, ষ্ট্র, ভ্র' প্রভৃতি চীনা অক্ষরের অনুকারী জটিল অক্ষরের হাত হইতে আমরা উদ্ধার পাই।

রোমান লিপির আর একটি গুণ আছে—ইহার বর্ণগুলির গঠন অতি সরল; নাগরী ও বাঙ্গালার যে-কোনও অক্ষরের সহিত তুলনা করিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইহা বুঝা যাইবে। যেমন ক্=k, ম্=m, হ্=h, র্=r, স্=s, ত্=t, l=ল্ ইত্যাদি।

ভারতীয় লিপি কিন্তু একটি বিষয়ে রোমান লিপির বহু উর্ধ্বে অবস্থিত—বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ভারতীয় বর্ণমালার অক্ষরের সমাবেশ। ইহাতে স্বরধ্বনিগুলি প্রথম প্রদত্ত হইয়াছে; তদনন্তর ব্যঞ্জনবর্ণগুলি—মুখ-বিবরের অভ্যন্তর বা কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া পর-পর উচ্চারণ-স্থান ধরিয়া তালু, মূর্ধা, দন্ত, ক্রমে মুখ-বিবরের বাহিরে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য—এই পাঁচটি স্পর্শবর্ণের বর্গ; প্রতি বর্গে আবার অঘোষ (যথা—ক, খ) এবং ঘোষ (যথা—গ, ঘ),—তথা নাসিক্য (যথা—ঙ)—এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ (ক), অঘোষ মহাপ্রাণ (খ), ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ (গ), ঘোষবৎ মহাপ্রাণ (ঘ), এবং নাসিক্য (ঙ), এই হিসাবে বর্গের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ সজ্ঞিত। স্পর্শবর্ণের পরে অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব—ইংরেজিতে যেগুলিকে liquids and semivowels বলে), তদনন্তর উষ্মবর্ণ (শ ষ স হ—ইংরেজিতে spirants বলে)। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণক্রম পৃথিবীর আর কোনও বর্ণমালায় নাই। এই বর্ণক্রমটুকু প্রাচীন ভারত হইতে প্রাপ্ত এক অতি মূল্যবান্ রিক্থ, ইহা আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। এই শুদ্ধ বর্ণক্রমের সমক্ষে রোমান লিপির বর্ণক্রম দাঁড়াইতেই পারে না। রোমান্ লিপির বর্ণগুলি a b c d e f g h i-ইত্যাদি ক্রমে, যেমন-তেমন করিয়া খামখেয়ালী ভাবে সাজানো।

যদি আমরা রোমান বর্ণগুলি গ্রহণ করি, সেগুলিকে নূতন করিয়া আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার ক্রম অনুসারেই সাজাইয়া লইব।

রোমান বর্ণমালায়, ভারতীয় বর্ণমালার সমস্ত ধ্বনি নির্দেশ হওয়া সম্ভব নহে—উহার বর্ণসংখ্যা নিতান্ত অল্প। এক্ষেত্রে প্রচলিত রোমান অক্ষরে কতকগুলি বিশেষ নির্দেশক চিহ্ন দিয়া ভারতীয় বর্ণমালার প্রত্যক্ষরীকরণের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবশ্য কিছুই বাধা নাই।

প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের ভারতীয় বর্ণমালা ছাড়িয়া রোমান বর্ণমালা লইতে যাইব কেন? তাহাতে লাভ কী? লাভ থাকিলেও, এরূপ করা জাতীয়তার বিরোধী হইবে কি না? আমরা হিন্দুরা ধর্মের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার একটি যোগ নির্ধারিত করিয়া লইয়াছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তান্ত্রিক বীজমন্ত্র—'ওঁ, ঐং, হ্রীং, ক্লীং, রং' ইত্যাদি ভারতীয় বর্ণমালায় লিখিয়া থাকি। এগুলিও রোমানে লিখি, এরূপ স্বপ্নের অগোচর কথা কেহ প্রস্তাবও করিতে পারে? দেশীয় অক্ষরে আমরা নিজেরা তো কিছু বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছি না; বিদেশীয় অজ্ঞাত জিনিসের মোহে নিজের পরিচিত জিনিস কেন ছাড়িয়া দেই?

আমার নিজের মনে হয়, রোমান লিপি গ্রহণ করিলে আমাদের সুবিধা অনেক হইবে; এবং জিনিসটা তলাইয়া বিচার করিয়া দেখিলে, ও যেভাবে রোমান অক্ষর আমাদের উপযোগী করিয়া লইবার প্রস্তাব আমি করিতেছি সেভাবে রোমান অক্ষর গ্রহণ করিলে, ইহাতে আমাদের জাতীয়তাবোধের বিরোধী কিছু-ই থাকিবে না। আপত্তিগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখা যাক।

প্রথম, রোমান লিপি গ্রহণ করিলে মাতৃভাষা তথা বিদেশী ভাষা শিক্ষার পথ খুব-ই সহজ হইয়া যাইবে। বই ছাপানোও অপ্রত্যাশিতভাবে সহজ, সরল ও সুলভ হইয়া যাইবে। এখন বাঙ্গালা ছাপিতে গেলে প্রায় ৬০০ বিভিন্ন টাইপের দরকার। নাগরী 'কলকতিয়া' হরফে ছাপাইতে গেলে ৭০০ টাইপ চাই, 'বোম্বাইয়া' হরফে ৪৫০ টাইপ চাই। রোমানে ইংরেজি ছাপিতে সাকল্যে দুই প্রস্থ capital letter এক প্রস্থ small letter প্রভৃতিতে প্রায় ১৫০ টাইপের দরকার হয়। আমি যেভাবে ভারতীয় ভাষার জন্য রোমান অক্ষর ব্যবহার করিতে বলি (আমার পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল), তাহাতে অনধিক চল্লিশটি অক্ষরেই সব কাজ চলিবে। কোথায় চল্লিশটির চেয়েও কম অক্ষর, আর কোথায় ছয় শত অক্ষর! ইহার দ্বারা ছাপার ব্যয়-সংক্ষেপে ও সময়-সংক্ষেপ কত হইবে, তাহা অনুমান করা যায়। তারপর, মাত্র চল্লিশটি অক্ষর চিনিয়া লইলেই মাতৃভাষা পড়িতে পারা যাইবে—সেটিও কম কথা নহে। দুই বৎসর ধরিয়া 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ' ও 'বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ' সাঙ্গ করিয়া তবে বাঙ্গালীর ছেলে মাতৃভাষায় লেখা বা ছাপা কিছু পড়িতে সমর্থ হয়। আমার প্রস্তাবিত রোমান হরফে সাধারণ বুদ্ধিমান্ ছেলে ৩।৪ মাসের মধ্যেই সমস্ত পড়িতে পারিবে।

'ক', 'খ', 'চ',—এইরূপ আকারের অক্ষরের বিশেষ কোনোও মাহাত্ম্য নাই; ইহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল ৮।৯ শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যোগ আছে, এইটুকু মাত্র। যদি প্রাচীনত্ব ধরিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা বা নাগরী 'ক, খ, চ', প্রভৃতি বর্জন করিয়া ব্রাহ্মীকেই গ্রহণ করিতে হয়। 'ক'-এর যদি একটি সংক্ষিপ্ত, সহজ-লিখনযোগ্য আকার ব্যবহার করি, তাহাতে ক্ষতি কী? আর এই আকার যদি রোমানের k-র আকারই হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কী? 'ক' না লিখিয়া k লিখিব; k হইবে আমাদের 'ক'—k-কে আমরা বলিব 'ক'—ইংরেজেরা যেমন এই অক্ষরের নাম করিয়াছে kay 'কে', সে-রকম 'কে' নাম আমরা দিব না। 'গ'-র নূতন রূপ হিসাবেও g গ্রহণ করিব,—g এই চিহ্নের নাম দিব 'গ'—ইংরেজদের মতো ইহাকে jee 'জী' বলিব না, ফরাসীদের মতো g-কে zhi বলিব না, স্পেনীয়দের মতো g-কে 'খে' নাম দিব না। 'হ'-এর নূতন রূপ হিসাবে যদি h গ্রহণ করিয়া, 'h' এই চিহ্নকে 'হ' বলি—ইংরেজদের মতো aitch 'এইচ্' না বলি, ফরাসীদের মতো ache 'আশ্' না বলি, স্পেনীয়দের মতো ache 'আচে' না বলি, তাহা হইলে কী যায় আসে? সরলতর বিধায় রোমান অক্ষরগুলিকে দেশী নামে আমাদের ভারতীয় অক্ষরের নবরূপ বা প্রত্যক্ষর হিসাবে গ্রহণ করিব; এবং অক্ষরগুলিকে আমাদের ভারতীয় বর্ণমালার 'অ আ, ক খ' আদি ক্রমে সাজাইব। ইহাতে ভারতীয় পদ্ধতির বর্ণক্রম বজায় থাকিবে, ভারতীয় নাম বজায় থাকিবে, আবার লেখা সহজ হইবে। এরূপ করিলে জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ থাকিবে না।

সাধারণতঃ 'ভারতীয় রোমান' বা 'ভারত রোমক' বর্ণমালা ব্যবহৃত হইলেও, প্রাচীন ভারতীয় লিপি একেবারে বর্জিত হইবে না। তান্ত্রিক মন্ত্রাদি লিখনের জন্য, অলংকরণের জন্য ভারতীয় লিপি (নাগরী, বাঙ্গালা, তেলুগু, গ্রন্থ, এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতি) ব্যবহৃত হইবার কোনও বাধা নাই। বিশেষ কার্য্যের জন্য কতকগুলি পণ্ডিত লোক দেশের প্রাচীন বর্ণমালা বলিয়া এক বা একাধিক ভারতীয় বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়া রাখিলে, ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির কার্য্য বেশ চলিয়া যাইবে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হইতেছে না, অতএব উন্নতি করিবার আবশ্যকতা নাই—এইরূপ মনোভাব সকলে গ্রহণ করিবে না। আমাদের ভালো জিনিসই আছে; আরো ভাল হয় কি না, দেখিতে ক্ষতি কী? ৬০০-র বদলে ৪০, দুই বৎসরের বদলে চারি মাস,—জাতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অর্থনৈতিক ও সময়-সম্পর্কীয় এবং মানসিক লাভালাভের খাতে এই দুই প্রকারের অঙ্কের অন্তর্নিহিত কথাটি ভাবিয়া দেখিবার নহে কি? স্থিরচিত্তে বিচার করিলে বুঝা যাইবে, একমাত্র sentiment অর্থাৎ জাতীয় লিপির প্রতি প্রাণের টান ছাড়া, রোমান অক্ষরের প্রতিকূলে কোনও যুক্তি নাই। অবশ্য sentiment একটা বড়ো জিনিস, এবং উপেক্ষণীয় নহে। তবে sentiment কেবল অন্ধভক্তি-প্রণোদিত না হইয়া, জ্ঞান- ও ভক্তি-মিশ্র হইলেই আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়।

সমগ্র সভ্য জগতে যে জাতিগুলি সবচেয়ে অগ্রগামী, তাহাদের মধ্যে রোমান লিপির প্রচলন রহিয়াছে। আরও বহুজাতি রোমান গ্রহণ করিয়াছে, করিতেছে, এবং করিবে। রোমানের মারফৎ সমগ্র জগতের সহিত ভারতের যোগ সাধিত হইলে ক্ষতি কী? রোমান বর্ণমালা এখন আর রোম বা ইতালি বা ইউরোপেই নিবদ্ধ নহে, ইহা এখন সার্বভৌম বর্ণমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইংরেজি ভাষা আর যেমন খালি ইংরেজ জাতির ভাষা নহে—ইহা সমগ্র জগতে আধুনিক যুগের সভ্যতার মুখ্য ভাষা লইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রোমান অক্ষর আজই কিংবা কালই আমাদের ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসকে মুছিয়া দিয়া, ভারতীয় বর্ণমালাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, একদিনেই ভারতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করুক্, এরূপ পাগলের প্রলাপ কেহ করিবে না। রোমানের কথাটা উঠিয়াছে; দেশের সংস্কৃতিকে যাঁহারা উপেক্ষা করেন না, এমন চিন্তাশীল লোকেদের কেহ-কেহ ইহার পোষকতা করিতেছেন; জিনিসটা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কী?

একেবারে শিশুদের রোমান অক্ষর শিখাইতে যাওয়া বাতুলতা হইবে। শিশুদের উপর দিয়া পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; দেখা গিয়াছে যে, তাহারা রোমান হরফের সাহায্যে মাতৃভাষা আরও শীঘ্র-শীঘ্র পড়িতে শিখে। কিন্তু রোমান হরফে ছাপা বই দুই-চারিখানির বেশি নাই, এইভাবে শিখিলে তাহাদের কোনও কাজের হয় না, ভারতীয় অক্ষর পরে তাহাদের শিখিতেই হয়। আগে বয়োজ্যেষ্ঠদের বুঝানো দরকার। বছর ৩০।৪০।৫০ ধরিয়া দুই প্রকার বর্ণমালা পাশাপাশি চলিবে—ভারতীয় লিপিতে লেখা ভারতীয় ভাষা, রোমান লিপিতে লেখা ভারতীয় ভাষা। ইংরেজি আছে বলিয়া, এমনি-ই তো রোমান লিপি আমাদের অনেককেই জানিতে হইতেছে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে রোমান লিপির সঙ্গে পরিচয় বাড়িতেছে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইংরেজ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও, ইংরেজি ভাষা ও সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী, জর্মান প্রভৃতি ভাষা আমরা ছাড়িতে পারিব না। কিছু প্রচার দরকার—লিখিত জনসাধারণের মধ্যে, কলেজ ও ইস্কুলে ছাত্রদের মধ্যে, সাধারণ অক্ষর-জ্ঞান-যুক্ত লোকেদের মধ্যে আলোচনার আবশ্যক। রোমান লিপিতে বাঙ্গালা, রোমান লিপিতে হিন্দী, রোমান লিপিতে তেলুগু প্রভৃতি দুই এক স্তম্ভ করিয়া ঐ ঐ ভাষার সাধারণ খবরের কাগজে মাঝে মাঝে ছাপাইতে পারা যায়। রোমান লিপিতে মাতৃভাষা লিখন প্রথমটা কলেজে ও ইস্কুলসমূহের উচ্চ শ্রেণীতে শিখাইতে পারা যায়। লোকে যখন ইহার উপযোগিতা বুঝিবে তখন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ভারতের সংস্কৃতির, ভারতের ভাষায় উপযোগী করিয়া ইহাকে গ্রহণ করিবে—তখন আর জাতীয় আত্মসম্মান লাঘবের কোনও কথাই থাকিবে না। বাহিরের বা উপরের চাপে ইহার প্রচার বা গ্রহণ ঘটিবে না—ইহার উপযোগিতা বুঝিয়া, আমাদের sentiment বা মনের টানের সঙ্গে মিশ খাওয়াইয়া, তবে আমরা নিজেরা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি।

একাধিক বার ভারতে রোমান লিপি চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও বার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কারণ সে চেষ্টা বাহির হইতে হইয়াছিল। আংশিক ভাবে দুই এক স্থলে রোমান লিপি চলিয়াছে, কিন্তু এতাবৎ দেশের অবস্থা ইহার পক্ষে অনুকূল ছিল না। পর্তুগীস রোমান কাথলিক পাদরিদের চেষ্টায় গোয়ার ভাষা কোঙ্কণী রোমান লিপিতে লিখিত হয়, গোয়ার খ্রীষ্টানেরা এই লিপি এখনও ব্যবহার করে। বাঙ্গালা ভাষায়ও রোমান লিপি ব্যবহৃত হয় পাদরিদের হাতে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। কিন্তু তাহা মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টানদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এবং পরে তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ হইতেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যালোচকগণ সংস্কৃত পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা রোমান লিপিতে লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং পরে ভারতীয় আধুনিক ভাষাও লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। মাঝে মাঝে দুই একজন উৎসাহী ইংরেজ, ব্যাপকভাবে ভারতীয় ভাষা লিখনের জন্য রোমান লিপি ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেশের লোকেদের সমর্থন বা উৎসাহের অভাবে তাহা কার্যকর হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১৯৩৫ সালে একজন ভারতীয় সিভিলিয়ান শ্রীযুত এ. লতীফী ভারতের তাবৎ ভাষার জন্য All-India Alphabet (বা Latifi Alphabet) নাম দিয়া রোমান অক্ষরের আধারের উপরে একটি বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রচার করিয়াছিলেন। এই বর্ণমালায় রোমান বর্ণগুলির অতিরিক্ত নূতন কতকগুলি অক্ষর তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, —এই সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলিকে ধ্বনিবাচক চিহ্ন রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। লতীফী সাহেবের এই All-India-Alphabet ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে; নানা বিষয়ে ইহা খুব গ্রহণযোগ্য নহে। আমি অন্যত্র ইহার সমালোচনা করিয়াছি। লতীফী সাহেব বড়োদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কবাড় বাহাদুরের কতকটা সমর্থন পাইয়াছিলেন, মহারাজার আনুকূল্যে তাঁহার প্রস্তাবিত 'লতীফী বর্ণমালা'র অল্প একটু প্রচারও হইয়াছিল।

রোমান বর্ণমালা ভারতীয় ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে, কতকগুলি মুখ্য বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। যে কয়টি রোমান অক্ষর সবত্র পাওয়া যায়, কেবল সেইগুলিতেই যাহাতে কাজ চলে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। সম্পূর্ণ নূতন অক্ষর হইলে, বা প্রচলিত অক্ষরের সঙ্গে মাত্রা বা চিহ্ন জুড়িয়া নূতন অক্ষর প্রস্তুত করিলে, রোমান অক্ষর চালানো কঠিন হইবে—কারণ এরূপ অক্ষর দুর্লভ—ভারতীয় ভাষায় রোমান বর্ণমালার পরীক্ষা বা সমীক্ষার যুগে খুব কমই ছাপাখানা নূতন অক্ষর কিনিয়া আনিতে বা নূতন অক্ষরের ছেনি কাটাইয়া আনিতে রাজী হইবে।

এই সমীক্ষার জন্য, ভারতীয় ভাষায় চলে কিনা তাহা দেখিবার জন্য, বাঙ্গালা বা নাগরী অক্ষরের পাশাপাশি বা সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারের উদ্দেশ্য লইয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃতের উপযোগী রোমান বর্ণমালা নীচে প্রদর্শিত হইতেছে।

এই প্রস্তাবিত **ভারত-রোমক** বর্ণমালায় **a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z** ঃ, সর্বত্র প্রাপ্য এই সাতাশটি রোমান অক্ষর ব্যবহৃত হইবে। ইহার সবগুলি বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃতের জন্য দরকার হইবে না, কতকগুলির ব্যবহার ফারসী, উর্দু প্রভৃতির জন্য নিবদ্ধ থাকিবে। এতদ্ভিন্ন এরূপ ব্যবস্থাও থাকিবে যে, আবশ্যক হইলে, **c e f h j k v** এই কয়টি অক্ষরকে উল্টাইয়া নূতন অক্ষররূপে, অর্থাৎ **ɔ ǝ ɟ ɥ ɾ ʞ ʌ** রূপে ব্যবহার করা যাইবে। এই নূতন অক্ষরের দ্বারা ও প্রচলিত ২৭টি অক্ষরের দ্বারা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং নিম্নে প্রদর্শিত কয়টি indicator বা 'সূচক-চিহ্ন' সাহায্যে, ভারতীয় ভাষাবলীর প্রায় তাবৎ ধ্বনি বা অক্ষর দ্যোতিত হইতে পারিবে।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হইবে বলিতে পারি, ইংরেজিতে প্রচলিত এই ২৭টি বর্ণ ছাড়া অন্য প্রকারের নূতন বর্ণ—তাহা পুরাতন অক্ষরকে উল্‌টাইয়া লইয়াই হউক, অথবা গ্রীক রুষ প্রভৃতি বর্ণমালায় ২।৪টি অক্ষর ধার করিয়া লইয়াই হউক—লোকে সাধারণতঃ লইতে চাহিবে না। সমস্ত ছাপাখানায় এইরূপ নূতন আকারেব বর্ণ মিলিবে না, এবং জনসাধারণ অপরিচিত বলিয়া এই-সব নূতন আকারের বর্ণ সম্বন্ধে উদাসীন অথবা বিরোধীই থাকিবে। সেইজন্য, প্রস্তাবিত 'ভারত-রোমক' বর্ণমালায় কেবল ইংরেজিতে ব্যবহৃত ২৭টি অক্ষরই রাখিতে হয়। তবে, ফরাসীতে বহুল প্রচলিত ও ফরাসী বর্ণমালায় ব্যবহৃত, আমাদের হাতের কাছে যাহা তৈয়ার রহিয়াছে এবং যাহা পাঠে ও প্রয়োগে অসুবিধা হইবে না, দীর্ঘস্বর জানাইবার জন্য এইরূপ টুপী-মাথায় এই পাঁচটি স্বরের হরফ 'ভারত-রোমক' বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়—সে পাঁচটি হরফ এই—â ê î ô û।

প্রস্তাবিত-সূচক চিহ্নগুলি এই—

[· : ´ ˝ ']

·=ফুট্‌কি বা বিন্দু;

:=কোলন, বা দুই বিন্দু;

´=বাড়ি, বা মিনিট চিহ্ন;

˝=দুই বাড়ি, বা সেকেণ্ড চিহ্ন,

'=টিকি বা ঊর্ধ্ব কমা।

প্রচলিত রোমান হরফের পাশে (অর্থাৎ পরে) এই সূচক চিহ্নগুলিকে যথা-আবশ্যক বসাইয়া দিয়া, মূল রোমান হরফ বা বর্ণ এবং সংযোজিত সূচক-চিহ্ন এই দুইকে মিলাইয়া, নূতন অক্ষর গঠিত হইবে—অতি সহজে বিনা আয়াসে। উপরন্তু পৃথক্ নূতন হরফের দরকার হইবে না। যেমন, n·, n:, n˝, t', s', a', u´, m· ইত্যাদি।

একটা বড়ো কথা। ভারত-রোমক লিপিতে রোমান বর্ণমালার capital letters প্রযুক্ত হইবে না। ইহাতে অনাবশ্যক ২৭টি হরফ বাদ পড়িল। স্থান- ও পাত্র-বাচক নাম—Proper Noun—জানাইতে, নামের পূর্বে [*] তারকা-চিহ্ন দিলেই চলিবে। এবং 'খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, ঢ়'—এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১১টি মহাপ্রাণ বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া অল্পপ্রাণ বর্ণ **k g c j t' d' t d p b r'**-এ প্রাণ বা হ-কার (**h**) যোগ করিলেই চলিবে—১১টি অক্ষরের বোঝা কমানো যাইবে।

প্রস্তাবিত ভারতীয়-রোমক বর্ণমালা এইরূপ দাঁড়াইবে (অক্ষরের পাশে বন্ধনীর মধ্যে যে নামে অক্ষরগুলিকে অভিহিত করিতে হইবে তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইল—স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাদের ইংরেজি নাম সর্বদা বর্জনীয়)—

ভারত-রোমক বর্ণমালা

(বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার জন্য)

স্বরবর্ণ

a=অ ;

â অথবা **a´**=আ (ফরাসীতে ব্যবহৃত এই **â** পাওয়া না গেলে, **a** ব্যবহার করিতে হইবে) ;

i=ই ; **î**, অভাবে **i'**=ঈ ;

u=উ ; **û**, অভাবে **u'**=ঊ ;

r'=ঋ ; **r:**=ৠ ;

l'=ঌ ; **l:**=ৡ ;

e=এ ; **o**=ও ; (দক্ষিণের ভাষায়, **e o**=হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও ; **ê** বা **e´**=দীর্ঘ এ ; **ô** বা **o'**=দীর্ঘ ও।)

ai=ঐ ; **au**=ঔ ; (**aï**, বা **a-i**=অ-ই ; **aü** বা **a-u**=অ-উ।)

am'=অং ; **an:**=অঁ ; **ân:** বা **a'n:**=আঁ ; **ah:**=অঃ।

ব্যঞ্জনবর্ণ

k (=ক) ; **kh** (=ক-য়ে হ, বা ক-য়ে প্রাণ খ) ; **g** (গ) ; **gh** (গ-য়ে হ, বা গ-য়ে প্রাণ ঘ) ; **n'** (মাথায়-ফুটকি ঙ) ;

c (চ) ; **ch** (চ-য়ে হ, বা চ-য়ে প্রাণ ছ) ; **j** (বর্গীয় জ) ; **jh** (জ-য়ে প্রাণ বা জ-য়ে হ ঝ) ; **n´´** (মাথায় দুই বাড়ি ঞ) ;

t' (মাথায়-টিকি ট) ; **t'h** (ট-য়ে প্রাণ বা ট-য়ে হ ঠ) ; **d'** (মাথায়-টিকি ড) ; **d'h** (ড-য়ে হ বা ড-য়ে প্রাণ ঢ) ; **n'** (মাথায়-টিকি মূর্দ্ধন্য ণ) ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

t (ত); **th** (ত-য়ে হ বা ত-য়ে হ প্রাণ থ); **d** (দ); **dh** (দ-য়ে হ বা দ-য়ে প্রাণ ধ); **n** (দন্ত্য ন);

p (প); **ph** (প-য়ে হ বা প-য়ে প্রাণ ফ); **b** (পুঁটলি-আলা বর্গীয় ব); **bh** (ব-য়ে প্রাণ বা ব-য়ে হ ভ); **m** (ম);

y (দো-ফরকা অন্তঃস্থ য); **r** (র); **l** (ল); **w** (আনাগোনা অন্তঃস্থ র=ওয়);

s" (মাথায় দুই বাড়ি তালব্য শ); **s'** (মাথায়-টিকি মূর্ধন্য ষ); **s** (সাপ-খেলানো দন্ত্য স); **h** (হ); **r'** (মাথায়-টিকি ড়); **r'h** (ড়-য়ে হ বা ড়-য়ে প্রাণ ঢ়);

ks' (ক-য়ে মূর্ধন্য ষ ক্ষ), **jn"** (জ-য়ে ঞ জ্ঞ)।

মন্তব্য—(১) **j**=বর্গীয় জ ; **y**=অন্তঃস্থ য (=y) ; কিন্তু বাঙ্গালা উড়িয়ার 'য' (=অন্তঃস্থ 'জ') জানাইবার জন্য, উচ্চারণ ধরিয়া **j** লেখাই সুবিধার হইবে। তবে অন্তঃস্থ-য-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য জানাইবার জন্য, য=**j"** ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, 'যাওয়া' শব্দ : **jâwâ** বা **ja'wa'** লেখাই সহজ হইবে, **j"âoyâ** বা **j"a'oya'** একটু কিম্ভূতকিমাকার হইবে। তবে বাঙ্গালায় অগণিত সংস্কৃত শব্দের বেলায় **j"** লেখা যাইতে পারে ; যথা যোগ= **j"og**, যদি=**j"adi**, যাজ্ঞবল্ক্য=***j"âjn"abalkya**, শুদ্ধ সংস্কৃত রূপ ***yâjn'avalkya** ইত্যাদি।

(২) শুদ্ধ সংস্কৃতে 'ড়, ঢ়' (**r'**, **r'h**) নাই, কেবল 'ড, ঢ' (**d'**, **d'h**).

(৩) সংস্কৃতের প্রতিবর্ণীকরণে 'বর্গীয় ব' (=**b**) এবং 'অন্তঃস্থ ব, বা র' (=**v**) সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন, বাঙ্গালার জন্য æ অক্ষরটিকে বাঙ্গালার বাঁকা এ-কারের প্রতীক স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন, **æk**=এক, **ekt'i**=একটি ; এবং চলিত বাঙ্গালার ইলেক-দেওয়া অ' (যেমন, ক'রে, চ'লে) ও আ' (যেমন, কা'ল) কে **a'** ও **â'** (বা **a"** রূপে লেখা চলিতে পারে —যথা, করে, চলে= **kare**, **cale** ; ক'রে, চ'লে=**ka're**, **ca'le** ; কাল=সময়, **kâl**, **ka'l** ; 'কলা'-অর্থে কা'ল=**kâ'l**, **ka"l**.

অক্ষরগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য

a=অ ; বাঙ্গালা ও হিন্দীতে অ-কার, আ-কারের ধ্বনি হইতে পৃথক্, আ-কার এই দুই ভাষায় অ-কারের ধ্বনির দীর্ঘ রূপ নহে ; আমরা 'স্বরে অ',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'স্বরে আ' বলি, কদাচ 'হ্রস্ব অ', 'দীর্ঘ আ' বলি না। কিন্তু সংস্কৃত হ্রস্ব-দীর্ঘ পদ্ধতি বজায় রাখিয়া—a=অ, â (বা a')=আ।

শব্দের শেষে আধুনিক ভাষায় অনুচ্চারিত অ-কার ভারত হইবে না।

r'—একটি ফুটকি দ্বারা, r:=দীর্ঘ ঋ-কারের বর্ণ বা ধ্বনি জানানো হইল। তদ্রূপ l'=ঌ, l:=ৠ।

n:—সানুনাসিকতার জন্য রোমান বর্ণমালায় (স্পেন দেশে ব্যবহৃত) যে tilde চিহ্ন আছে, (ইহার রূপ ~, স্বরের মাথায় বসে)—তাহা সর্বত্র সুলভ নহে বলিয়া, আমাদের প্রস্তাবিত ভারত-রোমক লিপিতে প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। [:] চিহ্ন (দুই বিন্দু) নাসিক্য n-বর্ণের পরে বসাইয়া, সমগ্র n:-কে, ঁ=চন্দ্রবিন্দুর প্রতীকরূপে, স্বরের হরফের পরে ব্যবহার করা যাইবে; যেমন পাঁচ=pân:c বা pa'n:c, কাঁপ=kân: p)।

n'', s'',=ঞ, শ ; ''-দ্বারা তালব্য ধ্বনি প্রকাশিত হইবে।

মাথায়-দীর্ঘ-মাত্রা-যুক্ত রোমান অক্ষর পাওয়া দুর্লভ, তাই অনন্যোপায় হইয়া স্বরবর্ণের স্বরে 'একবাড়ি' চিহ্ন দিয়া দীর্ঘস্বর জানানো হইবে—যথা â, ê, î, ô, û=আ, এ (দীর্ঘ), ঈ, ও (দীর্ঘ), ঊ-স্থলে a, e', i', o', u'। তলায় ফুট্‌কি বা অন্য চিহ্ন চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক—কিন্তু মাথায় বা পাশে চিহ্ন থাকিলে, পড়ার সময় কষ্ট হয় না; অধিকন্তু পৃথক্ বিশেষ চিহ্নের সহিত সংযুক্ত নূতন অক্ষরেরও আবশ্যকতা থাকে না।

বিদেশী ধ্বনি বা অক্ষরের জন্য ɔ, ə, q, f, x, j, v, q, x, z'', z', h' ব্যবহৃত হইবে। ə, বিকল্পে বাঙ্গালা অ-কারের জন্য চলিতে পারে—কিন্তু হিন্দী ও সংস্কৃতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অ-কারের জন্য a ব্যবহার করাই ভালো।

বিদেশী ভাষার ধ্বনির জন্য প্রস্তাবিত বর্ণ—

ə=ইংরেজির অস্পষ্ট আ-কার (যথা—ago, China প্রভৃতি শব্দের a), q=আরবীর 'অয়ন্ বা আয়েন' অক্ষর—সাধারণতঃ রোমান লিপিতে ইহা ['] রূপে প্রদর্শিত হয়; f, v—ইংরেজির দন্তৌষ্ঠ্য f, v-র ধ্বনি; q—উর্দু, ফারসী, আরধীর 'বড়ী কাফ' অক্ষর; x=উর্দু, ফারসী, আববীর 'খে' অক্ষর; z—ইংরেজির z, ফারসী ও উর্দুর জাল, জে, জোআদ ও জোয় অক্ষরগুলির জন্য; z''—ফারসীর ঝে অক্ষরের জন্য, ও ফরাসী j-র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

[illegible] জন্য ; h'=আরবীর 'বড়ী হে' অক্ষরের জন্য ; ‘=আরবীর 'আলিফ-[illegible]'র জন্য।

p ([illegible] অভিহিত এবং ভারতীয় বর্ণ-ক্রমে সজ্জিত 'ভারত-[illegible]); [illegible]মালা শিখিবার পরে, ভারতীয় বালক-বালিকাগণ যখন [illegible]খিবে, তখন ইংরেজি First Book পড়িবার কালে a, b, c, [illegible] করিয়া শিখিবে না ; তাহারা ভারতীয় ভাবেই শিখিবে। ইংরেজি শব্দেরও বানান করিবার সময়ে তাহারা অক্ষরগুলির ভারতীয় নাম-ই বলিবে। ইংরেজি neighbour (n-e-i-g-h-b-o-u-r) শব্দ বানান করিতে —'দন্ত্য ন-এ-ই-গ-হ-ব-ও-উ-র' বলিবে, ইংরেজির মোতাবেক 'এন্-ঈ-আই-জী-এইচ্-বী-ও-যু-আর্' বলিবে না ; যেমন ফরাসী দেশের ছেলে, ঐ ইংরেজি শব্দের বানান করিবার কালে, নিজ ভাষায় অক্ষরগুলির নাম অনুসারে— 'এন্-অ্য-ঈ-গ্রী-আশ্-বে-ও-যু-এয়ার্' বলে ; কিংবা যেমন স্পেন-দেশের ছেলে, 'এনে-এ-ই-খে-আচে-বে-অ-উ-এরে', অথবা সুইডেনের ছেলে, 'এন্-এ-ঈ-ইয়ে-হো-বে-উ-এরে' বলে। তদ্রূপ ***bhârater**—এই শব্দ বাঙ্গালায় বানান করা হইবে—তারা-চিহ্ন, ব-য়ে হ ভ (**bh**), আ (**â**), র (**r**), অ (**a**), ত (**t**), এ (**e**), র (**r**)' ; সৃষ্টি **dr's't'i**='দ (**d**), (মাথায় ফুটকি) ঋ-ফলা (**r'**), (মাথায় টিকি) মূর্দ্ধন্য ষ (**s'**), (মাথায় টিকি) ট (**t'**), ই (**i**)'। 'মাথায় ফুটকি, মাথায় টিকি, আনাগোনা র (**w**)' ইত্যাদি বর্ণনা, শিশু বা প্রথম শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদন অথবা স্মরণ-বিষয়ে সাহায্যের জন্য প্রস্তাবিত হইতেছে।

বাঙ্গালায় এই ভারত-রোমক বর্ণমালার প্রয়োগ দেখাইবার জন্য, নিম্নে এই প্রবন্ধের প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ এই বর্ণমালায় মুদ্রিত হইল। এই মুদ্রণ-কার্য্যে কোনও হরফের জন্য ছাপাখানার ইংরেজি টাইপ-কেসের বাহিরে যাইতে হয় নাই।

ভারতের সমস্ত ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিবার একটি ***bhârater samasta bhâs'â *román aks'are likhibâr e'kt'i** প্রস্তাব বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই প্রস্তাবটি **prastâb bahu kâl dhariyâ caliyâ âsiteche. ei prastâb-t'i** আপাত-দৃষ্টিতে এমনিই অনাবশ্যক ও জাতীয়তা-বিরোধী যে **âpâta-dr's't'ite emanii anâbas''yak o jâtîyatâ-birodhî j''e**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাদের দেশে সকলেই এই প্রস্তাব উত্থাপন-মাত্রেই তাহা
âmâder des"e sakalei ei prastâb utthâpan-mâtrei tâhâ
জাতীয়তা-বোধ-বর্জিত পাগলের প্রলাপ বলিয়া "পত্র-পাঠ"
jâtîyatâ-bodh-barjita pâgaler pralâp baliyâ "patra-pât"
বর্জন করিয়া বসেন, তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে
barjan karîyâ basen, tâhâr sambandhe konao kathâ s"unite
চাহেন না। কিন্তু প্রস্তাবটি উঠিয়াছে; যদিও এখন
câhen nâ. kintu prastâb-t'i ut'hiyâche ;—j"adi-o ækha
মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহার পক্ষে, এবং দেশের জন-সাধারণ
mus't'imeya byakti ihâr paks'e, ebam' des"er jana-sâdhâran'
ইহার সম্বন্ধে উদাসীন অথবা ইহার বিরোধী; আমার মনে
ihâr sambandhe udâsîn athabâ ihâr birodhî ; âmâr mane
হয়, শিক্ষিত জন-গণের মধ্যে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে
hay, s"iks'ita jana-gan'er madhye dhîre dhîre, ati dhîre,
এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। তুর্কী দেশে আতাতুর্ক
e-dike dr's't'i âkars'ita haiteche. *turkî des"e *âtâ-turk
কামাল পাশা রোমান হরফ চালাইয়াছেন, সকলেই তাহার
***kâmâl pas"â *roman haraph câlâiyâchen, sakalei tâhâr**
তারিফ করিতেছে—সমগ্র আরবী কোরান রোমান হরফে
târiph kariteche—samagra *ârbî *korân *roman haraphe
ছাপা হইয়াছে; পারস্তে-ও রোমান অক্ষর গ্রহণের
châpâ haiyâche ; *pârasye-o *român aks'ar grahan'er
প্রস্তাব উঠিয়াছে, এবং ফারসি ভাষায় ইউরোপীয় স্বর-
prastâb ut'hiyâche, ebam' *phârsi bhâs'ây *iuropîya swara-
লিপি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, এই স্বর-লিপির সহিত যে সব
lipi byabahr'ita hay baliyâ, ei swara-lipir sahit j"e sab
ফারসি গান প্রকাশিত হয়, বাধ্য হইয়া রোমান হরফেই
***phârsi gân prakâs"ita hay, bâdhyâ haiyâ *român haraphei**
লিখিত ও মুদ্রিত হইতেছে।
likhita o mudrita haiteche.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভারতীয়-রোমক লিপিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

নিরুদ্দেশ-যাত্রা

niruddes''-j''âtrâ

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত)

(s''rîj''ukta *rabîndranâth *t'hâkur racita)

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী ?
âr kato dûre niye j''âbe more, he sundarî ?

বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ?
balo, kon pâr bhir'ibe tomâr sonâr tarî ?

যখনই শুধাই, ওগো বিদেশীনী,
j''akhani s''udhâi, o go bides''înî,

তুমি হাসো শুধু মধুর-হাসিনী,—
tumi hâso s''udhu, madhura-hâsinî ;—

বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে তোমার মনে।
bujhite nâ pâri, ki jâni ki âche tomâr mane.

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি—
nîrabe dækhâo an'guli tuli—

অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি—
akûl sindhu ut'hiche âkuli—

দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে।
dûre pas''cime d'ubiche tapan gagan-kon'e.

কি আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে ?
ki âche hothây, ca'lechi kiser anwes'an'e ?

অবশেষে ভারতীয়-রোমক লিপিতে সংস্কৃতের নিদর্শন-রূপে গীতার প্রথম দুইটি শ্লোক দিতেছি—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ :

***dhr'tarâs't'ra uvâca :**

ধর্ম-ক্ষেত্রে কুরু-ক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
dharma-ks'êtrê *kuru-ks'êtrê samavêtâ yuyutsavah:/

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিম্ অকুর্বত সঞ্জয়॥
mâmakâh: *pân'd'avâs''caiva kim akurvata *san''jaya//

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সঞ্জয় উবাচ :

***san"jaya uvâca :**

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং
dr'sṭvâ tu *pân'd'avânîkam' vyûḍ'ham'

দুর্যোধনস্ তদা।
***duryôdhans tadâ/**

আচার্যম্ উপসংগম্য রাজা বচনম্ অব্রবীৎ॥
âcâryam upasan'gamya râjâ vacanam abravît//

ছাপার কাজে রোমান অক্ষরের আর এক সুবিধার কথা বলিয়া—পূর্বে যে কথার উল্লেখ করা হয় নাই—আপাততঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রোমান অক্ষরগুলি স্বল্পরেখ ও সরল হওয়ায়, ইহার টাইপ খুব ছোটো করা যায়, এবং টাইপ ভাঙ্গেও কম, ও কালিতে জোবড়া হয়ও কম। বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ স্মল-পাইকায় ছাপা হয়। আবার নাগরীতে স্মল-পাইকা বেশি চলে না, পাইকার-ই চল বেশি; বর্জাইসের মতো ছোটো অক্ষর নাগরীতে অত্যন্ত কম ব্যবহৃত হয়। জটিল অক্ষর বেশি ভঙ্গুর হয় বলিয়া, ও কালিতে বেশি জোবড়া হয় বলিয়া, চক্ষুর পক্ষে হানিকর। রোমান অক্ষরের মতো সরল বা স্বল্পরেখ অক্ষরে সে বিপদ্ কম।

পরিশেষে আর একটি কথা বলা উচিত। প্রস্তাবিত 'ভারত-রোমক' বর্ণমালায় সূচক-চিহ্ন ব্যবহারের যে পদ্ধতি প্রদত্ত হইল, তাহা পরীক্ষা-মূলক মাত্র, চরম কিছু নহে। বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত লইয়া এই পদ্ধতির খণ্ডন বা মণ্ডন অপেক্ষিত। রোমান লিপিতে প্রত্যক্ষর করার নীতি গৃহীত হইলে, বাকি সমস্ত সহজ ও সর্বজন-মান্য করিয়া লইতে দেরী হইবে না॥

"শারদীয়া আনন্দবাজার" পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত (১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। কিছু-কিছু সংযোজন-সহ সংশোধিত রূপে পুনর্মুদ্রিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম